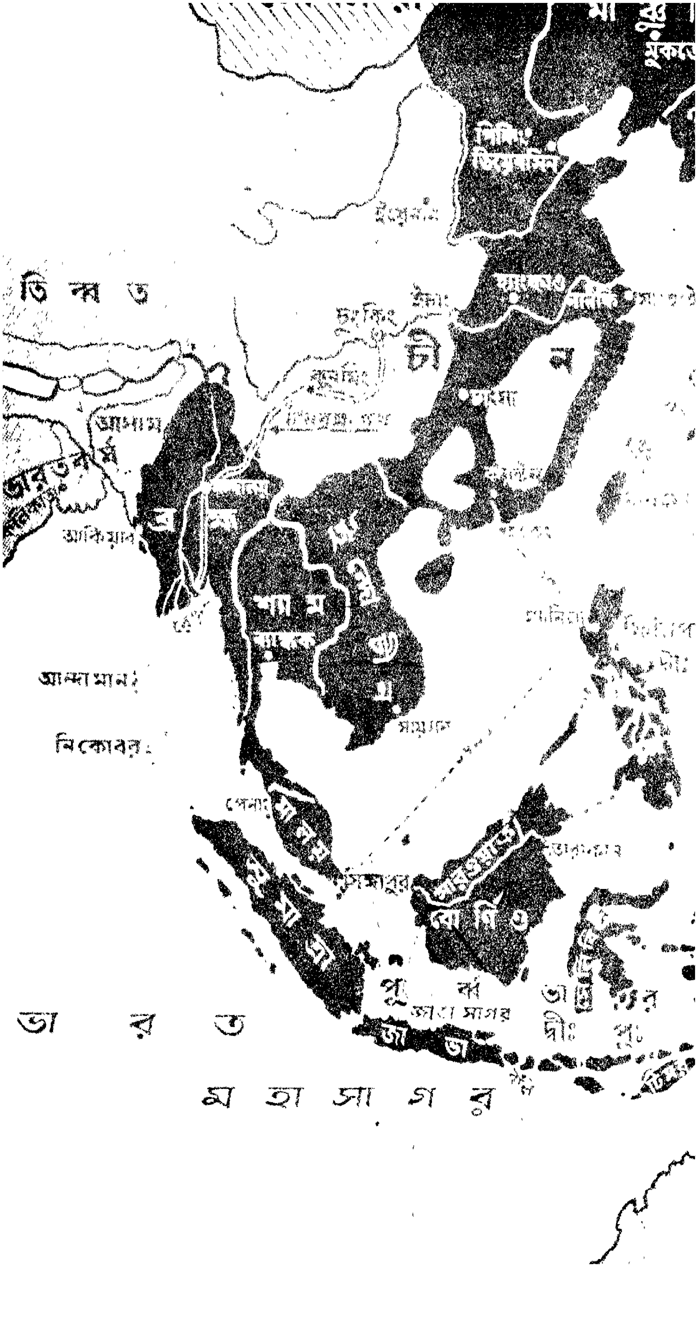
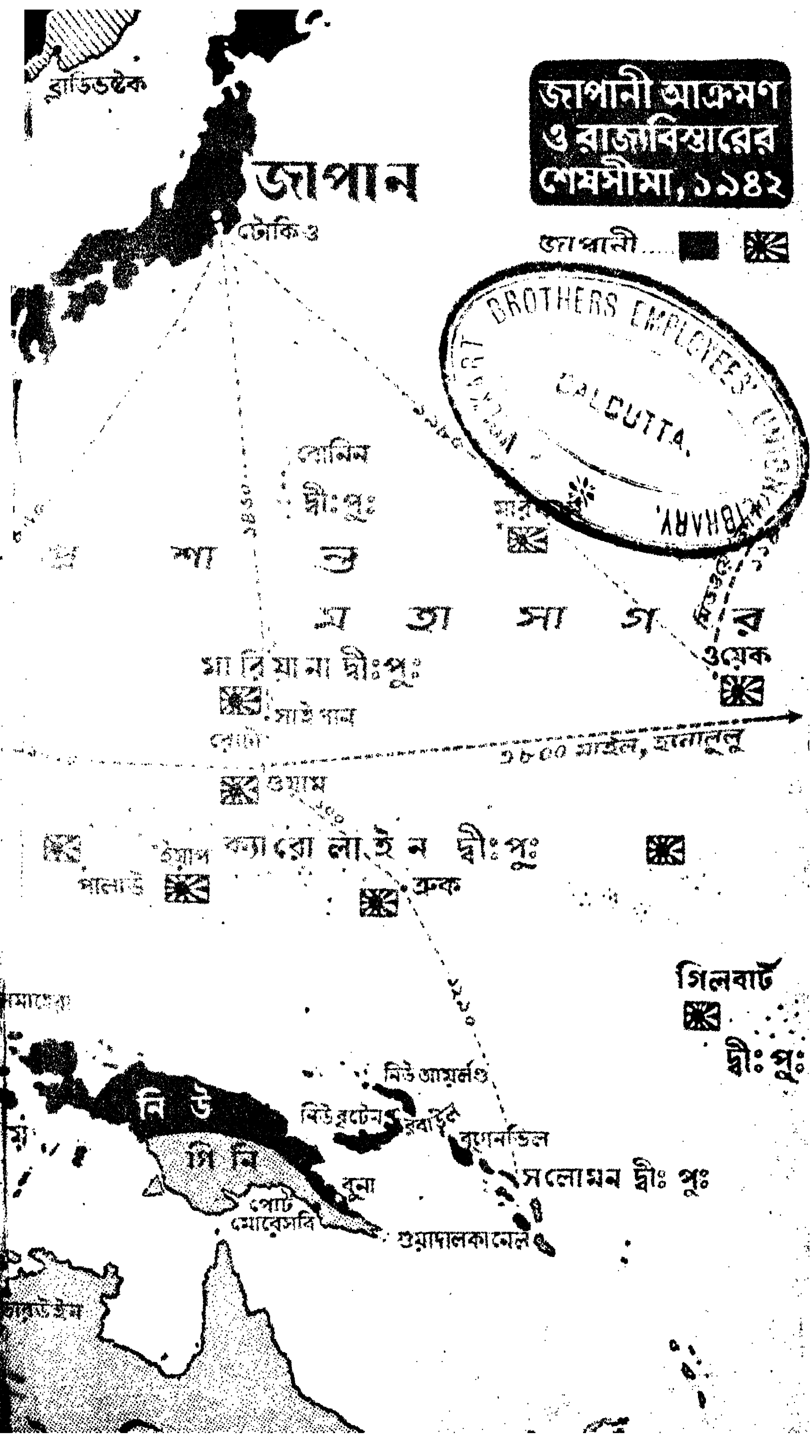

তি ব্ব ত
আসাম
আকিয়াব
শ্যাম
আন্দামান দ্বীঃ
নিকোবর দ্বীঃ
সিঙ্গাপুর
বোর্ণিও
জাভা সাগর
ভা র ত
ম হা সা গ র


জাপানী আক্রমণ ও রাজ্যবিস্তারের শেষসীমা, ১৯৪২
জাপানী....
ভ্লাডিভস্টক
জাপান
টোকিও
বোনিন দ্বীঃপুঃ
মারিয়ানা দ্বীঃপুঃ
সাইপান
রোটা
গুয়াম
ওয়েক
২৮০০ মাইল, হনোলুলু
ক্যারোলাইন দ্বীঃপুঃ
ইয়াপ
পালাউ
ট্রুক
গিলবার্ট দ্বীঃ পুঃ
নিউ আয়র্লণ্ড
নিউ ব্রিটেন
রবাউল
বুগেনভিল
সলোমন দ্বীঃ পুঃ
নিউ গিনি
বুনা
পোর্ট মোরেসবি
গুয়াদালকানেল

জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী

খ্যাতনামা সাংবাদিক

ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ., পি-এইচ. ডি.

করকমলেষু

—জীবনযুদ্ধের একটি নাটকীয় অধ্যায়ের স্মরণে—

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ঐ বৎসরই উহা নিঃশেষে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ১৯৪৪ সালেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে প্রেসের অসুবিধার দরুণ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে প্রায় বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। তবে, এই বিলম্বের ক্ষতি আমি অন্যভাবে পূরণের চেষ্টা করিয়াছি—প্রথম সংস্করণের সমস্ত ত্রুটি সংশোধনের ও পরিবর্জ্জনের দ্বারা। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যে সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং যে কয়খানা আমাদের দেশে পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির সাহায্য আমি গ্রহণ করিয়াছি। ফলে, **দ্বিতীয় সংস্করণ আগাগোড়া সংশোধিত, পরিবর্জ্জিত এবং প্রচুর নূতন ও বহু মূল্যবান সামরিক তথ্যের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।** বৃটেন ও আমেরিকার সহিত জাপানের যুদ্ধ বাধিবার একটি সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাসও গোড়ার দিকে দেওয়া হইয়াছে। মূল গ্রন্থ হইতে ইহাকে আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে, 'ডায়েরী'র দৈনন্দিন রূপ বজায় রাখিবার জন্য। এই ইতিহাস পড়িলে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও আমেরিকার তুলনায় জাপানকে উহার যুদ্ধের জন্য ততটা 'অপরাধী' করা যায় না, যতটা মিত্রপক্ষ প্রচার করিয়াছেন।

রণনীতি, রণকৌশল ও ইতিহাসের নূতন তথ্যের জন্য গ্রন্থের কলেবর আগের তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সমস্ত বিদেশী গ্রন্থ ও মতামতের সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহা পৃষ্ঠার নীচে পাদটীকায় (foot note) উল্লেখ করা হইয়াছে। শেষের দিকে দুইটি পরিশিষ্টে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপান ও আমেরিকার দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষের বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ নহে। কেননা মিত্রপক্ষের পাল্টা আক্রমণ ও জাপানের আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত উহা আলাদা পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। তবে, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে বর্ত্তমান ১৯৪৫ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধের সম্পূর্ণ দিনপঞ্জী দেওয়া হইয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা ও আণবিক বোমার আকস্মিক দানবীয় আঘাতে জাপান দ্রুত পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হইয়াছে। এশিয়ার একমাত্র

স্বাধীন ও শক্তিশালী রাষ্ট্র আজ ভূলুণ্ঠিত। ইহার জন্য আনন্দ বোধ করিবার কারণ নাই, বরং জাপানী নেতাদের ভ্রান্ত নীতির জন্য বেদনাবোধই করা উচিত।

প্রবলতর শক্তির সমাবেশে জাপান হারিলেও জার্ম্মানীর মতই জাপান রণনীতি ও রণকৌশলের কম বিস্ময় দেখায় নাই। 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী'র দ্বিতীয় সংস্করণে উহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। জাপানের নৌ-বহর, বিমানবহর এবং সৈন্যদলের নূতন পরিচয় এবং ব্রহ্মদেশ, মালয়, ফিলিপাইন এবং ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধের অপ্রকাশিত বহু তথ্য বর্ত্তমান গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই . হিসাবে বর্ত্তমান দ্বিতীয় সংস্করণকে নূতন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

বিলম্ব ও তাড়াহুড়া, এই উভয় কারণে দুই এক স্থানে ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। যেমন, ৫ পৃষ্ঠার নীচের দিকে—'বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্টের পিতা'র স্থলে 'পিতৃব্য' হইবে। এই ভুলের জন্য দুঃখিত।

প্রথম সংস্করণ বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহিরে যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল, (যাহা যুদ্ধ ও রণবিজ্ঞান সম্পর্কে দেশবাসীর নূতনতর চেতনা ও আগ্রহের পরিচায়ক), আশা করি এই পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ সেই জনপ্রিয়তাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায় আধুনিকতম মানচিত্র এবং 'কাফি খাঁ' প্রচ্ছদপট আঁকিয়া এই পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। ইতি—

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৫।

ভূমিকা

গোড়াতেই বালক বয়সের একটা স্মৃতির কথা লিখিতেছি। ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সময় গ্রামে দেখিতাম সংবাদপত্র লইয়া দস্তুরমত একটা বৈঠক বসিত। তখন দৈনিক পত্রিকার গ্রাম্য অঞ্চলে চল ছিল না। সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' কিম্বা 'বসুমতী' যাইত। সেই প্রকাণ্ড কাগজখানা পাটির মত বিছাইয়া দেওয়া হইত—উহার চারিদিকে ৫।৬ জন লোক বসিতেন এবং একজন গভীর মন দিয়া উহা পড়িয়া বাকি পাঁচজনকে শুনাইতেন এবং আবশ্যকমত বুঝাইয়া দিতেন। যুদ্ধ-সংক্রান্ত সংবাদ জানিবার এবং বুঝিবার জন্য লোকের অপরিসীম আগ্রহ লক্ষ্য করিতাম। যদিও আমি সেই সময় নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলাম, তথাপি বয়স্কদের বৈঠকে এক কোণে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া নিতান্ত কৌতূহলের সহিত জার্ম্মাণ যুদ্ধের আলোচনা শুনিতাম। সেই দূর অতীতের স্মৃতি সন্ধান করিলে আজও মনে পড়ে—এণ্টোয়ার্প দুর্গের পতনে সেই ক্ষুদ্র বৈঠকের চাঞ্চল্য। "জার্ম্মাণরা কাঁটা তারের বেড়া ডিঙ্গাইতেছে"—এই গোছের একটা ছবিও বাহির হইয়াছিল এবং সেই ছবিটা আমার বালকচিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছিল। ১৯১৮ সালের পর একে একে ২০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি আর সংবাদ-পত্রের গ্রাম্য পাঠক নহি। এক্ষণে আমার নিজের স্কন্ধেই একখানা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার পড়িয়াছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে যখন এই মহাযুদ্ধ বাধিল, তখন মনে পড়িয়া গেল আমার ছোট বেলার সেই গ্রাম্য বৈঠকের কথা—এই যুদ্ধ বুঝিতে হইবে এবং বুঝাইতে হইবে। সম্পাদক হিসাবে 'যুগান্তর' মারফৎ আমি সেই গ্রাম্য ভাষ্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। কল্পনা করিলাম আমার চারিদিকে উৎসুক পাঠকের জনতা—তাঁহাদিগকে এই মহাযুদ্ধের নীতি, প্রকৃতি এবং রণবিজ্ঞানের অসংখ্য অজ্ঞাত তথ্য বুঝাইয়া দিতে হইবে। ১৯১৪-১৮ সালের তুলনায় বর্ত্তমানে দেশ আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষায় ও আলোচনায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পাঠক সমাজের এই পরিবর্ত্তন আমি প্রতিদিন অনুভব করিলাম। নিতান্ত

সরলভাবেই স্বীকার করিতে পারি যে, আজিকার দিনে পাঠককে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে; গোঁজামিল দিয়া কোন জিনিষ বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, কিম্বা কেবল উচ্ছ্বাসের দ্বারাই পাঠকের চিত্ত জয় করা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও তথ্যানুসন্ধান আসিয়াছে—অন্ততঃ 'যুগান্তর' মারফৎ আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে। দেশবাসী এবং সংবাদপত্র উভয়ের পক্ষে ইহা প্রকাণ্ড লাভ।

আধুনিক যুদ্ধ বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য স্বভাবতঃই আমাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, রাশিয়া ও জাপানের বহু খ্যাতনামা রণপণ্ডিতের পুস্তক এবং স্বদেশী ও বিদেশী নানা পত্রিকায় বিশেষজ্ঞদের রচনা, তথ্য, আলোচনা ও সিদ্ধান্তের অবিরত সাহায্য লইতে হইয়াছে। এমন দিনও গিয়াছে যখন 'যুগান্তরের' একটিমাত্র যুদ্ধ-সংক্রান্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য আমাকে ক্রমাগত ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে এবং সেই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহের জন্য তিন চারি দিন ধরিয়া খাটিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র সামরিক ইতিহাসের দিক হইতে ধারাবাহিক সম্পাদকীয় আলোচনা ইতিপূর্ব্বে এই দেশে হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না এবং বর্ত্তমানকালেও বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে একমাত্র বোম্বাইয়ের 'টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া' ছাড়া আর কোন কাগজে এই ধরণের ধারাবাহিক আলোচনা দেখি নাই।

'যুগান্তরে' প্রকাশিত ধারাবাহিক সম্পাদকীয় আলোচনার যে অংশগুলি কেবলমাত্র জাপানের সহিত সংশ্লিষ্ট সেগুলিকে ভিত্তি করিয়াই বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইউরোপীয় যুদ্ধ অপেক্ষা জাপানী যুদ্ধের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতর যোগ এবং ভারতবর্ষের অধিকতর বিপদ থাকায় জাপান সম্পর্কেই আগে লিখিলাম। ইচ্ছা আছে এই মহাযুদ্ধের সমস্ত পর্ব্বগুলি একে একে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিব। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তারপর ৬ মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪২ সালের মে মাসের মধ্যে জাপান ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত দখল করিয়া ফেলে। কার্য্যতঃ জাপানী আক্রমণের পালা তখনই শেষ হইয়া গেছে। এই ৬ মাসের ঘটনাবলীই 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' নাম দিয়া প্রকাশিত হইল। 'ডায়েরী' নাম দেওয়ার কারণ এই যে, ডিসেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর দৈনন্দিন সংবাদ যেভাবে আমাদের নিকট আসিয়াছে, সেভাবেই উহা রচিত হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট তারিখ এবং সেই

তারিখের ঘটনাবলী সামরিক দিক হইতে কি তথ্য বহন করিয়া আনিল, অতীত ও ভবিষ্যতের সহিত ইহার কি প্রকার যোগাযোগ, কি হইতে পারিত এবং কি হওয়া উচিত, ইত্যাদি বহু দিক দিয়া ঘটনাবলীর বিচার করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, জল, স্থল ও আকাশ যুদ্ধের সামরিক তথ্য হিসাবেই দৈনন্দিন ঘটনাবলীর উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলিকে বিচার করা হইয়াছে। কোন রাজনৈতিক মতবাদের সংস্কার ও বদ্ধমূল ধারণা লইয়া রণক্ষেত্রকে বিচার করি নাই—যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দর্শক ও ভাষ্যকার হিসাবে কেবলমাত্র সামরিক ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই প্রবন্ধগুলি রচনা করিয়াছি। পাঠকবর্গের বিশেষভাবে স্মরণে রাখা দরকার যে, পুস্তকটি 'ডায়েরী'র আকারে রচিত বলিয়া কেবলমাত্র সেই সময়ের ঘটনাবলীর ফলাফলের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইহার মধ্যে দৈনন্দিন ঘটনাবলীর গবেষণা রহিয়াছে প্রচুর এবং এই গবেষণা সামরিক মতবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্ত্তী কালের ঘটনার দ্বারা এইগুলির অধিকাংশই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 'ডায়েরী'র আকারে লিখিত হওয়ায় পুস্তকের আগাগোড়া ঘটনাপ্রবাহের একটি দৈনন্দিন সুর রহিয়াছে ; ইতিহাস, ভূগোল এবং সমরবিদ্যার অসংখ্য প্রশ্নের দ্বারা ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করিবার জন্য এই সুর আমি শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছি।

একটি বিষয়ের উপর আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। দুরূহ শব্দ, বাগাড়ম্বর ও বাক্যের ছটা আমি যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছি। মহাত্মা গান্ধী একদা বলিয়াছিলেন যে, সংবাদপত্রের ভাষা হইবে জনসাধারণের ভাষা। যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রবন্ধের কঠিন বিষয়গুলি আলোচনার সময়েও এই আদর্শ স্মরণে রাখিয়াছি। সহজ, স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ভাষার সহিত সাহিত্যের রস সংমিশ্রণে এই প্রবন্ধগুলি রচনার চেষ্টা করিয়াছি। ত্রুটি, বিচ্যুতি কোথাও হয় নাই, এতখানি দাবী আমি করি না। তবে, উহা আমার জ্ঞানত: ঘটে নাই, সবিনয়ে ইহাই দাবী করিতে পারি। যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্যের সমাবেশের দিকেই নজর রাখিয়াছিলাম এবং সন্দেহের ক্ষেত্রগুলিকে সন্দেহের কোঠায়ই রাখিয়া দিয়াছি।

যদিও এই পুস্তকের ঘটনাবলীর মূল উপাদান 'রয়টার', 'এসোসিয়েটেড প্রেস' এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন সামরিক সংবাদদাতার বার্ত্তা ও বিভিন্ন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি এই-

গুলিকে আমি অন্ধের মত গ্রহণ করি নাই। সামরিক মতবাদ ও ইতিহাসের আলোকে যথাসম্ভব এইগুলিকে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি। তথাপি আমি জানি এই গ্রন্থ ইতিহাসের দিক হইতে সম্পূর্ণ নহে। কারণ, যুদ্ধ যখন চলিতে থাকে, তখন সমস্ত সত্য সংবাদ ও সত্য ঘটনা কোন দেশেই প্রকাশিত হয় না—সেন্সরের নিষেধবিধি সর্ব্বত্রই উগ্র। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, যুদ্ধ থামিবার অন্ততঃ ১০ বৎসর অতিক্রান্ত না হইলে আসল ইতিহাস রচনা করা যায় না। তথাপি সমসাময়িক ইতিহাসেরও গুরুত্ব এবং মূল্য আছে। কারণ আজিকার দিনে সত্য ঘটনা সম্পূর্ণ চাপিয়া রাখা যায় না এবং তেমন চেষ্টা করিতে গেলে যুদ্ধ চালনাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সিঙ্গাপুরের পতন বা প্যারিসের পতন, ইহা যেমন মিথ্যা নহে এবং একদিনের জন্যও এই ঘটনা-গুলিকে যেমন গোপন করা যায় নাই, তেমনই কেন এই দুর্ব্বিপাক ঘটিল মোটামুটি সেই বিবরণও পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে। এজন্যই যুদ্ধ চলিবার পথেই ইংলণ্ডে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ইতিহাসও ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী'তে যাহা লিখিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে, উহার মূল উপাদানগুলি মিথ্যা নহে। পাঠকবর্গ ইহা হইতে জাপানী রণনীতি ও রণকৌশলের একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন। যে সমস্ত দ্বীপ, উপদ্বীপ ও দেশ সাধারণতঃ আমাদের নিকট পরিচিত নহে, সেগুলিরও একটা সংক্ষিপ্ত এবং সরস পরিচয় দিতে আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নাই।

'যুগান্তরে' প্রকাশিত ধারাবাহিক সামরিক প্রবন্ধগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই এই পুস্তক রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রন্থ আকারে প্রকাশের সময় ইহার বহু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে হইয়াছে এবং অনেক নূতন তথ্য ও বিষয় ইহার মধ্যে সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং এই পুস্তক নূতন রচিত গ্রন্থ হিসাবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। পুস্তকটি প্রকাশিত হইবার কথা ছিল গত অক্টোবর মাসে, কিন্তু ছাপাখানার বিভ্রাট এবং যুদ্ধের দরুণ কাগজ, কালি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য এই পুস্তক বর্ত্তমান বর্ষের এপ্রিল মাসের আগে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিল না। এভাবে বিলম্ব হওয়ায় গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে বাঙ্গলার বিভিন্ন অংশে জাপ বোমারুর আক্রমণ কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইংরাজীতে যাহাকে up to date বলে, পুস্তকটি এক হিসাবে তাহাই। হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর,

ফিলিপাইন, ওয়েক, গুয়াম, পার্ল হারবার, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, দক্ষিণ ব্রহ্ম, উত্তর ব্রহ্ম ইত্যাদি সমস্ত স্থানের যুদ্ধ এবং কলিকাতা, চট্টগ্রাম, সিংহল, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার উপকূলের বিমান আক্রমণ ইত্যাদি সমস্ত আক্রমণকাহিনীই এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। মিত্রপক্ষের পাল্টা আক্রমণের সত্যকার সংগ্রাম এখনও সুরু হয় নাই বলিয়া পুস্তকটি শুধু জাপানী যুদ্ধের আক্রমণাত্মক অভিযানের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে। জাপান যখন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবে, তখন সেই পাল্টা-অভিযানের কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিবার আশা আছে।

'যুগান্তরে' প্রকাশিত সামরিক প্রবন্ধগুলির জন্য বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহিরের পাঠকসমাজ হইতে যে সাড়া, সহানুভূতি এবং সমর্থন আমি পাইয়াছি, উহারই উপর ভরসা রাখিয়া বর্ত্তমান পুস্তক রচনা করিলাম। এই অবসরে আমি সেই সহৃদয় পাঠকবর্গকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি।

মানচিত্র বিশারদ শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায় যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানাপ্রকার নক্সা ও মানচিত্র আঁকিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার মানচিত্রের দ্বারা যুদ্ধের গতি বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই পুস্তকে তাঁহারই অঙ্কিত বহু মানচিত্র 'যুগান্তর' কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি অনুসারে সন্নিবিষ্ট হইল। এজন্য তাঁহাকে এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার বহু বন্ধুবান্ধব এবং বিশেষভাবে আমার প্রীতিভাজন সহকর্ম্মী ও বন্ধু শ্রীশিবশঙ্কর মিত্রও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকেও আন্তরিকতার সহিত স্মরণ করিতেছি।

এই পুস্তকের প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছেন বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী 'কাফি খাঁ'। তাঁহার সঙ্গে আমার বন্ধুতার সম্পর্ক এত নিবিড় যে, আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে নূতন করিয়া ধন্যবাদ জানানো নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার প্রতিভা জয়যুক্ত হউক—শুধু ইহাই প্রার্থনা করিতে পারি।

'যুগান্তর' কার্য্যালয়
বাগবাজার, কলিকাতা
এপ্রিল, ১৯৪৩।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

মানচিত্র সূচী

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় : আক্রমণ পর্ব্ব

—১—

আক্রমণের বিস্ময়

৭ই ডিসেম্বর, '৪১।

আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের মন্ত্রিভবনে তখনও জাপ ও মার্কিণ গভর্ণমেন্টের মধ্যে আপোষের কথা চলিতেছে। টোকিও হইতে প্রেরিত বিশেষ দূত মিঃ কুরুসো ও রাজদূত এডমিরাল নোমুরা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট্ ও মিঃ কর্ডেল হালের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন কি ভাবে আমেরিকা ও জাপান পরস্পরের সহিত সম্মানজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে।* ইহার আগের দিন মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট জাপ সরকারের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, ফরাসী ইন্দোচীনে যে সমস্ত জাপসৈন্য

* কার্য্যতঃ ৯ মাস ধরিয়া জাপ-মার্কিণ আলোচনা চলিয়াছিল। বিরোধ ও নিষ্পত্তির বস্তু এত বৃহৎ যে, উহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। দীর্ঘকাল টানা-হেঁচড়ার পর ২০শে নভেম্বর (১৯৪১) তারিখ জাপান যে শেষ প্রস্তাব পেশ করে, উহার মর্ম্ম এই: (১) একমাত্র ফরাসী ইন্দোচীনের যে অংশে জাপ সৈন্য রহিয়াছে, সেখানে ছাড়া জাপ ও মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রে সসৈন্যে প্রবেশ করিবেন না, (২) জাপান ও চীনের মধ্যে কিম্বা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে ফরাসী ইন্দোচীন হইতে জাপ সৈন্য প্রত্যাহৃত হইবে (এই মীমাংসার ব্যবস্থায় রাজী হইলে জাপান ইতিমধ্যে ফরাসী ইন্দোচীনের দক্ষিণাংশ হইতে উত্তরাংশে সৈন্য লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছে।), (৩) ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে জাপান ও আমেরিকার যে সমস্ত পণ্য দ্রব্যের প্রয়োজন, উভয় গভর্ণমেন্টের পারস্পরিক সহযোগিতায় তাহা সংগৃহীত হইবে। (৪) সম্পত্তি ও টাকাকড়ি আটক (freezing) করার আগে উভয় দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের যেসম্পর্ক ছিল, তাহা পুনরুজ্জীবিত হইবে। জাপানের প্রয়োজনমত মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট তৈল সরবরাহ করিবেন (৫) জাপান ও চীনের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় বিঘ্নজনক কোন কার্য্য মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট করিতে পারিবেন না।

এই প্রস্তাবগুলি মার্কিণ গভর্ণমেন্টের মতে আপোষরফার অযোগ্য ছিল। কারণ, জাপানী যুদ্ধোদ্যমের বা আক্রমণাত্মক লক্ষ্য পরিত্যাগের কোন সর্ত্ত ইহাতে ছিল না। সুতরাং ২৬শে নভেম্বর মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট পাল্টা প্রস্তাব দাখিল করেন: (১) প্রশান্ত মহাসমুদ্র এলাকায় যাঁহাদের স্বার্থ রহিয়াছে, তেমন সমস্ত গভর্ণমেন্টের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি, (২) ইন্দোচীনের ভূমিগত সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার ও কোন প্রকার অর্থনৈতিক বিশেষ সুবিধা গ্রহণ না করা, (৩) চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ছাড়া অন্য কোন গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার না করা, (৪) চীনে সমস্ত বিদেশী শক্তির রাষ্ট্রাতিরিক্ত অধিকার পরিত্যাগ, (৫) পারস্পরিক সম-অধিকারসম্পন্ন ব্যবসায় বাণিজ্যের সর্ত্ত, (৬) পারস্পরিক টাকাপয়সা ও সম্পত্তি আটকের আদেশ প্রত্যাহার,

প্রেরিত হইয়াছে, উহার উদ্দেশ্যই বা কি এবং কারণই বা কি? টোকিও কর্ত্তৃপক্ষ জবাব দিলেন যে, চীন কর্ত্তৃক ফরাসী উপনিবেশ বিপন্ন হইতে পারে, এ জন্যই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন দরকার। ফ্রান্সের ভিসি গভর্ণমেন্টের সহিত জাপানের যে নূতন চুক্তি হইয়াছে তদনুসারেই এই সতর্কতার ব্যবস্থা। চুক্তির বাহিরে জাপান কিছু করে নাই। বলা বাহুল্য যে, এই জবাবে মার্কিণ গভর্ণমেন্ট সন্তুষ্ট হন নাই এবং ঐ দিনই বে-সরকারীভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, জাপান ১ লক্ষ ২৫ হাজার সৈন্য ইন্দোচীনে পাঠাইয়াছে এবং তাহারা ইন্দোচীনের বিভিন্ন ঘাঁটিতে উপনীত হইয়াছে। তথাপি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হাল ছাড়িলেন না, সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য তিনি স্বয়ং জাপ-সম্রাটের নিকট এক লিপি প্রেরণ করিলেন। উহার জবাব আসিবার আগেই ৭ই ডিসেম্বর তারিখ মার্কিণ মন্ত্রিভবন বা হোয়াইট হল হইতে ঘোষণা করা হইল যে, জাপানী নৌ ও বিমানবহর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবার, ওয়েক দ্বীপ এবং ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার উপর আকস্মিক আক্রমণ চালাইয়াছে। জাপানী রাজদূত ও বিশেষ দূত তখনও হোয়াইট হলে মার্কিণ গভর্ণমেন্টের সহিত আপোষের কথা চালাইতেছিলেন।............

আক্রমণের প্রাক্-মুহূর্ত্তের যবনিকা উত্তোলন করা গেল। পৃথিবীব্যাপী চাঞ্চল্য ও বিস্ময় দেখা দিল। ইহার ঢেউ আমাদের রাজধানী কলিকাতায় পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়া আনিল। বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় ১৯৪১ সালের বর্ষাকাল হইতেই কলিকাতায় আলোক ম্রিয়মান করা হইয়াছিল, দীপাধারে কালো মুখোস পরাইয়া কলিকাতাকে জাপ বোমারুর ভীতি হইতে রক্ষা করা হইতেছিল। এত আগেই যখন সতর্কতা, তখন জাপানী আক্রমণে বিস্ময়ের সৃষ্টি হইল কেন? ইহা কি অপ্রত্যাশিত ছিল?—না। ইহা কি অজ্ঞাত ছিল?—না। কিন্তু ইহা অবিশ্বাস্য ছিল। জাপানীরা সত্য সত্যই আমেরিকা, বৃটিশ সাম্রাজ্য, চীন ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ বা ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের

(৭) ডলার ও ইয়েন মুদ্রা বিনিময় হারের নির্দ্দিষ্ট মান স্থির করা ইত্যাদি।

—'American and Japanese Documents'—মার্কিণ সরকার ও হাচিন্সন এণ্ড কোং লিঃ (লণ্ডন) কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উভয় গভর্ণমেন্টের এই আপোষ সর্ত্তাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গের এই বিরোধ মূলনীতিগত। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য ছিল—লেখক।

(ইংরাজীতে ইহাই ABCD Powers নামে পরিচিত হইয়াছিল) সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে, কার্য্যক্ষেত্রে অনেকেই ইহা বিশ্বাস করেন নাই।*

বৃটিশ ও মার্কিণ কর্তৃপক্ষীয় মহলের ধারণা ছিল যে, জাপান শুধু ভয় দেখাইতেছে। জার্ম্মাণী ও ইতালীর দলে যোগ দিয়া এবং তাহাদের সহিত রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া জাপন মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে 'war on nerves' বা স্নায়ুমণ্ডলীর উপর লড়াইয়ের কসরৎ দেখাইতেছে।† চক্র-শক্তির সহিত ভিতরে ভিতরে চক্রান্ত করিয়া এবং পরাজিত ফরাসী গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া জাপান যেভাবে ফরাসী ইন্দোচীনে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, বৃটেন, আমেরিকা ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদির বেলায়ও তাহারা সেই একই কৌশল খাটাইতে চাহিতেছে। প্রকৃতপক্ষে জাপান যুদ্ধ করিবে না, বিনা যুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় তাহারা প্রবেশ করিতে চাহে, ইহাই ছিল অনেকের বিশ্বাস। যুক্তির দিক হইতে এই বিশ্বাস একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। সামরিক দিক দিয়া অনেকে এই যুক্তি দেখাইলেন যে, চীনের সহিত জাপানের নবপর্য্যায়ের যুদ্ধ চলিয়াছে ক্রমাগত চার বৎসর ধরিয়া। এই যুদ্ধে জাপান চীনের অধিকাংশ নগর ও বন্দর দখল করিয়া থাকিলেও চীনের সংগ্রাম শেষ করিতে পারে নাই। ম্যাক্স ভার্ণারের মত রণপণ্ডিতও বলিয়াছেন যে, আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধে জাপান প্রথম শ্রেণীর নহে, উহা ইতালীর মত দ্বিতীয়

---

* জাপানী আক্রমণের এক মাস আগে জেনারেল ওয়েভেল সেনানীমণ্ডলীসহ ব্রহ্মদেশ, মালয় ও সিঙ্গাপুরের অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলেন। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত সাক্ষাতের পর তাঁহার যে ধারণা হইয়াছিল, দীর্ঘকাল পরে তিনি তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন এবং সেই মন্তব্য এই—"There was a sense of unreality in all the preparations for war with Japan at that time ; no one seemed to believe in the possibility of Japanese attack and most keen soldiers I met asked me about transfer to an 'active' theatre"—'ষ্টেটসম্যান', ১৮ই জুন' ৪৪।

সিঙ্গাপুরের পতনের পর স্বয়ং মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি যুক্তির দ্বারা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, জাপানীরা সত্য সত্যই ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে।

† ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট বলিতেছেন যে, ৬ই ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত অনেক মার্কিণী গবেষক মনে করিয়াছিলেন যে, মিঃ কুরুসু শুধু ধাপ্পা দিতেছেন। আমেরিকা যাহাতে চিয়াং কাইশেককে আর সাহায্য না করে, মিঃ কুরুসু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে তেমন উস্কানিই দিতেছেন। আমেরিকার সহিত জাপানের কোন যুদ্ধ বাধিবে না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও আলাপ আলোচনার দ্বারা 'স্নায়ুর লড়াই' সাফল্যের সহিত চালাইতেছেন! সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত জাপান পিছু হটিবে!—'This Expanding War.'—লীডেল হার্ট প্রণীত।

বা তৃতীয় শ্রেণীর। যদি যান্ত্রিক সংগ্রামে জাপানের শ্রেষ্ঠতা থাকিত, তাহা হইলে চীনে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া লড়াইয়ের প্রয়োজন হইত না। চীনের যুদ্ধে জাপানের লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়োজিত। এত বড় যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া ঘটিবেই। ইহা ছাড়া মাঞ্চুরিয়া বা মাঞ্চুকুতে জাপানকে বহু লক্ষ সৈন্য রাখিতে হইয়াছে, সাইবেরিয়া সীমান্তে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত তাহার প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ চলিতেছে। রাশিয়া বৃটেনের বন্ধু: জাপান জার্ম্মাণীর বন্ধু। সুতরাং জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিলে সোভিয়েট রাশিয়াও অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইবে এবং রাশিয়ার ভ্লাডিভোষ্টক বন্দর হইতে ৭০০ মাইল দূরবর্ত্তী টোকিওর উপর দলে দলে রুশ বোমারু বিমান হানা দিয়া হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা বিস্তার করিবে। ইহা ছাড়া মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট গুয়াম্, ওয়েক ও ফিলিপাইন হইতে নৌবহর ও বিমানবহর পাঠাইয়া জাপান দ্বীপকে ঘিরিয়া ধরিবে। মার্কিণ নৌসচিব কর্ণেল নক্স তো দর্পভরে ঘোষণা করিলেন, জাপান যুদ্ধে নামিলে ১৪ দিনের মধ্যেই ভীমকায় মার্কিণ বোমারুগুলি জাপানকে ছারেখারে দিবে! অপর দিকে সিঙ্গাপুরের দুর্ভেদ্য নৌঘাঁটি, যাহা নৌজগতের এক বিস্ময়—সেই ঘাঁটি হইতে বৃটিশ নৌবহর হংকং নৌঘাঁটির সহিত একত্রে চীনা-সমুদ্রে জাপানী জাহাজগুলিকে কাবু করিয়া ফেলিবে। ইহার সঙ্গে আছে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সামরিক সহযোগিতা। অবশ্য জাপান জার্ম্মাণী ও ইতালীর সহিত রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা জাপানের কি লাভ হইবে? জার্ম্মাণী ও ইতালী রহিয়াছে সাত সমুদ্রের ব্যবধানে—বহু সহস্র মাইল দূরে। সুতরাং ইহারা কেহই পরস্পরকে সামরিক মাল-মশলা, সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতে পারিবে না। অতএব জাপানকে যদি যুদ্ধ চালাইতে হয়, তবে একাই চালাইতে হইবে। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা সম্ভব নহে।

তারপর বিশেষজ্ঞগণ আরও দেখাইলেন যে, আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রাম চালাইবার পক্ষে যে সমস্ত কাঁচামাল একান্তরূপে অপরিহার্য্য জাপানের তাহা নাই। লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, পেট্রোল, রবার, তূলা, পশম ইত্যাদি জাপানের কোথায়? ১৯৩৫ সালে জাপানে উৎপাদিত ইস্পাত শিল্পের পরিমাণ ছিল জার্ম্মাণীর একচতুর্থাংশ, মোটর-শিল্পে জাপান দুর্ব্বল। ১৯৩৬ সালে তয়োদা কারখানা (Toyoda Works) মাত্র ৪ হাজার মোটর গাড়ী ও লরি নির্ম্মাণ

করিতে পারিয়াছিল এবং ইহাই ছিল জাপানের গৌরব। জাপানের ট্যাঙ্ক উৎপাদনের ক্ষমতা বার্ষিক ৩ হাজারের বেশী নাই এবং বিমানযন্ত্রও বার্ষিক ৫ হইতে ৬ হাজারের বেশী তৈয়ার করিতে পারে না। ফলে, এক হাজারের বেশী এরোপ্লেন সে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে পারিবে না।* আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া (এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য) যেমন কাঁচামালে আত্মনির্ভরশীল, জাপান তাহা নহে। এই অবস্থায় জাপানের পক্ষে ব্যাপক যান্ত্রিক সংগ্রাম চালানো কি ভাবে সম্ভব? তারপর জাপানী বাণিজ্য ও নৌপথের যোগাযোগ রক্ষার প্রশ্নও চিন্তা করা যাইতে পারে। জাপান একান্তরূপে দ্বীপবাসী, তাহার বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের সহিত সারা পৃথিবীর যোগাযোগ। চীন, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, বৃটেন ও আমেরিকায় তাহার বিশাল কারবার—আমদানী ও রপ্তানী উভয় প্রকারের বাণিজ্যই তাহার চলিতেছে এবং এই বাণিজ্যই জাপানকে লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছে। আমেরিকা ও বৃটেনের সহিত যুদ্ধ বাধিবার ফলে তাহার এই বিশাল বাণিজ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বন্ধ হইয়া যাইবে এবং শত শত জাপানী বাণিজ্য-জাহাজ (Mercantile Navy) ওসাকা, ইয়াকোহামা ইত্যাদি বন্দরে অলস বসিয়া থাকিবে। যুদ্ধ কবে শেষ হইবে, ঠিক নাই। সুতরাং জাপানী জাহাজগুলি তাহার নিজস্ব বন্দরে নজরবন্দী থাকিয়া সমুদ্রের লোণা জলে পচিয়া যাইবে! কোন কোন বিশেষজ্ঞ বাণিজ্যিক ব্যাপারে সমুদ্রপথের যোগাযোগ রক্ষার প্রশ্নও তুলিলেন। ১৯৩৫ সালের হিসাবে দেখা গেল :—

(১) বিদেশ হইতে জাপানে যত পণ্য দ্রব্য আমদানী হয়, উহার শতকরা ১৯ ভাগ আসে চীন, মাঞ্চুরিয়া ও সাইবেরিয়া হইতে—জাপসমুদ্র, পীত সাগর ও পূর্ব্ব চীন-সমুদ্র পাড়ি দিয়া এইগুলি আসে।

(২) শতকরা ১৮ ভাগ আসে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ চীন-সমুদ্র পাড়ি দিয়া ভারতবর্ষ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোচীন ও হংকং হইতে।

(৩) শতকরা ১১·৫ ভাগ আসে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ফিলিপাইন হইতে।

---

* 'The Military Strength of the Powers'—by Max Werner.

(৪) শতকরা ৩৩ ভাগ আসে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে, এই দুই মহাদেশের তীর ধরিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়া।

(৫) শতকরা ১৮'৫ ভাগ আসে ইউরোপ ও মিশর হইতে। এইজন্য উত্তর সাগর, অতলান্তিক মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ চীন-সমুদ্র অতিক্রম করিতে হয়।

অর্থাৎ একমাত্র বৃটেনের সহিত যুদ্ধ বাধিলেই জাপানের সমস্ত আমদানী বাণিজ্যের প্রায় ৪৮ ভাগ বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ, সিঙ্গাপুরের নৌপথ দিয়া এই বাণিজ্যের স্রোত প্রবাহিত। কেবল আমদানী নহে, রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কেও এই অবস্থাই দেখা দিবে। সুতরাং বৃটেন, আমেরিকা, চীন ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের সহিত সংঘর্ষের অর্থ জাপানের বাণিজ্যিক জীবনের সর্ব্বনাশ। অতএব রাজনীতি ও অর্থনীতির বিচারে জাপান এত বড় যান্ত্রিক সংগ্রামে বাহির হইতে পারে না এবং বাহির হইলেও ৬ মাসের বেশী তাহার অভিযান চলিবে না। একমাত্র পেট্রোলের অভাবেই জাপান মারা পড়িবে!

বিশেষজ্ঞদিগের এই সমস্ত গবেষণার মূলে নিঃসন্দেহে যুক্তির সারবত্তা ছিল। কিন্তু মানুষের জীবন যেমন কেবল পুঁথিগত বিদ্যা ও তথ্যের দ্বারা চলে না, নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘাতে যেমন নূতন পথ ও উপায় দেখা দেয়, রাষ্ট্র-জীবনের ধারাও তেমনই নিছক 'থিওরি' বা তত্ত্ব ও তথ্যের কড়াকড়ি সীমানা ধরিয়া চলে না। অবস্থা ও সমস্যার সংঘর্ষে নূতন নূতন বুদ্ধির কৌশল ও পন্থা দেখা দেয়। মার্কিণ ও বৃটিশ প্রচারকগণ ও গবেষকদল জাপানের কেবল বিঘ্ন, বিপদ ও সমস্যার মন্দ দিক লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু এইগুলি অতিক্রমণের জন্য অন্যান্য উপায়ও যে থাকিতে পারে এবং কেবল একটিমাত্র সুপরিকল্পনাবদ্ধ অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা জাপান যে অধিকাংশ সমস্যাই ডিঙ্গাইতে পারে, গবেষকমণ্ডলী সেই দিক ধরিয়া অগ্রসর হন নাই। শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ অনেক সময় তাহার সত্যকার শক্তি ও বুদ্ধির দিক বিশ্লেষণে বাধা জন্মায়।* শত্রুকে তুচ্ছ করার পক্ষে যত যুক্তি ও তথ্য থাকিতে পারে

---

* জাপানী সরকারী পক্ষও মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ ও মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট জাপানকে ঘেরাও করিবার নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া অবস্থার বাস্তবরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—'failed to grasp the realities of the situation'. জাপানের ৫ শতেরও বেশী যুদ্ধজাহাজ এবং ৪ হাজারের অধিক বিমান ছিল। কিন্তু এইগুলি জাপান তখনই ব্যবহার করিবে, যখন তাহার জীবন-মৃত্যুর সমস্যা দেখা দিবে।—ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট প্রণীত 'This Expanding War'.

বিদ্বেষের উত্তেজনায় এবং নিজেদের সামরিক শক্তির উপর অন্ধ বিশ্বাসের ফলে তাহাই উগ্র হইয়া উঠে। জাপানী নৌবল সম্পর্কে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কিঞ্চিৎ স্পষ্ট চেতনা থাকিলেও প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিশালতা এবং মিত্রশক্তির নৌ ও বিমান ঘাঁটির উপর নির্ভরতা সেই শক্তিকে ততখানি মর্য্যাদা দেয় নাই। কিন্তু নৌবল সম্পর্কে যাহাই হউক, জাপানের বিমানশক্তি, সৈন্যবাহিনী, সঙ্ঘশক্তি এবং আক্রমণপটুতা ও দুর্দ্ধর্ষতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হইয়াছিল। বিশেষভাবে জাপানী বিমানশক্তি সম্পর্কে কোন সঠিক সংবাদ মিত্রপক্ষ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র এই একটি ক্রটীর জন্যই পরবর্ত্তী কালে মিত্রপক্ষের দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণনীতি ব্যর্থ হইয়া যায়।

কেবল ১৯৪১ সালের জাপান সম্পর্কেই বা কেন, ১৯১৪ সালের এবং ১৯৩৯ সালের জার্ম্মাণী সম্পর্কেও এমন মারাত্মক ভুল ধারণা করা হইয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে বড় বড় বৃটিশ ধুরন্ধরগণের মধ্যে একমাত্র লর্ড কিচেনার ছাড়া প্রায় বাকী সকলেই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, জার্ম্মাণী কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবে। এবারের মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেও চেম্বারলেন, দালাদিয়ের প্রভৃতি হিটলারের জার্ম্মাণী সম্পর্কে অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছিলেন। জার্ম্মাণী যে আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রামের ও সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের এত বড় ভয়াবহ বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, বৃটিশ ও ফরাসী পার্লামেন্টের সদস্যবর্গ হইতে সুরু করিয়া মন্ত্রিসভা, এমন কি সেনাপতিমণ্ডলী পর্য্যন্ত তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মিত্রশক্তি যেমন জার্ম্মাণীর সম্পর্কে ভুল ধারণা করিয়াছিলেন, জার্ম্মাণীও সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে অনুরূপ ভুল হিসাব করিয়াছিল। ১৯৪১ সালের জুন মাসে রাশিয়াকে আক্রমণের আগে হিট্‌লারী সমর-নেতাদের ধারণা ছিল যে, ১০।১২ সপ্তাহের মধ্যেই সোভিয়েট রাশিয়া ঘায়েল হইয়া যাইবে এবং নাৎসী নেতারা মস্কো হইতে ব্লাডিভোষ্টক পর্য্যন্ত মনের সুখে দীর্ঘ রেল ভ্রমণ করিতে পারিবেন! সৌভাগ্যক্রমে রণনীতিবিদ্‌ ও রাজনীতিবিশারদগণের এই ধরণের ভুল হয় বলিয়াই মানুষের পৃথিবী আজও টিকিয়া আছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ভালো মন্দ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের দ্বন্দ্বে বিশাল মনুষ্য সমাজ অগ্রগতির পথ খুঁজিয়া পায়। জাপানী আক্রমণের পূর্ব্বে মিত্র-শক্তির যে ভুল ধারণা ও স্বপ্ন-বিলাস ছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার কারণও

রণনীতির কৌশলের মধ্যে নিহিত, পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে পাঠকেরা তাহার সন্ধান পাইবেন।

—২—

আক্রমণের সন্ধিক্ষণ

৮ই ডিসেম্বর, '৪১।

ভোর রাত্রে জাপানী গভর্ণমেণ্ট বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং বৃটিশ ও মার্কিণ গভর্ণমেণ্টও পাণ্টা ঘোষণা জারি করিলেন। পরে জার্ম্মাণী ও ইতালীও আমেরিকার বিরুদ্ধে কাগজপত্রে অস্ত্র ধারণ করিলেন। মহাযুদ্ধ সত্যসত্যই সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। কিন্তু আগে আক্রমণ, পরে যুদ্ধ ঘোষণা ইহাই হইল নূতন নাৎসী রণনীতি। চরমপত্র দেওয়া, দাবী পেশ করা এবং আইনমাফিক সরকারী ঘোষণা—এই সমস্ত লেফাপাদুরস্ত কায়দার কোন বালাই নাই। ওয়াশিংটনে যখন দুইজন জাপানী দুত টোকিও সরকারের পক্ষ হইতে মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিলেন, তখন জাপান বিশ্বাসঘাতকের মত অতি অকস্মাৎ গুয়াম্, ওয়েক্, হাওয়াই ও ফিলিপাইন ইত্যাদি দ্বীপের উপর একযোগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনাকে তাঁহারা একটা cover বা আড়ালের মত ব্যবহার করিলেন। পদাতিক সৈন্যেরা যেমন ক্রমাগত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের আড়াল ধরিয়া প্রতিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, জাপানী সমর কর্ত্তৃপক্ষও তেমনই মার্কিণ সরকারের সহিত ক্রমাগত দিনের পর দিন আলোচনার আঁড়াল ধরিয়া অতি নিঃশব্দে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের সমস্ত মার্কিণ ও বৃটিশ ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। যে সমস্ত বিভিন্ন দ্বীপে ও ঘাঁটিতে জাপান একযোগে আক্রমণ চালাইয়াছে, সেগুলির দূরত্ব চিন্তা করিলেই স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে যে, জাপানের এই ব্যাপক আক্রমণ একটা সুনির্দ্দিষ্ট ও সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা অনুসারে ঘটিয়াছে। ফিলিপাইন হইতে গুয়াম্ ১৬২৫ মাইল, গুয়াম্ হইতে ওয়েক্ ১৫০০ মাইল, ওয়েক হইতে মিড্ওয়ে ১২৫০ মাইল, মিডওয়ে হইতে হাওয়াই ১৩১২ মাইল, হাওয়াই হইতে সান্ফ্রান্সিস্কো ২১০০ মাইল। আর জাপানের ইয়োকোসুকা নৌঘাঁটি হইতে ফিলিপাইন ১৭৪৯, গুয়াম্ ১৩৬০ এবং হাওয়াই ৩৩৭৪ মাইল। জাপান হইতে কতগুলি দীর্ঘবাহু বিস্তার করিলে এইভাবে বিশাল সমুদ্রে ছড়াইয়া পড়া

যায়? নিঃসন্দেহে জাপানী নৌবহর ও বিমানবাহী জাহাজগুলি কয়েকদিন আগেই প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘাঁটিগুলির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। এই বহুদূর বিস্তৃত আক্রমণের আয়োজনকে গোপন করিবার জন্যই জেনারেল তোজোর গভর্ণমেণ্ট ওয়াশিংটনে আলোচনা চালাইয়াছিলেন এবং মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সতর্ক সমরায়োজনের বদলে রাজনৈতিক পটভূমিকার দিকে আকৃষ্ট রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার এই ওস্তাদি একা জাপানেরই প্রাপ্য নহে—আগে আক্রমণ পরে যুদ্ধ ঘোষণা, চক্রশক্তির অন্যান্য বন্ধুরাও দুষ্টনীতির এই খেলা দেখাইয়াছেন। ১৯৩৫ সালে ইতালী আবিসিনিয়াকে হঠাৎ আক্রমণ করে, কিন্তু সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন, লক্ষ লক্ষ সৈন্য পোল্যাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম করিবার পর যুদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল জার্ম্মাণী অতি অকস্মাৎ ডেনমার্ক ও নরওয়ের উপর নৌবহর ও বিমানবহরযোগে ঝাঁপাইয়া পড়ে, কোন প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন ভোর বেলা হিট্‌লার অতি অকস্মাৎ রাশিয়ার উপর ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করেন। আজও চীনের বিরুদ্ধে জাপানের যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহা সরকারীভাবে ঘোষিত হয় নাই। মঃ ষ্ট্যালিন একদা বলিয়াছিলেন যে, আজিকার দিনে যুদ্ধ আর ঘোষিত হয় না, শুধু আরম্ভ হয়! সর্ব্বত্র নাৎসী আক্রমণ লক্ষ্য করিলে এই নূতন কৌশল ধরা পড়িবে। অথচ ১৯১৪ সালে যখন ইউরোপীয় মহাসংগ্রাম আরম্ভ হয়, তখন চরমপত্র, দাবী পেশ ও সরকারী ঘোষণার যথেষ্ট জমক ছিল। কিন্তু সেই 'রাশভারী' যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে; এক্ষণে যুদ্ধ যন্ত্রের বাহন, উহার গর্ভে বিদ্যুৎগতি নিহিত। উহা অপেক্ষা করিতে জানে না, প্রতিপক্ষকে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দেয় না। আকস্মিক ঘূর্ণিবাত্যার মত উহা বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝটিকার সহিত ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ কি? নেপোলিয়ন, যিনি আধুনিক যুদ্ধের জন্মদাতা, তিনি অতর্কিত আক্রমণের বিস্ময়ের (surprise attack) উপর অত্যন্ত জোর দিতেন, এমন কি তিনি ইহাকে যুদ্ধের essential factor বা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। আক্রমণ নীতির এই 'surprise' এর উপর জোর দিতে দিতে বর্ত্তমানে সমরনেতাগণ এমন এক স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছেন যে, অত্যন্ত হীন বিশ্বাসঘাতকতায়ও আর লজ্জা নাই! প্রতিপক্ষকে কোন রকমেই বিন্দুমাত্র সময় দেওয়া হইবে না, তাহাকে ২৪ ঘণ্টা আগেও সতর্ক করিয়া

দেওয়া হইবে না, গোপনে ও নিঃশব্দে ব্যাপক আক্রমণের পরিকল্পনা পাকা করিয়া হঠাৎ প্রচণ্ড অভিযান চালানো হইবে—যেন একটিমাত্র আঘাতের দ্বারাই প্রতিপক্ষ বিস্মিত, বিমূঢ় ও বিহ্বল হইয়া যায়! যদি প্রতিপক্ষকে একবার বিহ্বল করা যায়, তারপর অতি দ্রুত আঘাতের পর আঘাত হানিয়া তাহার সমস্ত পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয় আনা যাইবে এবং বিদ্যুৎগতিতে যুদ্ধের চরম ফল আসিবে। আকস্মিক আক্রমণের পশ্চাতে এই রণনৈতিক উদ্দেশ্য রহিয়াছে এবং এই কৌশলের দ্বারাই জার্ম্মাণী পশ্চিম ও পূর্ব্ব রণাঙ্গনে প্রচুর সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। জাপান জার্ম্মাণীর মিত্র ও রণনীতির দোসর। তাহার আক্রমণের প্ল্যান ও পদ্ধতিও নাৎসী জার্ম্মাণীর ধারা অনুসরণ করিয়াছে।

কিন্তু এই আকস্মিক আক্রমণই একমাত্র বড় কথা নহে, তার চেয়ে বড় কথা আক্রমণের সন্ধিক্ষণ বাছিয়া লওয়া। উপযুক্ত মুহূর্ত্তে উপযুক্ত আঘাত হানো—রণনীতির ইহা একটা প্রকাণ্ড শিক্ষা। গত ২০ বৎসর ধরিয়া জাপানী সমরনেতারা চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন যে, কিভাবে পূর্ব্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া হইতে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিপুঞ্জকে বিতাড়িত করিয়া বৃহত্তর জাপ সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলা যায়। এই বৃহত্তর জাপ সাম্রাজ্যকেই তাঁহারা এশিয়াটিক ফেডারেশন কিম্বা বৃহত্তর এশিয়ার ভ্রাতৃবন্ধনরূপে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।

১৯২৭ সালে জেনারেল ট্যানাকা প্রধান মন্ত্রীরূপে জাপ সম্রাটের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৫ সালে লেঃ কমাণ্ডার ইসিমারু যে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টরূপেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও রণনৈতিক মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছিল। জেনারেল ট্যানাকা লিখিলেন :—

"With all the resources of China at our disposal, we shall pass forward to the conquest of India, the Archipelago, Asia Minor, Central Asia and even Europe. But the first step must be the seizure of control over Manchuria and Mongolia…one day we shall have to fight against America. If we wish in future to gain control over China we must crush the United States".

এই পরিকল্পনার প্রথম ধাপ জাপান অতিক্রম করিয়াছে। দ্বিতীয় ধাপেরও একান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। লেঃ কমাণ্ডার ইসিমারু লিখিয়াছেন :—

"Should Britain not understand the elementary components of the present problem, Japan would profit by the weakening of the British Empire, the apathy of the dominions and the weakness and decadence of the British Navy; She would suddenly attack that navy when it is scattered throughout the seven seas. Australia and Newzealand would be the first aims of Japanese conquest. Hongkong would be taken quickly and India would be helped by an invasion."*

জাপানী সমরনেতাদের এই ধরণের মতবাদ প্রকাশ্যে প্রচার হইয়াছে। বৃটেন ও আমেরিকার রাষ্ট্রনেতারা ইহা উপেক্ষা করিলেও জাপান অলস বসিয়া থাকে নাই। কখন কোথায় কিভাবে আক্রমণ করিয়া সাম্রাজ্য বৃদ্ধির এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইবে—এই সুযোগের সন্ধানে জাপানী সমরকর্ত্তারা অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেজন্য তাঁহারা এমন একটা মুহূর্ত্ত বাছিয়া লইয়াছেন, যে মুহূর্ত্তের আক্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক হইবে। তাঁহাদের মতে Timing is the first act of war বা উপযুক্ত মুহূর্ত্তের আক্রমণই যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা বুদ্ধিমান রণনীতিজ্ঞের সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নাই। যদি কোন প্রতিপক্ষ উৎকৃষ্টতর এবং শ্রেষ্ঠতর শক্তিরও অধিকারী হইয়া থাকে, তথাপি তাহার যুদ্ধযাত্রার সময় যদি সুনির্ব্বাচিত না হয়, যদি উপযুক্ত মুহূর্ত্তে সে আক্রমণ করিতে না পারে, তবে শ্রেষ্ঠতর শক্তি সত্ত্বেও রণক্ষেত্রে তাহার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিতে পারে। ১৯০৪-৫ সালে রাশিয়ার সহিত জাপযুদ্ধের ইতিহাসে ইহার নজীর আছে। উপযুক্ত সময় নির্ব্বাচনের দিক হইতে জারের রাশিয়া নিদারুণ ভুল করিয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের গোড়ায় তাহার যে নৌবহর প্রশান্ত মহাসমুদ্রে ছিল, জাপ নৌবহরের তুলনায় উহা কোনক্রমেই হীন ছিল না। তাহার আর একটি নৌবহর ছিল ইউরোপীয় সমুদ্রে। যদি এই দ্বিতীয় নৌবহরের কিছু অংশও রাশিয়া পূর্ব্বাহ্নে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে পাঠাইয়া দিত, তবে জাপানের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হইত না।

* 'Japan must fight Britain'—লেঃ কমাণ্ডার ইসিমারু প্রণীত।

কিন্তু জাপানকে দীর্ঘকাল ধরিয়া শাসাইলেও তাহারা পোর্ট আর্থারের নৌবহরকে বাল্‌টিক নৌবহরের দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী করে নাই। পোর্ট আর্থারের নৌবহর ঘায়েল হইবার পর যখন বাল্‌টিক নৌবহর প্রাচ্যে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিল, তখন অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গেল এবং উপযুক্ত মুহূর্ত্ত পার হইয়া গেল। ফলে, বিনাযুদ্ধেই ইহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল নিজের ঘাঁটিতে! নিঃসন্দেহে রাশিয়ার মোট সমরশক্তি ও নৌবল জাপানের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল, তথাপি তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। কারণ উপযুক্ত মুহূর্ত্তে উপযুক্ত শক্তির সমাবেশ সে করে নাই। জাপানীরা জাত-যোদ্ধা, রণনীতির পটুতায় তাহারা ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

এবারের মহাযুদ্ধেও তাহারা এই রণনৈতিক বুদ্ধির কৌশল খাটাইয়াছে। একদিকে সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের শক্তিশালী বৃটিশ নৌঘাঁটি এবং অন্যদিকে ম্যানিলা, গুয়াম্, ওয়েক, পার্ল হারবার ইত্যাদি মার্কিণ নৌঘাঁটি—এই দুই দিকে জাপানের নজর ছিল। টোকিওর সমরকর্ত্তারা ইউরোপীয় যুদ্ধের অবস্থা বিশ্লেষণ করিলেন, ১৯৩৯ সাল হইতে তাঁহারা ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। যখন দেখিলেন যে, বৃটেনের নৌবহর ও বাণিজ্যবহরগুলি একান্তরূপে বিব্রত এবং অতলান্তিক, ভূমধ্যসাগর, উত্তর সাগর, ভারত মহাসাগর ইত্যাদি পৃথিবীব্যাপী নানা সমুদ্রে এই নৌবহর বিক্ষিপ্ত এবং মার্কিণ নৌবহরও বৃটেনের সাহায্যের জন্য অতলান্তিক মহাসমুদ্রে ব্যতিব্যস্ত, জাপানী কর্ত্তারা ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, জার্ম্মাণীর হাতে হল্যাণ্ড পরাজিত, সুতরাং ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ বেশীদিন বাধা দিতে পারিবে না। ফ্রান্স হিট্‌লারের পদানত, সুতরাং ফরাসী ইন্দোচীন জাপান নাৎসী বন্ধুত্বের দাবীতেই দখল করিতে পারে। ইন্দোচীন হইতে জাপানী সমরশক্তি চাপ দিলেই থাইল্যাণ্ড বশ্যতা স্বীকার করিবে। আর ইউরোপ ও আফ্রিকার যুদ্ধে বৃটিশশক্তি একান্তরূপে বিব্রত, সুতরাং সিঙ্গাপুরে তাহারা শক্তিশালী নৌবহর সমাবেশ করিতে পারিবে না এবং দীর্ঘকাল দক্ষিণ এশিয়ায় বাধা দিতেও পারিবে না। অন্যদিকে চীন ও রাশিয়া নিজেদের ঘর সামলাইতেই ব্যস্ত। অতএব আঘাত হানিবার সময় আসিয়াছে। একমাত্র প্রশ্ন ছিল আমেরিকার, কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে যদি আমেরিকার ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মার্কিণ নৌবহর ও বিমানবহর কোন্ পথে জাপানকে বাধা দিবে? জাপানের এজন্য প্রথম লক্ষ্য ছিল মার্কিণ ও

বৃটিশ নৌবহর যাহাতে কোন ক্ষেত্রেই একত্র হইতে না পারে, সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের নৌবহর চীনা সমুদ্রে বাধা দিতে না পারে এবং বিভিন্ন ঘাঁটিগুলি যাহাতে অতি দ্রুত হাতছাড়া হইয়া যায়। এই রণনৈতিক সঙ্কল্প স্থির করিয়া জাপান ৭ই তারিখ ভোর বেলা হইতে ৯ই তারিখ অর্থাৎ প্রায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওয়েক্, হাওয়াই, গুয়াম্, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়, থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি সর্ব্বত্র বিমান আক্রমণ ও স্থানে স্থানে নৌ-আক্রমণ আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সাংহাই দখল, ওয়েক্ বিপন্ন ও গুয়াম্ পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জাপান ইঙ্গ-মার্কিণ সমরশক্তিকে বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। শ্রেষ্ঠতর সমরশক্তি থাকা সত্ত্বেও মিত্রপক্ষ জাপানের কাছে অন্ততঃ সাময়িকভাবে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহাদিগকে নিদারুণ আত্মরক্ষার যুদ্ধে বা 'defensive war'-এর দিকে ঠেলিয়া দিল।

'Timing is the first act of war'—রণনীতির এই মতবাদ অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সন্দেহ নাই।

—৩—

নৌপথের আক্রমণ

১০ই ডিসেম্বর, '৪১।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্র যদি পাঠকবর্গ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে সহসা মনে হইবে যে, তাঁহারা যেন নিশীথ রাত্রির নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন! অসংখ্য ছোট বড় বিন্দু আকাশের অগণিত নক্ষত্রের মত পূর্ব্ব এশিয়ার তটভূমি হইতে আমেরিকার পশ্চিম তট পর্য্যন্ত ছড়াইয়া আছে। মহাসমুদ্রের বিস্তার এখানে কোথাও ৪ হাজার (টোকিও হইতে সানফ্রানসিস্‌কো সাড়ে ৪ হাজার মাইল), কোথাও বা ৫।৬ হাজার মাইল কিম্বা বেশী হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর যেন আকাশের মতই বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং আকাশের গায়ে অগণিত নক্ষত্রের মত অসংখ্য দ্বীপ মানচিত্রের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে! দ্বীপগুলি কোথাও বা মৌচাকের মত ঝাঁক বাঁধিয়াছে, কোথাও বা ছায়াপথের মত দ্বীপের সারি

বসিয়াছে; আবার কোথাও বা বহু দূরবর্ত্তী গ্রহ-উপগ্রহের মত একটি আর একটির কাছ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয় হইতে যদি অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত তাকানো যায়, তবে মনে হইবে কোন দুষ্ট বালক যেন কালি ছিটাইয়া দিয়া দুরূহ মানচিত্রবিন্যাস উপর প্রতিশোধ লইয়াছে! দ্বীপগুলি এত কাছাকাছি ও ঘেঁষাঘেঁষি যে, বোধ হয় বিভিন্ন সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথের উপর দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিলেই মালয় হইতে অনায়াসে অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি বা অন্য যে কোন দ্বীপান্তরে যাওয়া যাইবে। মহাসমুদ্রের বুদ্বুদের মত এই দ্বীপগুলি আজ রক্ত-সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে এবং উহাদের বুক আজ বোমায় বিদীর্ণ ও গোলায় বিধ্বস্ত হইতেছে। এই দ্বীপের সংখ্যা কত, তাহা গণিয়া লাভ নাই। কারণ, একা জাপানেরই নাকি আড়াই হাজার দ্বীপ রহিয়াছে! পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই এমন মানচিত্র লইয়া ভৌগোলিক সঙ্কটে পড়িবেন। তথাপি বলা যাইতে পারে মালয়, সুমাত্রা ও জাভা যেন তিনটি কচি বেগুনের মত লম্বমান হইয়া পড়িয়াছে এবং বোর্ণিও দ্বীপকে যেন অগ্রভাগ কর্ত্তিত শশার মত উহার পাশেই হেলাভরে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে! আজিকার জাপ সংগ্রামের পক্ষে ঠিক এই স্থানটিই মর্ম্মঘাতী। মালয় উপদ্বীপ যেখানে সুমাত্রা দ্বীপের মাঝামাঝি স্থানে পীঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আমাদের বহু-বিজ্ঞাপিত ও বহু-পরিচিত সিঙ্গাপুর এবং সিঙ্গাপুর হইতে কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব্ব কোণ ধরিয়া তির্য্যক রেখা টানিলে ফিলিপাইনে পৌছানো যাইবে। এই ফিলিপাইন ও উহার রাজধানী ম্যানিলা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নৌ ও বিমানঘাঁটি। কিন্তু সমুদ্রপথের সামরিক ভূগোল এখানেই শেষ হইল না। ম্যানিলা হইতে সোজা পূর্ব্ব দিকে সরল রেখা টানিলে গুয়াম্ দ্বীপ পাওয়া যাইবে। বৃটেনের পক্ষে যেমন সিঙ্গাপুর, আমেরিকার পক্ষে তেমনই গুয়াম্। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে এই দুই রাষ্ট্রের যুদ্ধের চরম মীমাংসা এই দুই কেন্দ্রে ঘটিতে পারে। গুয়াম্ হইতে ঈষৎ ঈশান কোণের দিকে রেখা টানিলে ওয়েক্ দ্বীপ হাতে আসিবে এবং ইহাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটি। আবার এখান হইতে একেবারে পূর্ব্ব দিকে সোজা পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বিখ্যাত পার্ল হারবার (পোতাশ্রয়) এবং বাঙ্গালী পাঠকের উদ্ভট কল্পনায় সিঞ্চিত হনলুলুর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। হনলুলু হইতে মাত্র আড়াই হাজার মাইলের একখানা লাফ দিতে পারিলেই আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো বন্দরে

পৌঁছিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যাইবে! সিঙ্গাপুর হইতে ম্যানিলা হইয়া যদি সানফ্রান্সিস্‌কো পর্য্যন্ত দীর্ঘ রেখা টানা যায়, তাহা হইলে দোদুল্যমান সেতুর মত উহা কৌতূহলকর রূপ ধারণ করিবে এবং এই সেতুর এক একটি প্রকাণ্ড ধাপকে বর্ত্তমান ইঙ্গ-মার্কিণ-জাপ যুদ্ধের এক একটি প্রাণ-কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে অবশ্যই পূর্ব্ব এশিয়ার তটভূমিস্থিত হংকং বন্দর এবং উহারই পার্শ্ববর্ত্তী ফরমোসা দ্বীপকে স্মরণে রাখিতে হইবে। কারণ, প্রশান্ত সমুদ্রের যুদ্ধে ইহারাও নিতান্ত অশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিবে। যুদ্ধকে সহজভাবে বুঝিতে হইলে এই জটিল মানচিত্রের সরল রূপটা চোখের সামনে রাখিতে হইবে।

জার্ম্মাণ ব্লিজক্রিগের ধারা অনুসরণ করিয়া জাপান সমুদ্রে, তটভূমিতে, দ্বীপে এবং উপদ্বীপে বিদ্যুৎগতি আক্রমণ চালাইয়াছে। এই আক্রমণ ব্যাপক, বৃহৎ ও তীক্ষ্ণ এবং ঘড়ির কাঁটার মত সুনির্দ্দিষ্ট সময়ের তালিকা ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে। রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ যেমন মরমনস্ক বন্দর হইতে ওডেসা বা ক্রিমিয়া পর্য্যন্ত একটানা দুই হাজার মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনের সংগ্রাম, প্রশান্ত মহাসমুদ্রের যুদ্ধ তেমন নিরবচ্ছিন্ন একটানা যুদ্ধ নহে, কিন্তু দৈর্ঘ্যে উহা রুশ-জার্ম্মাণ রণাঙ্গনকে ইতিমধ্যেই ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে। ইহার প্রথম কারণ বিমান এবং দ্বিতীয় কারণ নৌবহর। এই বিশাল সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপে অতি দ্রুত বিমানবহর ও নৌবহরের যুদ্ধ চলিবে এবং বিদ্যুৎগতিতে পরস্পর পরস্পরকে ঘায়েল করিতে চাহিবে। কিন্তু নৌ এবং বিমান যুদ্ধই ইহার শেষ কথা নহে, ইহার সঙ্গে স্থলপথের যুদ্ধ অনিবার্য্যরূপে দেখা দিয়াছে এবং স্থলপথের আরও বিস্তার ঘটিবে। অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিণ-জাপ যুদ্ধ জলে, স্থলে ও আকাশে যুগপৎ সমান তীব্রতা ও সমান দ্রুততার সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। জাপান প্রথম আক্রমণ সুরু করিয়াছে এবং তাহাও অতর্কিতে ও সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে। সুতরাং প্রথম সুবিধা জাপানই পাইবে। ইতিমধ্যেই হাওয়াই দ্বীপের পার্ল পোতাশ্রয় জখম, ওয়েক্ দ্বীপ আক্রান্ত, সাংহাই অধিকার এবং হংকং অবরুদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি কেন্দ্রই ইঙ্গ-মার্কিণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ছাড়া ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর এবং অন্যান্য স্থানেও বিমান ও নৌ-আক্রমণ ঘটিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ দেখা দিয়াছে স্থলপথে এবং তাহা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রান্তে। ইন্দোচীনে জাপান অনেক দিন আগেই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেখানে নৌ ও বিমান ঘাঁটি দখল করিয়া জাপান এতদিন অপেক্ষমান ছিল। আজ শ্যাম উপসাগর হইতে নৌবহরের সাহায্যে একদিকে মালয় ও অন্য দিকে শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। থাইল্যাণ্ড জাপানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া জাপ-সৈন্যের জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দিয়াছে। ফলে ব্রহ্মের সীমান্ত আজ প্রত্যক্ষভাবে এবং একান্তরূপে বিপন্ন। মালয় উপদ্বীপেও জাপ সৈন্যেরা অবতরণ করিয়াছে এবং এতক্ষণে সাম্রাজ্য সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শ্যাম ও মালয় উপদ্বীপে নিদারুণ সংগ্রাম চলিতেছে। যদি হংকং ও গুয়াম্ সত্যই অবরুদ্ধ ও বেষ্টিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৃটিশ ও মার্কিণ নৌবহর অবিলম্বে জাপানকে ঘায়েল করিতে পারিবে না এবং যে সিঙ্গাপুর লইয়া এত বিজ্ঞাপন ও হৈচৈ হইতেছে, তাহা ফ্রান্সের বিখ্যাত ম্যাজিনো লাইনের দশায় পৌছিতে পারে। কারণ, জাপানের নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী সিঙ্গাপুরকে পাশে রাখিয়া মালয় ও শ্যামে প্রবেশ করিয়াছে। উদ্দেশ্য নিতান্ত স্পষ্ট—ব্রহ্মদেশকে প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া এবং সিঙ্গাপুরকে বিচ্ছিন্ন করা।

জাপানীদের নৌ-আক্রমণ এই উদ্দেশ্যকে সহজ করিয়া তুলিয়াছে। মালয়ে জাপানীদের অবতরণে বাধা দেওয়ার জন্য বৃটিশ নৌবহরের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান দুইটি যুদ্ধজাহাজ পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু এই ভীমকায় রণ-পোত দুইটি 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস' এবং 'রিপালস্' ১০ই তারিখ সকালে জাপানীরা মালয়ের অদূরবর্ত্তী সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়াছে। 'প্রিন্স্ অব ওয়েলস্' ৩৫ হাজার টনের ব্যাট্‌লশিপ, উহার গতি ঘণ্টায় ৩০ নটেরও অধিক, এত বড় যুদ্ধজাহাজের এত বেশী পরিমাণ গতি কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর। উহার অস্ত্রসজ্জাও অতুলনীয়। একমাত্র ১৪ ইঞ্চি ব্যাসের অতিকায় কামানের সংখ্যাই ছিল ১০টি, ইহা ছাড়া আরও ১৬টি কামান ছিল। কোন প্রকার গোলাগুলী ইহাকে বিদ্ধ করিতে পারিবে না বলিয়া ধারণা ছিল। কারণ, ১৬ ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের বর্ম্মের দ্বারা ইহার দুই পার্শ্ব ঢাকা ছিল। আক্রমণাত্মক এবং আত্মরক্ষার বর্ম্মে ইহা জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ইহা একান্তরূপে আধুনিকতম মডেলে তৈয়ারি জাহাজ, ১৯৩৯ সালের মে মাসে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। 'রিপালস্' বিগত মহাযুদ্ধের আমলে ১৯১৬ সালের আগষ্ট মাসে তৈয়ারি হইয়াছিল। ইহাও ৩২ হাজার টনের ভীমকায় রণতরী বা ব্যাট্‌ল-ক্রুজার, ইহাতে ১৫ ইঞ্চি ব্যাসের ৬টি

অতিকায় কামান এবং ৪ ইঞ্চি ব্যসের ১২টি কামান ছিল। বলা বাহুল্য যে, এইগুলির নির্ম্মাণে কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। এডমিরাল স্যার টম ফিলিপস্ ছিলেন প্রাচ্য সমুদ্রের বৃটিশ নৌবহরের প্রধান সেনাপতি। ক্যাপ্টেন জে সি লীচ্ 'প্রিন্স অব ওয়েলসের' অধিনায়ক ছিলেন। এই দুইজন বৃটিশ সেনাপতি এবং আরও ৬ শত লোক সমুদ্র-গর্ভে সমাধিলাভ করিয়াছে। দুই জাহাজে মোট সিপাই লস্করের সংখ্যা ছিল ২৯২৫। বাকি ২৩০০ জনকে উদ্ধার করা হইয়াছিল। এই দুর্ঘটনার কথা মিঃ চার্চ্চিল গভীর দুঃখের সঙ্গে কমন্স সভায় ঘোষণা করেন এবং বলেন,…'their loss alters the whole balance of naval power in Malayan waters in favour of Japan'—এই জাহাজ দুইটি হারাইবার ফলে মালয় সমুদ্রে সমগ্র নৌশক্তির ভারসাম্যের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল এবং উহা জাপানের অনুকূলে গেল। প্রকৃতপক্ষে বৃটেনের নৌবহরের ইতিহাসে এত বড় দুর্ঘটনা আর ঘটিয়াছে কিনা, সন্দেহ।

জাপানীরা বলিতেছে যে, তাহারা বৃটিশ নৌবহরের গতিবিধির উপর নজর রাখিয়াছিল, মঙ্গলবার অপরাহ্ণে একখানি জাপানী সাবমেরিণ সন্ধান পায় যে, বৃটিশ নৌবহর সমুদ্রে বাহির হইয়াছে। তখন বিমানবহরের সহযোগীতায় সাবমেরিণগুলি বৃটিশ নৌবহরকে খুঁজিতে বাহির হয়। বিমানবহরগুলি অবিলম্বেই বৃটিশ যুদ্ধজাহাজকে আক্রমণ করে।

এই প্রসঙ্গে দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ যথেষ্ট কৌতুকপ্রদ। মিঃ পিটার ওয়ালটন সিঙ্গাপুর হইতে রেডিওযোগে বলেন—"এডমিরাল ফিলিপস্ সিঙ্গাপুর হইতে জাহাজ দুইটি লইয়া যাত্রা করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল জাপানীদের দৃষ্টি এড়াইয়া তিনি উত্তর মালয়ে ও দক্ষিণ থাইল্যাণ্ডে, যেখানে জাপানীরা অবতরণ করিতেছে, যথাসম্ভব উহারই কাছাকাছি গিয়া উপস্থিত হইবেন। আবহাওয়া প্রথমতঃ আমাদের সহায়ক হইয়াছিল। বৃষ্টি ও মেঘের আড়াল ধরিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম, কিন্তু মঙ্গলবার অপরাহ্ণে সূর্য্যাস্তের কিছু আগে আবহাওয়া পরিষ্কার হইয়া গেল। এই সময় একখানি জাপানী বিমান (পর্য্যবেক্ষণকারী) যুদ্ধ জাহাজটিকে লক্ষ্য করিয়া গেল। 'রিপালস্' হইতে লাউডস্পীকারযোগে কমাণ্ডারের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'শত্রু বিমান আমাদিগকে ছায়ার মত অনুসরণ করিতেছে।' খানিকক্ষণ পরে ঘোষণা করা হইল যে, যে লড়াইয়ের

আশা লইয়া যাইতেছিলাম, তাহা ত্যাগ করা হইল এবং যুদ্ধজাহাজ সিঙ্গাপুরে ফিরিয়া যাইতেছে।

মঙ্গলবার সারারাত্রি ধরিয়া জাহাজ দুইটি বাহির সমুদ্রে চলিতে লাগিল। পরদিন সকালে আরও পর্য্যবেক্ষণকারী জাপ বিমানের আবির্ভাবের পর বোমারুর দল দেখা দিল।

বোমারুগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিল, অধিকাংশই টর্পেডো নিক্ষেপ করিল। বস্তুতঃ আমি যতদূর দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে, একটিমাত্র বোমা একটা জাহাজে পড়িয়াছিল। কিন্তু উহা দ্বারা খুব মারাত্মক ক্ষতি হয় নাই, তবে টর্পেডোগুলিই আসল ক্ষতি করিয়াছে। মোট ৬০ খানা জাপানী বিমান আসিয়াছিল, ১৭ হাজার ফুট বা ৩ মাইলেরও অধিক উর্দ্ধ হইতে তাহারা আক্রমণ করে। 'প্রিন্স অব্ ওয়েলসের' উপর ৩ ঘণ্টা ধরিয়া আক্রমণ চালানো হয়। জাপানী টর্পেডো-বিমানগুলি যুদ্ধজাহাজ দুইটির গতিপথে টর্পেডো ছাড়িতে থাকে। 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস' সিগন্যালযোগে 'রিপালসকে' জিজ্ঞাসা করে যে, সে আহত হইয়াছে কিনা? উত্তরে 'রিপালস' বলে—'এই পর্য্যন্ত ১৯টি টর্পেডো এড়াইয়াছি। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ!"

কলম্বিয়া বেতারের সিসিল ব্রাউন নিউইয়র্কে তার করিলেন—"মালয়ের তীর হইতে অনেক দূরে দক্ষিণ চীনসাগরে যখন জাপানীদের দুরন্ত আক্রমণে রণতরী 'রিপালস্' ডুবিয়া যায়, তখন আমি উহার আরোহী ছিলাম। জলের উপর পুরু পেট্রোলের (জাহাজ হইতে নির্গত) ভিতর দিয়া যখন সাঁতার কাটিতেছিলাম, তখন আধ মাইল দূরে 'প্রিন্স অব্ ওয়েলসকে'ও সমুদ্রগর্ভে তলাইয়া যাইতে দেখিলাম। এবারের মহাযুদ্ধে বৃটিশ নৌবহরের এত বড় সাংঘাতিক ক্ষতি আর হয় নাই। 'রিপালস্' যখন একদিকে কাৎ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন অন্যান্য শত শত লোকের মত আমিও ২০ ফুট লাফ দিয়া জলের উপর পড়িলাম এবং পেট্রোল মিশ্রিত জল যাহাতে নাকে মুখে না ঢুকে ও বিস্ফোরণের ধাক্কা না লাগে এজন্য যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সাঁতার দিয়া যাইতে লাগিলাম। ইতালীর ট্যারাণ্টোতে বৃটিশ বৈমানিকেরা যে দুঃসাহসিকতার সহিত ইতালীয় নৌবহর আক্রমণ করিয়াছিল, জাপানীরাও ঠিক তেমন দুঃসাহসের সহিত খুব কাছে আসিয়া আক্রমণ করিল। ৫০০ গজ দূরে দেখিলাম ৬ খানা জাপানী প্লেন গুলীবিদ্ধ ও অগ্নিদগ্ধ হইয়া সমুদ্রে পড়িয়া যাইতেছে। এড্মিরাল স্যার টম ফিলিপ্স ও ক্যাপ্টেন লীচকে 'প্রিন্স অব্

ওয়েলস' জাহাজের ব্রীজ হইতে জলে গড়াইয়া পড়িতে দেখিলাম—সেই শেষ দেখা! 'রিপালসের' ক্যাপ্টেন উইলিয়াম টেন্যাণ্ট রক্ষা পাইয়াছিলেন। যখন স্পষ্টতঃই বুঝা গেল যে, 'রিপালস' ডুবিতেছে এবং কামনসমূহের ধারে অনেকগুলি মৃতদেহ পড়িয়া আছে, তখন আমি ফ্ল্যাগ ডেকের উপর দাঁড়াইয়াছিলাম। সেই সময় জাহাজের মাইক্রোফোন মারফৎ ক্যাপ্টেন টেন্যাণ্টের নির্দ্দেশ শুনা গেল—'All hands on deck. Prepare to abandon ship. God be with you'—'সকলে ডেকের উপর যাও। জাহাজ ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হও। ভগবান তোমাদিগকে রক্ষা করুন।' কাহারও কোন ত্রাসের ভাব ছিল না। এক একটি আঘাতে 'রিপালসের' আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছিল এবং প্রতি আঘাতেই প্রত্যেকটি মানুষ শান্ত ও স্থিরচিত্তে স্ব স্ব কাজ করিতেছিল। আমার নোটের খাতা রক্ষা পাইয়াছিল, তবে সেগুলি তৈলসিক্ত হইয়া গিয়াছে।......একটা ডেষ্ট্রয়ার আমাদিগকে তুলিয়া লইল, কিন্তু অনেকের মত আমিও সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইলাম। কারণ, তৈলের জন্য কাপড় জামা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই জাহাজ-ডুবির করুণ দৃশ্য ভুলিবার নয়। 'রিপালস্' হইতে যখন ৫০ ফুট দূরে ছিলাম, তখন রক্তাক্ত বীভৎস ক্ষতের মত উহার হাল একবার উর্দ্ধে উঠিল এবং অতি দ্রুত অতলে ডুবিয়া গেল। 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস' একদিকে কাৎ হইয়া পড়িয়াছিল এবং রণ-তরীটি মিনিট দশেক আন্দোলিত হইল। একটা বিরাট দৈত্যের খোঁড়া পায়ের মত উহার একটা অংশ উর্দ্ধোত্থিত দেখা গেল, তারপর অদৃশ্য হইয়া গেল"।*

'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্' সমুদ্রে ডুবিতে পারে, এমন ধারণা অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু তাহাও সম্ভব হইল জাপানীদের আকস্মিক চতুর ও দুঃসাহসিক আক্রমণে। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি বিশালকায় রণপোত ধ্বংস হইবার ফলে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে ও সিঙ্গাপুরের এলাকায় বৃটিশ নৌশক্তি কার্য্যতঃ অকেজো হইয়া গেল। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল পার্ল হারবারের সর্ব্বনাশ! ৭ই ডিসেম্বর রবিবার সকাল ৮টা ১০মিঃ পার্ল হারবার দেড় শত † জাপানী বোমারুর দ্বারা অত্যন্ত অতর্কিতে

*লণ্ডনের 'ডেলী টেলিগ্রাফে' প্রকাশিত—'Story of the War', দ্বিতীয় খণ্ড।

† এই সংখ্যাও সঠিক নির্দ্ধারণের উপায় নাই। তবে, মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট নানা সূত্র সন্ধান করিয়া অনুমান করিতেছেন যে, জঙ্গীবিমান বাদে ১০৫ খানা বিমান পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়াছিল। এইগুলির মধ্যে ছিল ৪৬ খানা টর্পেডো-বিমান এবং ২৮ খানা ছোঁমারা বিমান (dive-bomber)।

আক্রান্ত হয়। ইহার জন্য স্থানীয় নৌ-কর্তৃপক্ষ আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। (অবশ্য এই ত্রুটী ও কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট পার্ল হারবারের নৌ-কর্ত্তাদিগকে দায়ী করিয়াছেন) ফলে, মার্কিণ নৌবহরের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের এলাকার প্রত্যেকটি মার্কিণ যুদ্ধজাহাজ এবং অধিকাংশ বিমান ও বিমানময়দান এই আক্রমণের দ্বারা অন্ততঃ সাময়িকভাবে অকেজো হইয়া গেল। ঐ দিন মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের ৮৬ খানা জাহাজ পার্ল হারবারে নোঙ্গর করা ছিল। এইগুলির মধ্যে ছিল ৮ খানা বড় যুদ্ধজাহাজ, ৭ খানা ক্রুজার, ২৮ খানা ডেষ্ট্রয়ার, এবং ৫টি সাব্‌মেরিণ। কিন্তু কোন বিমানবাহী জাহাজ ছিল না। জাপানী আক্রমণের ফলে ৫ খানা বড় যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাট্‌লশিপ, যথা—'আরিজোনা' (৩২০০০ টন), 'ওকলাহোমা' (২৯০০০ টন), 'ক্যালিফোর্ণিয়া' (৩২৬০০ টন), 'নেভাদা' (২৯০০০ টন) ও 'ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়া' (৩২৫০০ টন) এবং ৩ খানা ডেষ্ট্রয়ার, ১টি মাইনপাতা পুরাণো জাহাজ ও আরও একটি পোত এবং একটী বৃহৎ ভাসমান ড্রাইডক নিমজ্জিত কিম্বা সামরিক প্রয়োজনের হিসাবে অকেজো হইয়া যায়। এইগুলি ছাড়া আরও ৩টি বড় যুদ্ধ জাহাজ, 'পেন্‌সিল্‌ভানিয়া' (৩২৬০০ টন), 'মেরীল্যাণ্ড' (৩২৫০০ টন) ও 'টেনেসি' (৩২৬০০ টন) এবং ৩টি ক্রুজার (যথাক্রমে ১০ হাজার, ৯ হাজার ৬ শত এবং ৭ হাজার টনের) ও আরও দুইটি পোত বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নৌবিভাগীয় ২০২টি বিমানপোতের মধ্যে ৮০ খানা ধ্বংস, ৭০টি অকেজো এবং সৈন্য বিভাগীয় ২৭৩ খানা বিমানের মধ্যে ৯৭টি ধ্বংস হইয়া যায়। হতাহতের সংখ্যা আরও মারাত্মক। নৌবিভাগের ২১১৭ জন নিহত, ৯৬০ জন নিখোঁজ, ৮৭৬ জন আহত এবং সৈন্য বিভাগের ২২৬ জন নিহত ও ৩৯৬ জন আহত হইয়াছে। সকালবেলা প্রায় ৮ টার সময় এই আক্রমণ সুরু হয় এবং পৌণে দুই ঘণ্টা পর ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় জাপ বিমানগুলি ফিরিয়া যায়। বিমানগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। মার্কিণ গভর্ণমেণ্টও স্বীকার করিয়াছেন যে, ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত মারাত্মক হইয়াছে। *

---

* পার্ল হারবারের এই সর্ব্বনাশ কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে এক বৎসর পর। ১৯৪২ সালের ৫ই ডিসেম্বর মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের নৌবিভাগ এক সরকারী রিপোর্টে এই সমস্ত ক্ষতির কথা প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন—'The attack aided by the element

একদিকে পার্ল হারবারে মার্কিণ নৌবহরের এবং অন্যদিকে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বৃটিশ নৌবহরের ব্যাপক ধ্বংসের দ্বারা সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষীয় নৌ-রণনীতির (naval strategy) প্রায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। কারণ, প্রথমতঃ বৃটিশ ও মার্কিণ নৌবহরের যেমন আগাইয়া আসিয়া পরস্পরের সহিত সহযোগিতা স্থাপনের ও জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের সুযোগ রহিল না, দ্বিতীয়তঃ তেমনই সমুদ্রপথে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা জাপান দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার যে কোন অংশে সৈন্য প্রেরণের ও তীরভূমিতে অবতরণের এবং স্থল-পথে অভিযানের সুবিধা পাইল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবারই ছিল প্রশান্ত মহাসমুদ্রে আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি, এই ঘাঁটি জখম ও নৌ-বহর বিধ্বস্ত হওয়ায় জাপানের পক্ষে আর একটা সুবিধা এই হইল যে, মিত্রপক্ষ আর শীঘ্র পাল্টা-আক্রমণ করিতে পারিবেন না। সৌভাগ্যক্রমে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে জাপানীরা কেবল বিমান আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছে, যদি এই দ্বীপ দখলের তাহারা চেষ্টা করিত, তবে ভাবী ইতিহাস সম্ভবতঃ আরও দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত।

আমেরিকার পক্ষে এই আক্রমণ আকস্মিক বলিয়া বিবেচিত হইলেও জাপানী সমর-বিজ্ঞানীগণ বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের পুস্তকে ইহার আভাষ দিয়া গিয়াছেন। লেঃ কমাণ্ডার ইসিমারু বৃটেন সম্পর্কে এবং কিনোয়াকাই মাৎসুয়ো (জাপ নৌ-বিভাগীয় অফিসার) আমেরিকার বিষয়ে লিখিয়াছিলেন। পার্ল হারবারের উপর অতর্কিত আক্রমণের প্ল্যান সম্পর্কে মাৎসুয়ো লিখিয়াছিলেন—যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের সমগ্র নৌবহরের ৩০ খানা ব্যাট্‌লশিপ ও ৪০ খানা ক্রুজার (১৫ হাজার টনের) পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে নিয়োগ করিতে পারে, তাহা হইলে জাপানের তুলনায় তাহারা শ্রেষ্ঠ হইবে। সুতরাং আমেরিকাকে তৎপূর্ব্বেই আঘাত করিতে হইবে। গ্রন্থকার সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন—

'Unless the United States Navy mobilizes its warships on their way to Pearl Harbour, it will be quite inevitable for

---

of surprise was very successful. The damage suffered by the U. S. Pacific Fleet on Dec. 7, 1941 was most serious.

—Report on Pearl Harbour
(U. S. Navy Dept.)

it to sacrifice some of its warships on their way to Pearl Harbour from Panama, San Fransisco and other naval bases, because of the surprise attack tactics of Japan. Even if the United States Fleet is fortunate enough to line up at Pearl Harbour, it will encounter an attack by the Japanese surprise-attack-fleet before it is able to depart in direction of the Western Pacific.'*

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পার্ল হারবারের উপর অতর্কিত আক্রমণ পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত ছিল এবং গ্রন্থকার 'surprise attack' কথাটির উপর বারে বারে যে জোর দিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার মত। নিঃসন্দেহে জাপানী রণনীতির চাতুর্য্য প্রশান্ত মহাসাগরের মিত্রপক্ষীয় নৌরণনীতির পরিকল্পনাতে নিদারুণ বিভ্রাট সৃষ্টি করিয়াছে। পার্ল হারবারের জখম ও 'প্রিন্স অব্ ওয়েলসের' নিমজ্জন এই বিভ্রাটের অগ্রদূত।

— ৪ —

আক্রমণের গতি ও প্রকৃতি

১১ই ডিসেম্বর, '৪১।

দীর্ঘকাল যাবৎ, এমন কি বিগত ১৯২০ সাল হইতেই কূটনীতিবিদ্ ও রণনীতিবিদ্গণ জাপান ও আমেরিকার সংঘর্ষের সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণা করিয়া আসিতেছিলেন। ইহারই অন্যতর কারণস্বরূপ ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে ওয়াশিংটনে নৌবল-প্রধান রাষ্ট্রসমূহের এক সম্মেলন হয় এবং তাহাতে বৃটেন, আমেরিকা ও জাপানের নৌ-নির্ম্মাণ তালিকা প্রভূত পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু জাপানের মনে অবিশ্বাস বরাবরই ছিল, এজন্য জাপানের বড় যুদ্ধজাহাজগুলি হ্রাস করিতে আমেরিকাকে এই সর্ত্ত মানিতে হয় যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও গুয়াম্ দ্বীপে তাহারা নৌঘাঁটি তৈয়ার করিবে না। পরবর্ত্তীকালে নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনের ফলে সিঙ্গাপুর সম্পর্কেও এমন নীতি সাময়িকভাবে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুর শেষ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণরূপে নৌ-কেল্লা ও নৌ-ঘাঁটিতে পরিণত হইলেও জাপানের সহিত বাহ্যিক সৌহার্দ্য বজায় রাখিবার জন্য ফিলিপাইন, গুয়াম্ ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে আধুনিক-

* 'How Japan Plans to Win'—by Kinoaki Matsuo.

ধরণের নৌঘাঁটি, কেল্লা ও জাহাজঘাটা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয় নাই। অবশ্য এই যুদ্ধের হিড়িকে কোন্ শক্তি গোপনে কতটা অগ্রসর হইয়া রহিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন হইলেও একথা সত্য যে, আমেরিকার পক্ষ হইতে জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম, পূর্ব্ব ও উত্তর অংশে যে পরিমাণ আয়োজন ও সতর্কতার প্রয়োজন ছিল, তাহা অনুসৃত হয় নাই। জাপানী যুদ্ধের এই কয়েক দিনের ফলাফল দেখিয়া আমেরিকা নিশ্চয়ই এজন্য ক্ষুণ্ণ হইবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অতিকায় যুদ্ধ-জাহাজের মত—এইগুলির নড়িতে চড়িতে এবং উদ্যোগ আয়োজনে এত সময় লাগে যে, ঠিক উপযুক্ত মুহূর্ত্ত সেই অবসরে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ১৯১৪ সালের বৃটেন বা ১৯৩৯ সালের বৃটেনের মধ্যে সামরিক দৃষ্টিতে কোন তফাৎ নাই এবং বৃটেনের বন্ধু বৃকোদর আমেরিকারও এই একই ব্যারাম দেখিতেছি। আমেরিকার উদরে বিশাল অস্ত্রাগার, অপরিমিত কাঁচামাল, প্রভূত স্বর্ণভাণ্ডার, অসংখ্য কলকারখানা এবং প্রচুর লোকজন। আধুনিক যান্ত্রিক মহাযুদ্ধ চালাইবার পক্ষে আমেরিকার যোগ্যতার কোন অভাব নাই, বরং জাপানের চেয়ে অনেক বেশীগুণ শক্তি তাহারা রাখে। তথাপি জাপান প্রথম আক্রমণেই আমেরিকাকে (এবং বৃটেনকে তো বটেই) আত্মরক্ষার প্যাচে ফেলিয়া দিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে বৃটেনের জমিদারী বুদ্ধির রক্ষণশীলতা এবং আমেরিকার বণিক্ বৃত্তির তামসিকতা! যান্ত্রিক যুদ্ধের ব্লিজক্রিগের যুগে এই উভয় প্রকার মনোবৃত্তিই রণাঙ্গনের পক্ষে মারাত্মক। আগেকার প্রবন্ধগুলিতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের যে সমস্ত স্থান ও দ্বীপের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলিই আজিকার মহাযুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এই দ্বীপগুলি স্পেনের নিকট হইতে আমেরিকার হাতে আসিয়াছে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। এই সমস্ত দ্বীপে স্পেনীয়দের আত্মরক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান ও রণবিজ্ঞানকে অনুসরণ করিয়া সেইগুলিই আজ নৌ-ঘাঁটি, বিমান-ঘাঁটি ও পোতাশ্রয়ে পরিণত হইয়াছে। সাধারণতঃ ফিলিপাইন, গুয়াম্, ওয়েক্, মিডওয়ে (মধ্যবর্ত্তী) ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং একান্ত উত্তরবর্ত্তী (বেরিং উপসাগরের কাছাকাছি) এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও একান্ত দক্ষিণবর্ত্তী স্যামোয়া দ্বীপ—প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এই বিরাট অংশই জাপ-মার্কিণ যুদ্ধের নৌ-রণক্ষেত্ররূপে ধরা যাইতে পারে। খুব সংক্ষেপে এই দ্বীপগুলির কথা উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, একমাত্র ফিলিপাইনই ছোট বড়

৩১০০ দ্বীপ লইয়া গঠিত। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় লুজন ও মিণ্ডানাও দ্বীপ। এইগুলির মোট আয়তন ১১৫০০০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ১ কোটির উপর, কিন্তু অধিকাংশই মালয় জাতীয়। ফিলিপাইনে তিনটি নৌঘাঁটি আছে, যথা, ক্যাভাইট (ম্যানিলা), ওলোঙ্গাপো এবং পোলোক। ফিলিপাইনের আত্মরক্ষা অনেক বৎসর ধরিয়া মার্কিণ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের উদ্বেগের স্থল হইয়া রহিয়াছে এবং জাপানের আশঙ্কাতেই ফিলিপাইনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। উহার নৌঘাঁটি ও সামরিক আত্মরক্ষার সমস্ত দায়িত্বই আমেরিকার হাতে। জাপানের দক্ষিণ প্রান্তিক নৌঘাঁটি হইতে ফিলিপাইনের দূরত্ব ১৩০০ হইতে ১৭৫০ মাইলের মধ্যে। কিন্তু ইন্দোচীনের সহিত নূতন সামরিক চুক্তি হওয়ার ফলে এই ব্যবধানও হ্রাস পাইয়াছে এবং এক্ষণে ইন্দোচীন হইতে ফিলিপাইন ৭০০ মাইলের বেশী নহে। বিশ বৎসর আগে জনৈক বৃটিশ নৌ-বিশেষজ্ঞ বলিয়াছিলেন যে, আমেরিকার সহিত জাপানের যুদ্ধ বাধিলে ম্যানিলার অবস্থা পোর্ট আর্থার বন্দরের মত হইবে! লুজন এবং মিণ্ডানাওতে অবতরণের উৎকৃষ্ট ঘাঁটি (landing place) আছে এবং যে তিনটি নৌঘাঁটি ফিলিপাইনে রহিয়াছে, উহা জাপানীদের নৌ-আক্রমণের মুখে টিকিতে পারিবে না। আমেরিকাকে আসিতে হইবে ৫ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী হাওয়াই দ্বীপের নৌঘাঁটি হইতে। বিশ বৎসর আগে যদি এই অবস্থা থাকিয়া থাকে, তবে, বর্ত্তমান বোমারুর যুগে উহা আরও কত বিপজ্জনক হইয়াছে! যে হাওয়াই দ্বীপের উপর জোর দেওয়া হইতেছে, তাহারই বা অবস্থা কি? এই দ্বীপটি আমেরিকার অধিকারে যায় ১৮৯৮ সালে, কিন্তু এখানে ১৯২০ সালে আড়াই লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজারই ছিল জাপানী। এই প্রচুর সংখ্যক জাপ বাসিন্দা যুদ্ধের সঙ্কটে যে কোন সময় বিদ্রোহ বাধাইতে এবং জাপানের আক্রমণে সহায়তা করিতে পারে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবার একটি বিখ্যাত পোতাশ্রয়। এখানে একটি প্রকাণ্ড ডক আছে এবং বড় বড় যুদ্ধ জাহাজগুলি ইহাতে আশ্রয় লইতে পারে। ইহা ছাড়া এখানে জাহাজ মেরামতের কারখানা এবং তীররক্ষী কামান ও কেল্লা ইত্যাদি রহিয়াছে। হাওয়াই হইতে অত্যধিক দূরত্বের জন্য ফিলিপাইনকে সাহায্য দেওয়া কঠিন, তবে, আমেরিকার উপকূল রক্ষার পক্ষে হাওয়াইয়ের উপযোগিতা আছে। কিন্তু জাপান চতুরের মত প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইয়া পার্ল পোতাশ্রয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অপর পক্ষে যে গুয়াম্ দ্বীপকে ফিলিপাইন ও

প্রশান্ত মহাসাগরের পক্ষে আমেরিকার চাবিকাঠি বলা হয়, উহাও চারিদিকে জাপানী দ্বীপের দ্বারা বেষ্টিত। ক্যারোলাইন, পালেউ, ম্যারিয়ানা ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের নৌ ও বিমান ঘাঁটি হইতে জাপান গুয়ামে দ্রুত আক্রমণ চালাইতে পারিবে। কার্য্যতঃ জাপান তাহাই করিয়াছে এবং গুয়ামের রাজধানীরও পতন হইয়াছে। গুয়াম্ দ্বীপ লম্বায় ৩২ মাইল, চওড়ায় ৪ হইতে ১০ মাইল মাত্র। রাজধানী আগানা হইতে ৮ মাইল দূরে আপ্রা পোতাশ্রয়, একটি চওড়া প্রণালী দিয়া নৌ-বহর এখানে উপস্থিত হইতে পারে। নৌ-বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, এখান হইতে ১৫০০ মাইল দূরবর্ত্তী ফিলিপাইনের ভাগ্যসূত্র গুয়ামের সহিত অবিচ্ছিন্ন। ভূমধ্যসাগরের পক্ষে যেমন মাল্টা, জার্ম্মাণীর পক্ষে যেমন হেলিগোল্যাণ্ড, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার পক্ষে যেমন সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইনের পক্ষে গুয়ামও তেমনগুরুত্বপূর্ণ। এমন গুরুত্বপূর্ণগুয়ামের পতনে যদি আর বিলম্ব না থাকিয়া থাকে, তবে ফিলিপাইন আত্মরক্ষা করিবে কিসের জোরে? গুয়ামের চারিদিকে যে সমস্ত জাপানী দ্বীপ রহিয়াছে, সেগুলির মধ্যে ইয়াপ একটি উৎকৃষ্ট সাবমেরিণ ঘাঁটি, এই ঘাঁটি হইতে ম্যানিলা ও গুয়ামের যোগাযোগ ছিন্ন করা যাইতে পারে। ক্যারোলাইন দ্বীপের পশ্চিমে পালেউ দ্বীপের এঙ্গুয়ার পোতাশ্রয় জাপানের আর একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মাণীর বিখ্যাত 'এমডেন' রণতরী এখান হইতেই (তখন ইহা জার্ম্মাণীর ছিল) কয়লা সংগ্রহ করিয়া ভারত মহাসাগরে অভিযানে বাহির হইয়াছিল। এই দ্বীপগুলি এক্ষণে জাপানী ঘাঁটিতে পরিণত হওয়ায় গুয়াম্ ও ফিলিপাইন বিপদে পড়িয়াছে। আমেরিকার আরও যে সমস্ত দ্বীপ আছে, যেমন ওয়েক, মিড্ওয়ে ইত্যাদি সেগুলিও আজ জাপানী আক্রমণে বিপন্ন। একমাত্র উত্তরবর্ত্তী এলুশিয়ান (এখানে ডাচ হারবার নামে একটি ভালো পোতাশ্রয় আছে) এবং দক্ষিণবর্ত্তী স্যামোয়া হাওয়াই দ্বীপ হইতে ২৩০০ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু সেখানকার পোতাশ্রয়কে আধুনিক কায়দায় নৌ-কেল্লায় পরিণত করা হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই।

প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তার অপরিসীম। এই অপরিমিত বিস্তারের জন্য নৌবহরগুলিকে একান্তরূপে নৌঘাঁটির উপর এবং একাদিক্রমে দীর্ঘ পথ চলিবার শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রকাণ্ড নৌবহর ছাড়া এই মহাসমুদ্রে অভিযান চালানো কষ্টকর। কিন্তু ইহার জন্য অবিশ্বাস্য পরিমাণ কয়লা ও পেট্রোল দরকার। ৩০টি অতিকায় যুদ্ধজাহাজ (ব্যাটলশিপ), ২০টি বৃহত্তম

ক্রুজার, ৪০টি ডেষ্ট্রয়ার ও আনুসঙ্গিক অনেক ছোট বড় পোত এই মহাসমুদ্রে প্রয়োজন। একদা এই নৌবহরসহ পানামা হইতে ফিলিপাইন পর্য্যন্ত ঘণ্টায় মাত্র ১০ মাইল (সামুদ্রিক) গতিতে যাতায়াতের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। হিসাবে দেখা গিয়াছে পানামা হইতে ম্যানিলা পর্য্যন্ত যাইতে ২৪২২০০ টন পরিমাণ কয়লা এবং ৪১৬০০ টন পরিমাণ পেট্রোল দরকার!

ইহা শান্তির সময়ের অবস্থা এবং তাহাও একবারের ভ্রমণের জন্য। সুতরাং যুদ্ধের সময়ে কি ঘটিবে, এই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। জাপানকে একা প্রতিরোধ করার শক্তি আমেরিকার আছে কিনা, সন্দেহ। এজন্য বৃটেন, চীন, ওলন্দাজ এবং শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়ার সহযোগিতাও দরকার হইবে। বর্ত্তমানে একমাত্র রাশিয়া ছাড়া আর সকলেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। এই রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ওলন্দাজের সামরিক শক্তি কিছু উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার হল্যাণ্ড জার্ম্মাণীর অধিকৃত, সুতরাং তাহার বাধাদান শক্তি সীমাবদ্ধ। চীনের অবস্থাও সুখকর নহে। কারণ, উহার সমস্ত সমুদ্রতীরস্থ বন্দর ও বড় বড সহর জাপ দখলে গিয়াছে। আমেরিকা বা বৃটেনের পক্ষে চীনকে আর তেমন সাহায্যদান সম্ভব নহে। বোধ হয় রাশিয়ার অবস্থাও তাহাই, তবে রাশিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ চাপে পড়িয়া পরবর্ত্তী কোন কালে হয়তো জাপানের বিরুদ্ধে সাহায্যদানে অগ্রসর হইবে। কিন্তু আপাততঃ একমাত্র বৃটেন ছাড়া আমেরিকার শক্তিশালী সমরসঙ্গী আর কেহই নাই। সুতরাং বৃটেনের অবস্থাটা পরীক্ষা করা যাউক।

সিঙ্গাপুর, হংকং, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ প্রধানতঃ এইগুলিই বৃটেনের সম্বল এবং এই বিচিত্র পাঁচমিশালী শক্তি বৃটেনের ভরসা। জহোর প্রণালীর অপর তীরে সিঙ্গাপুর উপদ্বীপ, এই প্রণালী দীর্ঘ, কিন্তু সঙ্কীর্ণ। ইহার ভৌগোলিক অবস্থা এমন চমৎকার যে, আত্মরক্ষা খুব সহজসাধ্য। সিঙ্গাপুর আধুনিক নৌ-ঘাঁটি ও নৌ-কেল্লার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, কোটি কোটি টাকা ইহার জন্য বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ব্যয় করিয়াছে। ইহার মধ্যে ভাসমান ডক, শুষ্ক ডক, তীররক্ষী বড় কামান, পেট্রোল সরবরাহ কেন্দ্র এবং প্রচুর কয়লা মজুতের ব্যবস্থা আছে। সিঙ্গাপুরের বাবদ বোধ হয় ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে, শত্রুর আক্রমণ হইতে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষার উপযোগী করিয়া এই নৌ-দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। হংকং

হইতে এই স্থান প্রায় দেড় হাজার মাইল এবং ফরমোসা দ্বীপ হইতে ১৬০০ মাইল। সিঙ্গাপুর সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ার প্রধান প্রবেশপথ হওয়ায় বৃটেনের সহিত যুদ্ধ বাধিবার ফলে জাপানের যোগাযোগ ব্যাহত হইবে। জাপানের সমগ্র আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ৪৮ ভাগ এই পথ দিয়া চলে। সুতরাং সিঙ্গাপুর যতক্ষণ হাতে থাকিবে, ততক্ষণ কেবল সামরিক দিক দিয়াই নহে, জাপানের যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থারও প্রভূত ক্ষতি হইবে। ইহা ছাড়া আমেরিকা ও চীনের সহিত যুদ্ধের ফলে জাপানের অন্যান্য বাণিজ্যও প্রচণ্ড মার খাইবে। এজন্য গুয়াম্, ফিলিপাইন ও হাওয়াই দ্বীপের মত হংকং এবং সিঙ্গাপুর জাপান সর্ব্বাগ্রে দখল করিতে চাহিবে। জাপানী আক্রমণের গতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, হংকং অবরোধ করিয়া সিঙ্গাপুরকে বিচ্ছিন্ন করাই জাপানীদের মতলব। সিঙ্গাপুরের চেয়ে হংকং জাপানের অধিকতর নিকটবর্ত্তী এবং ইহা ক্যান্টন হইতে ৯০ মাইল দক্ষিণে। তীরভূমি হইতে দেড় মাইল চওড়া একটি প্রণালীর দ্বারা ইহা বিচ্ছিন্ন। যে দ্বীপের উপর ইহা অবস্থিত, তাহা পাহাড় ও বন্ধুরভূমিতে আচ্ছন্ন। কোন নদী এখানে নাই, তবে এই বন্দরের নানাস্থানে সৈন্যদল অবতরণ করিতে পারে, কিন্তু বৃহৎ কোন সেনাবাহিনীর এখানে একযোগে অবতরণ সম্ভব নহে। তবে হংকং পোতাশ্রয় এত বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট যে, যে কোন বড় নৌবহর এখানে আশ্রয় পাইতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি যদি জাপানীদের হাতে পড়ে, তবে সিঙ্গাপুর হইতে আগাইয়া আসিয়া কোন বৃটিশ নৌবহর সহজে জাপানকে ঘায়েল করিতে পারিবে না। সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের পর রহিয়াছে অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্ব তীরস্থ সিডনী ও মেলবোর্ণ। এখানে সুরক্ষিত এবং অস্ত্রসজ্জিত নৌঘাঁটি ও কেল্লা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া পূর্ব্বতীরে ব্রিসবেন, নিউক্যাসেল, উত্তরদিকে টরেস প্রণালীতে থার্সডে দ্বীপ, দক্ষিণে অ্যাডেলাইড, পশ্চিমে ফ্রিম্যাণ্টেল, একান্ত উত্তর-পশ্চিমে পোর্ট ডারউইন ঘাঁটি রহিয়াছে। আরও দক্ষিণে টাসম্যানিয়া দ্বীপে আছে হোবার্ট, কিন্তু এইগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পোর্ট ডারউইন। যদি অবস্থা চক্রান্তে বৃটিশ নৌ-বহরকে সিঙ্গাপুর ছাড়িতে হয়, তবে পোর্ট ডারউইনই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নিকটতম ঘাঁটি। কিন্তু মুস্কিল এই যে, এই ঘাঁটি হইতে জাপানী নৌবহরের নাগাল পাওয়া একান্ত কঠিন। অষ্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যাণ্ডে চারিটি সুরক্ষিত ঘাঁটি আছে—অকল্যাণ্ড, ওয়েলিংটন,

লিট্‌লটন এবং ডিউনেডিন। নিউজিল্যাণ্ডে নৌ-বহরের পক্ষে অকল্যাণ্ডই সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটি। ইহার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর একটি প্রধান ঘাঁটি আমাদের ভারতবর্ষ। পশ্চিম উপকূলে করাচী ও বোম্বাই, দক্ষিণে সিংহল দ্বীপের কলম্বো ও ত্রিঙ্কোমালি, পূর্ব্ব উপকূলে মাদ্রাজ, আরও পূর্ব্বে কলিকাতা এবং ব্রহ্মদেশে আছে রেঙ্গুণ। কিন্তু এই ঘাঁটিগুলি এবং ভারতীয় নৌবহরকে কোনক্রমেই প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বলা যায় না। বৃটেনের সাম্রাজ্যনীতি, ভারতবর্ষকে সামরিক দিক দিয়া বিশ্বাস করে নাই। এজন্যই কোন বৃহৎ ও শক্তিশালী নৌবহর এখানে গড়িয়া উঠে নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই সমস্ত ঘাঁটি ছাড়া অন্যান্য ঘাঁটিও আছে। যেমন বোর্ণিও, নিউগিনি, ফিজি ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ। সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের নৌবহরের পক্ষে এই সমস্ত ঘাঁটি সাহায্যকারী এবং জাপানের নাগালের বাহিরে। যদি ইউরোপীয় যুদ্ধে বৃটেন বিব্রত না হইত, তবে জাপান বৃটিশ নৌবহরের বিরুদ্ধে খুব সুবিধা করিতে পারিত না। কিন্তু জাপানী রণনীতিবিদ্‌গণের লক্ষ্য ছিল বৃটেনের সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধার মুহূর্ত্তে আক্রমণ করা। তাহাদের মতে সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রে বৃটিশ নৌবহরকে অকেজো করিতে পারিলে আর কোন চিন্তার কারণ নাই। এই কারণেই তাহারা 'Timing the first act of war' বা উপযুক্ত মুহূর্ত্তের আক্রমণকে যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে।

জাপান ও বৃটেনের এক্ষেত্রে পরস্পরের পুঁথিগত রণনৈতিক লক্ষ্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৃটেন চাহিতেছে :—

(১) জাপানী নৌবহরকে ধ্বংস করা।

(২) জাপানের নৌ-পথের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং

(৩) জাপানের বড় বড় সহরে, শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রে এবং সমস্ত নৌ ও জাহাজ-ঘাঁটিতে বিমান আক্রমণ ও ধ্বংস করা।

আর জাপান চাহিতেছে :—

(১) বৃটেনের নৌ-বহরকে সম্পূর্ণ ঘায়েল করা।

(২) বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনীকে বিদ্যুৎগতি যুদ্ধে ধ্বংস করা।

(৩) গোড়াতেই দক্ষিণ চীন-সমুদ্রের সমস্ত ঘাঁটি দখল করা এবং

(৪) বৃটেনের যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করা।

সম্ভবতঃ জাপান এই পরিকল্পনা সম্মুখে রাখিয়াই অতিদ্রুত ব্যাপক আক্রমণ চালাইয়াছে। যদি তর্কের খাতিরে এমন একটা দুর্ভাগ্যের কথা ধরিয়া লওয়া

যায় যে, হংকং ও সিঙ্গাপুরের আর কোন আশা নাই, তাহা হইলে জাপানী নৌ-বহর আসিয়া দাঁড়াইবে সিঙ্গাপুর ও বোর্ণিও দ্বীপের মাঝামাঝি এবং উহার সাবমেরিণগুলি মালাক্কা, শুণ্ডা, বালি ও লম্বক প্রণালীসমূহের মধ্য দিয়া অতর্কিত আক্রমণ চালাইবে এবং এই সঙ্কীর্ণ জলপথগুলি জাপানের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হইবে। আর বৃটিশ নৌ-বহরকে তেমন অবস্থায় অষ্ট্রেলিয়ার ঘাঁটি ও পোতাশ্রয়গুলির দিকে যাইতে হইবে। দূরত্ব ও নৌ-ঘাঁটির উৎকর্ষের বিবেচনায় সিডনী এবং পোর্ট ডারউইন সম্ভবতঃ বৃটেনের আশ্রয়স্থল হইবে। কিন্তু খুব দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত না হইলে বৃটেনের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ড হইতে পাণ্টা আক্রমণ চালানো সহজ হইবে না। যদি বৃটিশ নৌ-বহরকে একটি প্রকাণ্ড শক্তিমান পুরুষরূপে কল্পনা করা যায়, তবে এমন অনুমান স্বাভাবিক যে, সিঙ্গাপুর (মালয়সহ) ও বোর্ণিও—এই দুই দ্বীপের উপর দাঁড়াইয়া সে জাপানী নৌ-বহরকে বাধা দিবে। ইহাকে আমরা বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব বলিয়া ধরিতে পারি। যদি ফ্রান্সের পতন না হইত এবং শ্যাম বৃটেনের কবলে থাকিত, তাহা হইলে সিঙ্গাপুরেব বাম বাহু ফরাসী ইন্দো-চীন, শ্যাম ও শ্যাম উপসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত। কিন্তু ইন্দো-চীন ও শ্যাম* ইতিপূর্ব্বেই জাপানের দখলে গিয়াছে। এই অবস্থায় বৃটেনকে প্রয়োজন হইলে বোর্ণিও হইতে একেবারে দূরবর্ত্তী নিউজিল্যাণ্ড পর্য্যন্ত সরিয়া আসিতে হইতে পারে। এই বৃহৎ দেশের মধ্যে ম্যাকাসার প্রণালী, মালাক্কা প্রণালী, টরেস প্রণালী এবং অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ বৃটিশ সাবমেরিণ ও বিমান-বহরের পক্ষে সহায়ক হইবে। স্বাভাবিক সময়ে প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের রণনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, আমেরিকার তুলনায় বৃটেনের পক্ষে আক্রমণাত্মক বা offensive নীতি অনুসরণের সুবিধা ছিল। কিন্তু এই সুযোগ নষ্ট হইয়াছে প্রথমতঃ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ নৌ-বহরের শক্তিক্ষয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ ইন্দো-চীন ও শ্যামের আত্মসমর্পণে। বৃটেন যদি পূর্ব্বাহ্ণে ইরাণের মত শ্যাম দেশ দখল করিয়া রাখিত, তবে উহা মালয় ও ব্রহ্মদেশের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি হইতে পারিত। সম্ভবতঃ জাপানের সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্যই তাঁহারা থাইল্যাণ্ডকে নিজেদের সামরিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। বর্ত্তমানে যে অবস্থাব উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে বৃটেন ও

* ৮ই তারিখ জাপ সৈন্য থাইল্যাণ্ড আক্রমণ করে। নৌবহর ও বিমানবহর ইহাতে সাহায্য করে। অতঃপর শ্যাম ও জাপানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আমেরিকার পক্ষে একমাত্র আত্মরক্ষার নীতি বা defensive অনুসরণ না করিয়া উপায় নাই।

— ৫ —

নৌ-আক্রমণের ঐতিহ্য

১২ই ডিসেম্বর '৪১।

একদিকে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবার এবং অন্যদিকে ইন্দো-চীন ও মালয়ের মধ্যবর্ত্তী শ্যাম উপসাগর—এই হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথে জাপান ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোন্ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া জাপান সীমা-হীন সমুদ্রের অভিযানে বাহির হইবার জন্য এতটা দুঃসাহসী হইল? বৃটেনের মত জাপানও একান্তরূপে দ্বীপবাসী, নীল সমুদ্রের জলের সঙ্গে তাহার রক্তের টান রহিয়াছে। জাতি হিসাবে তাহার জীবন-ধর্ম্ম সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল, এজন্য সামুদ্রিক জাতির রাষ্ট্রধর্ম্মও সাগরের স্রোত ধরিয়া প্রবাহিত। নৌবহর এবং নৌশক্তিই জাপানের প্রধান অবলম্বন এবং এই শক্তিই জাপানের অগ্রগতির মূল কারণ। ১৯০৪-৫ সালে এড্মিরাল টোগোর নেতৃত্বে রুশ-জাপান যুদ্ধই জাপানীদিগকে ঐতিহাসিক খ্যাতি দিয়াছে। রাশিয়ার বিশাল সাম্রাজ্যশক্তিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়া এবং উহাকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করিয়া জাপান যে অভূতপূর্ব্ব প্রেরণা পাইল, সেই প্রেরণা ক্রমশঃ তাহাকে পৃথিবী-ব্যাপী শক্তি অর্জ্জনে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। রুশ-জাপান যুদ্ধের বিচারে জাপান একান্তরূপে আধুনিক ও নূতন রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত। তথাপি জাপানের পুরাণো ইতিহাস আছে—যদিও সে ইতিহাস ইংলণ্ডের মত বহু দূর অতীতের গর্ভে নিহিত কিম্বা বিভিন্ন অভিযানের দ্বারা কীর্ত্তিমণ্ডিত নয়। জাপ নৌশক্তির বিশ্বাসযোগ্য লিখিত ইতিহাসে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৫৯২) জাপানীরা কোরিয়া দখলের জন্য নৌ-অভিযান করিয়াছিল। দুই লক্ষ সৈন্য এই জন্য মজুত হইয়াছিল। সেদিনের বিচারে এত প্রচুর সংখ্যক সৈন্যের অভিযান একটি অভিনব ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু তার চেয়েও অভিনব এই যে, এই দুই লক্ষ সৈন্যই শত শত মাইল সমুদ্র-পথ অতিক্রম করিয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, ইহার জন্য নিশ্চয়ই কয়েক

হাজার ছোট বড় পোত ব্যবহৃত হইয়াছিল। সুতরাং সেই সময়েও জাপানী নৌপোতের সংখ্যা ও শক্তি কম ছিল না। তথাপি কোরিয়াবাসীদের হাতে জাপান সেদিন প্রচণ্ড মার খাইয়াছিল, কারণ সেদিনের অভিযানের নেতাগণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, সমুদ্রের উপর একাধিপত্য বিস্তার ছাড়া সমুদ্র পারবর্ত্তী দেশকে সাফল্যের সহিত আক্রমণ করা যায় না। সমুদ্রের উপর আধিপত্য লাভই নৌযুদ্ধের প্রথম নীতি। কোরিয়াবাসীরা একপ্রকার লৌহবর্ম্মাবৃত পোত ব্যবহার করিয়া সেদিনের জাপানী নৌবহরের ও নৌসৈন্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। নৌবিশেষজ্ঞ বাইওয়াটারের মতে বোধ হয় এই 'কূর্ম্মপোত'-ই (উহার আকৃতি অনুসারে জাপানীরা এই নামকরণ করিয়াছিল) পৃথিবীর প্রথম লৌহবর্ম্মাবৃত যুদ্ধ-জাহাজ। এই অদ্ভুত 'সামুদ্রিক জানোয়ার' সেদিন জাপানী নৌবহরেব ত্রাস সঞ্চার করিয়াছিল।

ইহাব পব জাপানের জাহাজ নির্ম্মাণে ইউরোপীয় প্রভাব আরম্ভ হয় এবং তাহাও ঘটনাচক্রে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে উইল এডামস্ নামে একজন ইংবাজ ওলন্দাজ জাহাজে চড়িয়া আসিয়া উপকূলে আটকা পড়েন। নৌপোত নির্ম্মাণে তাঁহার কৃতিত্ব দেখিয়া জাপানী কর্ত্তারা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। উইল এডামসের নেতৃত্বেই প্রথম জাপানের দেশীয় কারিগব ও মিস্ত্রীগণ ইউরোপীয় প্রথায় জাহাজ তৈয়ার করিতে শিখে এবং কয়েক বৎসবের মধ্যেই ১০০ টন ভারবহনক্ষম অনেকগুলি জাহাজ সমুদ্রে ভাসানো হয়। ইহার পর সুদীর্ঘ আড়াই শত বৎসরের ইতিহাস নিঃশব্দ। জাপান বহির্জগতের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্র্যের গর্ব্বে বাস করিতেছিল। তারপব ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আবার জাপানের সহিত ইউরোপ ও আমেরিকার সম্পর্ক-সূত্রের সূচনা হয়। মার্কিণ নৌ-যোদ্ধা পেরির নেতৃত্বে ৪ খানা মার্কিণ যুদ্ধজাহাজ জাপানী সমুদ্রে তিমি মাছের ব্যবসায়ের জন্য ঘাঁটি স্থাপনের দাবী জানায়। ইহার পর ক্রমে ক্রমে নানাসূত্রে বৃটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজ জাহাজগুলি জাপানী সমুদ্রে আবির্ভূত হয়। নৌ-পথের এই সমস্ত চাঞ্চল্যকর ঘটনায় জাপানের জাতীয় জীবনে সাড়া পড়িয়া যায় এবং জাপান অতি দ্রুত ইউরোপীয় এবং মার্কিণী কায়দায় নূতন যুদ্ধজাহাজ ও নৌবহর গড়িয়া তোলে। বর্ত্তমানে জাপান নৌ-রণবহর ও নৌবাণিজ্যবহরে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত। সরকারী ও বে-সরকারী কলকারখানা, ডক, হার্ব্বার, ইয়ার্ড ও পোর্ট এবং বেস্ ইত্যাদির দিক হইতে জাপান সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল। অর্থাৎ যে কোন

জাহাজ ও যাত্রী-জাহাজ নির্ম্মাণে জাপান আজ এতটা অগ্রগতিসম্পন্ন যে, তাহার অন্য কোন দেশের সাহায্য বা সহযোগিতার দরকার নাই।*

একথা লেখা বাহুল্য যে, নৌ-সৈন্যবাহিনী ছাড়া নৌবহরের কোন অর্থ নাই। যুদ্ধজাহাজ একটা বিরাট যন্ত্র বা অস্ত্র মাত্র, ইহার আসল প্রাণ রহিয়াছে চালক ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে। সুতরাং জাপ নৌবহরের অগ্রগতির সঙ্গে নৌবাহিনী ও নৌবিভাগও গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপানের যে সমস্ত অঞ্চল সমুদ্র তীরবর্ত্তী, সাধারণতঃ সেই সমস্ত জেলা হইতেই নৌসৈন্য ও নাবিক সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইহারা সমুদ্রতীরবাসী বলিয়া ছোটবেলা হইতেই সমুদ্রের সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট, সুখসুবিধা এবং লাঞ্ছনা ও রোমান্সের সহিত একান্তরূপে পরিচিত। সমুদ্রের সহিত আশৈশব পরিচয়ের ফলে জাপানী নৌ-সৈন্যেরা স্বাভাবিক পটুতা অর্জ্জন করিয়াছে। জাপানী নৌবাহিনীতে দুই শ্রেণীর সৈন্য আছে,

(১) যাহারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ১৮ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে যোগ দিয়া থাকে, ইহারা ৬ বৎসরকাল ট্রেণিং লইয়া থাকে।

(২) যাহারা সৈনিকবৃত্তিব জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সংগৃহীত হইয়া থাকে, ইহাদের প্রাথমিক শিক্ষাকাল ৩ বৎসর।

মূলতঃ স্বেচ্ছাসৈনিকের বৃত্তির উপবেই জাপ নৌ-বাহিনীর প্রতিষ্ঠা। যাঁহারা অফিসারের পদের জন্য স্কুলে ও কলেজে প্রবেশ করেন, তাঁহারা প্রধানতঃ বিখ্যাত সাৎসুমা গোষ্ঠী হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকেন। অনেক বড় বড়

---

* নৌবহর নির্ম্মাণে জাপানের উদ্ভাবনী শক্তিও উপেক্ষার নহে। ৭ই ডিসেম্বর পার্লহারবার আক্রমণে জাপানীরা মার্কিণ জাহাজগুলির বিরুদ্ধে এক প্রকারের 'পকেট সাব্‌মেরিণ' ব্যবহার করিয়াছিল। পার্ল হারবারে এমন একটি সাব্‌মেরিণ ধরা পড়ে। এই সাব্‌মেরিণ লম্বায় মাত্র ৪১ ফুট, পাঁচটা কামরায় উহা বিভক্ত, ইহাতে দুইটি ১৮ ইঞ্চি টর্পেডো আছে। মাত্র দুইজনের দ্বারা ইহা পরিচালিত—একজন অফিসার ও একজন লস্কর। মাত্র ১ ইঞ্চির এক চতুর্থাংশ পুরু ইস্পাতের দ্বারা ইহা মোড়া। মাস্তুলের অংশ সাড়ে ৪ ফুট উঁচু। ইহার গতি ঘণ্টায় ২৪ নট্ (সামুদ্রিক মাইল), যে কোন বড় জাহাজের ডেকের উপর ইহা বহন করা যায় এবং এক পার্শ্ব দিয়া জলে নামানো যায়। ইহা ২০০ মাইল পর্য্যন্ত চলিতে পারে, দুইটি টর্পেডো ছাড়া ৩০০ পাউণ্ড ওজনের বিস্ফোরক পদার্থও ইহাতে আছে। দরকার মত ইহা নিজকে ধ্বংস করিবার বা শত্রু জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটাইবার জন্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কয়েক বৎসর ধরিয়াই এই ধরণের 'পকেট সাব্‌মেরিণ' তৈয়ারীর কথা শুনা গিয়াছিল। এক্ষণে নাকি এমনি শত শত সাব্‌মেরিণ তৈয়ারি হইতেছে এবং ইহার ব্যয় একটা ভালো মোটর গাড়ী তৈয়ারির সমান। জাপানী নৌবুদ্ধির ইহা পারিচায়ক, সন্দেহ নাই।

—'The Sphere', লণ্ডন ২৭-১২-৪১।

খ্যাতনামা জাপ নৌসেনাপতি এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। তীরভূমিতে ইহাদের শিক্ষাকাল দীর্ঘস্থায়ী নহে। কারণ, জাপানী নৌকর্ত্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন যে, নৌ-সেনানীর আসল শিক্ষা সমুদ্রে, অর্থাৎ সক্রিয় ও সচল নৌবহরে। নৌ-রণবিদ্যার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এত বিস্তৃত যে, উহার বর্ণনা অত্যন্ত কঠিন এবং এখানে অপ্রয়োজনীয়। সংক্ষেপে শুধু ইহাই বলা যায় যে, নৌবহর ও নৌবিভাগের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের জন্য হাতে-কলমে যুদ্ধ হইতে সুরু করিয়া সাধারণ নাবিকবৃত্তি পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়েই জাপানের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত এবং আধুনিক ধরণের। জাপানের নৌযুদ্ধপ্রণালী জার্ম্মাণ, মার্কিণ ও ইংরাজ বিশেষজ্ঞগণও প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জাপানী নৌসেনানীরা সংযত, পরিশ্রমী, উৎসাহী এবং সাহসী ও আত্মবিশ্বাসপরায়ণ,—এই আত্মবিশ্বাস জাপানী নৌবাহিনীর একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মত। ঐতিহাসিকদের মতে চীন ও রাশিয়ার যুদ্ধে অতি সহজে জয়লাভ করিয়া জাপানী নৌবাহিনীর মধ্যে বিস্ময়কর আত্মবিশ্বাস জন্মিয়াছে। তাঁহাদের নৈপুণ্য, সাহস ও আত্মবিশ্বাসই কেবল উল্লেখযোগ্য নহে, তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিগত বীরত্বও প্রশংসনীয়। জনৈক নৌরণপণ্ডিত বলিয়াছেন :—

It would be a poor compliment to Japanese navalmen to call them brave, that they certainly are ; but to great personal courage they add a fierce tenacity which is no less impressive.

ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে চীন ও রাশিয়ার যুদ্ধে। এই সমস্ত গুণ ছাড়াও জাপানী নৌ-সৈন্যদের বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও চাতুর্য্যও পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ নৌবাহিনীর সহিত তুলনীয়। রাশিয়ার সহিত পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে জাপানের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে যে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে, সেই যুদ্ধ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, জাপানীরা নৌরণবিদ্যায় কত নিপুণ।

১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতেই জাপান ও জারের রাশিয়ার মধ্যে মন কষাকষি চলিতেছিল এবং যুদ্ধ যে অনিবার্য্য উভয় পক্ষই তাহা ধরিয়া লইয়া প্রস্তুত হইতেছিল। অবশেষে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী উভয়ের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হয়। রাশিয়া গোড়া হইতেই নৌবহরের শক্তিতে জাপানের অপেক্ষা অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ ছিল। রাশিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নূতন যুদ্ধজাহাজগুলির ১খানা

বাদে, অর্থাৎ মোট ১৭ খানা ব্যাটালশিপ্ ও ক্রুজার প্রাচ্য সমুদ্রে জমায়েৎ ছিল, ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল পোর্ট আর্থারের ঘাঁটি ও ভ্লাডিভোষ্টক বন্দরের নৌবহর।

সুতরাং রুশ নৌশক্তি অজেয় বলিয়াই সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু জাপানীরা দুঃসাহসী। তাহারা স্থির করিয়া লইল নৌবহরের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তাহারা শ্রেষ্ঠতর রণনীতি ও রণকৌশলের দ্বারা রাশিয়াকে হারাইয়া দিবে। গোড়া হইতেই জাপ রণনীতি এক প্রকাণ্ড সমস্যার মুখে পড়িল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করিতে হইলে বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সমুদ্র পার হইতে হইবে। এই বিশাল সৈন্যদলের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া রসদ, অস্ত্র, গোলাগুলী ও অজস্র প্রকারের দ্রব্য সরবরাহ করিতে হইবে। কিন্তু রুশ নৌবহর যতক্ষণ অক্ষত ও কার্য্যক্ষম থাকিবে, ততক্ষণ কি ভাবে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব? সুতরাং জাপ নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এড্‌মিরাল্ টোগো স্থির করিলেন—হয় শত্রুর নৌবহরকে আগে ধ্বংস করিতে হইবে, কিম্বা সম্পূর্ণরূপে অবরোধের দ্বারা উহাকে অকেজো করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু ইহা সহজসাধ্য নহে। রাশিয়া কেবল জাহাজের শক্তিতেই বলীয়ান্ নহে, তাহাদের দুইটি উৎকৃষ্ট নৌঘাঁটি ও নৌকেল্লা রহিয়াছে। পোর্ট আর্থার ও ভ্লাডিভোষ্টকের সুরক্ষিত ঘাঁটি হইতে তাহারা অনায়াসে যুদ্ধ চালাইতে পারিবে। তাহাদের নৌবহরের অধিকাংশ যদিও পোর্ট আর্থারের ঘাঁটিতে, তথাপি ১২০০ মাইল দূরবর্ত্তী ভ্লাডিভোষ্টক বন্দরে রহিয়াছে তাহাদের ক্রুজারবাহিনী। কিন্তু জাপানী নৌবহরের এমন ক্ষমতা নাই যে, এই দুই নৌঘাঁটিই তাহারা একযোগে অবরোধ করিতে পারে। এড্‌মিরাল টোগো ইহা ছাড়া আর এক প্রকারের অসুবিধায় পড়িলেন। তাঁহার কোন রিজার্ভ বা মজুত যুদ্ধজাহাজ ছিল না। সুতরাং যদি কোন বড় জাহাজ ঘায়েল বা খতম হয়, তবে উহার স্থান পূরণ করা সম্ভব ছিল না। কাজেই সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করিলেও তাঁহার বিপদ ঘটিবে। এই প্রকার জটিল অবস্থায় তিনি যে রণনীতির অনুসরণ করিলেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এক চমৎকার পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি দুঃসাহসের সঙ্গে পোর্ট আর্থার বন্দরের নৌবহরের উপর টর্পেডো আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। পরদিন তিনি তাঁহার নৌবহরকে পোর্ট আর্থারের পাল্লার মধ্যে লইয়া গেলেন এবং যে সমস্ত রুশ

জাহাজ বাহির হইয়া আসিল, তিনি সেগুলির অধিকাংশ জখম করিলেন। অপর পক্ষে তাঁহার নিজের বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না। এই দুঃসাহসিক আক্রমণাত্মক নীতির ফলে রাশিয়ার প্রধান নৌবহর প্রায় অচল অবস্থায় পৌছিল। ফলে, টোগো তাঁহার নৌবহরের একাংশকে পাঠাইতে পারিলেন ভ্লাডিভোষ্টক বন্দরের ক্রুজারগুলির উপর নজর রাখিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি টোকিও গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, এক্ষণে জাপানী সৈন্যদলকে নিরাপদে কোরিয়ায় পাঠানো যাইতে পারে। তিনি নিজে পোর্ট আর্থারের কাছাকাছি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং রুশদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখিয়া যখনই সুযোগ পাইলেন তখনই টর্পেডো দ্বারা আক্রমণ, দূর পাল্লার কামান হইতে গোলাবর্ষণ করিতে এবং মাইন পুঁতিতে লাগিলেন। এই সময় জাপ নৌবহরেরও ক্ষতি হইল, দুইখানা ব্যাট্‌ল্‌সিপ্ ও একখানা ক্রুজার একমাসের মধ্যেই নষ্ট হইল। তথাপি টোগো পোর্ট আর্থারের উপর তাঁহার বজ্রমুষ্টি শিথিল করিলেন না।

এই অবস্থায় আগষ্ট মাসে রুশ নৌবহর জাপানীদের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষে ঘোরতর লড়াই বাধিল। টোগোর জাহাজ (Flagship) 'মিকাসা' সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল, কিন্তু রুশীয় নৌবহর পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। কতকগুলি জাহাজ নিরপেক্ষ বন্দরে আশ্রয় নিল এবং কতকগুলি পোর্ট আর্থারে ফিরিয়া গেল। সেখান হইতে তাহারা আর বাহির হইতে পারিল না। ইহার চারিদিন পর টোগোর সহকারী এড্‌মিরাল্ কামিমুরার সহিত ভ্লাডিভোষ্টক বন্দরের ক্রুজারবাহিনীর নিদারুণ সঙ্ঘর্ষ বাধিল। এই নৌবহরও জাপানীদের হাতে পরাজিত হইল। এই সংঘর্ষে যে দুইখানা যুদ্ধজাহাজ রেহাই পাইয়াছিল, সেই দুইটি ভ্লাডিভোষ্টক বন্দরে ফিরিয়া যায় এবং আর কখনও সমুদ্রে জাপানীদের বিরুদ্ধে হানা দেয় নাই। সাত মাসের কম সময়ের মধ্যে জাপানীরা সমুদ্রের উপর আধিপত্য লাভ করিল এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে তাহাদের সামরিক অভিযান চালাইতে লাগিল। রাশিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের বাল্‌টিক নৌবহর প্রশান্ত মহাসমুদ্রে পাঠাইয়া এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে চাহিল। কিন্তু গোড়া হইতেই ইহা একটা ব্যর্থ চেষ্টা ছিল। ইউরোপ হইতে দীর্ঘ পাড়ি দিয়া এশিয়া খণ্ডে পৌছিবার মুখে সুশিমা প্রণালীতে এডমিরাল্ টোগো এই নৌবহরকে বাধা দেন। যে সঙ্ঘর্ষ ঘটিল তাহাতে রুশ নৌবহর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। খুব সামান্য

কয়েকখানা জাহাজই নিরপেক্ষ বন্দরে যাইতে পারিয়াছিল, আর বাকী সমস্ত রুশ জাহাজ হয় নিমজ্জিত না হয় ধৃত হইয়াছিল। আধুনিক নৌযুদ্ধের ইতিহাসে এতবড় চূড়ান্ত নৌ-সঙ্ঘর্ষ খুব কম ঘটিয়াছে, অথচ জাপানীদের ক্ষতি অতি সামান্যই হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই সমস্ত সংগ্রামে জাপানী নৌবহরের মহড়া, নৈপুণ্য ও সাহস অত্যন্ত উচ্চস্তরের হইয়াছিল। জাপানী নৌসেনাপতিগণ যে তিনটি গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা রুশদের মধ্যে দুর্লভ ছিল। নৌযুদ্ধ পরিচালনায় এই তিনটি গুণ উল্লেখযোগ্য :—

(১) Accuracy of diagnosis, বা আসল অবস্থার লক্ষণ সঠিকভাবে নির্ণয়,

(২) Concentration of purpose, বা লক্ষ্য পূরণের জন্য শক্তির সংহতিকরণ এবং

(৩) Steadiness of conduct, বা পরিচালনার নিয়ম শৃঙ্খলা।

জাপানী নৌসংগ্রামের পিছনে এই ঐতিহ্য রহিয়াছে। জাপানী নৌবাহিনী এজন্য গর্ব্বিত, আত্মবিশ্বাসী এবং দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছে। আজিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রামেও জাপানের অভিযান এই সমস্ত লক্ষণ বহন করিয়া আনিতেছে। আধুনিক জাপ নৌবহর অতিকায় যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাটল্‌সিপের দিক হইতে বৃটেন ও আমেরিকার সমকক্ষ নহে। কিন্তু ক্রুজার শ্রেণীর জাহাজে জাপান যথেষ্ট শক্তিশালী। ক্ষিপ্রতা, দ্রুতগামিতা, গোলাগুলী বর্ষণের পটুতা এবং যান্ত্রিক সজ্জার শ্রেষ্ঠতায় জাপ নৌবহর প্রশান্ত মহাসাগরের মার্কিণ নৌবহরের সহিত পাল্লা দিতে পশ্চাৎপদ হইবে না— বিশেষজ্ঞদের ইহাই ধারণা।*

---

* জাপানী নৌবহরের সঠিক বর্ণনা পাওয়া কঠিন। সামরিক কারণে জাপান উহা সযত্নে যথাসম্ভব গোপন করিয়া রাখিয়াছে। তবে, বিশ্বাসযোগ্য নানা সূত্র সন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, যুদ্ধ বাধিবার সময় জাপানের ১০টি ব্যাটলশিপ, বড ক্রুজার ১৩টি, ছোট ক্রুজার ২৩টি, বিমানবাহী জাহাজ ৯টি, ডেষ্ট্রয়ার ১০৬টি, ও সাবমেরিণ ছিল ৭৫টি।

মার্কিণ নৌবহরে ছিল ব্যাট্‌লশিপ ১৬, বড় ক্রুজার ১৮, ছোট ক্রুজার ১৯, বিমানবাহী জাহাজ ৭, ডেষ্ট্রয়ার ১৯৪, এবং সাবমেরিণ ১২২ খানা।

বৃটিশ নৌবহরে (১৯৩৯ সাল) ছিল ব্যাট্‌লশিপ ১৫, ক্রুজার ৬২, বিমানবাহী জাহাজ ৭, ডেষ্ট্রয়ার ১৬৮ এবং সাবমেরিণ ৫৪ খানা।

কিন্তু আমেরিকা ও বৃটেন উভয়েরই নূতন নৌবহর নির্ম্মাণের তালিকা সে সময় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। নব নির্ম্মিত তালিকা (১৯৪০-৪১) এই :—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—ব্যাটলশিপ ১৭, ক্রুজার ৪৮, বিমানবাহী জাহাজ ১২, ডেষ্ট্রয়ার ১৬৬, টর্পেডো-বোট ২৩, সাব্‌মেরিণ ৮০, সাবমেরিণ চেইজার ২৫, মাইন পাতা জাহাজ ৩ এবং আরও বহু প্রকারের পোত।

— ৬ —

বিমানপথের আক্রমণ

১৩ই ডিসেম্বর, '৪১।

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে বৃটেন ও ফ্রান্সের এক সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমেরিকা জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু এবারের অবস্থা বিপরীত; এবার জার্ম্মাণীই আগাইয়া আসিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রাইখষ্ট্যাগে এক বক্তৃতায় হিট্‌লার ইতালী ও জার্ম্মাণীর সম্মিলিত যুদ্ধ ঘোষণার কথা জানাইয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী, ইতালী ও জাপান পরস্পরের মধ্যে সামরিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। যে চুক্তি এতকাল রাজনৈতিক ও আধা-সামরিক ছিল, তাহা এক্ষণে পুরাপুরি সামরিক প্রতিজ্ঞা-পত্রে রূপান্তরিত হইল। গত বৎসর অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে, আমেরিকাকে প্রতিরোধ করিতে হইলে জার্ম্মাণীর পক্ষে জাপানকে যুদ্ধে না নামাইয়া উপায় নাই। বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান এবং সেবার জাপান মিত্রশক্তির পক্ষে ছিল। বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার প্রধানতম বিঘ্ন বৃটেনের নৌশক্তি এবং জার্ম্মাণীর নৌবলহীনতা। ইহার সঙ্গে আমেরিকার নৌবহর ও অস্ত্রাগার সংযুক্ত হইলে বৃটেন আরও বেশী শক্তিশালী হইবে। কিন্তু আমেরিকা ও বৃটেনের পরেই জাপান নৌ-শক্তিতে শ্রেষ্ঠ। ওয়াশিংটন চুক্তির দ্বারা বৃটেনের ও আমেরিকার আনুপাতিক নৌ-শক্তির হিসাবে জাপানকে নৌ-বহর কমাইতে হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে জাপান এই অবস্থাকে অস্বীকার করিয়া তাহার নৌবল বৃদ্ধি করিয়াছে। বর্ত্তমানে মার্কিণ ও বৃটিশ বড় যুদ্ধ-জাহাজগুলি (ক্যাপিটাল শিপ), জাপানের তুলনায় বেশী সন্দেহ নাই। কিন্তু ছোট যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা এবং ক্ষিপ্রতা ও নৌ-অস্ত্রসজ্জায় জাপান ইহাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। একদল বিশেষজ্ঞের মতে ছোট যুদ্ধ-জাহাজই (ক্রুজার) আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের দ্রুততা ও ক্ষিপ্রতার যুগে অনেক বেশী কার্য্যকরী। বড় যুদ্ধ-জাহাজের গতিবেগ কম এবং মহড়া চালাইবার পক্ষে

বৃটিশ নৌবহরের নূতন জাহাজ—ব্যাট্‌লশিপ ৯, ক্রুজার ২২, বিমানবাহী জাহাজ ৬, ডেষ্ট্রয়ার ৪০ এবং সাবমেরিণ ১৮ খানা ও অন্যান্য পোত।

বলা বাহুল্য যে, জাপানেরও নূতন নৌবহর নির্ম্মাণের তালিকা ছিল, কিন্তু তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই আরও নূতন নৌবহর তৈয়ার হইয়াছে।

অসুবিধা এবং একবার এইগুলি ডুবিয়া গেলে অস্ত্রে, যন্ত্রে, লোকবলে ও অর্থ ব্যয়ে অপরিমিত লোকসান ঘটিয়া থাকে। জাপানী নৌ-বলের এই সাহায জার্ম্মাণী গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে আমেরিকার বিরুদ্ধে। রোম, বার্লিন টোকিওর সামরিক চুক্তির অন্যতম রহস্য এই। কিন্তু উপযুক্ত সময় বুঝিয় উপযুক্ত আঘাত হানিবার অপেক্ষায় জাপান ছিল। দুই বৎসর যুদ্ধ চালাইয়া বৃটেনের নৌ-শক্তির প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে তাহার দায়িত্ব এবং রাশিয়া ও অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্র আজ বিব্রত। জাপান এমন মুহূর্ত্তে বৃটেন ও আমেরিকাকে আঘাত করিয়াছে যে, ইঙ্গ-মার্কিণের পক্ষে সহসা তাল সামলানো কঠিন। এই বিদ্যুৎগতি আক্রমণের পশ্চাতে জার্ম্মাণীর চাল আছে, একথা পূর্ব্বাহ্নে অনুমান করা গিয়াছিল। এক্ষণে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতায়ও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অক্ষ-শক্তিবর্গ পূর্ব্ব হইতে প্ল্যান ও চক্রান্ত করিয়া প্রশান্ত মহাসমুদ্রে এই অতর্কিত আক্রমণ করিয়াছে। আক্রমণের ফলে গুয়াম, ওয়েক, মিডওয়ে (প্রশান্ত মহাসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ) এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এমনভাবে বিপন্ন হইয়াছে যে, রুজভেল্টের মতে এই দ্বীপগুলি অধিকৃত হইতে বিলম্ব নাই।* এই স্বীকারোক্তি আমেরিকার নৌ-বহরের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আজিকার দিনে একথা কাহারও অজানা নাই যে, নৌ-বহরকে যুদ্ধ চালাইতে গেলে উহার পক্ষে আশ্রয়স্থল আবশ্যক। জাহাজের কয়লা, পেট্রোল, রসদ এবং মেরামতি কাজ ও শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ হইতে আড়াল লইবার জন্য নৌ-ঘাঁটি ও জাহাজঘাটা (base and dock) থাকা একান্ত দরকার। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিস্তার ৮।৯ হাজার মাইল। ফিলিপাইন হইতে হাওয়াই দ্বীপ পর্য্যন্ত পর পর কতকগুলি নৌ ও বিমান ঘাঁটি আমেরিকার রহিয়াছে। হাওয়াই দ্বীপের পর আড়াই হাজার মাইল পর্য্যন্ত আর কোন নৌ-ঘাঁটি আমেরিকার নাই। সুতরাং প্রশ্ন উঠিবে গুয়াম, হাওয়াই প্রভৃতি সমস্ত দ্বীপ আমেরিকার হাত ছাড়া হইয়া গেলে মার্কিণ নৌ-বহর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবে কিরূপে? আর এইগুলি হাত ছাড়া হইলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জও দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। কারণ, ফিলিপাইনের নিকটে জাপানের যে সমস্ত দ্বীপ রহিয়াছে, সেগুলি হইতে বিমান ও নৌ-আক্রমণ চালাইয়া ফিলিপাইনকে কাবু করা

* ১০ই ডিসেম্বর গুয়াম এবং ২৪শে ডিসেম্বর ওয়েক দ্বীপ জাপানীরা দখল করে।

সহজতর হইবে। ইতিমধ্যেই ফিলিপাইনে জাপানী বিমান আক্রমণ প্রবল হইয়াছে এবং জাপ সৈন্যেরা সেখানে অবতরণও করিয়াছে।

ভৌগলিক অবস্থানের বিচারে জাপানের আত্মরক্ষা বা আক্রমণ, উভয় দিক দিয়াই অত্যন্ত সুবিধা রহিয়াছে। কারণ, তাহার স্বগৃহের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলির (home base) কাছাকাছি স্থান হইতে সে যুদ্ধ চালাইতে পারিবে। খাস জাপান দ্বীপে তাহার প্রধান প্রধান বিমান ঘাঁটি হইতেছে ইয়োকাহামা, ইয়োকোসুকা, কিউরি, সাসুবে ও নাগাসাকি। এশিয়া ভূখণ্ডে পোর্ট আর্থার ও কোরিয়ায় ঘাঁটি রহিয়াছে, জাপানের উত্তর দিকে কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের পারামুশিরা (মার্কিণ ঘাঁটি এলুশিয়ান দ্বীপ হইতে ৮০০ মাইল দূরে) একটি বড় ঘাঁটি, আরও উত্তরে লিউচু দ্বীপে কয়েকটি ঘাঁটি আছে। তারপর ফরমোজো দ্বীপের তাইনান, বোনিন, সাইপান, ইয়াপ, পিলিউ (ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত) ও হংকংয়ের অদূরবর্ত্তী হাইনান দ্বীপেও* জাপানীদের বিমান ঘাঁটি রহিয়াছে। জাপান যেন পূর্ব্ব হইতেই চারিদিকে বহু শক্তিশালী ঘাঁটি তৈয়ার করিয়া এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ইহার সঙ্গে থাইল্যাণ্ড ও ফরাসী ইন্দোচীনের কথাও চিন্তনীয়।

বিলাতী পত্রিকার বিমান বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, একমাত্র ইন্দো-চীনেই ৯০টি বিমান ও নৌ-বিমান (seaplane) ঘাঁটি আছে! ফরাসীরা বিমান বিদ্যায় ওস্তাদ। যুদ্ধের আগে প্যারিস হইতে সাইগন পর্য্যন্ত ফ্রান্সের বিখ্যাত বিমান সার্ভিস ছিল, (বাটাভিয়ায় ওলন্দাজদেরও ছিল)। ইন্দো-চীনের এই সমস্ত ছোট বড় ঘাঁটির আজ সমস্তগুলিই জাপানের হাতে আসিয়াছে। প্রকাশ যে, থাইল্যাণ্ডে বা শ্যামদেশেও জাপানীরা অনেক দিন আগেই বিমান ঘাঁটি তৈয়ারীতে 'সাহায্য' করিয়াছিল। থাইল্যাণ্ডে ২০টি বিমান ও নৌ-বিমান ঘাঁটি রহিয়াছে। এই মোট ১১০টি বিমান ঘাঁটির (অবশ্য সবগুলিই প্রথম শ্রেণীর নহে) সাহায্য আক্রমণকারী জাপান পাইবে। রেঙ্গুন হইতে ব্যাঙ্ককের (শ্যাম) দূরত্ব ৭৫০ মাইল। কিন্তু এই দূরত্ব মাত্র রাজধানী বা প্রধান নগরীর হিসাবে। বিমান ঘাঁটিগুলি ইতস্ততঃ চারিদিকে এবং সীমান্ত অঞ্চলেও অবস্থিত। সুতরাং বুদ্ধিমান পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, শ্যাম ও ইন্দোচীনের বিমান ঘাঁটিগুলি হইতে জাপান

---

* হাইনান দ্বীপে জাপানীরা সম্প্রতি বিমানঘাঁটি তৈয়ার করিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হংকং আক্রমণ।

বোমারুর সাহায্যে অনায়াসে ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে অগ্রগতি লাভ করিতে পারিবে। অপরপক্ষে মিত্রশক্তি এই দিকে উপযুক্ত বিমানবহর সমাবেশ করিতে পারেন নাই।

বিমানবহর সমাবেশ দূরের কথা, জাপানী বিমানশক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতাও রহিয়াছে প্রচুর। অবশ্য এই অজ্ঞতার মূল কারণ এই যে, জাপানীরা সামরিক ব্যাপারের সমস্ত কিছু অত্যন্ত গোপন করিয়াছে। নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী বা স্থলবাহিনী, প্রত্যেকটি বিভাগ সম্পর্কেই জাপান অতি সতর্ক—বিদেশীরা যাহাতে টের না পায়, তেমন সযত্ন ব্যবস্থা অনুসৃত হইয়াছে। তথাপি যতটুকু সঠিক তথ্য জানা গিয়াছে, তাহা হইতে বলা যায় যে, অন্যান্য বিদ্যার মত জাপান এই বিদ্যাটিও বিদেশীদের, বিশেষভাবে ইউরোপ হইতে শিখিয়াছে। ১৯১১ সালে প্রথম সামরিক বিমান চালনা আরম্ভ হয়। ফ্রান্স হইতে দুইজন জাপানী অফিসার বিমান বিদ্যা শিখিয়া আসেন এবং স্বদেশে উহার প্রবর্ত্তন করেন। ১৯১৯ সালে একটি ফরাসী মিলিটারী এভিয়েশন মিশন টোকিওতে যান এবং এই ফরাসী মিশনই জাপানী সৈন্যবিভাগীয় বিমান সার্ভিস (Army air service) প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। পরের বৎসর নৌ-বিভাগীয় বিমান সার্ভিস খোলা হয় এবং ১৯২১ সালে একটি বৃটিশ এ্যয়ার মিশন জাপানে যাইয়া নৌবিভাগীয় বিমানবাহিনীর পুর্নগঠনে সাহায্য করেন। সৈন্যবিভাগ ও নৌবিভাগ উভয়েই পাঁচ বৎসরের প্ল্যানে বিমানবহর বৃদ্ধির পরিকল্পনা করেন। তখন প্রথম স্তরের বিমান ছিল মাত্র ১৯০০ খানা এবং ইহার মধ্যে প্রায় ১ হাজারই ছিল নৌবিভাগীয়। এইগুলি মধ্যে আবার শত করা ৪০ ভাগ ছিল জাহাজবাহিত (ship borne) এবং বাকিগুলি তীরবর্ত্তী ঘাঁটিতে অবস্থিত। জাপানের দাবী এই যে, জাহাজবাহিত বিমান শক্তিতে তাহার স্থান বৃটেন ও আমেরিকার পরেই, কিন্তু তাহার যথার্থ বিমানশক্তি সে প্রকাশ করে নাই। জাপানী বিমান-সৈন্যেরা উৎকৃষ্ট বলিয়াই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। নিয়মশৃঙ্খলা খুব কঠোর এবং নৈতিক শক্তিও উন্নত। তবে, তাঁহাদের এই বিমানবিদ্যা সাধারণতঃ পাঠ্য পুস্তকের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি কয়েকটি নূতন বিমান বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। নৌবিভাগীয় ও সৈন্যবিভাগীয় জঙ্গী-বিমানগুলি সাধারণতঃ এক ইঞ্জিনযুক্ত, ১৫ হাজার ফুট উর্দ্ধে উহাদের চরম গতিবেগ ঘণ্টায় ২৭০ হইতে ৩০০ মাইল পর্য্যন্ত। জঙ্গীগুলির অধি-কাংশতেই চারটি কামান আছে, কোন কোনটিতে দুইটি মেসিনগান ও দুইটি

কামান, আবার কতকগুলি বা ৪টি মেসিনগান যুক্ত। সম্ভবতঃ কতকগুলি পুরাণো ধরণের জঙ্গী বিমানও আছে, যেগুলি ২টি মেসিনগানযুক্ত এবং যাহাদের গতি ঘণ্টায় ২৫০ হইতে ২৬০ মাইল।

জাপানী বিমানগুলির কোন নিজস্ব মৌলিকত্ব নাই, বিদেশী বিমানের অনুকরণেই এগুলি তৈয়ার হইয়াছে। তবে, অনুকরণের পটুতার জন্য তাহাদের তৈয়ারি বিমানগুলি ঐ জাতীয় কোন বিদেশীয় বিমানের শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। দূরত্বের পাল্লায় (range), ভারবহনে (load) ও গতিবেগ (speed) ইত্যাদিতে জাপ বিমানের যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। গোড়ার দিকে তাহারা বৃটিশ ও ফরাসী বিমান ইঞ্জিনীয়ারগণ কর্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩০ ও ১৯৩৫ সালের মধ্যে জাপান জার্ম্মাণীর কাছ হইতে বোমারু বিমান তৈয়ারির প্রেরণা পায়। 'মিৎসুবিসি টি ৯৬' নামে সুপরিচিত জাপ বোমারু (তীর ও নৌরক্ষী) জার্ম্মাণীর বিখ্যাত 'জুঙ্কার্স ৮৬' শ্রেণীর বোমারুর অনুকরণে তৈয়ারি। ইহার পর জাপ বিমানবহরে আমেরিকার প্রভাবও পড়িয়াছে। ফলে নানা ধরণের বিমান তৈয়ার হইয়াছে। ভারী বোমারুর মধ্যে নৌবিভাগীয় 'মিৎসুবিসি টি ৯৬' এর পরেই সৈন্য বিভাগীয় 'মিৎসুবিসি টি ৯৭' উল্লেখযোগ্য। এইগুলি দুই ইঞ্জিনযুক্ত, গড়ে ২ হাজার পাউণ্ড ওজনের বোমা এইগুলি বহন করিতে পারে এবং ইহাদের পাল্লা (range) ১১০০ মাইল পর্য্যন্ত। হাল্কা বোমারুগুলির গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫০-২৬০ মাইল এবং সেগুলি ৮০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত পাউণ্ড বোমা বহন করিতে পারে।

জাপানী বোমারু ও জঙ্গী-বিমানের স্কোয়াড্রনগুলিতে সাধারণতঃ ১০টি করিয়া বিমান থাকে। পর্য্যবেক্ষণকারী স্কোয়াড্রনগুলিতে থাকে ৯টি করিয়া। বিমানবাহী জাহাজ ছাড়া ৫টি সীপ্লেনবাহী জাহাজও জাপানের আছে। সৈন্য বিভাগের ৬টি এবং নৌবিভাগের ১টি বিমান বিদ্যালয় আছে। কিন্তু এই ৭টি স্কুল হইতে বৎসরে ৭০০'এর বেশী পাইলট তৈয়ার হয় না। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সৈন্যবিভাগ ও নৌবিভাগের বিমানবাহিনীতে মোট ৩৩ হাজার লোক ছিল। ইহার মধ্যে ৩ হাজার ছিল সৈন্যবিভাগীয় বিমানের পাইলট এবং ২ হাজার ১ শত নৌবিভাগীয় বিমানের পাইলট। *

যুদ্ধারম্ভের সময় জাপানের মোট বিমানশক্তি কত ছিল, তাহা জানা যায় নাই। বিলাতী পত্রিকাগুলির অনুমান জাপানের মোট ৩ হাজার বিমান

* 'The Sphere,' লণ্ডন, ২৭-১২-৪১।

আছে। কিন্তু জাপানী সূত্রে ৫ হাজারের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। * মোট কথা জাপানের বিমানশক্তি উপেক্ষনীয় নহে। বিশাল প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপে, উপদ্বীপে ও ঘাঁটিতে সে যেভাবে বিমান অভিযান চালাইয়াছে, তাহাতে উহার পটুতা, নিয়মশৃঙ্খলা ও ব্যাপকতা যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। বৃটিশ নৌবহরের 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস' ও 'রিপালসের' উপর জাপানী বৈমানিকদের আক্রমণ (৪০০ মাইল দূর হইতে) ও লক্ষ্যভেদ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পর্য্যন্ত প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

— ৭ —

স্থলপথের আক্রমণ

১৪ই ডিসেম্বর, '৪১।

থাইল্যাণ্ড যেখানে একান্ত দক্ষিণবর্ত্তী ব্রহ্মদেশের সঙ্গে মিশিয়াছে, জাপ সৈন্যেরা সেই সীমানা ভেদ করিয়া ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট এলাকায় উপস্থিত হইয়াছে। ওদিকে হংকং বন্দরেও তাহারা ব্যাপক আক্রমণ সুরু করিয়াছে। জলপথ অতিক্রম করিয়া স্থলপথের এই আক্রমণের গুরুত্ব বুঝিবার আগে, জাপানী সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। কেন না, কেবল নৌযুদ্ধেই নহে, স্থলযুদ্ধেও যে জাপানীদের পটুতা আছে এবং প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া তাহারা যে কেবল যুদ্ধবিগ্রহ লইয়াই আছে, একথাও মনে রাখা উচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা ইউরোপীয় কূটনীতিবিদ্ বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্ম্মানী ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে ইউরোপে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের (প্যারিসের ঐতিহাসিক পতন—ভন্ মলট্‌কের অধিনায়কত্বে) বিরুদ্ধে জয়লাভের দ্বারা জার্ম্মাণীর খ্যাতি এশিয়াখণ্ড অবধি ছড়াইয়া পড়িল। জাপানও ইহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জাপানে প্রথম সৈন্য-বাহিনীর ও সামরিক শক্তির ভিত্তি পত্তন করা হয় এবং সেই সময় জাপানী

---

* ম্যাক্স ভার্ণার তাঁহার 'Great Offensive' পুস্তকে বলিয়াছেন যে, ১৯৪১-৪২' সালের প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপান মোট তিন হাজার বিমান নিয়োগ করিয়াছিল। যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে, তবে জাপানের মোট বিমানশক্তি নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশী।

অফিসারেরা বিদেশে, বিশেষভাবে জার্ম্মাণীতে গিয়া প্রুশিয়ান সমর বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। নবগঠিত জাপ সৈন্যদল ২২ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। তারপর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কিছুকালের জন্য কোরিয়া দখল করিয়া লয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত রুশ-জাপান যুদ্ধ, তখন হইতে জাপানী সৈন্যরা অধিকাংশ সময়েই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া এবং ১৯৩৭ সাল হইতে চীন-জাপান যুদ্ধ। মাঝখানে বিগত মহাযুদ্ধেও জাপান কিছুটা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এভাবে জাপান সম্পূর্ণরূপে সামরিক মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

যে কোন দেশের জনশক্তিই সৈন্যশক্তির বাহন। অর্থাৎ জনসংখ্যার উপরেই সৈন্যসংখ্যা ও সৈন্যদলের গঠন নির্ভর করে। চীনের জাপ অধিকৃত অঞ্চলগুলি বাদ দিলে জাপানী সাম্রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা হইবে ১০ কোটি ৩০ লক্ষ, ইহার মধ্যে ৭ কোটির উপর খাস জাপানী দ্বীপেই বাস। জাপানের আয়তন ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮ শত বর্গ মাইল এবং জাপ অধিকৃত কোরিয়া, ফরমোজা ও দক্ষিণ শাখালিনের মোট আয়তন ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৬ শত বর্গ মাইল। ইহা ছাড়া চীনে জাপ তাঁবেদার মাঞ্চুকুয়ো ও নানকিং গবর্ণমেণ্টের অধীন বিরাট এলাকাও জাপানের করতলগত। জাপানের বর্ত্তমান সৈন্যসংখ্যা ৫০ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান।*

---

* অবশ্য এই সংখ্যাটা প্রামাণিক কিনা বলা শক্ত। সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ৫ বৎসরের চীন যুদ্ধে জাপানের ১০ লক্ষ সৈন্য নষ্ট হইয়াছে এবং আরও ১০ লক্ষ সৈন্য সেখানে যুদ্ধরত বলিয়া প্রকাশ।

এই প্রসঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনেরও অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, জাপানের আসল সংগ্রাম ইহাদের বিরুদ্ধে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র :—অধিকৃত স্থানসমূহ ধরিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৩৭৩৮ ৩৯৫ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ১৩ কোটী, নিয়মিত ফেডারেল সৈন্য বাহিনীতে ১,৭৮০০০ সৈন্য রহিয়াছে। রিজার্ভ সৈন্যদল আছে ১লক্ষ ১৫ হাজার। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ষ্টেটের ন্যাশন্যাল গার্ডস (যাহারা যুদ্ধের সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রধান সেনাপতিরূপী প্রেসিডেণ্টের পরিচালনাধীনে আসে) ইত্যাদি ধরিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াইবে ১০ লক্ষ। গত মহাযুদ্ধের সময় সমর বিভাগের জন্য ২ কোটি ৪০ লক্ষ লোক রেজেষ্ট্রীভুক্ত হইয়াছিল এবং ৪০ লক্ষ ৫৭ হাজার সৈন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।

বৃটেন :—সেনাবাহিনী ৩ ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ১৯৩৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশ একত্রিত করা হয়। ১৮ হইতে ৪১ বৎসর বয়স্কদিগকে বাধ্যতামূলক ভাবে সামরিক কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসের

আগেকার ইতিহাস সন্ধানে দেখা যায় যে, ১৮৭২ সাল হইতে জাপানে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বৃত্তির প্রবর্ত্তন করা হয় এবং গত ৭০ বৎসর ধরিয়া সেই নীতিই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার ফলে, ষ্ট্যাণ্ডিং আর্ম্মি বা নিয়মিত সৈন্যদল বৃহৎ হইবার কথা। কিন্তু যথেষ্ট বাছাই করিয়া সৈন্য গৃহীত হয় বলিয়া উহার সংখ্যা বেশী নহে। মার্কিণ সমর বিভাগের লেঃ কর্ণেল পল ডব্লিউ টমসন বলিতেছেন যে, সাধারণতঃ দুই বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবৃত্তি গ্রহণের জন্য লোক গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষার দ্বারা খুব কড়াকড়ি ভাবে দৈহিক ও মানসিক ইত্যাদি যোগ্যতার সন্ধান করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ৬ শ্রেণীতে ভাগ করিয়া যোগ্যতার পরীক্ষা হইয়া থাকে। যেমন, ১৯৩৬ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, মোট প্রায় ৬ লক্ষ ৩০ হাজার যুবককে সৈন্যবৃত্তি গ্রহণের জন্য ডাকা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বোধ হয় ১ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশী চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হয় নাই। সমরবৃত্তির উপযুক্ত গুণাগুণের এভাবে কঠোর পরীক্ষা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ১৭ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক লোককে মিলিটারি সার্ভিসের যোগ্য বলিয়া মনে করা হয়। তবে, শান্তির সময়ে সমরবৃত্তি শিক্ষার জন্য ২০ বৎসর বয়সের যুবকদিগকে ডাকা হয়। এভাবে যে নিয়মিত সৈন্যদল গড়িয়া উঠে, তাহারা ছাড়াও নানা প্রকারের রিজার্ভ সৈন্য আছে। প্রতি বৎসর অন্ততঃ দেড় লক্ষ করিয়া যুবক মিলিটারী ট্রেণিংয়ের জন্য গৃহীত হইলে মোট শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা কয়েক বৎসরে কত দাঁড়ায়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

১৯৩৬ সালের হিসাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সৈন্যদলে শিক্ষার্থী জাপ যুবকের গড়পরতা দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৩½ ইঞ্চি, ওজন ১১৭ পাউণ্ড (বা প্রায় ১ মণ ১৮ সের)। সকলেরই অন্ততঃ স্কুলের শিক্ষা আছে, অশিক্ষিতের সংখ্যা অতি নগণ্য। বৃত্তি হিসাবে ভাগ করিলে দেখা যায় যে, শতকরা ৩১ জন চাষী, ৩০ জন কারখানার শ্রমিক, ১৫ জন ব্যবসায়-বাণিজ্যের কর্ম্মচারী, ৫ জন শিক্ষক ও সাহিত্যিক, সাধারণ শ্রমিক ৪ জন ও অন্যান্য শতকরা ১৫ জন। অর্থাৎ অধিকাংশই চাষী ও শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্গত।

মধ্যে ২০ হইতে ৩৬ বৎসর বয়সের ৪০ লক্ষের অধিক লোককে রেজেষ্ট্রীভুক্ত করা হয়। তখন মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের ২ লক্ষ সৈন্য এবং বিভিন্ন ডোমিনিয়নের মোট কয়েক লক্ষ সৈন্যও ধরা যাইতে পারে।—'যুগান্তর' ৮-১২-৪১।

গত মহাযুদ্ধে জাপানের প্রায় ২০ ডিভিসন বা মোট ৪ লক্ষ সৈন্য ছিল। ১৯২৩ সালের প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে উহা হ্রাস পাইয়া যায় এবং ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধের সময় উহা আবার ৩ লক্ষ ৭৫ হাজারে দাঁড়ায়। লেঃ কর্ণেল টমসনের মতে জাপানী সৈন্যসংখ্যা নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতা ও 'লণ্ডন টাইমসের' হিসাব ইত্যাদি একত্র করিলে ডিভিসন হিসাবে জাপানী সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াইবে ১৫ লক্ষ, কিম্বা ৭০ হইতে ৮০টি পদাতিক ডিভিসন। নিয়মিত পূরাপূরি যান্ত্রিক ডিভিসন নাই, তবে ১৫টি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট আছে এবং উহার প্রত্যেকটিতে ১৫০খানা ট্যাঙ্ক রহিয়াছে। অর্থাৎ সাঁজোয়া সৈন্যশক্তি (armoured strength) ৫ হইতে ৬ ডিভিসন হইবে। মোটকথা সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ লক্ষ জাপ সৈন্য রণক্ষেত্রে নিয়োজিত আছে। 'লণ্ডন টাইমসের' মতে এগুলির মধ্যে ৩০ ডিভিসন মাঞ্চুকুয়ো-সাইবেরিয়া সীমান্ত অঞ্চলে, ২০ ডিভিসন চীনে এবং ২৫ ডিভিসন বর্ত্তমান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে নিয়োজিত।*

জাপানী যুবকদিগকে যেমন বাছাই করিয়া সৈন্যদলে নেওয়া হইয়া থাকে, তেমনই যাহাতে তাহারা উৎকৃষ্ট যোদ্ধারূপে গড়িয়া উঠে, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। জাপানীরা সম্রাট ও দেশের প্রতি অত্যন্ত ভক্ত, এই ভক্তি যেমন অবিচলিত, তেমনই অন্ধ। এ কারণে যোদ্ধা হিসাবে জাপ সৈন্যেরা অত্যন্ত গোঁড়া ও দুর্দ্ধর্ষ, হারিলে হারিকিরি করিবে, কিন্তু সহজে ধরা দিবে না। তাহারা কঠোর পরিশ্রমী, দৈহিক সহনশীলতা তাহাদের অপরিসীম, ভাবপ্রবণতায় তাহারা অদ্বিতীয়, সুতরাং মরিয়া হইয়া যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে এশিয়ায় তাহাদের জুড়ি নাই।†

রণধর্ম্মের কতকগুলি নীতিবাক্য জাপানীদের মনে রাখিতে হয়। বিশেষভাবে ৫টি নীতিবাক্য ও তাহার ব্যাখ্যা স্মরণীয়। যথা—(১) আনুগত্য বা loyalty প্রাথমিক কর্ত্তব্যের অন্তর্গত (মনে রাখিও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও তাহার

---

* 'How The Jap Army Fights'—তিনজন মার্কিণ মিলিটারি অফিসার লিখিত এবং ১৯৪২ সালে আমেরিকায় প্রকাশিত। এই হিসাবে দেখা যায় ২৫ লক্ষ সৈন্য জাপানের বাহিরে, তাহা হইলে খাস জাপানে আরও ২৫ লক্ষ অনুমান করিলে মোট সংখ্যা ৫০ লক্ষ হওয়া অসম্ভব নহে।

† লেঃ কর্ণেল টমসন ইহাদিগকে extraordinary বা 'অসাধারণ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বল রক্ষা সশস্ত্র শক্তির উপর নির্ভর করে। আর মনে রাখিও কর্ত্তব্য পাষাণের চেয়েও ভারী এবং মৃত্যু পাখীর পালকের চেয়েও হাল্কা)! (২) আচরণের শৃঙ্খলা বা propriety মানিতে হইবে (নিম্নপদস্থদের মনে রাখা দরকার যে, উচ্চপদস্থদের হুকুম স্বয়ং সম্রাটের দেওয়া হুকুমের মতই পালনীয়)। (৩) বীর্য্যবত্তা বা valour'এর গুণ উপলব্ধি করিতে হইবে (কোন নিকৃষ্ট শত্রুকেও ঘৃণা করিবে না এবং উৎকৃষ্টতরকেও কখনও ভয় করিবে না। কিন্তু আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে)। (৪) বিশ্বস্ততা ও সততার বা faithfulness and righteousness এর মূল্যও বুঝিতে হইবে। কথা দিয়া কথা রাখার অর্থ বিশ্বস্ততা এবং কর্ত্তব্য পালন করার অর্থ সততা)। (৬) সহজ জীবনযাত্রা বা simplicity অনুসরণ করিতে হইবে। (যদি অনাড়ম্বর ও সহজ জীবনযাত্রা তোমার লক্ষ্য না হয়, তবে, তুমি নির্বির্য্য, বিলাসী ও অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িবে)।*

এই সমস্ত নীতি ও নির্দ্দেশ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ, সন্দেহ নাই। কিন্তু জাপ সৈন্যের শিক্ষা কেবল পুঁথির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। হাতে কলমে যে শিক্ষা তাহারা লাভ করিয়া থাকে, উহার সঙ্গে যুক্ত হয় শান্তির সময়ের দীর্ঘ ও কঠোর মহড়া। ১৯৩৪-৩৫ সালে একজন মার্কিণ অফিসার উত্তরচীনে জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে ৬ মাস ছিলেন। তিনি ১২ দিনের মহড়ার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, জাপসৈন্যদিগকে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হয়। কোনপ্রকার বিশ্রাম না করিয়া ও না ঘুমাইয়া একাদিক্রমে দীর্ঘকাল মার্চ্চ করিতে হইয়াছিল। একদিন ৩৭ মাইল মার্চ্চ করিতে হইয়াছে, দুইবার সৈন্যেরা তিন দিন ও দুই রাত্রি না ঘুমাইয়া ক্রমাগত চলিয়াছে। মহড়ার শেষ চারিদিন অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়াছিল। ভোর রাত্রি ৫টার সময় রওনা হইয়া পরদিন বেলা ১০টা পর্য্যন্ত মার্চ্চ করিতে হইয়াছে। এই সময় তাঁহারা একাদিক্রমে ৫৬ মাইল মার্চ্চ করিয়াছিলেন।† এই প্রকার অদ্ভুত

---

* 'How The Jap Army Fights'.

† নিঃসন্দেহে বিশেষজ্ঞ মতের বিচারে এত দীর্ঘ মার্চ্চ অত্যন্ত বিস্ময়কর। একটি প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা যায়—"পুরা এক ডিভিসন সৈন্য একটি মাত্র সড়ক ধরিয়া ঘণ্টায় ৫ মাইলের বেশী মার্চ্চ করিতে পারে না এবং সারা দিনে ১৫ মাইল মার্চ্চ করিলেই যথেষ্ট মনে

সহনশীলতা ও পরিশ্রমে জাপ সৈন্যদিগকে অভ্যস্ত করানো হয়। আহারও তাহাদের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও স্বল্প। ইউরো-মার্কিণ সৈন্যেরা ভাবিতেই পারে না যে, এত কম খাদ্যে তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় কিরূপে এবং লড়াইও বা করে কি প্রকারে? এই বইয়ের পরবর্ত্তী অংশে জাপ স্থলসৈন্যদের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ফলাফল পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ হংকং ও পেনাংয়ের পতন

—১—

হংকং অবরোধ

১৫ই ডিসেম্বর '৪১।

জাপানীরা আক্রমণের সুরু হইতেই প্রায় সমস্ত মার্কিণ ও বৃটিশ ঘাঁটিগুলির উপর আঘাত হানিতেছিল। ১৫ই তারিখ হইতে বিখ্যাত হংকং বন্দরে অবরোধ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অতর্কিত আক্রমণে সমুদ্রপথে আধিপত্য লাভ করিয়া এবং শ্রেষ্ঠতর বিমানশক্তি ও সৈন্যশক্তি প্রয়োগ করিয়া জাপানীরা গোড়া হইতেই গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। মিত্রপক্ষের সহিত যাহাতে সংবাদ আদান প্রদান না চলিতে পারে, এজন্য ১১ই তারিখ তাহারা হংকং ও ওয়াশিংটনের তারের সংযোগ (cable line) নষ্ট করিয়া দেয়। যোগাযোগ নষ্ট করিতে পারা রণকৌশলের একটা বড় লক্ষ্য; সুতরাং প্রারম্ভেই তাহারা এই কাজটি করিয়া রাখিল। হংকংকে কেবল তাহারা সমুদ্রপথেই অবরোধ করে নাই, স্থলভাগ দিয়াও তাহারা বেষ্টনী সৃষ্টি করিল। ১৯৩৮ সালে চীনের হাত হইতে এক দুর্দ্ধর্ষ ও কৌশলপূর্ণ সংগ্রামের দ্বারা জাপানীরা ক্যাণ্টন দখল করিয়া লইয়াছিল। তখন হংকং বন্দর দিয়া ক্যাণ্টনে চীনাদের জন্য বিদেশ হইতে (বিশেষভাবে বৃটেন হইতে) সাহায্য যাইত। এই সাহায্যের পথ ছিন্ন হইল ক্যাণ্টন দখলের দ্বারা। এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রটি জাপানীদের হস্তগত

করা উচিত। ১৫ হইতে ২০ মাইল মার্চ্চকে দীর্ঘ মার্চ্চ বলা যাইতে পারে এবং ২০ মাইলের বেশী মার্চ্চ করার অর্থ জোরপূর্ব্বক মার্চ্চ করানো।"

'The Operations of War.'—জেনারেল হ্যামলি রচিত।

হইলে ভবিষ্যতে হংকং যে বিপন্ন হইবে, সেই ধারণা পূর্ব্বাহ্লেই করা উচিত ছিল। কারণ জাপানীদের হংকং আক্রমণে দেখা যাইতেছে যে, তাহারা ক্যাণ্টন হইতে অগ্রসর হইতেছে। কোয়াংটান প্রদেশের ইহা রাজধানী; ইহার পরেই কৌলুনের এলাকা আরম্ভ। জাপানীরা ক্যাণ্টনের পথ ধরিয়া কৌলুনে পৌছিয়াছে এবং ইহা দখল করিয়াছে। ক্যাণ্টন হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র দুই মাইল। অতএব অবস্থা স্বভাবতঃই গুরুতর হইবে। হংকংয়ের পশ্চাৎদিক দিয়া এই অভিযান ব্যাহত করিবার জন্য চীনাবাহিনী ক্যাণ্টনে ও কৌলুনে জাপানের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু সেই আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। কৌশল হিসাবে ইহা ভালোই ছিল। কারণ, ইহা দ্বারা হংকংয়ের উপর চাপ হ্রাস পাইত। এক্ষণে ভোরবেলা হইতে অবরোধকারী জাপ সেনাদল ও হংকংয়ের আত্মরক্ষাকারীদের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলিতেছে। জাপানীরা নৌবহর ও বিমানবহর হইতে গোলা ও বোমাবর্ষণ করিতেছে। ইহা ছাড়া কৌলুনের পিছনে পাহাড়ের উপর কামান বসাইয়া হংকংয়ের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। জনৈক সংবাদদাতা বলিতেছেন—

'যদিও জাপানীরা প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইতেছে, তথাপি হংকং-বাসীরা জার্ম্মাণ আক্রমণের সময় লণ্ডনবাসীদের অনুরূপ প্রতিরোধ চালাইতেছে। হংকংয়ের সম্মুখস্থ ৩০ বর্গমাইল জাপানীরা অধিকার করিয়াছে বলিয়া যে দাবী করা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় সত্য। বৃটিশেরা ব্যবহার উপযোগী সমস্ত জিনিষপত্রই ধ্বংস করিয়াছে। স্কটল্যাণ্ড, কানাডা, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সৈন্যগণ হংকংয়ের দুই সহস্র স্বেচ্ছাসৈন্যের সহযোগিতায় হংকং রক্ষা করিতেছে। মনে হইতেছে, প্রধান স্থল অঞ্চল হইতে হয়তো সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত দ্বীপটিকে রক্ষা করা হইবে। দ্বীপ-রক্ষা কার্য্য দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্রতর হইবে।'

*　　*　　*　　*

পরবর্ত্তী তারিখগুলিতে দেখা যায় যে, চীনাবাহিনী ক্যাণ্টন-হাঙ্কৌ রেল-পথের ধার দিয়া কৌলুন দখলকারী জাপানী সৈন্যদের পার্শ্ব ও পশ্চাৎদেশ আক্রমণ করিয়াছে। আর জাপ গোলন্দাজবাহিনী হংকংয়ের সমগ্র বন্দরের উপর গোলাবর্ষণ সুরু করিয়াছে। এই চীনাবাহিনীর সহিত জাপানীদের কয়েকদিন ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু চীনারা জাপানীদের ক্ষতি সাধন করিলেও জয়লাভ করিতে পারে নাই।.........

এইভাবে আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হইয়া হংকং কতকাল আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? যাঁহারা দীর্ঘ অবরোধের কথা ভাবিতেছেন, তাঁহারা বোধহয় বিশুদ্ধ সমরনীতির দিক দিয়া বিচার করিতেছেন না, করিতেছেন আত্মসান্ত্বনা লাভের জন্য। হংকংয়ের উপর আক্রমণ অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে। যদি কোন সমুদ্রতীরস্থ বন্দর নৌপথ দিয়া আক্রান্ত, বিব্রত ও অবরুদ্ধ হয়, তবে দীর্ঘকাল উহার পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন। নৌঘাটি ও নৌ-বন্দর সাধারণতঃ সমুদ্রপথের আক্রমণ ও আত্মরক্ষার এবং যোগাযোগ রক্ষার জন্য স্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু শত্রুর আক্রমণে যদি সেই সমুদ্রপথ বিপন্ন, বেষ্টিত ও যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে একমাত্র দুর্গশ্রেণীর আড়ালে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয় এবং একান্তরূপে নির্ভর করিতে হয় নিজেদের পূর্ব্বাহ্ণে সংগৃহীত রসদ, পানীয়, গোলাগুলী এবং অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যের উপর। কিন্তু হংকংয়ে দীর্ঘ অবরোধের উপযোগী এতগুলি আবশ্যকীয় দ্রব্য ও সৈন্যের ব্যবস্থা আছে কিনা, সন্দেহজনক। সমুদ্রপথের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় এই পথ দিয়া কোন নূতন সৈন্য, অস্ত্র, রসদ ইত্যাদি আনা সম্ভব নহে। এমন কি একমাত্র বেতারযন্ত্র ছাড়া সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি নৌপথেব পর স্থলপথের সংযোগও অব্যাহত থাকিত, তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ আশা করা যাইত। কিন্তু সেই সম্ভাবনাও নষ্ট হইয়াছে। কারণ জাপানীরা কৌলুন ও ক্যান্টন দখল করিয়া সেই পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে। এভাবে বহির্জগতের সহিত সহিত সংযোগ হারাইয়া হংকং দীর্ঘ অবরোধ যুদ্ধ চালাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ জাপানীরা বিদ্যুৎগতিতে জল, স্থল ও আকাশ পথ ধরিয়া আক্রমণ চালাইয়াছে এবং ক্ষুদ্র হংকং দ্বীপের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে। হংকংয়ের গভর্ণর অবশ্যই সাহসী ও দৃঢ়চেতা পুরুষের মত এই বিপজ্জনক অবস্থায়ও শেষ পর্য্যন্ত লড়িবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার এই ঘোষণানুযায়ী 'হংকংয়ের সংগ্রাম ইতিহাসের প্রশংসা লাভ করিবে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সামরিক জয়লাভ হইবে কিনা, তাহা নিশ্চয়ই সংশয়াচ্ছন্ন।

(২)

উত্তর মালয়ে

১৬ই ডিসেম্বর '৪১।

হংকং বন্দর ও নৌ-ঘাঁটির বিপদ যখন ঘনাইয়া আসিতেছে, তখন নিম্ন ব্রহ্মে জাপ সৈন্যের প্রবেশ ও উত্তর মালয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। নিম্ন ব্রহ্মের শেষ প্রান্ত লেজের মত সমুদ্রে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং উহা মালয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই পুচ্ছের শেষভাগে ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট এবং এই ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টের ভিতর দিয়াই কিছু জাপ সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উত্তর মালয়ের যে অংশে এক্ষণে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত জাপানীদের যুদ্ধ চলিতেছে, ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট হইতে উহার নিরবচ্ছিন্ন স্থল-পথের যোগ রহিয়াছে। এই সমগ্র অংশটাই মানচিত্রে দীর্ঘ লম্বমান সূতার মত দেখা যাইতেছে। মালয় উপদ্বীপ ৭০০ মাইল দীর্ঘ, সঙ্কীর্ণতম অংশে ইহা মাত্র ৩০ মাইল চওড়া ও বিস্তৃততম অংশে ১৮০ মাইল। ক্রা যোজক হইতে ইহা সিঙ্গাপুরে গিয়া শেষ হইয়াছে এবং ক্রার উপর হইতে দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্মের আরম্ভ হইয়াছে। মালয় উপদ্বীপ অরণ্যের জন্য বিখ্যাত। বহু রোমাঞ্চকর আরণ্যক চিত্রের উপাদান মালয়, বোর্ণিও ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া সিনেমা-বিলাসীদের মনোরঞ্জন করা হইয়াছে। নানা শ্রেণীর বিচিত্র জন্তু জানোয়ার এই দেশের গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা। নদীগুলি কুমীরে ভর্ত্তি। তীরভূমির অধিকাংশই জলাভূমি মাত্র। ইহা ছাড়া মালয়ের শিরদাঁড়া অরণ্যবহুল গিরিশ্রেণীতে নিবদ্ধ। এই সমস্ত পাহাড়ের অনেক শৃঙ্গ আছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ ৭ হাজার ফুট। নিম্ন ব্রহ্মের টেনাসারিম বিভাগ, যেখানে জাপানী বোমারুর আক্রমণ ঘটিয়াছে, সেখানে টিনের কারখানা আছে। এই বিভাগ সালুইন, থাটন, আমহার্ষ্ট, টাভয় ও মার্গুরি জেলা লইয়া গঠিত। জেলাগুলি সমস্তই অরণ্যে ও পাহাড়ে আচ্ছন্ন। নদীর মধ্যে সালুইন প্রধান। সালুইন জেলার পাহাড়গুলির শৃঙ্গ ১ হাজার হইতে ৩ হাজার ফুট, থাটনে পাহাড় কিছু কম এবং উহাদের শৃঙ্গগুলি ৩০০ হইতে ১ হাজার ফুট উঁচু মাত্র। টাভয় জিলাও অনুরূপ, কিন্তু টাভয় অত্যধিক গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে সীমান্তবর্ত্তী পাহাড়ের উচ্চতা আড়াই হাজার ফুট। মার্গুরি জেলা ব্রহ্মের শেষ প্রান্ত।

ইহার পূর্ব্বে ও দক্ষিণে শ্যামদেশ ও শ্যাম উপসাগর এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। ভিক্টোরিয়া পয়েন্টের যেখানে ইহা শেষ হইয়াছে সেখানে ইহা সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়াছে। এখানে কিংস্ সেলোয়, এলফিনষ্টোন, ডোমেল, ক্যাম্পবেল প্রভৃতি কতকগুলি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপগুলি বিমান ও নৌঘাঁটির পক্ষে সহায়ক এবং ব্রহ্মদেশ রক্ষার পক্ষে এই দ্বীপগুলি কাজে লাগিবে। নিম্ন ব্রহ্ম বা উত্তর মালয় কোনটাই বড় রকমের যুদ্ধের উপযোগী নহে, কারণ এই দেশগুলি জঙ্গল ও পাহাড়ে আচ্ছন্ন এবং রাস্তাঘাট কম ও সঙ্কীর্ণ। তথাপি সংবাদে প্রকাশ, জাপানী সৈন্যরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত প্রাকৃতিক বিঘ্নকে অস্বীকার করিতেছে এবং জঙ্গলে ও কুমীর পরিপূর্ণ নদীতে দুঃসাহসের সহিত যুদ্ধ চালাইতেছে। দীর্ঘকাল দক্ষিণ চীনে সংগ্রাম করিয়া জাপানী সৈন্যরা এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে।

কিন্তু এই সমস্ত দেশেরই ভাগ্যসূত্র জড়িত সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের সহিত। হংকংকে অবরোধ করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হইতেছে। হংকংয়ের পতন হইলে সিঙ্গাপুর হইতে বৃটিশ নৌবহরের দক্ষিণ চীন-সমুদ্রে অভিযান চালানো অত্যন্ত কঠিন হইবে এবং সিঙ্গাপুর অঞ্চল হয়তো বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। হংকংয়ের যুদ্ধে চীনারা যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিত। যদি তাহারা ক্যাণ্টন হইতে পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশ সাফল্যের সহিত আক্রমণ করিতে পারিত, তাহা হইলে হংকং রক্ষা অনেক বেশী সহজ হইত। আক্রান্ত স্থানগুলিকে জাপান যেমন পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছে, তেমনই জাপানী রণনীতির আর একটা বড় উদ্দেশ্য হইতেছে মার্কিণ ও বৃটিশ নৌবহরের মধ্যে সংযোগ রক্ষার পথ বিচ্ছিন্ন করা। এই কারণেই তাহারা ফিলিপাইন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মার্কিণ দ্বীপে দ্রুত আক্রমণ চালাইতেছে। আর একটি গুরুতর প্রশ্ন এই যে, এই সংগ্রাম কেবল নৌবহর ও স্থলসৈন্যের উপর নির্ভরশীল নহে। বিমানবাহিনী ও বিমানবহরের কার্য্যকারিতা এই যুদ্ধে অত্যন্ত বেশী। বিমানশক্তিতে যাহারা শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহারা যেমন নৌবহরকে ঘায়েল করিতে পারিবে, তেমনই প্রতিপক্ষের সমস্ত প্রকার সামরিক লক্ষ্য নষ্ট করিতে পারিবে। কিন্তু মালয়ের যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যক বিমানের অভাব ঘটিয়াছে। প্রচুর সংখ্যক বিমান না আসা পর্য্যন্ত মালয় হইতে জাপানীদিগকে

বিতাড়ন কার্য্যতঃ অসম্ভব। হয়তো শেষ পর্য্যন্ত মালয় ছাড়িয়া সিঙ্গাপুরে পশ্চাদপসরণ ঘটিতে পারে।

সাধারণতঃ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া কোন শত্রুদেশে সৈন্যদলের অবতরণ অত্যন্ত বিপজ্জনক। এজন্য প্রথমেই দরকার সমুদ্রের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন প্রতিপক্ষের নৌবহর ধ্বংস বা অকেজো করা কিম্বা উহা পৌছিবার আগেই সেনাদলকে সমুদ্র পার করা। রণপণ্ডিতগণ আরও বলেন যে, জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর মধ্যে পরিপূর্ণ সংযোগ প্রতিষ্ঠা না হইলে এই প্রকার অভিযানে আক্রমণকারীর পক্ষে সাফল্য অর্জ্জন প্রায় অসম্ভব। কিন্তু মালয়ে জাপ সৈন্যেরা ইতিমধ্যেই বহু স্থানে অবতরণ করিয়াছে এবং তীব্র আক্রমণ চালাইয়াছে। এই আক্রমণের ব্যাপারে তাহারা যথেষ্ট কৌশল খাটাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বহু স্থানে একই সময়ে সৈন্যদলের অবতরণ প্রকৃতপক্ষে একটা ধাপ্পা মাত্র। কারণ, নির্দ্দিষ্ট কোন্ স্থানে আক্রমণকারী তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে, তাহা বুঝা যায় না। ফলে, একই সময়ে অনেকগুলি স্থান রক্ষা করিতে গিয়া আত্মরক্ষাকারীদলের শক্তি বিচ্ছিন্ন হয় এবং ছড়াইয়া পড়ে। আক্রমণকারী ঠিক এমন সুযোগেরই অপেক্ষা করে এবং আত্মরক্ষাকারীর সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল স্থানে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ঘায়েল করিবার চেষ্টা করে। উত্তর মালয়ের জাপবাহিনী সম্ভবতঃ এই কৌশলই অবলম্বন করিয়াছে। এজন্যই তাহারা একই সময়ে বহু স্থানে অবতরণ করিয়া একটিমাত্র কেন্দ্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। ইহার ফলে কেডার যুদ্ধ অন্ততঃ স্থানীয়ভাবে বিপদ ঘটাইতে পারে। দক্ষিণ ব্রহ্মের যেখানে প্রথম আক্রমণ ঘটিয়াছে, সেখান হইতে সমগ্র ব্রহ্মদেশ বিপন্ন করা যাইবে না। কারণ, এখান হইতে কেবল রেঙ্গুণেরই দূরত্ব ৫ শত মাইল। ভৌগোলিক অসুবিধার জন্য কোন বড় রকমের অভিযান এই অঞ্চলে চালানো কঠিন।

জাপবাহিনী স্বভাবতঃই স্বজাতগর্ব্বী, দুঃসাহসী ও বেপরোয়া। এই দিক দিয়া জার্ম্মাণ সৈন্যদের সহিত তাহাদের কিছু সাদৃশ্য আছে। যে কোন বিঘ্ন অতিক্রমণের জন্য তাহারা আত্মবলি দিতে বা বেপরোয়া আক্রমণ করিতে পারে। মালয়ে সেই লক্ষণ দেখা যাইতেছে। উত্তর মালয়ের কোটাবারুর বিমান ঘাঁটি তাহারা ইতিমধ্যে দখল করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে কেডায় প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। প্রাকৃতিক বিঘ্নের জন্য এখানে আত্মরক্ষাকারীদের

আড়াল লইবার এবং অতর্কিত পাল্টা-আক্রমণ চালাইবার অনেক সুবিধা আছে। কিন্তু জঙ্গল ও পাহাড়ের জন্য বিমান আক্রমণে ও গোলাবর্ষণে উভয় পক্ষেরই অসুবিধা। গভীর জঙ্গলের আড়ালে লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যেমন কঠিন, তেমনই প্রতিপক্ষের উপর ঠিকমত বোমানিক্ষেপ অসুবিধাজনক। তথাপি যুদ্ধ অত্যন্ত তীব্র হইতেছে এবং ভারতীয় সৈন্যরা অত্যন্ত বীরত্বের সহিত লড়িতেছে। পেনাংয়ে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ চলিতেছে এবং কেডা রক্ষাকারী ভারতীয় সৈন্যদের উপর এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের একজনও পিছু হটিতে বা আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে না, শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে হইবে। সেনাপতির এই আদেশের দ্বারা রণক্ষেত্রের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে হইতেছে। ভবিষ্যৎ সঙ্কটজনক!

—৩—

বিমান, আরও বিমান!

১৭ই ডিসেম্বর, '৪১।

মালয় রক্ষাকারী সাম্রাজ্যবাহিনী দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াও জাপবাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। কেডা অঞ্চল হইতে সাম্রাজ্যবাহিনী কিছু পশ্চাতে হটিয়া আসিয়াছে, ব্রহ্মের দক্ষিণপ্রান্ত ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট হইতেও বৃটিশবাহিনী হটিয়া আসিয়াছে। জাপানীরা মালয়ের উত্তর-পশ্চিম (বঙ্গোপসাগরের দিকে) অংশে ক্রমাগত চাপ দিতেছে এবং সাম্রাজ্যবাহিনীর প্রথম আত্মরক্ষার ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। মালয়ের উত্তর-পূর্ব্ব দিকেও যুদ্ধ চলিতেছে। 'রয়টার' বলিতেছেন যে, জাপানীরা ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা মালয়কে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছে। যদি মালয় বিচ্ছিন্ন হয়, তবে ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে বিমান পথের যোগাযোগ নষ্ট হইবে। সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুণের বিমান পথের যে যোগাযোগ আছে, মালয় উপদ্বীপে উহার ঘাঁটি রহিয়াছে। সেই ঘাঁটিগুলি জাপানীদের হাতে পড়িলে বিমানগুলিকে রেঙ্গুণ হইতে খোলা সমুদ্রের উপর দিয়া সিঙ্গাপুরে যাইতে হইবে। কিন্তু মালয়ের তীর হইতে তেমন অবস্থায় জাপানী বিমান নিশ্চয়ই বাধা দিবে। সুতরাং মালয়ের যুদ্ধ সিঙ্গাপুরের পক্ষেও বিপজ্জনক।

মালয়রক্ষাকারীগণ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহাদের আর সমস্তই ঠিক আছে, কিন্তু বিমান চাই এবং আরও বিমান চাই! যদি বিমান না পাওয়া যায়, তবে জাপানীদের মালয় হইতে হটানো যাইবে না, সোজা সিঙ্গাপুরের দিকে পালাইতে হইতে পারে। অতি সরল এবং স্পষ্ট উক্তি! ইহার উত্তরে ব্রহ্মদেশ, মালয় ও ভারতবর্ষের সমরকর্ত্তাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা এতদিন ধরিয়া কি দিবানিদ্রা দিতেছিলেন? মালয়, সিঙ্গাপুর এবং গোটা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ঘাঁটিগুলি যে সুরক্ষিত, একথা অজস্রবার ঘোষণা করা হইয়াছিল। জাপান যে আক্রমণ করিবে, তাহাও গত ৬ মাস ধরিয়া প্রচারিত হইতেছিল। তথাপি উপযুক্ত বিমানের অভাবে যুদ্ধের ৭ দিনের মধ্যেই বৃটিশ নৌবহরের শ্রেষ্ঠতম দুই যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস হইল, মালয় ও ব্রহ্মদেশের দুই অংশে পশ্চাতে হটিতে হইল এবং আরও বিমান চাই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে হইল!

এই অবস্থার যে উদ্ভব হইতে পারে, তাহা আশঙ্কা করিয়াই ভারতবর্ষের শ্রমশিল্পের মালিকগণ এবং আত্মরক্ষায় উৎসাহী ব্যক্তিগণ যুদ্ধের গোড়া হইতেই এই দেশে মোটর-শিল্প ও বিমান-শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর আন্দোলন ও আবেদন করিয়া আসিয়াছেন। যদি বৃটিশ কর্ত্তারা সেই আবেদনে সাড়া দিয়া কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠা করিতেন, তাহা হইলে মালয়ের জঙ্গলে আজ জাপ বোমারু বিমানের মার খাইতে হইত না। আজিকার দিনে রণনীতির এই তথ্য আর অজ্ঞাত নাই যে, বর্ত্তমান ইঙ্গ-মার্কিণ-জাপ সংগ্রাম কেবল নৌবহর ও স্থলবাহিনীর উপরেই নির্ভরশীল নহে, উহা একান্তরূপে বিমানবহরের সহিত জড়িত। ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪১'এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যান্ত্রিক যুদ্ধের ভয়াবহ অভিযান চলিয়াছে, কিন্তু বৃটিশ সমরযন্ত্রের শিথিল গ্রন্থি যেন কিছুতেই দৃঢ় হইতে চাহিতেছে না। নরওয়ের যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীর পরাজয় ঘটিল উপযুক্ত বিমানশক্তির সাহায্য ও সহযোগিতার অভাবে। বৃটিশ নৌবহর তীরের দিকে অগ্রসর হইতে বাধা পাইল এবং বৃটিশ স্থল-সৈন্যেরা জার্ম্মাণ বিমানের প্রচণ্ড আক্রমণে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিল না। ইহার আগে পোল্যাণ্ডের রণক্ষেত্রে বীর পোলিশ বাহিনীর পরাজয় ঘটিল বিমানশক্তির দ্রুত ক্ষয়ের জন্য। তারপর বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, গ্রীস ও বলকান ইত্যাদির যুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে। ক্রীটের যুদ্ধে বৃটিশ নৌবহর পিছু হটিল জার্ম্মাণ বোমারুর রূঢ় আক্রমণের জন্য এবং আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দর হইতে

বৃটিশ বিমানের ক্রীট পর্য্যন্ত গমনে ব্যর্থতার জন্য। লিবিয়ায় ইতালীর বিরুদ্ধে বৃটিশ অভিযানের সাফল্য ঘটিয়াছিল নৌবহর ও বিমানবহরের পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য। ইহা ছাড়া অসংখ্য জাহাজ ডুবির ব্যাপারে এবং ইতালীর টরেণ্টো বন্দরে ও মাটাপনের নৌযুদ্ধে বার বার বিমানবহরের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়াছে। বিমানবাহিত বোমা, টর্পেডো ও মাইন আজ নৌবহরকে পশ্চাতে ফেলিয়াছে। এত অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনার পরেও ভারতবর্ষের একান্ত পূর্ব্ব-দক্ষিণ দ্বারে বিমান শক্তির দুর্ব্বলতার কথা শুনা যাইতেছে।

আজ জাপানী নৌবহর ও বিমানবহর একত্রে হংকং, মালয়, ফিলিপাইন ও বৃটিশ বোর্ণিও দ্বীপকে বিপন্ন করিয়াছে। সংবাদে দেখা যাইতেছে, 'Japanese forces landed at—'অর্থাৎ জাপ-সৈন্যেরা অমুক স্থানে 'অবতরণ' করিয়াছে। এই 'অবতরণ' শব্দটা লক্ষ্য করিবার মত। ইহার পশ্চাতে রণনীতির একটা বড় ইঙ্গিত লুকানো আছে। কারণ ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, জাপ নৌবহর উপযুক্ত বিমানবহরের সহায়তায় তীরের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা বিদীর্ণ করিয়া কিম্বা অতিক্রম করিয়া সৈন্যদল নামাইতে পারিতেছে। এই অবস্থাটা আক্রমণকারীর শক্তি ও আত্মরক্ষাকারীর দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। জেনারেল স্যার এডমণ্ড আয়রণ সাইড, যিনি কিছুকাল আগেও বৃটিশ ইম্পিরিয়েল জেনারেল ষ্টাফ বা সাম্রাজিক সেনানীমণ্ডলীর বড়কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার মতামত এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। বিদেশে সমুদ্রপারের অভিযান সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন,—

There is no operation of war which is so difficult as a landing from the sea against an enemy who is prepared to offer resistance. Navy, Army and Air authorities have all to work together like one man···To attempt to establish an aerodrome ashore against an enemy with an air force is just as difficult as any other landing, for the enemy will not be hoodwinked into allowing you to get on equal terms with him as regards air before the main operation start···The whole administration of the operation should be thoroughly

sound, and if there is any doubt about this such undertakings should be avoided like the pest.*

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, 'সমুদ্রপারবর্ত্তী কোন শত্রুর দেশে সৈন্য অবতরণের মত এমন কঠিন ও বিপজ্জনক কাজ আর কিছু নাই। আত্মরক্ষাকারী সমুদ্রতীর হইতে বিমান ও অন্যান্য শক্তির সাহায্যে আক্রমণকারীকে গোড়া হইতেই এক প্রকাণ্ড যুদ্ধের ফ্যাসাদে না ফেলিয়া কিছুতেই অবতরণ করিতে দিবে না। এই অবস্থায় আক্রমণকারীকে নৌশক্তি, বিমানশক্তি ও স্থলশক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটাইতে হইবে এবং পূর্ব্বাহ্নে সুনিপুণ সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা অত্যন্ত নিখুঁত আয়োজন করিতে হইবে। বিমানবহর, নৌবহর ও স্থলবাহিনীর মধ্যে যদি এই প্রকার নিখুঁত সংযোগ সাধিত না হয়, কিম্বা সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে এই ধরণের অভিযান বিষবৎ ত্যাগ করিতে হইবে।' বৃটিশ রণপণ্ডিতের এই অভিমতের বিচারে আজ জাপানীদেব মালয়ে, বের্ণিওতে ও ফিলিপাইন ইত্যাদিতে অবতরণ কি আক্রমণকারীর শক্তি ও আত্মরক্ষাকারীর দুর্ব্বলতার সূচনা করিতেছে না? জাপান দূর সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া এত সহজে অবতরণ করিতেছে কিরূপে? ১৯১৪ সালেও ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে আরও 'কামান চাই', 'গোলা চাই' এই চিৎকার শুনা গিয়াছিল। আজ ১৯৪১ সালেও মালয়ের জঙ্গলে সেই একই কাহিনী শুনিতেছি।

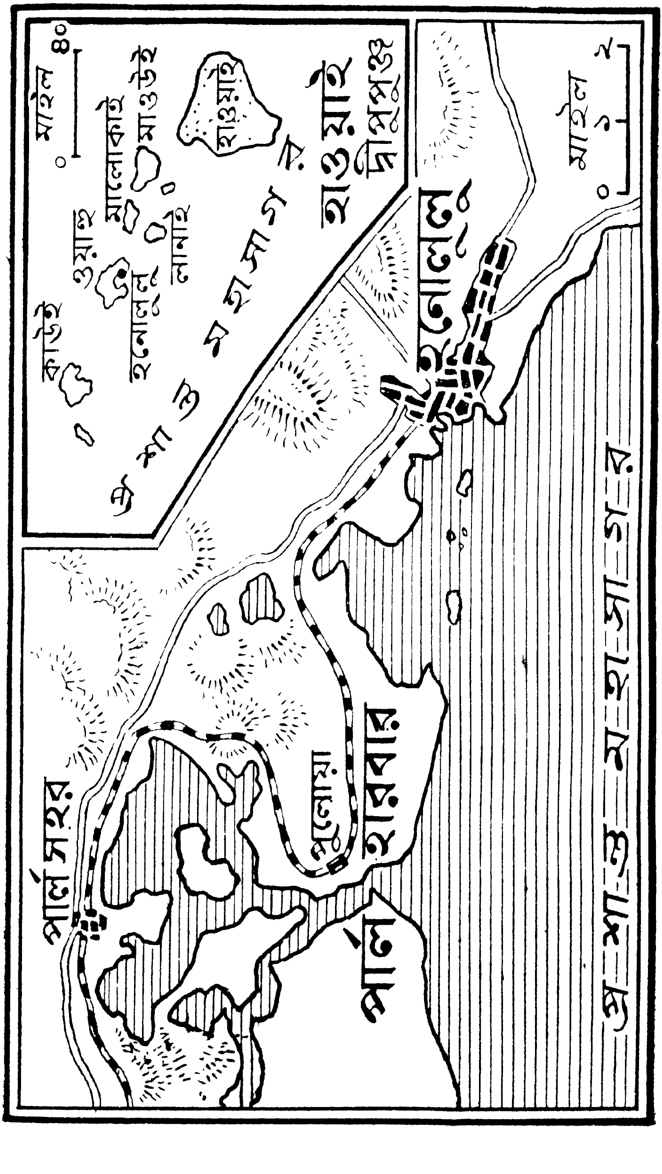
—8—

হংকং ও পেনাংয়ের বিপদ

২০শে ডিসেম্বর '৪১।

ইঙ্গ-জাপ-মার্কিণ যুদ্ধের অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে। মালয়ের উত্তরে ও ব্রহ্মের দক্ষিণ প্রান্তে ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট দখলের পর জাপবাহিনী ক্রমশঃ মালয়ের পশ্চিম তীর ধরিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে। মালয়ের পশ্চিম তীর ভারত মহাগরের দিকে। এখানকার ওয়েলেসলী প্রদেশ জাপানীদের দখলে আসিয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী কেডা অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বেই জাপানী ও সাম্রাজ্যবাহিনীর মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাহিনী ক্রমশঃই পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইয়াছিল। ওয়েলেসলী দখল

* 'The Study of War'—edited by Major-General Sir George Aston.



হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ও পার্ল হারবার

হওয়ার ফলে পেনাং বন্দর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মালয়ের অভ্যন্তর ভাগ হইতে পেনাং পর্য্যন্ত কয়েক মাইল জলপথের ব্যবধান আছে। সোজা সম্মুখের দিকে আক্রমণ করিয়া জাপ সৈন্যরা এই জলপথ অতিক্রম পূর্ব্বক পেনাং দখল করিতে পারে কিম্বা পেনাংকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পশ্চাতে রাখিয়া তাহারা আরও দক্ষিণ অভিমুখে অভিযান করিতে পারে। পেনাং জাপানীদের দখলে গেলে মালয়ের অবস্থা যে অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে, পেনাং একটি উৎকৃষ্ট বন্দর হওয়ায় জাপানীরা সিঙ্গাপুরের আগেই ভারত মহাসাগরের দিকে একটি ঘাঁটি পাইবে। সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বে জাপানীরা শ্যাম উপসাগরে কিছু নৌ-আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। কারণ, তাহারা যে ভাবে শ্যামে ও মালয়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে শ্যাম উপসাগরের উপর জাপানী নৌ-বহরের আধিপত্য ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদি কার্য্যতঃ ইহাই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে শ্যাম উপসাগর দিয়া আরও প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্র এবং বিমানবহর পেনাংয়ে আমদানী করিয়া তাহারা একদিকে সিঙ্গাপুর এবং অন্যদিকে ভারত মহাসাগরের কিছু দূর পর্য্যন্ত আক্রমণ চালাইতে পারে। এমন কি, তাহারা পেনাং হইতে সুমাত্রা দ্বীপের উপর অভিযান চালাইবারও সুবিধা পাইতে পারে। কারণ, পেনাং হইতে সুমাত্রার (উত্তরাংশ) দূরত্ব বিমান-পথে দুইশত মাইলের বেশী হইবে না। জাপানের আশু লক্ষ্য হইতেছে সিঙ্গাপুরকে অন্যান্য সমস্ত ঘাঁটি হইতে বিচ্ছিন্ন ও বেষ্টন করিয়া ঘায়েল করা। এজন্য তাহারা প্রায় একই সময়ে হংকং, ফিলিপাইন, বোর্ণিও ও মালয় উপদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছে। ইন্দোচীন ও শ্যাম ইতিপূর্ব্বেই তাহাদের কবলে গিয়াছে। এক্ষণে দক্ষিণ পার্শ্বে বোর্ণিও ও বাম পার্শ্বে মালয়ের উপর চাপ দিয়া এবং বোর্ণিও ও মালয় হইতে সুমাত্রার উপর আক্রমণ করিয়া সিঙ্গাপুরকে ঘিরিতে চাহিতেছে। যদি এই বেষ্টননীতি সফল হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সিঙ্গা-পুরের অবস্থা উদ্বেগজনক হইবে।

হংকংয়ের সংবাদ আদৌ আশাপ্রদ নহে। কয়েকদিন ধরিয়া সেখানে প্রচণ্ড সংগ্রাম ও গোলাবর্ষণের পর জাপানীরা হংকংয়ে প্রচুর সৈন্য নামা-ইয়াছে। 'ডোমেই এজেন্সি'র সংবাদে প্রকাশ, জাপ সৈন্যগণ হংকংয়ের বৃটিশ আত্মরক্ষাবাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতেছে। ১২ ঘণ্টাকাল অবিরাম গোলাবর্ষণের পর কতকগুলি জাপ সৈন্য 'বোটে' করিয়া প্রতিপক্ষের অজ্ঞাত-সারে কৌলুন ও হংকংয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী অতিক্রম করে। তাহারা নৌকা-

গুলি হইতে সমুদ্র তীরে লাফাইয়া পড়ে। বৃটিশ সৈন্যগণ প্রবলভাবে বাধা দেয় এবং ২০ মিনিটকাল হাতাহাতি যুদ্ধের পর কয়েকটি ঘাঁটি দখল করে এবং সঙ্কেতে জানায় যে, অবতরণকার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এইভাবে সৈন্য অবতরণ অত্যন্ত সঙ্কটের সূচনা করিতেছে। কারণ, তীরভূমির আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দুর্ব্বল না হইলে বা ভাঙ্গিয়া না পড়িলে জাহাজ বা বিমানযোগে অথবা নৌকাযোগে সৈন্য অবতরণ করানো যায় না। জাপানীরা যখন প্রচুর সৈন্য নামাইতে সমর্থ হইয়াছে, তখন হংকংয়ের নৌদুর্গ ও নৌঘাঁটি কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে ইহাই বিবেচনার প্রশ্ন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিযার নৌবিশারদগণ সিঙ্গাপুরের ভাগ্যকে সর্ব্বদাই হংকংয়ের সহিত একত্র করিয়া দেখিয়াছেন। কারণ, সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার পক্ষে হংকং অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটির মত। হংকং ও সিঙ্গাপুরের নৌ-যোগাযোগ অব্যাহত থাকিলে জাপানের পক্ষে অগ্রসর হইয়া আসা কঠিন। কিন্তু হংকংয়ের পতন হইলে নৌযুদ্ধের খাস এলাকা সিঙ্গাপুরের চারিদিকেই সীমাবদ্ধ হইবে। অপর দিকে পশ্চাৎ হইতে মালয় দিয়া জাপানীরা অগ্রসর হইতেছে। পেনাংয়ের অবস্থাও শোচনীয়। যদিও ইহার কোন বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি উহা যে শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইবে, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।*

—৫—

'গ্রাণ্ডষ্ট্রাটিজি'র সন্ধানে

২৪শে ডিসেম্বর '৪১।

'To plan a Grand Strategy'—এক মহারণনৈতিক পরিকল্পনার সন্ধানে মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ রুজভেল্ট অকস্মাৎ ওয়াশিংটনে সম্মিলিত হইয়াছেন (২২শে ডিসেম্বর)। মিঃ চার্চ্চিলের সঙ্গে গিয়াছেন লর্ড বীভারব্রুক এবং জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর প্রধান প্রধান সামরিক পুরুষগণ, লণ্ডনস্থিত মার্কিণ রাজদূত এবং ইংলণ্ডের আরও অনেক বাছাই করা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। স্বয়ং মিঃ চার্চ্চিল ও বৃটেনের বড় বড় পদস্থ ব্যক্তির এভাবে আমেরিকা গমন সমগ্র অবস্থার অত্যন্ত গুরুত্ব সূচনা করিতেছে। গত মহা-

* প্রকৃতপক্ষে ২০শে তারিখেই পেনাংয়ের পতন সংবাদ আসে। সাম্রাজ্য-বাহিনী এই ঘাঁটি ত্যাগ করিয়া পশ্চাতে হটিয়াছে।

যুদ্ধের তুলনায় এবারের অবস্থা নানাদিক দিয়া অধিকতর উদ্বেগজনক। সেবার বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীকে বার বার ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকায় ছুটিতে হয় নাই, কিন্তু এবার যাইতে হইতেছে। সেবার যুদ্ধ যে কায়দায় ও যে ধরণে চলিয়াছিল, এবার তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। একমাত্র রাশিয়া ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণ ইউরোপ হিটলারের কবলে, অন্যদিকে ইঙ্গ-মার্কিণ নৌশক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান অতি অকস্মাৎ ব্যাপক আক্রমণ চালাইয়া প্রভূত সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। সিঙ্গাপুর আজ বিপন্ন এবং এই সিঙ্গাপুর রক্ষা না পাইলে ব্রহ্মদেশ, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ ইত্যাদি গভীরতর সঙ্কটে পড়িবে এবং ওদিকে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে মার্কিণ নৌবহর ও দ্বীপপুঞ্জ অকেজো হইয়া যাইবে। কি ভাবে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, জাপানী আক্রমণের অগ্রগতিকে ঠেকাইবার উপায় কি, ইহাই আজ মিত্রশক্তির সমস্যা। এই সমস্যা এত জরুরী যে, জাপানী যুদ্ধের দুই সপ্তাহের মধ্যেই মিঃ চার্চ্চিলকে ছুটিতে হইল আমেরিকায়।

বর্ত্তমান ইঙ্গ-মার্কিণ সংগ্রামে জাপানের প্রথম রণনৈতিক লক্ষ্য হইতেছে বৃটিশ নৌবহর ও মার্কিণ নৌবহরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো। অর্থাৎ এই দুই নৌবহর যেন কোন কেন্দ্রে সম্মিলিত হইতে কিম্বা পরস্পরের নিরাপদ ঘাঁটি হইতে সংযোগ স্থাপন করিয়া জাপানকে বাধা দিতে না পারে। এই জন্য জাপানের দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতেছে ইঙ্গ-মার্কিণ-ওলন্দাজের নৌ ও বিমান ঘাঁটিগুলি, যথা—হাওয়াই, ওয়েক্, ফিলিপাইন, হংকং, বোর্ণিও, মালয়, সুমাত্রা ও শেষ পর্য্যন্ত সিঙ্গাপুর দখল করা এবং এই সিঙ্গাপুর দখলের জন্য জাপানীদের তৃতীয় লক্ষ্য হইতেছে সিঙ্গাপুরকে দুই পার্শ্ব (flank) ও সম্মুখ ভাগের (front) ঘাঁটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নৌ, বিমান ও স্থলপথের সাহায্যে ঘিরিয়া ধরা ও এই ভাবে ঘায়েল করা। এই রণনীতি কাজে খাটাইতে গিয়াই জাপান নৌবহর, বিমানবহর ও স্থলবাহিনীকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে গড়িয়া তুলিয়া এবং সমস্ত আয়োজন পূর্ব্বাহ্নে চতুরের মত পাকা করিয়া অতি অকস্মাৎ ব্যাপক ও প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে। যুদ্ধের দুই সপ্তাহের মধ্যেই সাংহাই, গুয়াম্, মালয়ের উত্তরাঞ্চল ও ব্রহ্মের দক্ষিণপ্রান্ত দখল হইয়াছে, হংকংয়ে তাহারা প্রবেশ করিয়াছে, ফিলিপাইনে প্রচুর জাহাজ, সৈন্য ও বিমানযোগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হইয়াছে; বোর্ণিও, হাওয়াই ও ওয়েক্ আক্রান্ত হইয়াছে এবং এই সমস্ত

দ্বীপের প্রত্যেকটিই আজ বিপন্ন। যদি শীঘ্রই এই স্থানগুলির পতন ঘটে, তাহা হইলে সিঙ্গাপুর রক্ষা পাইবে কি মন্ত্রে, ইহাই আজ মিত্রশক্তির সমরনীতিবিদদের নিকট দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়াছে। বৃটেনের নৌবহর যে ভাবে ঘায়েল হইয়াছে এবং মার্কিণ দ্বীপসমূহ ও পার্ল হারবারের জাহাজগুলি যে ভাবে নষ্ট হইয়াছে, তাহাতে প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে মার্কিণ নৌবহব ও বিমান-বহর ৭।৮ হাজার মাইল বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অগ্রসর হইয়া আসিবে কি ভাবে? প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এই দূরত্বের পাল্লা বর্ত্তমান যুদ্ধের রণনীতির উপর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে। অথচ লক্ষ্য কবিবার বিষয় এই যে, বৃটেন, আমেরিকা বা রাশিয়া একক ও পৃথকভাবে জাপানের তুলনায় আদৌ হীন নহে, বরং বহু দিক দিয়া জাপানের চেয়ে অনেক বেশীগুণ শক্তি ইহারা রাখে। কিন্তু প্রত্যেকেই আজ বিচিত্র সঙ্কটে বিব্রত। দুই বৎসরের যুদ্ধে বৃটেনের নৌবহর ও বিমানবহর এবং ট্যাঙ্ক প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, জার্ম্মাণীর উৎপাতে মিশর দেশ পর্য্যন্ত রণক্ষেত্রের বিস্তার হইয়াছে। আমেরিকা একদিকে অতলান্তিক এবং আর একদিকে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ব্যবধানে—হাজার হাজার মাইলের তফাৎ। দুই মহাসাগরের উপযোগী নৌবহর তাহার রহিয়াছে; কিন্তু এক মহাসমুদ্রে জার্ম্মাণীর নৌযুদ্ধকে এড়াইয়া বৃটেনকে সাহায্য দানেব প্রশ্ন এবং আর এক মহাসমুদ্রে জাপানী আক্রমণে বিপন্ন বিভিন্ন দ্বীপের ঘাঁটিগুলিকে রক্ষা করিয়া অগ্রসব হইবার প্রশ্ন। অপর পক্ষে রাশিয়া জার্ম্মাণীর সহিত সংগ্রামে বিব্রত এবং চীন ৪।৫ বৎসর ধরিয়া সংগ্রামের ফলে সমস্ত সহর ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দব হইতে বঞ্চিত। ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের আপন গৃহ অর্থাৎ হল্যাণ্ড জার্ম্মাণীর অধিকারে। সুতরাং পূর্ব্ব-ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের শক্তি কতটুকু তাহা বুঝিবার মত। 'এ-বি-সি-ডি' শক্তিসমূহ যখন এই বিচিত্র অবস্থায় পড়িয়াছেন, তখন জাপান সৈন্যবলে এবং অস্ত্র ও যন্ত্রবলে অধিকতর বলীয়ান হইয়া যুদ্ধ চালাইতেছে।

ওয়াশিংটনে যে সম্মেলন বসিয়াছে, তাহাতে এই সমস্ত জটিল প্রশ্ন উত্থিত হইবে। কি ভাবে বিশাল সমুদ্রের দুবত্বের ব্যবধান ঘুচানো যায়—বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের রণনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে* কি ভাবে একটি কেন্দ্রে সংহত করা যায়, কি ভাবেই বা সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের উপযোগী করিয়া

* রণনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির সম্মিলিত পরিকল্পনারই আর এক নাম 'গ্রাণ্ড ষ্ট্রাটিজি' বা মহারণনীতি।

সমস্ত দেশের শক্তিকে সংগঠিত করা যায়, ইহার বিচার চলিবে ওয়াশিংটনে। যুদ্ধ চলিতেছে সমস্ত পৃথিবীতে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে। এই বিচ্ছিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই চার্চ্চিল-রুজভেল্টের লক্ষ্য। বর্ত্তমানে এই চারিটি দেশের রাজধানীতেই পরস্পরের মিলিটারী মিশন বা সামরিক প্রতিনিধি-মণ্ডলী রহিয়াছেন। তাঁহারা সেই দেশের হাইকমাণ্ডের সঙ্গে যোগসূত্র রাখিয়াছেন। কিন্তু এই যোগসূত্র চলিতেছে সাধারণতঃ পরস্পরের সংবাদ আদান প্রদান ও সরবরাহ ব্যবস্থার সম্পর্কে। অর্থাৎ কোন রণনীতি ও যুদ্ধের নেতৃত্ব ও পরিচালন লইয়া নহে। কিন্তু জাপান ও জার্ম্মাণীকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিতে হইলে এই গদাইলস্করি চালের যুদ্ধে চলিবে না, পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধে জয়লাভ করা যাইবে না। সুতরাং দরকার কোনও একটা Supreme War Council বা সর্ব্বোচ্চ সমর পরিষদ কিম্বা সম্মিলিত সেনানীমণ্ডল বা Joint executive staffs কিম্বা ঐক্যবদ্ধ সামরিক নেতৃত্ব বা Unified command—এই ধরণের কোন একটা ব্যবস্থার। সেবাবের যুদ্ধ পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে, কিন্তু এবারের সংগ্রাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে। সেবার Allied command বা সম্মিলিত সামরিক নেতৃত্ব প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছিল প্যারিসে—ইঙ্গ-ফরাসী সমর নেতাদের মিলনে। ইহার সঙ্গে পরে আমেরিকা যোগ দিয়াছিল। কিন্তু অবস্থা এবারের মত এত জটিল ছিল না। তথাপি বিভিন্ন শক্তির সমর নেতাদের সম্মিলিত নেতৃত্বে অনেক সময় বিভ্রাট দেখা দিয়াছিল। প্রত্যেক সেনাপতি ও রাষ্ট্রনেতাই স্ব স্ব দেশের স্বার্থ আগে দেখিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকেই অপরের অপেক্ষা নিজকে বিজ্ঞ ও ধুরন্ধর বলিয়া বিশ্বাস করেন। ফলে সেনাপতিদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রনেতা-গণও স্ব স্ব কূটনীতির চাপে পড়েন।* ইহার ফল রণক্ষেত্রের উপর ভালো হয়

* কমিটি ও কনফারেন্স দিয়া যুদ্ধ চালাইবার বহু ফ্যাসাদ আছে। বিশেষতঃ বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির দ্বারা গোলমাল আরও বাড়িতে পারে। রাজনীতিজ্ঞ ও সমরনীতিজ্ঞের মধ্যেও ঝগড়া বাধিতে পারে। এই সম্পর্কে বিগত মহাযুদ্ধের বহু দৃষ্টান্ত আছে। সেবারের মহাযুদ্ধে মার্কিণ সৈন্যেরা যোগ দিলে পর, অবস্থা দাঁড়াইল এই :—Clemenceau wanted the newly arrived American regiments split up and assigned to French and British sectors. Foch resisted this idea and supported Pershing's demand for an autonomous American Army and a separate American Front. The reasons which guided Clemenceau, and to a lesser degree

না, বরং যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে বিঘ্ন দেখা দেয়। যেমন, তর্কের খাতিরে বলা যাইতে পারে, আমেরিকা হয়তো ফিলিপাইন ও গুয়ামের উপর বেশী জোর দিবেন, বৃটেন হয়তো সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন এবং চীন হয়তো চীন-ব্রহ্ম রাস্তা ও ইউনানের উপর জোর দিবেন এবং রাশিয়া হয়তো ব্লাডিভোষ্টক বন্দর ও মাঞ্চুকু-সোভিয়েট সীমানার গুরুত্ব দেখাইবেন। ইহাতো গেল রণনীতির দিক হইতে স্থানের গুরুত্ব। ইহা ছাড়া অস্ত্রশস্ত্র, মাল-মশলা, সৈন্য, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অজস্র রকমের প্রশ্ন আছে। সুতরাং ব্যাপারটা আদৌ সহজ নহে।

—৬—

হংকংয়ের পতন

২৬শে ডিসেম্বর '৪১।

এক সপ্তাহকাল (১৮ই হইতে ২৫শে ডিসেম্বর) অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া হংকং আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছে। জাপানীরা যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল এবং যে প্রচুর সংখ্যক সৈন্য তাহারা জাহাজযোগে নামাইতে পারিয়াছিল তাহাতেই বুঝা গিয়াছিল যে, হংকংয়ের আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। কানাডীয়, বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যেরা সংখ্যায় ও অস্ত্রসজ্জায় এত দুর্ব্বল ছিল যে, তাহারা যে এই কয়দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট। তাহারা বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে, সন্দেহ নাই এবং আত্মরক্ষাকারী সৈন্যেরা প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়াছিল। কিন্তু জাপানীদের প্রচণ্ড আক্রমণে, বিশেষতঃ সংখ্যায় ও অস্ত্রশস্ত্রে তাহারা অত্যধিক শক্তিমান হওয়ায় হংকংয়ের অবরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। হংকং দ্বীপ এত ক্ষুদ্র যে, এখানে কোন বড় রকমের আক্রমণ হইলে আত্মরক্ষাকারীদের বশ্যতা স্বীকার ছাড়া উপায় ছিল না। যে ভাবে উহাকে অবরোধ করা হইয়াছিল এবং কৌলুনের চীনা এলাকার দিক হইতে যে ভাবে প্রচণ্ড কামান দাগানো হইয়াছিল, তাহাতে হংকং দুর্গের অনিবার্য্য বিপদ ছিল। জাপানীরা

Lloyd George, were *political* reasons; the reasons which stiffened Foch's resistance were purely *military* reasons'.—'Defence Will Not Win the War'—by Lt. Colonel W. F. Kernan. (U. S. Army).

তিন বার উহার আত্মসমর্পণ দাবী করে এবং তিনবারই উহা প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু গুরুতর বিপদ দেখা দিল পানীয় জলের প্রশ্নে। হংকংয়ের জল সরবরাহ নির্ভর করে পাহাড়ের উপর স্থাপিত জলাধারগুলির উপর। শত্রু বিমানের আক্রমণ হইতে জলাধারগুলি রক্ষা করিবার মত বিমানব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং প্রধান জলাধারগুলি শীঘ্রই জাপানীদের হস্তগত হয়। গোলাবর্ষণের ফলে জলের পাইপসমূহ ধ্বংস হইয়া যায়। পূর্ত্ত বিভাগ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু শত্রুসৈন্য পুনঃ পুনঃ পাইপগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে। ২২শে ডিসেম্বর জাপানীরা হংকংয়ের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে সৈন্য নামায়, প্রতিরোধ ব্যর্থ হয় এবং আত্মরক্ষাকারী সৈন্যেরা তিন দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। খাদ্যভাণ্ডারও জাপানীদের হাতে পড়ে। এই সমস্ত অপরিসীম বাধাবিপত্তির মধ্যে গবর্ণর স্যার মার্ক ইয়ং সামরিক নেতা ও সৈন্যদের সহ-যোগীতায় শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়তাব সহিত আত্মরক্ষার লড়াই চালাইয়াছিলেন। কিন্তু নৌ ও স্থল বাহিনীর অধিনায়কগণ তাঁহাকে জানান যে, আর প্রতিরোধ চালান সম্ভব নয়।* অতঃপর কৌলুনের একটি হোটেলে বসিয়া জাপ সামরিক ও নৌ-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনার পর স্যার মার্ক ইয়ং বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করেন।

ভারত মহাসাগরে পেনাং ও দক্ষিণ চীন সমুদ্রে হংকং জাপানীদের দখলে গেল। এই দুই নৌঘাঁটিই দুই সমুদ্রের পক্ষে প্রয়োজনীয়। কিন্তু পেনাংয়ের চেয়ে হংকংয়ের মূল্য অনেক বেশী। হংকং বন্দর ও নৌঘাঁটি হিসাবে উৎকৃষ্টতর, খাস জাপানের দিক হইতে নিকটতর এবং সিঙ্গাপুর রক্ষার পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। হংকং শত্রুর হাতে যাওয়ায় সিঙ্গাপুর হইতে বৃটিশ নৌ-বহরের

---

* হংকং দুর্গে বোধ হয় ৮ হাজারের বেশী সৈন্য ছিল না। অপরপক্ষে জাপানীরা পুরা ২ ডিভিসন বা ৩০ হাজার হইতে ৪০ হাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণ করে।—'Story of the War'—লণ্ডনের 'ডেলী টেলিগ্রাফ' প্রকাশিত, Vol II.

কিন্তু সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে জাপানীরা দাবী করে যে, হংকংয়ে প্রায় ১৪ হাজার বন্দী হইয়াছে ও ৩ হাজারের বেশী ইংরাজ সৈন্য মারা গিয়াছে।—ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট প্রণীত 'This Expanding War' দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তীকালে (১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী) জাপ গবর্ণমেণ্টের স্বীকৃতিতে দেখা যায় যে, হংকংয়ে প্রায় ১১ হাজার বন্দী ছিল। তাহা হইলে হংকং রক্ষাকারী সৈন্যদের সংখ্যা ১৩ হাজার হইতে ১৫ হাজার হইবে বলিয়া মনে হয়।

অগ্রসর হইয়া আসা কঠিন। হংকং দ্বীপ ও চীনের তীরভূমি প্রায় পরস্পরের সহিত জোড়া লাগানো, মাঝখানে একটি সংকীর্ণ জলপথ রহিয়াছে, ইহা ক্যাণ্টন নদীর প্রবেশপথে অবস্থিত। এই দ্বীপ মাত্র ১১ মাইল লম্বা এবং ২ হইতে ৫ মাইল চওড়া। ইহারই উত্তর প্রান্তে কৌলুন উপনিবেশ। দ্বীপটি আগে চীনাদের ছিল, ১৮৩৯ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা ছিল চীনা জেলেদের একটা আড্ডা। এই বৎসর ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ক্যাণ্টন হইতে হংকং দ্বীপে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ১৮৩৯ সালের জুলাই মাসে চীনাদের সঙ্গে বৃটিশ লস্করদের ঝগড়া বাধে এবং একজন চীনা নিহত হয়। ফলে, চীনের সহিত বৃটেনের যুদ্ধ বাধে এবং বৃটিশবাহিনী হংকংকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে ও দখল করে। পরে সন্ধিসূত্রে ইহা বৃটেনেরই অধিকারভুক্ত হয়। এই দ্বীপের উত্তরাংশে অতি সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডে, যে ভূমির একদিকে পাহাড় ও অন্য-দিকে সমুদ্র, সেখানে ভিক্টোরিয়া সহর গড়িযা উঠে। এই সহরটি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পযন্ত মাত্র ৪ মাইল বিস্তৃত। ভিক্টোবিয়া গিরিশৃঙ্গের উপর অনেক চমৎকার বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং পাহাড়ের উপর হইতে হংকং বন্দরের দৃশ্য উপভোগ করিবার মত। হংকংয়ের বর্ত্তমান যুদ্ধের শেষের দিকে এই গিরিশৃঙ্গ হইতেই বৃটিশ সৈন্যেরা জাপানীদিগকে বাধা দিয়াছিল এবং আত্মরক্ষার পক্ষে এই দিকটা সুবিধাজনক ছিল। পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় বন্দরগুলির মধ্যে হংকং অন্যতম, চীনের সহিত প্রচুর বাণিজ্য এই পথ ধরিয়া চলিত। কিন্তু জাপানীরা ইতিপূর্ব্বেই চীন যুদ্ধের সময় ক্যাণ্টন-হংকং রেলপথ বিচ্ছিন্ন ও চীনের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ বন্ধ কারয়া দিয়াছিল। তথাপি জাপানের বিরুদ্ধে নৌ-সংগ্রামে হংকংয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। অনেক দিন ধরিয়া জাপানী রণনীতিবিদ্‌গণ একটা প্রশ্ন চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন—বৃটেনকে কখন আক্রমণ করিতে হইবে? তাঁহারা এমন একটি মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, যখন বৃটেনের নৌ-বহরের অধিকাংশই থাকিবে দূরবর্ত্তী ইউরোপীয় সমুদ্রে এবং আমেরিকা থাকিবে ৫।৬ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। কার্য্যতঃ জাপান ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই আক্রমণ করিয়াছে। জাপানী রণনীতিবিদ্‌গণের এই ধারণা ছিল যে, সিঙ্গাপুরস্থিত বৃটিশ নৌবহর হংকং ও ফরমোজার দিকে অগ্রসর হইয়া জাপানী নৌ-বহরকে প্রকাশ্য সংগ্রামে আহ্বান করিবে। সিঙ্গাপুর হইতে হংকংয়ের দূরত্ব ১৪৪০ মাইল এবং ফরমোজা ১৬২৫ মাইল। সুতরাং কোন বৃটিশ নৌ-বহর যদি

সিঙ্গাপুর হইতে ১৫ নট গতিতে রওনা হয়, তবে হংকংয়ের রণক্ষেত্রে পৌছিতে ৪ দিন সময় লাগিবে। এই চারি দিন সময়ের মধ্যেই হংকং দখল করিতে হইবে, জাপানীদের ইহাই ছিল বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণা। কিন্তু এক্ষণে দেখা গেল সিঙ্গাপুর হইতে বৃটিশ নৌ-বহর দক্ষিণ চীন-সমুদ্রে যাত্রার আগেই 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্' এবং 'রিপালস্'—এই দুইটি অতিকায় যুদ্ধ-জাহাজ ডুবিয়া গেল এবং নৌ-পথে কোন প্রকার বাধা না পাইয়া হংকং দখল হইয়া গেল! ১৯২৩ সালে ইংলণ্ডের 'মর্ণিং পোষ্ট' পত্রিকায় সুদূর প্রচ্যের অবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিয়া জনৈক বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করিয়াছিলেন—Hongkong was only twenty hours from the southern end of Formosa. If Japan elected to take that place and the Philippines at the same time, neither England nor America would have any naval base in the Far East and both would be powerless. 'ফরমোজার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে জাহাজযোগে হংকংয়ে যাইতে মাত্র ২০ ঘণ্টা সময় লাগে। যদি জাপান হংকং ও ফিলিপাইন উভয় দ্বীপকেই এক সঙ্গে অধিকারের ইচ্ছা করে, তবে সুদূর প্রাচ্যে ইংলণ্ড বা আমেরিকা কাহারও আর নৌ-ঘাঁটি থাকিবে না এবং উভয়েই শক্তিহীন হইয়া পড়িবে।' জাপানী আক্রমণের গতি এবং ইঙ্গ-মার্কিণ নৌ-শক্তির অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সমগ্র অবস্থা ক্রমশঃ গভীর সঙ্কটের দিকে যাইতেছে। জনৈক জাপানী নৌ-বিশেষজ্ঞ হিসাব করিয়াছিলেন যে, ইউরোপে যদি বৃটেনের কোন প্রকার বাধাও না থাকে (অর্থাৎ যদি শান্তি থাকে), তাহা হইলে মাণ্টা হইতে সুয়েজ খাল হইয়া কোন বৃটিশ নৌ-বহরের পক্ষে সিঙ্গাপুরে পৌছিতে (১৫ নট গতিতে) অন্ততঃ ২০ দিন সময় লাগিবে এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আসিতে অন্ততঃ ৩৭ দিন সময় লাগিবে। এই দীর্ঘ সময়ের সুযোগে জাপান হংকং দখল ও সিঙ্গাপুর অবরোধ করিতে পারিবে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের কোন প্রয়োজন হইল না। ওয়েক্, গুয়াম্, হংকং, পেনাং, ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট এবং উত্তর মালয় জাপানীরা দখল করিয়াছে। নৌ-ঘাঁটি হাত ছাড়া হইয়া গেলে নৌ যুদ্ধ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে এবং যদি ইহার সঙ্গে বিমান বহরের অভাব দেখা দেয়, তবে অবস্থা আরও মারাত্মক হইবে। জাপানীরা জানে যে, One of the first conditions of victory in a modern sea-fight is to gain

command of the air.* অর্থাৎ আধুনিক নৌ-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে উহার প্রথম সর্ত্তই হইতেছে আকাশের উপর আধিপত্য লাভ। আকাশের উপর আধিপত্য করিতে হইলে উপযুক্ত বিমানবহরের দরকার। আবার উপযুক্ত বিমানবহরের সহযোগীতা ছাড়া সমুদ্রপথে নৌবহরের যুদ্ধ সফল হইতে পারে না এবং সমুদ্রপথে সাফল্য লাভ না হইলে স্থলপথের অভিযানও দানা বাঁধিতে পারে না। সুতরাং বিমান শক্তির একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু হংকং, মালয় বা ফিলিপাইনের যুদ্ধে বৃটেন বা আমেরিকার বিমান শক্তির শ্রেষ্ঠতা কোথায়? হংকংয়ে বৃটিশপক্ষ বীরত্বের সহিত লড়িয়াছে বটে, কিন্তু একমাত্র বীরত্বই যুদ্ধের শেষ কথা নহে। যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য জয়লাভ এবং সেই হিসাবে জাপানীরা লাভবান।†

---

* 'Japan must fight Britain'—লেঃ কমাণ্ডার ইসিমারু প্রণীত।

† হংকংয়ের আত্মসমর্পণের পর মিত্রপক্ষীয় বন্দী সৈন্যদের উপর জাপানীরা অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে হাতে কলমে প্রমাণ পাইবার পর ১৯৪২ সালের ১০ই মার্চ্চ তারিখে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ এণ্টনি ইডেন কমন্স সভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—"১৯৩৭ সালে জাপানীরা নান্‌কিংয়ের হত্যাকাণ্ড ও বর্ব্বরতার দ্বারা যেমন সমস্ত সভ্য জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, হংকংয়ের অসহায় সামরিক বন্দী ও বে-সামরিক জনগণের উপরেও তেমন বর্ব্বরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এ বিষয়ে কোন জাতি বা বর্ণের বৈষম্য করা হয় নাই। জানা গিয়াছে যে, বৃটিশ আর্ম্মির ৫০ জন সৈন্য ও অফিসারকে হাত পা বাঁধিয়া এবং পরে বেয়নেট চালাইয়া হত্যা করা হইয়াছে। মৃত সৈন্যদের সমাধি দিতে অস্বীকার করা হইয়াছে, ইউরোপীয়ান এবং এশিয়াটিক উভয় দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে বলাৎকার করা হইয়াছে। ধর্ষণের পর তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে। একটা গোটা চীনা পল্লীকে গণিকালয় বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, অধিবাসীদের মানমর্য্যাদার কোন বিবেচনা করা হয় নাই। ভারতীয়, চীনা ও পর্ত্তুগীজ সহ হংকং দুর্গের যাবতীয় জীবিত বন্দীদিগকে একটা ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ক্যাম্প হইতেছে কতকগুলি কুঁড়ে ঘর মাত্র, দরজা জানলা নাই, আলো বাতাস ও স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। রুগীদিগকে ঔষধ দেওয়া হইতেছে না, মৃতদিগকে ক্যাম্পের এক কোণে কবর দিতে হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে জাপ গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, হংকংয়ে বন্দীর সংখ্যা বৃটিশ ৫০৭২, কানাডীয় ১৬৮৯, ভারতীয় ৪৮২৯ ও অন্যান্য ৩৫৭—মোট ১০৯৪৭ জন।

—Hutchinson's 'Quarterly Record of the War', 10th Vol.

তৃতীয় অধ্যায়ঃ মালয়ের পতন

—১—

'সাম্‌নে আরও দুর্দ্দিন !'

২৮শে ডিসেম্বর '৪১।

১৯৪০ সালের যুদ্ধে বারম্বার পরাজয়ের পর মিঃ চার্চ্চিল এই ভরসা দিয়াছিলেন যে, ১৯৪১ সালে তাঁহাদের আয়োজন-পর্ব্ব শেষ হইবে, ১৯৪২ সালে তাঁহারা পাল্টা-আক্রমণের দ্বারা জার্ম্মাণীকে কাবু করিবেন। এক্ষণে ওয়াশিংটনে মার্কিণ সিনেট সভায় এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা (২৬শে ডিসেম্বর) দিয়া মিঃ চার্চ্চিল বলিতেছেন যে, ১৯৪২ সালও আমাদের নিকট দুর্ব্বৎসর হইবে, তবে, ১৯৪৩ সালে আমরা পাল্টা-আক্রমণ করিতে পারিব। জাপানের আক্রমণের জন্যই মিঃ চার্চ্চিল মিত্রপক্ষের সময় এক বৎসর পিছাইয়া দিলেন, সন্দেহ নাই। আগে শত্রু ছিল একা জার্ম্মাণী, এক্ষণে জার্ম্মাণী ও জাপানকে কেন্দ্র করিয়া আরও অনেক শত্রু দল বাধিয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন যে, জাপানের এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য গুরুতর বিপদের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, আমেরিকা বা বৃটেন কেহই এই ধরণের আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল না। মিঃ চার্চ্চিলের মতে এশিয়া ও ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা সামরিক বলসম্পন্ন রাষ্ট্র (the greatest military power) জাপান ও জার্ম্মানী ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। তাহাদের আয়োজন পাকা ও নিখুঁত, তাহারা দুর্দ্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর যোদ্ধা। সুতরাং ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্রদ্বয়ের অদৃষ্টে কিছুকাল ধরিয়া লাঞ্ছনা ঘটিবেই। আমেরিকা ও বৃটেন যে শত্রুদ্বয়ের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের শক্তি কত দুর্দ্ধর্ষ মিঃ চার্চ্চিল তাহা গোপন করেন নাই। তাঁহার নিজের ভাষা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

'The forces ranged against us are enormous. They are bitter, they are ruthless. The wicked men and their factions, who have launched their peoples on the path of war and conquest know that they will be called to terrible account

if they cannot beat down by force or arms the people they have assailed. They will stick at nothing. They have a vast accumulation of war weapons of all kinds. They have highly trained disciplined armies, navies and air-services. They had plans and designs which have long been tried and matured. They will stop at nothing that violence or treachery can suggest. It is quite true that on our side our own resources in manpower and materials are as yet mobilised and developed and we both have much to learn in the cruel art of war. We have, therefore, without doubt a time of tribulation before us. In the same time some ground will be lost which will be hard and costly to regain.'

ইহার সহজ মর্ম্ম এই যে, প্রচণ্ড ও ব্যাপক শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছে। এই শক্তি নৃশংস ও নির্ম্মম। এই সমস্ত দুরন্ত লোক ও তাহাদের দলবল জানে যে, যদি তাহারা পাশবিক শক্তি ও অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষ দলকে পরাজিত করিতে না পারে, তবে, তাহাদিগকে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হইতে হইবে, এই জন্য কোন প্রকার কার্য্যেই তাহারা ক্ষান্ত থাকিবে না। সর্ব্বপ্রকার সামরিক অস্ত্রের বিশাল আয়োজন তাহারা করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের স্থল-সৈন্য, নৌ-সৈন্য ও বিমান-সৈন্য অত্যন্ত সুশিক্ষিত ও নিয়মশৃঙ্খলায় উন্নত। দীর্ঘ কাল ধরিয়া তাহারা রণপরিকল্পনা স্থির করিয়াছে এবং এই পরিকল্পনা পরীক্ষার দ্বারা তাহারা পাকা করিয়া লইয়াছে। বৃটেন ও আমেরিকা যে অস্ত্রবল ও লোকবল এতদিন ধরিয়া সমাবেশ করিয়াছে, তাহা এখনও যথেষ্ট নহে এবং নিষ্ঠুর রণনীতি সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিণ উভয় রাষ্ট্রেরই এখনও অনেক কিছু শিখিবার আছে। সুতরাং আমাদের সাম্নে যে দুর্দ্দিন রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে কতকগুলি ভূখণ্ড আমাদের হাতছাড়া হইবে এবং সেগুলি পুনরায় উদ্ধার করিতেও আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি ও দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে।

স্বয়ং মিঃ চার্চ্চিল শত্রুর রণশক্তি সম্পর্কে যে চিত্র আঁকিয়াছেন, উহার উপর রং ফলানো অনাবশ্যক। এই প্রকার দুর্দ্ধর্ষ শক্তিকে রোধ করিতে হইলে সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের মূলমন্ত্র শিখিতে হইবে। কি ভাবে রাষ্ট্রের সমগ্র জনশক্তি, অর্থশক্তি, বিজ্ঞানশক্তি, শ্রমশক্তি এবং কাঁচামাল ও রাষ্ট্রনীতির শক্তি

যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায়, সেই বিরাট পরিকল্পনা স্থির ও অনুসরণ করিতে হইবে। মিঃ চার্চ্চিল বলিতেছেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের পর ২০ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা যে শান্তির বাণী ও শান্তির নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিলেন, উহারই জন্য তাঁহারা আজ রণক্ষেত্রে পারিয়া উঠিতেছেন না। মিঃ চার্চ্চিলের এই মতবাদের মধ্যে সমগ্র সত্য প্রকাশ পায় নাই। কারণ, ইঙ্গ-মার্কিণ ও ফরাসী রাষ্ট্রনীতি যে শান্তির বাণী প্রচার করিতেছিল, সেই শান্তির মূলে ছিল এই যে, ইংরাজের ও ফরাসীর বিশাল সাম্রাজ্য ও আমেরিকার বিশাল বাণিজ্য বজায় থাকিবে এবং এই উভয় দলের রাজত্ব ও শাসন সর্ব্বত্র কায়েম থাকিবে। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বনিয়াদ উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত একই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া থাকিবে। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে এই সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য-সুখ স্বপ্নের নিদ্রাভঙ্গ হওয়া উচিত ছিল। তারপর সোভিয়েট বিপ্লব ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের অগ্রগতির দ্বারাও এই ভুলের সংশোধন হওয়া উচিত ছিল। শান্তির মূল্য তখনই যখন শান্তি বা peace সমগ্র মানুষের সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধিকারকে স্বীকার করে। কিন্তু বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স তাহা করেন নাই। ফরাসী সাম্রাজ্য ও বৃটিশ সাম্রাজ্য ইহার বড় দৃষ্টান্ত। ফ্রান্স শোচনীয়রূপে পরাজিত, তথাপি ফরাসী উপনিবেশের উপর দাবী ও লোভ তাহাদের যায় নাই। সাধারণ গৃহস্থ মৃত্যুমুখে পড়িয়াও যেমন কুমড়াগাছ ও লাউগাছ সম্পর্কে বাড়ীর লোকদিগকে সাবধান করিয়া যায়, এই সমস্ত পরাধীন রাজ্য ও উপনিবেশ সম্পর্কেও মালিকরূপী রাষ্ট্রকর্ত্তাদের সেই একই মনোভাব! এই মনোভাব লইয়া Total war বা সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ চালানো যায় না। উহার পিছনে এমন একটা মতবাদ থাকা চাই, যে মতবাদ নূতন রাষ্ট্রধর্ম্মের মত—যাহা প্রত্যেকটি মানুষকে আত্মবিসর্জ্জনে উদ্দীপ্ত করিবে। সোভিয়েট রাশিয়া এই শক্তির উপর দণ্ডায়মান, এই জন্যই আজিকার পৃথিবীতে একমাত্র রাশিয়াই জার্ম্মাণীকে প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কি তেমন আদর্শ ও কর্ম্মপ্রণালী গ্রহণ করিতে পারিতেছেন? তাঁহারা ভারতবর্ষকে কি অবস্থায় রাখিয়াছেন? প্রাকৃতিক সম্পদে ও জনসংখ্যায় ভারতবর্ষ রাশিয়া ও আমেরিকার সমান, কিন্তু সেই ভারতবর্ষের অবস্থা কি? এখানকার যুদ্ধায়োজনের চেহারাটা কিরূপ? কয়টি এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক ও মোটরগাড়ী ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে এবং মালয়

ও হংকং হইতে কেন বার বার যুদ্ধাস্ত্রের অভাবের উপর জোর দিয়া সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের দুর্ভাগ্য গোপন করিতে চাহিতেছেন?

মিঃ চার্চ্চিল ১৯৪৩ সালের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু গোটা ১৯৪২ সালে দুর্দ্ধর্ষ জাপান যে অবস্থার সৃষ্টি করিবে, উহার প্রতীকার কি ভাবে সম্ভব হইবে? প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বাকি দ্বীপ, উপদ্বীপ ও রাজ্যগুলি জাপান কর্ত্তৃক আক্রান্ত বা দখল হইলে জাপান কি আরও বেশী শক্তিশালী হইবে না? প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ৯।১০ হাজার মাইল দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিবে কোন্ নৌবহর ও বিমানবহরের সাহায্যে? ফিলিপাইন হইতে ওয়েক্ দ্বীপ পর্য্যন্ত সমস্ত নৌঘাঁটি হাতছাড়া হইলে মার্কিণ নৌবহর অগ্রসর হইবে কিরূপে? নৌঘাঁটি ছাড়া নৌবহর কি দীর্ঘ মহড়ায় ঘুরিতে পারে? কয় হাজার এরোপ্লেন এবং আরও কত সংখ্যক জাহাজ তৈয়ারী করিতে পারিলে মহাসমুদ্রের এই বিশাল অভিযানে আমেরিকা বা বৃটেন বাহির হইতে পারিবে এবং উহার জন্য কত মাস সময় লাগিবে? আমেরিকা ও বৃটেনের নৌশক্তি ও বিমানশক্তি সম্মিলিত হইবে কোথায় এবং উভয়ের রণপরিকল্পনা কোন্ কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হইবে, সামরিক নেতৃত্বেরই বা ঐক্য হইবে কি ভাবে? রণনীতির এই মূল প্রশ্নগুলির জবাব পাওয়া দরকার। চার্চ্চিল ও রুজভেল্টের সম্মিলিত পরিকল্পনা যদি এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিতে পারে, তবেই আগামী দুর্দ্দিনে মিত্রপক্ষের আত্মরক্ষা সম্ভব।

—২—

'গ্রাণ্ড ষ্ট্রাটিজি'র আবিষ্কার?

৫ই জানুয়ারী, '৪২।

বৃটেন ও আমেরিকার সেনাপতিমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ এবং মস্কো ও চুংকিংয়ের মধ্যে আলোচনার পর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চ্চিল তাঁহাদের বহু বিজ্ঞাপিত 'গ্রাণ্ড ষ্ট্রাটিজি' বা মহারণনীতির সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহাদের সম্মিলিত ঘোষণায় দেখা যাইতেছে যে, মিত্রশক্তির এই রণপরিকল্পনার প্রথম স্তর গড়িয়া উঠিয়াছে সামরিক নেতৃত্বের বণ্টন লইয়া এবং দ্বিতীয় স্তর গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর ১৭টি রাষ্ট্রের রোম-বার্লিন-টোকিওর বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষরের দ্বারা। অর্থাৎ 'ষ্ট্রাটিজি'র প্রথমাংশ সামরিক এবং দ্বিতীয়াংশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। বলা বাহুল্য যে, সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের

বিরুদ্ধে লড়িতে হইলে রণনীতিকে অর্থনীতি ও রাজনীতির পাকা বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে। এই প্রকার সুদৃঢ় ভিত্তি ছাড়া আধুনিক কালের সংগ্রাম অচল। এই জন্যই চার্চ্চিল ও রুজভেল্ট ১লা জানুয়ারী তারিখ নূতন বর্ষের নূতন সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়া পৃথিবীর ২৬টি রাষ্ট্রকে হিটলার-মুসোলিনী-তোজোর বিরুদ্ধে সম্মিলিত করিয়াছেন। ইহার সামরিক দিকটা বিশ্লেষণ করা যাউক।

যে বিরাট রণনীতির কথা ঘোষিত হইয়াছে, তাহার প্রথমেই দেখিতেছি প্রাচ্য মহাদেশের রণাঙ্গনকে প্রধানতঃ দুইটি বিরাট রণক্ষেত্রে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, দক্ষিণ-পূর্ব্ব (আমেরিকার দিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম) প্রশান্ত মহাসাগর বা দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, চীন মহাদেশ। দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকায় ধরা হইয়াছে ফিলিপাইন মালয়, সিঙ্গাপুর, বোর্ণিও, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ, আর চীনের এলাকায় ধরা হইয়াছে খাস চীন, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড বা শ্যামদেশ। খুব সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশকেও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মধ্যে ফেলা হইয়াছে এবং ভারতবর্ষকে আলাদা করা হইয়াছে। জাপানী আক্রমণের পর ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশকে একত্রে জেনারেল ওয়েভেলের নেতৃত্বে আনা হইয়াছিল। এক্ষণে ব্রহ্মদেশকে রণাঙ্গনের দিক হইতে আলাদা করিয়া কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য নূতন সেনাপতি নিযুক্ত করা হইবে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিরাট রণাঙ্গনের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে খ্যাতনামা জেনারেল স্যার আর্চ্চিবল্ড ওয়েভেলের উপর। তিনি এই রণক্ষেত্রের জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর সর্ব্বোচ্চ অধিনায়ক বা Supreme Commander নিযুক্ত হইয়াছেন (৩রা জানুয়ারী)। জেনারেল ওয়েভেলের সহকারী হইবেন মার্কিণ বিমানবাহিনীর কর্ত্তা মেজর-জেনারেল জি এইচ ব্রেট এবং এই অঞ্চলের নৌ-শক্তির ভার পাইয়াছেন মার্কিণ নৌ-সেনাপতি এডমিরাল টমাস সি হার্ট। বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল স্যার হেনরি পাওন্যাল—যিনি কিছুদিন আগে জেনারেল পপহামের স্থলে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে জেনারেল ওয়েভেলের সেনানীমণ্ডলীর কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, মার্কিণ নৌ-শক্তি ও বিমানশক্তি জেনারেল ওয়েভেলের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় সম্মিলিত হইল। ইহার কারণ তিন প্রকার—(১) ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, বৃটিশ

বোর্ণিও ইত্যাদি দেশগুলি একত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান অংশ। এই অংশ হাতছাড়া হইয়া গেলে ইতিহাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন পাত্তা থাকিবে না এবং খাস বৃটেন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইবে। অপর পক্ষে জাপান প্রচুর শক্তি লাভ করিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইতে পারিবে। সুতরাং বৃটেনের মাথার মণি রক্ষার দায়িত্ব বৃটিশ সেনাপতির হাতে থাকাই উচিত। (২) জাপানের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে সর্ব্বাধিক প্রয়োজন এরোপ্লেন ও যুদ্ধজাহাজের। কিন্তু বর্ত্তমানে নৌবহর ও বিমানবহর বৃটেনের যাহা আছে, তাহা পূর্ব্ব-এশিয়ায় সংগ্রাম চালাইবার পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নহে। এইজন্য আমেরিকার উপর ভরসা রাখিতে হইতেছে এবং আমেরিকার বিমানবহর ও নৌবহর জেনারেল ওয়েভেলকে সাহায্য করিবে বিমান-সেনানী মেজর-জেনারেল ব্রেট ও নৌ-সেনানী এডমিরাল হার্টের মারফৎ। আমেরিকার যুদ্ধ ও স্বার্থ উভয়ই এই দুই সেনাপতির সহায়তায় অক্ষুণ্ণ থাকিবে। (৩) জাপানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ সংগ্রাম ত্রিধারার যুদ্ধ (war of three dimensions) অনুসরণ করিবে। জল, স্থল ও আকাশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা ও সংযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়া লড়িতে হইবে। জাপানী নৌ বহর প্রথম শ্রেণীর, সংখ্যার দিক দিয়া এই নৌ-বহর কিছু কম হইলেও (যুদ্ধের জন্য এই ঘাটতি ইতিমধ্যে পূরণ করা হইয়াছে কিনা কে জানে ?), ইহার গঠন-প্রণালী, অস্ত্রসজ্জা এবং রণপটুতা মার্কিণ নৌ-বহরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।* জাপানের বিমানশক্তি সম্পর্কে সন্দেহ ছিল, কিন্তু যেভাবে জাপান বিমানবহরের সাহায্য লইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, জাপান যথেষ্ট পরিমাণে এরোপ্লেন তৈয়ার (অন্ততঃ ৫ হাজার) ও বিমানবাহিনী প্রস্তুত করিয়াছে এবং জাপানী স্থলসৈন্যের সাহস, একগুঁয়েমি ও পটুতা ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। সুতরাং জাপ সংগ্রামের এই ত্রিধারার শক্তিকে রোধ করিতে হইলে এমন একজন সেনাপতির উপরেই সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা থাকা উচিত, যিনি এই তিন

---

* All catagories of ships in the Japanese Navy are of a very high technical quality. The Japanese naval authorities have also succeeded in thoroughly modernising their battleships, which now have a higher speed than the U. S. battleships. The Japanese heavy crusiers armed with ten 8-inch guns have the strongest armour plating and the highest of any ships in the class and they represent a unique combination of fire-power and mobility. —'The Military Strength of the Powers' by Max Werner.

প্রকারের যুদ্ধনীতিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সংগ্রাম চালাইতে ওস্তাদ। সেই হিসাবে বৃটেন ও আমেরিকায় জেনারেল ওয়েভেল ছাড়া বোধহয় দক্ষতর সেনাপতির সন্ধান মিলে নাই। উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয় জল, স্থল ও বিমানশক্তির বিরুদ্ধে জেনারেল ওয়েভেল প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। রণনীতি বা ষ্ট্রাটিজির দিক হইতে জেনারেল ওয়েভেল খ্যাতিমান। রাশিয়ার যেমন টিমোশেঙ্কো, বৃটেনের তেমন ওয়েভেল। প্রকৃতপক্ষে রণনীতিকে আশ্রয় করিয়াই রণকৌশল বা tactics দানা বাঁধিয়া উঠে। রণনীতির উদ্দেশ্য জয়লাভ এবং এই জয়লাভকে কার্য্যক্ষেত্রে সফল করে বণকৌশল। উপযুক্ত মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করা, উপযুক্ত মুহূর্ত্তে আঘাত দেওয়া এবং দরকার মত সরিয়া যাওয়া—রণনীতির এইগুলি অন্যতর বৈশিষ্ট্য। রাশিযার রণক্ষেত্রে টিমোশেঙ্কো ইহার চমৎকার পরিচয় দিয়াছেন। উত্তর আফ্রিকায় জেনারেল ওয়েভেলও এই দিক দিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিযাছেন। ফ্রান্সের পতনের পর ১৯৪০ সালে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। ইতালীয় সেনাপতি জেনারেল গ্রাৎসিয়ানী এই সুযোগে মিশরের সীমানায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু জেনারেল ওয়েভেল ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত অপেক্ষমান ছিলেন। যখন পাণ্টা-আক্রমণের মুহূর্ত্ত সন্নিকট বলিয়া তিনি বুঝিলেন, তখন তিনি গ্রাৎসিয়ানীকে আঘাত হানিলেন, গোটা লিবিয়ায় তিন লক্ষ ইতালীয় সৈন্যের শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায়ও এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সেই অবস্থা উত্তর আফ্রিকার চেয়ে অনেক বেশী উদ্বেগজনক। কারণ, জাপান অনেক বেশী শক্তিশালী।

ইংলণ্ডের কোন কোন মহলে এই উপলক্ষে ১৯১৪-১৮ সালের মিত্রশক্তির সম্মিলিত সৈনাপত্যের কথা স্মরণ করা হইয়াছে এবং মার্শাল ফসের সহিত জেনারেল ওয়েভেলের দায়িত্বের তুলনা করা হইয়াছে। একমাত্র ভাবী ইতিহাসই এই তুলনার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিতে পারে। তবে, আপাততঃ একথা স্বীকার্য্য যে, ১৯১৮ সালের মার্চ্চ মাসে পশ্চিম রণাঙ্গণে জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড আক্রমণে মিত্রশক্তির অবস্থা আজিকার জাপানী আক্রমণের মতই সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সঙ্কট রোধ করিবার জন্য সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন যে, একজন সেনাপতির হাতে সমগ্র মিত্রশক্তির সমস্ত বাহিনীর পরিচালন ভার দেওয়া দরকার। ২৬শে মার্চ্চ তারিখ মার্শাল ফস মিত্রশক্তির

অর্থাৎ বৃটিশ, ফরাসী, মার্কিণ ও বেলজিয়ান বাহিনীর সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন এবং ১৫ই জুলাই তারিখ তিনি ফরাসী রণক্ষেত্রের রেইম ও সয়সনে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া ১৮ই জুলাই তারিখ মার্ণে নদী-তীরের বিখ্যাত পাল্টা-আক্রমণের অভিযান আরম্ভ করেন। এখান হইতেই জার্ম্মাণীর চরম পরাজয়ের সূচনা হয়।* কিন্তু মার্শাল ফসের তুলনায় জেনারেল ওয়েভেলের সমস্যা আরও কঠিন। ইহার প্রথম কারণ সমুদ্র এবং দ্বিতীয় আকাশ। ১৯১৮ সালে রণনীতির এই দুই সমস্যা পশ্চিম রণাঙ্গনে জটিল ছিল না। আজ জাপানী নৌবহর শক্তিমান ও অক্ষত এবং বৃটিশ নৌবহর দুর্ব্বল ও মার্কিণ নৌবহরের গতিবিধি অনিশ্চিত।† প্রশান্ত মহাসমুদ্রে সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইলে জেনারেল ওয়েভেলকে জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত ইঙ্গ-মার্কিণ দ্বীপগুলিকে উদ্ধার ও ইঙ্গ-মার্কিণ নৌবহরের সম্মিলিত মহড়ার পথ মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু এই সম্মিলিত নৌবহরও জাপানকে দ্রুত হারাইতে পারিবে কিনা, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিস্তার ইহার একটা বড় কারণ। নৌবিশেষজ্ঞ বাইওয়াটারের মতে, "The enormous expanse of the Pacific makes base power and large steaming radius the dominating factors in the strategical problems of that ocean. Without a chain of well defended fuel stations it would be impossible for the American Fleet to operate for any length of time in the Western Pacific". সোজা কথায় প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিশালতার জন্য এখানকার রণনীতিতে দুইটি প্রশ্ন বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিবে। প্রথমতঃ নৌঘাঁটির শক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘপথে একাদিক্রমে জাহাজ চালাইবার শক্তি। পর পর সারিবদ্ধ সুরক্ষিত ঘাঁটি (এবং যে ঘাঁটি হইতে কয়লা ও পেট্রোল সংগ্রহ করা যায়) ছাড়া মার্কিণ নৌবহরের পক্ষে কোন দীর্ঘ মহড়ায় বাহির হওয়া

---

* 'Doubleday's Encyclopedia'—See *Marshal Foch*—Vol., No. IV.

† An Anglo-American naval coalition would not be in a position to defeat Japanese naval power quickly. The naval forces and the naval bases of Great Britain in the Far East are not strong enough to give the U. S. A. the superiority she lacks over Japan.

—'The Military Strength of the Powers'
by Max Warner.

অসম্ভব। মহাসমুদ্রের বিশালতা ও দূরত্ব এবং সেই দূরত্বের ব্যবধান ঘুচানো এখানকার রণনীতির জটিল সমস্যা। এই অভিমতের সঙ্গে আজিকার প্রশান্ত মহাসমুদ্রের অবস্থা মিলাইলে দেখা যাইবে যে, সমস্যা কত কঠিন। কারণ, ওয়েক হইতে পেনাং পর্য্যন্ত (একমাত্র সিঙ্গাপুর ছাড়া) সমস্ত ইঙ্গ-মার্কিণ নৌঘাঁটি আজ জাপানের দখলে। জেনারেল ওয়েভেল ও তাঁহার সেনানী-বৃন্দকে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে।

জাপানকে পিছন ও পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণের জন্য মার্শাল চিয়াং কাইসেককে ভার দেওয়া হইয়াছে এবং মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনীগুলিকে তাঁহার অধীনে আনা হইয়াছে। চীন-ব্রহ্ম রাস্তা, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড—প্রধানতঃ এই তিন সীমানায় তিনি জাপানকে আক্রমণ করিবেন এবং এই বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য মার্কিণ সেনাপতি ব্রেট ও বৃটিশ সেনাপতি ওয়েভেল ইতিপূর্ব্বেই চুংকিংয়ে গিয়া এক সমর-পরিষদ গঠন করিয়া আসিয়াছেন। এই পরিষদে মিত্রশক্তির প্রতিনিধিবর্গ থাকিবেন। আপাততঃ 'গ্রাণ্ড ষ্ট্রাটিজি'র যে ব্যবস্থা হইয়াছে, কাগজপত্রে তাহা মন্দ দেখাইতেছে না। সেনাপতিবৃন্দ খ্যাতিমান, সৈন্যদল উৎকৃষ্ট যোদ্ধা এবং মিত্রশক্তির দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা প্রচুর। কিন্তু রণক্ষেত্র বহুবিস্তৃত, ঘাঁটিগুলি হস্তচ্যুত এবং ট্যাঙ্ক, নৌবহর ও বিমানবহরের সংখ্যা অতি সামান্য। এই অবস্থার মধ্যে 'ষ্ট্রাটিজি' ও 'ট্যাক্‌টিসের' পূর্ণ মিলন ঘটাইতে হইবে, অন্যথা মার্শাল ফসের উপর জেনারেল ওয়েভেল ইতিহাসের দিক হইতে টেক্কা দিতে পারিবেন না!*

—৩—

মালয়ের যুদ্ধ

১০ই জানুয়ারী, '৪২।

ব্রহ্মদেশের শেষ প্রান্ত হইতে মালয় উপদ্বীপ যেন দীর্ঘ পুচ্ছের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এই পুচ্ছকে কেবল ব্রহ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করাই জাপানীদের উদ্দেশ্য নহে, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব মালয়ের একান্ত দক্ষিণ প্রান্তে বিখ্যাত

* মার্শাল ফসের উপর টেক্কা দেওয়া দূরের কথা, তিনি অতি শোচনীয় পশ্চাদপসরণ ও পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৯৪২-৪৩ সালের শীতকালের আরাকানের অভিযানের ব্যর্থতার দায়িত্বও তিনি পরবর্ত্তীকালে স্বীকার করিয়াছেন।

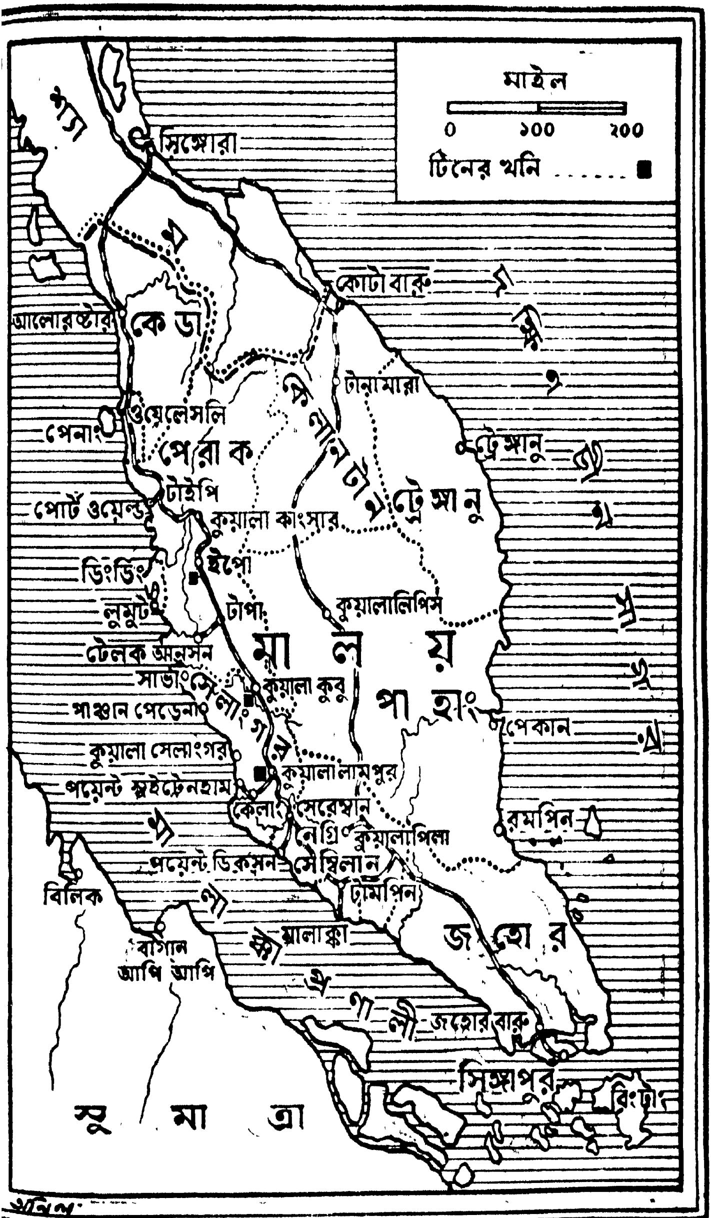
সিঙ্গাপুরের জন্য। কিন্তু মালয়ের নিজস্ব গুরুত্বও অপরিসীম। ইহার ভৌগোলিক অবস্থা আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের আদৌ উপযোগী নহে। মালয় একান্তরূপে জঙ্গলের দেশ এবং গোড়ায় এই দেশের সর্ব্বত্র ছিল অরণ্যের রাজত্ব। ভিতরের দিকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে এখনও কেবল জঙ্গল, কিন্তু তীরবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্র আধুনিক কালে পরিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষভাবে পশ্চিম তীরের বৃহৎ অংশ স্থানীয় অধিবাসীরা পরিষ্কার করিয়াছে, উত্তর দিকে কেডা অঞ্চলে ধানের চাষ হইয়া থাকে, দক্ষিণ দিকে পেরাক ও সেলাংগড় জেলায় বিখ্যাত রবারের ক্ষেত্র—গাছগুলি যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে চমৎকাররূপে সাজানো। একবারে দক্ষিণে জহোর রাজ্য, এখানকার মাটী নীচু ও চওড়া। তবে, অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলে ভর্ত্তি। মালয়ের ঐশ্বর্য্য হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, চাউলের জন্য ইহার কেডা বিখ্যাত। সেলাংগড় জেলার কুয়ালালামপুর রবার উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। পেরাক জেলার ইপো টিনের খনির অপরিমিত ঐশ্বর্য্যে লোভনীয়। ইহা ছাড়া রাউবে সোনার খনি, কুয়াণ্টানে লোহার খনি (জাপানীদের পরিচালিত) রহিয়াছে। মালয়ের লোকসংখ্যা ৫৫ লক্ষ। ইহার মধ্যে চীনা ২৪ লক্ষ, ভারতবাসী ৮ লক্ষ এবং খাস মালয়বাসিন্দা ২২ লক্ষ—জাপানীদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, ইউরোপীয়দের সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার।

মালয়ে জাপানীদের যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। অথচ মালয়বাসীদের কোনই আগ্রহ নাই, তাহারা যেন দর্শক মাত্র। রাজনীতির কথা উল্লেখ না করিয়া শুধু লোকসংখ্যা বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, দেশটা যেন তাহাদের নহে। ডিসেম্বর মাস হইতেই উত্তর মালয়ের যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। এখানে জাপানীরা খুব প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে নাই, তথাপি দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনীর শক্তি এখানে প্রায় সমস্ত দিক দিয়াই শত্রুর তুলনায় দুর্ব্বল। সুতরাং আত্মরক্ষাকারীদিগকে ক্রমাগতঃ পশ্চাতে হটিতে হইতেছে। মানচিত্র সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, পেনাং হইতে প্রায় ২০০ মাইল দক্ষিণে ও মালয়ের পশ্চিম তীরে সেলাংগড়। সেলাংগড়ের বিপরীত দিকে অর্থাৎ মালয়ের পূর্ব্ব তীরে কুয়াণ্টান—কুয়ালালামপুর ও সেলাংগড় প্রায় কাছাকাছি। এই তিনটি স্থানের উপর রেখা টানিলে ইহারা মোটামুটি একই লাইনে পড়ে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনী ঠিক এই লাইনের উপর সরিয়া আসিয়াছে। ইহাকেই মধ্য মালয়ের শেষ সীমা বলিয়া ধরা যায়। ইহার পরেই দক্ষিণ মালয় সুরু হইল, যাহার শেষ প্রান্ত

সিঙ্গাপুর। অর্থাৎ সহজ কথায় উত্তর মালয় জাপানীদের দখলে গিয়াছে, মধ্য মালয়ে জাপানীরা বহু দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এখানকার আত্মরক্ষার ব্যূহ ভাঙ্গিতে পারিলে তাহারা দক্ষিণ মালয়ে প্রবেশ করিবে। আরও সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, জাপানী সৈন্যেরা স্থলপথে সিঙ্গাপুরের ২০০ মাইলের মধ্যে পৌছিয়াছে।

দক্ষিণপ্রান্তিক ব্রহ্ম ও মালয়ের মধ্যে থাইল্যাণ্ড বা শ্যামের একটা ছোট্ট টুক্‌রা অংশ আছে। এই ক্ষুদ্র অংশটাই মালয় ও ব্রহ্মকে স্থলপথে সংযুক্ত করিয়াছে। থাইল্যাণ্ড জাপানীদের আওতায় যাওয়ায় এই ক্ষুদ্র ভূভাগই এক্ষণে ব্রহ্মদেশ ও মালয় উভয়ের বিপদ ঘটাইয়াছে। কারণ, ব্যাঙ্কক হইতে একটি রেলপথ দক্ষিণপ্রান্তিক ব্রহ্মের সীমা ঘেঁসিয়া সঙ্কীর্ণ থাইল্যাণ্ড যোজককে অতিক্রম করিয়া কোটাবারুতে পৌছিয়াছে এবং কোটাবারু হইতে মধ্য মালয়কে ভেদ করিয়া রেলপথ গিয়াছে সিঙ্গাপুর। এই রেলপথের সহিত কুয়ালালামপুর ও সেলাংগড়েরও যোগ রহিয়াছে। মালয়ের যুদ্ধে এই রেলপথ স্বভাবতঃই গুরুত্ব অর্জ্জন করিবে। সুতরাং এই রেলপথের উপর দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। জাপানীরা শ্যাম দেশ ও শ্যাম উপসাগর হইতে মালয়ে আক্রমণ চালাইয়াছে। সিঙ্গোরা হইতে কেডা হইয়া তাহারা পেনাং দখল করিয়াছে। পেনাং হইতে জাপানীদের এক বাহু জলপথে যাইতেছে সেলাংগড়ের দিকে এবং আর এক বাহু সম্ভবতঃ রেলপথ ধরিয়া ইপো হইয়া কুয়ালালামপুরে যাইবে। ইপো ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাহিনী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। বার্ণাম নদী ও পেরাক নদী এই অঞ্চলের যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য হইয়াছে এবং নদী অতিক্রমণে জাপানীদের পটুতা ইতিপূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। সিঙ্গোরা হইতে জাপানীদের আর এক বাহু কোটাবারু দখল করিয়াছে। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটি দখলের পর কেলানটান ও ট্রেনগানাউ প্রদেশও জাপানীদের হাতে গিয়াছে। সুতরাং শত্রুপক্ষ শীঘ্রই মধ্য মালয়ের প্রান্ত সীমানায় পৌছিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

লণ্ডনে সরকারীভাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, মালয়ের ১৫টি বিমান-ঘাঁটি জাপানীদের দখলে গিয়াছে। এতগুলি বিমান-ঘাঁটি শত্রুর কবলে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ, বিমান-যুদ্ধের পক্ষে বিমান-ঘাঁটির একান্ত প্রয়োজন। নরওয়ে ও ক্রীটের যুদ্ধে মিত্রশক্তির হারিবার অন্যতম কারণ পূর্ব্বাহ্নে শত্রু কর্ত্তৃক বিমান-ঘাঁটিগুলির দখল। একে জাপানীদের বিমানশক্তি



মাইল
০ ১০০ ২০০
টিনের খনি
সিঙ্গোরা
কোটা বারু
আলোরস্টার
কেডা
টানামারা
ওয়েলেসলি
পেনাং
পেরাক
ট্রেঙ্গানু
টাইপি
পোর্ট ওয়েল্ড
কুয়ালা কাংসার
ইপো
ডিংডিং
লুমুট
কুয়ালালিপিস
টাপা
টেলক অনসন
মালয়
সাভাং
কুয়ালা কুবু
পাহাং
পেকান
কুয়ালা সেলাংগর
কুয়ালালামপুর
কেলাং
সেরেম্বান
রমপিন
কুয়ালাপিলা
পয়েন্ট ডিকসন
টামপিন
বাগান
আপি আপি
মালাক্কা
জহোর
জহোর বারু
সিঙ্গাপুর
সুমাত্রা

এখানে শ্রেষ্ঠতর, ইহার উপর তাহারা বিমান-ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া লইয়াছে। যদিও মালয় অত্যন্ত অরণ্যসমাকুল দুর্গম দেশ, তথাপি আধুনিক যুদ্ধ প্রকৃতির বিঘ্নকে বার বার লঙ্ঘন করিতেছে। জাপানীরা দুঃসাহসী ও বেপরোয়া, জার্ম্মাণ রণনীতির আদর্শে তাহারা সংগঠিত ও সুশিক্ষিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী হইতে জাপানী গভর্ণমেণ্ট স্থলযুদ্ধে জার্ম্মাণীর পরামর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার সঙ্গে জঙ্গল যুদ্ধের এক অভিনব বৈশিষ্ট্য তাহাবা অর্জ্জন করিয়াছে। মালয়ের গভীর জঙ্গলে একান্ত চুপি চুপি তাহাদের প্রবেশ, যাহা পরে সামরিক ভাষায় infiltration বা 'অনুপ্রবেশ' নীতি বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার সুরু এখানে। ইউরোপে জার্ম্মাণী ও এশিয়ায় জাপান এই রণকৌশলের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। কিন্তু মালয়ের জঙ্গল যুদ্ধ জার্ম্মাণীর তুলনায় অনেক বেশী অভিনব, যাহার উদাহরণ শীঘ্রই পাঠকেরা পাইবেন।

—৪—

দক্ষিণ মালয়ে অগ্রগতি

১৪ই জানুয়ারী, '৪২।

আগেকার প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, সেলাংগড়, কুয়ালালামপুর ও কুয়াণ্টান—এই স্থানগুলির উপর রেখা টানিলে মোটামুটি যে লাইনের সৃষ্টি হয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনী সেখানেই ছিল। কিন্তু জাপানীরা ইতিমধ্যে দ্রুত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কোন প্রকার ক্ষতি গ্রাহ্য না করিয়া এবং সাম্রাজ্য-বাহিনীর দৃঢ় আত্মরক্ষার ব্যূহ ভাঙ্গিয়া জাপানীদের ব্লিজক্রিগ চলিতেছে দুর্দ্ধর্ষ বেগে। মালয়ের পশ্চিম তীরে সেলাংগড় ও পূর্ব্বতীরে কুয়াণ্টান দখল হইয়া গিয়াছে এবং কুয়ালালামপুরেরও পতন হইয়াছে। কুয়ালালামপুর সমগ্র মালয়ে অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন সহর ছিল, ইহা দখলে যাওয়াতে মালয়ের পশ্চিম তীরস্থ সুইটেনহাম বন্দরও জাপানীরা ব্যবহারের সুযোগ পাইবে। মালয় ও সিঙ্গাপুরের সমস্ত সংবাদেই দেখা যাইতেছে যে, উপযুক্ত পরিমাণ বিমান-বহরের অভাবেই আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদল বীরত্বের সহিত লড়িয়াও তাল সামলাইতে পারিতেছে না। নিদারুণ বোমাবর্ষণের জন্য তাহারা ক্রমাগত হটিতে বাধ্য হইতেছে।

জাপানীরা বোমাবর্ষণের আড়ালে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। তাহাদের সঙ্গে ছোট ছোট ট্যাঙ্ক রহিয়াছে এবং আত্মরক্ষার ব্যূহগুলিকে ঝাঁঝরির মত বহু

ছিদ্র করিয়া পদাতিক দল নানাপথে অনুপ্রবেশ করিতেছে। আত্মরক্ষাকারী সৈন্যরা বলিতেছে যে, জাপানীরা একই সময়ে ৬।৭ দিক হইতে আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক আক্রমণাত্মক সংগ্রামের ইহাই রণকৌশল। প্রতি-পক্ষের বূ্যহের মধ্যে ট্যাঙ্ক ও বোমারুযোগে বহু ছিদ্র সৃষ্টি করিয়া পদাতিক বাহিনীর প্রচণ্ড বেগে অগ্রগতি—ইহাই আধুনিক জার্ম্মাণীর রণকৌশল এবং এই কৌশল জাপানীরাও অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য, এরোপ্লেন ও জাহাজের ব্যবস্থা থাকিলে জাপানীদের এই রণকৌশলও প্রতিহত করা যাইত। মধ্য মালয়ের শেষ প্রান্ত আজ অতিক্রান্তপ্রায় এবং ইহার পরেই দক্ষিণ মালয় বা জহোর রাজ্য সুরু হইবে এবং ইহারই দক্ষিণতম প্রান্তে সিঙ্গাপুব। ইতিমধ্যে আকাশপথে সেখানে প্রচুর বিমান আক্রমণ ঘটিতেছে। ইহার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। বোমাবর্ষণের দ্বারা সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার ঘাঁটি ছিন্ন করা, জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত কবা এবং সামরিক ব্যবস্থার বিভ্রাট ঘটানো—পরে স্থলপথে সিঙ্গাপুরকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ, ইহাই মালয়ের যুদ্ধে জাপানীদের লক্ষ্য।

* *

*

মালয়ের দুর্গম দেশে জাপানী সৈন্যেরা অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। পাহাড় জঙ্গল, জলাভূমি এবং নদী ইত্যাদি প্রকৃতির সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করিয়া জাপানীদের দ্রুত অগ্রগতি চলিতেছে। তাহাদের এই গতি ১৯৪০ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ ব্লিজক্রিগের সহিত তুলনীয়। সেখানেও ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী সৈন্যসংখ্যায় ও অস্ত্রসজ্জায় জার্ম্মাণীর তুলনায় অনেক বেশী দুর্ব্বল ছিল এবং যান্ত্রিক সংগ্রামের নূতনতর রণকৌশলে জার্ম্মাণী অভিনব যুদ্ধ চালাইয়াছিল। মালয়েও জাপানীদের এই লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাহারা যে ভাবে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ মালয় অতিক্রম করিতেছে, তাহাতে সিঙ্গাপুরের সীমানায় পৌছিতে খুব বেশী বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবস্থা যে অত্যন্ত গুরুতর এবং সিঙ্গাপুরের সঙ্কট যে আসন্ন, তাহা ইংলণ্ডের বড় বড় পত্রিকাসমূহ এবং ওয়াকেফহাল মহল স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন। মালয়ে বৃটিশবাহিনীর সঙ্গে 'লণ্ডন টাইমসে'র যে বিশেষ সংবাদদাতা আছেন, তিনি এখানকার পরাজয় সম্পর্কে তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য এই কারণগুলি নূতন নহে, তথাপি অবস্থা বুঝিবার পক্ষে এগুলির পুনরুল্লেখ করা

যাইতে পারে। যথা :—(১) জাপানীদের তুলনায় বৃটিশ সাম্রাজ্য-সৈন্যের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জাপানীদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী হইবে। (২) দীর্ঘ ৬ সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত একটানা যুদ্ধের জন্য সৈন্যেরা অত্যন্ত ক্লান্ত। যদি তাহারা এভাবে ক্লান্ত না হইত এবং সংখ্যায় কিছুটাও সমান হইত, তাহা হইলে জাপানীরা এত সুবিধা করিতে পারিত না। সৈন্যেরা এত পরিশ্রান্ত যে, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য খাদ্য গ্রহণের আগেই ঘুমাইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, যে ধরণের যান্ত্রিক যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে স্নায়ুমণ্ডলীর অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন। অতীতের যুদ্ধে সৈন্যদের মনে এই ভরসা থাকিত যে, তাহাদের পার্শ্বদেশ বা flank বিপন্ন হইলেও পশ্চাতে (rear) কোন ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু এই যুদ্ধে সৈন্যেরা রাত্রিবেলা পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে—বুঝি বিপদ তাহাদের চারিদিকে এবং যে কোন মুহূর্ত্তে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে। সৈন্যদের লড়াই করিবার শক্তি উচ্চস্তরের, কিন্তু সমস্যা শক্তির নহে, সমস্যা হইতেছে সংখ্যার। (৩) বিমানবহরের অভাব। এই অভাবের জন্য সাম্রাজ্যবাহিনীকে অপরিসীম বেগ পাইতে হইতেছে। সৈন্যদলের অগ্রবর্ত্তী বাহিনী জানে না তাহাদের সম্মুখে মাত্র ১০০ গজ দূরের জঙ্গলে শত্রুপক্ষ কি করিতেছে। সেনাপতিগণ বিমানবহরের অভাবে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। ফলে, শত্রুসৈন্যের সংখ্যা কত, তাহারা কোথায় কি ভাবে আছে এবং কোন্ দিক দিয়াই বা তাহারা আক্রমণের আয়োজন করিতেছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না।

এই বর্ণনা হইতে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে। সাধারণতঃ যাহারা আক্রমণ করে, তাহারা প্রথমেই এই সুবিধা পায় যে, বিপক্ষের সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে তাহাদের চালের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় এবং সেই চাল অনুসারে চলিতে হয়। অর্থাৎ আত্মরক্ষাকারীর রণনীতিকে আক্রমণকারীর রণনীতির মুখাপেক্ষী হইতে হয় এবং গোড়া হইতে আক্রমণকারীর চালের মধ্যে পড়িতে হয়। ফলে, আত্মরক্ষাকারীদিগকে স্বাভাবিক কারণেই অনেক বেশী অসুবিধা ও বিপদ বরণ করিয়া লইতে হয়। আক্রমণকারীর আর একটা লক্ষ্য থাকে বহু দিকে সৈন্য পাঠাইয়া আত্মরক্ষাকারীকে বিভ্রান্ত করা। অর্থাৎ আক্রমণকারী সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শক্তি কোথায় নিয়োজিত করিবে, তাহা আগে বুঝিতে না দেওয়া। সোজা বাঙ্গলায় ইহাকে ধাপ্পা দেওয়া (রণনীতির ভাষায় feint attack বলে) বলা যাইতে

পারে। এই ধাপ্পা বুঝিতে হইলে অগ্রবর্ত্তী বাহিনী বা vanguardকেও সম্মুখভাগে নানা দিকে ছড়াইয়া দিতে হয়, সম্ভাব্য সমস্ত প্রবেশপথে তীক্ষ্ণ নজর রাখিতে হয় এবং উপর হইতে নিরন্তর এরোপ্লেনযোগে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। সাধারণতঃ এরোপ্লেনই এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সহায়ক। কিন্তু যেখানে উপযুক্ত এরোপ্লেনের অভাব, যেখানে শক্রর গতিবিধি একান্ত অজ্ঞাত, সেখানে আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদলের বিপদ কত গুরুতর তাহা সহজেই অনুমেয়। মালয় রক্ষাকারী সাম্রাজ্যবাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সহিত লড়িতেছে, কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্র ও যন্ত্রের অভাবে তাহাদের এই বীরত্ব জয়মণ্ডিত হইতে পারিতেছে না। এই সাম্রাজ্যবাহিনীর মধ্যে শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ ইংরাজ সৈন্য রহিয়াছে, বাকী ৭৫ ভাগ ভারতীয়। সামান্য অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যও আছে। ভারতীয় সৈন্যেরা যুদ্ধবিদ্যায় জাপানীদের তুলনায় মোটেই হীন নহে। সমান অস্ত্র ও সমান সংখ্যার অভাবেই তাহারা আজ ক্লান্তদেহে ক্রমাগত পশ্চাতে হাটিতে বাধ্য হইতেছে এবং জাপানীরা সিঙ্গাপুরের ১০০ মাইলের মধ্যে পৌছিয়াছে। ইহা দুঃসংবাদ সন্দেহ নাই, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত এই তিক্ত অবস্থার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া উপায় কি?......

১৯শে জানুয়ারী '৪২।

জাপানীরা সিঙ্গাপুরের দিকে ক্রমশঃ সমস্ত শক্তি অতি দ্রুত প্রয়োগের চেষ্টা করিতেছে। তাহারা প্রত্যহ যে গতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহা উদ্বেগজনক। গত এক সপ্তাহে তাহারা সিঙ্গাপুরের ২০০ মাইলের মধ্যে ছিল, তারপর ১৫০ মাইল, তারপর ১২০ মাইল, তারপর ১০০ মাইল এবং এক্ষণে প্রকাশ যে, তাহারা সিঙ্গাপুরের ৯০ মাইলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মালয়ের যে প্রধান রেলপথ ও রাস্তা দক্ষিণাভিমুখী সিঙ্গাপুরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই দিক দিয়াই জাপানীরা প্রধান যান্ত্রিক ও পদাতিকবাহিনী পাঠাইতেছে। ইহা ছাড়া মালয়ের পশ্চিম ও পূর্ব্ব তীর ধরিয়াও তাহারা অগ্রসর হইতেছে। প্রকাশ যে, দক্ষিণাভিমুখী রাজপথের অবস্থাও আদৌ আশাপ্রদ নয়। তাহারা নৌকা ও বজরা যোগে মুয়ার নদীর দক্ষিণে অবতরণ করিয়াছে। মুয়ার নদী দক্ষিণ মালয়ে এবং এখানে প্রচুর সংখ্যক জাপ সৈন্য অবতরণ করায় বৃটিশ সৈন্যেরা সংখ্যার দিক হইতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। মুয়ার নদী হইতে জাপানীরা নাকি খেয়া পার হইতেছে! ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা। কারণ, আধুনিক বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক ও বড় কামানের

যুগে নৌকা ও বজরাযোগে শত্রু সৈন্যের অগ্রগতি, আমাদের মত অ-সামরিক জনগণের নিকট অত্যন্ত অভিনব বলিয়া মনে হইতেছে। অপর দিকে জাপানীরা মালাক্কা প্রণালীতেও কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মালাক্কা ও মুয়ার নদী হইতে জাপানীরা সাম্রাজ্যবাহিনীর পার্শ্বদেশ বিপন্ন করিতে পারিবে এবং মালাক্কা প্রণালীতে জাপানীদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা হইলে সিঙ্গাপুরের নৌপথ অবরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। এদিকে বাটাভিয়ার সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানীরা প্রথমতঃ ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্বাংশ দখলের চেষ্টা করিবে এবং তারপর সিঙ্গাপুরকে চারিদিক দিয়া বেষ্টন করিবে। জাপানীদের প্ল্যান সেই ভাবেই অগ্রসর হইতেছে।

সিঙ্গাপুর অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা ব্রহ্মদেশ সম্পর্কেও আদৌ উদাসীন নহে। রেঙ্গুণে ও মৌলমেনে তাহারা বার বার বোমাবর্ষণের পর এক্ষণে স্থলপথে আক্রমণ সুরু করিয়াছে। তাহারা ২৫ মাইল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্মের শেষাংশ ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট তাহারা আগেই দখল করিয়াছে। এক্ষণে টাভয় জেলার দিকে তাহারা অভিযান করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই দক্ষিণ ভাগ মলয়ের সহিত স্থলপথে সংযুক্ত এবং ইহাকে মালয় যুদ্ধেরই ক্রমবিস্তৃতি বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

* *

*

মালয় যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনীর যে শোচনীয় পশ্চাদপসরণের কাহিনী শুনা যাইতেছে, সেই সম্পর্কে পরবর্ত্তীকালে প্রকাশিত একটি পুস্তকে * দেখা যায় যে, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানীরা মালয়ের পূর্ব্বতীরে কুয়াণ্টানে শক্ত হইয়া বসে এবং উত্তর পেরাকে অগ্রসর হয়। অবস্থা ইতিমধ্যেই গুরুতর হইয়া পড়িয়াছিল। চারি সপ্তাহের আত্মরক্ষার যুদ্ধের পর পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী টিনের খনি অঞ্চল, লোহার খনি, রবার ক্ষেত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ শত্রুর হাতে দিয়া আসিতে হইল। জঙ্গল যুদ্ধে যাহারা শিক্ষালাভ করিয়াছে, তেমন সৈন্যদলের কাছেও জাপানীদের রণকৌশল হতবুদ্ধিকর ছিল। জাপানীরা খুব কাছাকাছি যুদ্ধে ওস্তাদ না হইলেও তাহারা রাইফেল ও মেসিনগান বেশ উত্তমরূপে ব্যবহার করিয়াছিল। যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য হতাহত হইলেও তাহারা আদৌ বিচলিত ছিল না। বিমানের সংখ্যায়

* Hutchinson's "Quarterly Record of the War", Vol. 10.

তাহারা শক্তিশালী ছিল এবং বিমানবহরের সঙ্গে তাহাদের সহযোগিতা ঘনিষ্ঠ ছিল। জাপানী বোমারুগুলি উৎকৃষ্ট ছিল, তাহাদের জঙ্গীবিমান বৃটিশ বিমানের * চেয়ে ভালো ছিল।

বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যেরা মালয়ে বহু বিচিত্র বাধার সম্মুখীন হইয়াছে। যেমন,—চীনা ও মালয়বাসীদের সঙ্গে জাপানীদের চেহারার সাদৃশ্য ছিল, ফলে জাপানীরা অনেক সময় মালয়বাসীদের, বিশেষভাবে রবার ক্ষেতের শ্রমিকদের জামা পরিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, এমন কি অগ্রবর্ত্তী পাহারাদার সৈন্যকেও এভাবে পাঠাইয়াছে। পেনাংয়ে তাহারা যে সমস্ত জেলেদের নৌকা কিম্বা তীরভূমি ও অন্যান্য স্থান হইতে যে সমস্ত হাল্কা যান ধরিয়াছিল, সেগুলিও তাহারা অগ্রসর হইবার জন্য কাজে লাগাইয়াছিল। গরান কাঠের ঝোপ ও জলাভূমির সুযোগ তাহারা লইয়াছিল, আকাশপথের পর্য্যবেক্ষণ বা নৌ-আক্রমণ হইতে তাহারা এভাবে রক্ষা পাইয়াছিল। তাহারা রাত্রিবেলা চুপে চুপে তীরভূমি দিয়া চলিতে থাকে এবং এক একবারে বড় বা ছোট অবতরণকারী সৈন্যদিগকে নামাইয়া দেয়। মিত্রবাহিনীর পার্শ্ব বা পশ্চাৎভাগে এভাবে ক্রমাগত জাপানীরা অনুপ্রবেশ করিতে থাকে, ইহাতে বাধা দেওয়ার জন্য মিত্রপক্ষের হাল্কাজাতীয় কোন নৌবহর কিম্বা ততটা বিমানশক্তি ছিল না। ৬ই জানুয়ারী সিঙ্গাপুর হইতে স্বীকার করা হয় যে, "আমাদের সৈন্যেরা পেরাক হইতে আরও পশ্চাদপসরণ করিয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য আমাদের বামপার্শ্বে শত্রুর আক্রমণ চেষ্টায় বাধা দান।" পাহাং ষ্টেটের কুয়াণ্টান এলাকা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ৭ই জানুয়ারী লণ্ডন 'টাইমসের' সংবাদদাতা জানান যে, কুয়ালালামপুরের দিকে ব্যাপক আক্রমণ সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। কুয়ালা সেলাংগড়ে জাপানীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা হইলে পর তাহারা বার্ণাম নদীর মোহনায় অবতরণ করে এবং কুয়ালালামপুরের উত্তর দিকের সহিত সংযুক্ত রেলপথ ও রাস্তা বিপন্ন করিয়া তোলে। সহরের এই উত্তর দিকটায় কয়েকদিন যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে জাপানীরা মাঝারি ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিয়াছিল। শ্লিম নদীতটের আক্রমণে এই সমস্ত ট্যাঙ্ক যেন বর্শা ফলকের কাজ করিয়াছিল এবং জাপানীরা এই কৌশলে আংশিক ভাবে সফলও হইয়াছিল। অতঃপর ১০ই জানুয়ারী তারিখ সাম্রাজ্যবাহিনী কুয়ালালামপুর ত্যাগ করে। টিনের খনির যন্ত্রপাতি ও প্রভূতপরিমাণে রবার ধ্বংস করিয়া

* 'Brewester Buffalo' শ্রেণীর জঙ্গী বিমান।

ফেলা হয়। সৈন্যরা অত্যন্ত শ্রান্ত ছিল, তাহাদের কোন ট্যাঙ্ক ছিল না, বিমান-ও সামান্য ছিল, তাহারা ক্রমাগত পিছু হটিতে থাকে।

১৮ই জানুয়ারীর সামরিক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গেমাস-টেম্পিন সড়কে প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধে বিমান আক্রমণের দ্বারা শত্রুর অনেক যানবাহন নষ্ট হয়। মুয়ার নদীর যুদ্ধে জাপানীদের ৮ খানা ট্যাঙ্ক নষ্ট হয় বটে, কিন্তু দক্ষিণ তীরের একটা অংশ দখল করিয়া লয়। এই সময় মেজর-জেনারেল গর্ডন বেনেটের অধীনে ৮নং অষ্ট্রেলিয়ান ডিভিসন রণক্ষেত্রে যোগ দেয়। তাহারা দৃঢ়তা, দৈহিক যোগ্যতা ও অবস্থানুযায়ী চলিবার যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছিল।

পার্শ্ববর্ত্তী মালাক্কা প্রণালী সুরক্ষিত ছিল না। শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত জাহাজগুলি এই জলপথে দেখা দিল। পশ্চিম পার্শ্বে 'অনুপ্রবেশ' কৌশল চলিতে লাগিল। 'কম্যাণ্ডো' দল পাঠাইয়া ইহার প্রতিশোধ লওয়ার চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু সফল হইল না। সাম্রাজ্যবাহিনীর সৈন্যেরা মালয়ী বা জাপানীদের বেশ ধরিয়া নিশ্চয়ই চলিতে পারিত না। কিম্বা জাপানীদের মত একমুঠা ভাত খাইয়া থাকিতে কিম্বা তাহাদের মত লড়াই করিতেও পারিত না। জাপানীরা জঙ্গলের রাস্তায় বাইসিকেলে চড়িয়া চলিয়া যাইত, বানরের মত তাহারা গাছে উঠিতে ওস্তাদ ছিল এবং শাখার আড়াল হইতে সাম্রাজ্য-বাহিনীর বহির্ঘাটিগুলির উপর তাহারা চোরাগোপ্তা গুলী চালাইত! ইহার সঙ্গে ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন যুক্ত হওয়ায় তাহারা সহজেই আত্মরক্ষাকারীদিগকে হটাইয়া দিল। বাটুপাহাট * হইতে জহোরবারু পর্য্যন্ত প্রধান সড়কের যুদ্ধ ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে শেষ হইয়া গেল। ক্রমাগত ৫৫ দিন (প্রায় দুই মাস) ধরিয়া জাপানীরা মালয় উপদ্বীপে যে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা ৫০০ মাইল (শ্যাম দেশের সীমানা হইতে দক্ষিণ মালয়ের প্রান্ত পর্য্যন্ত) অতিক্রম করিয়াছিল. এবং তাহারা ৮ হাজার সৈন্য বন্দী করিবার দাবী জানাইল।

* বাটুপাহাট এলাকায় যে সমস্ত মিত্র সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ৫৭০ জন পুনরায় প্রধান বাহিনীর সহিত যোগ দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু বাকি সৈন্যেরা পারে নাই।

—৫—

জঙ্গল যুদ্ধের কৌশল

জানুয়ারী, ৪২।

মালয় যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনীর ক্রমাগত পশ্চাদপসরণের মূলে কেবল যে, সৈন্যদলের সংখ্যাশক্তির অল্পতা এবং উপযুক্ত বিমানবহর ও ট্যাঙ্কেরই অভাব ছিল, এমন নহে। মালয়ে রণকৌশলের ভুল ভ্রান্তিও ঘটিয়াছে। বিশেষভাবে জঙ্গল যুদ্ধের উপযুক্ত ট্রেনিং না থাকায় এই বিভ্রাট আরও বেশী মারাত্মক হইয়াছে। অপর পক্ষে জাপানী সৈন্যেরা মালয়ের জঙ্গল যুদ্ধে রণকৌশল ও চতুরতার বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। যদিও মালয় যুদ্ধে ভুল-ভ্রান্তির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া সম্ভব নহে, তথাপি রণপণ্ডিত লীডেল হার্ট একটি প্রবন্ধে (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪১) অনুমান করিতেছেন—There may have been mistakes in the tactical handling of our troops, as reports suggest—their fighting spirit is usually better than their technique. There may have been undue complacency as to our capacity for defence, and the enemy's incapacity to advance through such difficult country. We may have suffered from letting our attention, and forces, be too easily absorbed by the preliminary Japanese landings on the east coast of Malaya, so that the enemy's subsequent indirect approach down the west coast was allowed too clear a course.*

এই মন্তব্যের সহজ ব্যাখ্যা করিলে এই দাঁড়ায় যে, সৈন্যদের রণকৌশলগত পরিচালনায় ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছিল। তাহাদের লড়াইয়ের স্পৃহা ভালো ছিল বটে, কিন্তু 'টেক্‌নিক' বা লড়াইয়ের পদ্ধতি ততটা ভালো ছিল না। শত্রু এমন দুর্গম ভূখণ্ডে সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর যেমন জোর দেওয়া হইয়াছিল, তেমনই নিজেদের আত্মরক্ষার শক্তির উপরও অযথা আস্থা রাখা হইয়াছিল। মালয়ের পূর্ব্ব তীরে (সম্ভবতঃ কুয়াণ্টানে) শত্রু যখন প্রথম অবতরণ করিয়াছিল, তখন সেই দিকে এত বেশী মন দেওয়া হইয়াছিল যে, সেই সুযোগে শত্রু পশ্চিম উপকূলে অবতরণ

---

* 'This Expanding War'—by Captain Liddell Hart.

করিয়া 'অপ্রত্যক্ষ আক্রমণের রণনীতির'* দ্বারা সোজা অগ্রগতির সুবিধা পাইল। অর্থাৎ মালয় যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাহিনীর কর্ত্তারা জাপানীদের রণকৌশলে বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বতীরে জাপানীদের অবতরণকেই সম্ভবতঃ তাঁহারা আসল আক্রমণ বলিয়া ভাবিয়াছিলেন এবং সেই দিকেই বেশী মন দিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অনবধানতার সুযোগ লইয়া চতুর জাপানীরা পশ্চিম তীরেও অবতরণ করে এবং সেখান দিয়া দ্রুত অগ্রগতির সুযোগ লাভ করে। অবশ্য সমুদ্রপথে ও আকাশে মিত্রপক্ষের বাধাদান শক্তি ছিল না বলিয়াই জাপানীরা এতটা সুবিধা পাইয়াছিল। তথাপি মালয় যুদ্ধ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, জাপানী চতুরতার সঙ্গে মিত্রবাহিনীর পরিচালনার বুদ্ধিমত্তা তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই। এখানে পদে পদে ঠকিতে হইয়াছে।

মালয় অভিযানে জাপ পরিকল্পনা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই উভয় তীর ধরিয়া আক্রমণ ও অগ্রগতির কথা তাহারা চিন্তা করিয়াছিল। তবে, পশ্চিম তীরের রাস্তাঘাট ও জঙ্গলহীন ভূমির প্রশস্ততার জন্য সেই উপকূলভাগ ধরিয়াই তাহাদের প্রধান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আর পূর্ব্ব তীরের আক্রমণ ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট ধরণের—পূর্ব্ব তীর হইতে ক্রমে নিম্নাভিমুখে এবং কোটাবারু-গেমাস রেলপথ ধরিয়া আরও নীচের দিকে। থাইল্যাণ্ডের যে সরু গলার অংশটা মালয় উপদ্বীপে মিশিয়াছে, সিঙ্গোরা ও পাটানি সেই অংশটারই পূর্ব্ব তীরে। থাইল্যাণ্ড প্রায় বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করে। জাপানীরা সিঙ্গোরা ও পাটানি বন্দর হইতে মালয়ের পশ্চিম তীর অভিযাত্রী সৈন্যদের যোগাযোগ ও সরবরাহ রক্ষার সুবিধা পাইল। আবার এই বন্দর দুইটিই ছিল পশ্চিম মালয়ের রেলপথ ও রাস্তার সেতুমুখের মত। আর পূর্ব্বতীরের অভিযানে সরবরাহ ও যোগাযোগরক্ষার বন্দরঘাট ছিল কোটাবারু, যাহা প্রথম আক্রমণেই জাপানীরা দখল করে। রসদ ও সৈন্য ইত্যাদি নামাইবার এই ঘাটগুলি নষ্ট করার জন্যই 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্' ও 'রিপালস' রণতরী প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের নিমজ্জনের দ্বারা সমুদ্রপথে বাধাদান শেষে হইয়া গেল।

যতদূর জানা গিয়াছে, মালয়ে জাপানীরা মোট ৬টি পদাতিক ডিভিসন,

---

* 'The Strategy of Indirect Approach' নামে ক্যাপ্টেন লীডেল হার্টের একটি বিখ্যাত সামরিক গ্রন্থ আছে। তিনি এই বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী যে, পৃথিবীর অধিকাংশ বড় যুদ্ধের মীমাংসা হইয়াছে রণনীতির অপ্রত্যক্ষ আক্রমণ বা অগ্রগতির দ্বারা।

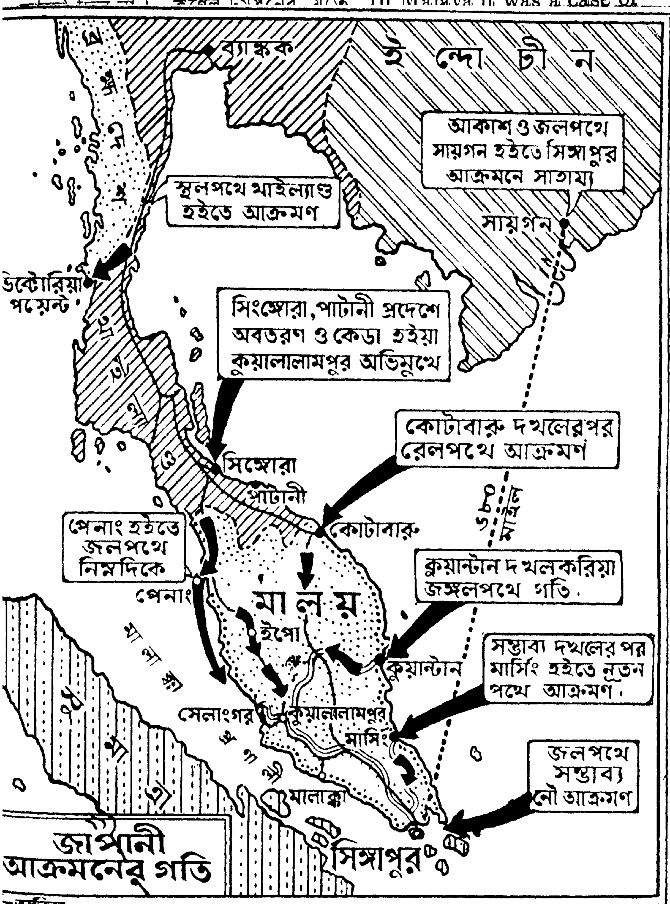
১টি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট (১৫০টি ট্যাঙ্ক) নিয়োগ করিয়াছিল। ২ ডিভিসন ছাড়া বাকি ৪ ডিভিসনই সম্ভবতঃ সিঙ্গোরা ও পাটানি হইতে পশ্চিম তীরাভিমুখী অভিযানে ব্যবহৃত হইয়াছিল। অপর পক্ষে সাম্রাজ্যবাহিনী বোধহয় মোট ৪টি পদাতিক ডিভিসন নিয়োগ করিয়াছিল। সমস্ত ডিভিসনগুলিতেই পুরাপুরি সৈন্যসংখ্যা ছিল বলিয়া মনে হয় না। এইগুলির মধ্যে এক ডিভিসন ছিল বৃটিশ (১৮নং), দুই ডিভিসন ছিল ভারতীয় (৯নং ও ১১নং), এক ডিভিসন ছিল অষ্ট্রেলিয়ান এবং মালয়ী পদাতিক ছিল দুই ব্রিগেড। * কোটাবারুর বিমান ঘাঁটি দখলের পর জাপানীরা যেন মালয়ের 'আকাশ হাতে পাইয়াছিল!' জাপানীরা মোট ৩০০ বিমান নিযুক্ত করিয়াছিল, উহার মধ্যে বোধহয় এক তৃতীয়াংশ ছিল জঙ্গীবিমান। মিত্রপক্ষের এই দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। সৈন্য সংখ্যার বিচারে জাপানীরা যে খুব অতিরিক্ত বেশী সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল, এমন নহে। কিন্তু এই সৈন্যদলকে যেভাবে সমাবেশ করা হইয়াছিল, তাহাতেই মিত্রবাহিনী ঠকিয়াছে এবং ইহাও রণকৌশলের একটা বড় ভুল বলা যাইতে পারে। জাপানীরা থাইল্যাণ্ডে ও মালয়ের (কেডা জেলা) অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশে অনবরত সৈন্য পাঠাইতে থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাহিনীর সৈন্যদল গোটা মালয় উপদ্বীপের প্রায় সমস্ত অংশে ছড়ানো ছিল। কর্ণেল টমসনের † মতে বোধহয় এক ডিভিসন ভারতীয় সৈন্য উত্তর দিকে কোটাবারুর বিমানঘাঁটি ও সন্নিহিত সমুদ্রতীর রক্ষা করিতেছিল। অষ্ট্রেলিয়ান ডিভিসনসহ অধিকাংশ সাম্রাজ্যসৈন্যই ছিল দক্ষিণ জহোর রাজ্যে, এমন কি সিঙ্গাপুরে পর্য্যন্ত। সুতরাং জাপবাহিনীর সহিত যখন প্রথম সংঘর্ষ সুরু হইল, তখন রণক্ষেত্রগুলিতে জাপানীরা স্বভাবতঃই সংখ্যাশক্তির শ্রেষ্ঠতা পাইল। রণক্ষেত্রের সংঘর্ষের সময় সৈন্যে ও অস্ত্রে সংখ্যাধিক্য লাভ আক্রমণকারীর পক্ষে রণনীতিসম্মত এবং এই রণনৈতিক সুবিধা ছিল জাপানীদের।

রণকৌশলের দিকে মালয় অভিযান জঙ্গল যুদ্ধের চমৎকার নিদর্শন ছিল। মালয়ের বিভিন্ন নদীপথ ও জলপথগুলিকে যোগাযোগ ও গতিশীলতা রক্ষার (Communications and Movement) জন্য খাটানো হইয়াছিল। উত্তর

* Hutchinson's 'Quarterly Record of the War', Vol. 10—সিঙ্গাপুরেও এই ডিভিসনগুলি যুদ্ধ করিয়াছিল।

† 'How the Jap Army Fights'—তিন জন মার্কিণ অফিসার লিখিত।

চীনে জাপানীরা সম্মুখ-সংগ্রামের যে মত্ততা দেখাইয়াছিল, মালয়ে তাহা
... ছিল না। কর্ণেল টমসনের মতে 'In Malaya it was a case of



কপিরাইট, যুগান্তর

* ১৯৪২ সালে বাঙ্গলা দেশে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নৌকা ও জেলে ডিঙ্গির অপসারণ ও পরবর্ত্তী বৎসরে মৎস্য ও অন্নসঙ্কটের কথা পাঠকেরা মালয়ের প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারেন।

১টি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট (১৫০টি ট্যাঙ্ক) নিয়োগ করিয়াছিল। ২ ডিভিসন ছাড়া

Hutchinson's 'Quarterly Record of the War', Vol. 10—সিঙ্গাপুরেও এই ডিভিসনগুলি যুদ্ধ করিয়াছিল।

† 'How the Jap Army Fights'—তিন জন মার্কিণ অফিসার লিখিত।

চীনে জাপানীরা সম্মুখ-সংগ্রামের যে মত্ততা দেখাইয়াছিল, মালয়ে তাহা আদৌ ছিল না। কর্ণেল টমসনের মতে, 'In Malaya it was a case of constant *infiltration* and constant *small-scale envelopment*,' মালয়ের যুদ্ধ ছিল সর্ব্বদা 'অনুপ্রবেশ' এবং সর্ব্বদা 'ক্ষুদ্র আকারে পার্শ্ববেষ্টনের যুদ্ধ।' এই বেষ্টন কৌশল আবার ঘটিয়াছিল জল ও স্থলের সমন্বয়ে। এই অভিনব বৈশষ্ট্যের আরও বিশেষত্ব এই যে, সাধারণতঃ সমুদ্রপারের অভিযানে যেমন বড় বড যুদ্ধজাহাজ বা নৌবহরের পাহারায় ও কামান শ্রেণীর গোলা নিক্ষেপের আড়াল ধরিয়া সৈন্যদলের অবতরণ ঘটিয়া থাকে, মালয়ে তেমন কিছু ঘটে নাই। পূর্ব্বতীরে কোটাবারুর প্রাথমিক অবতরণে জাহাজের কিছুটা সাহায্য ছিল বটে, কিন্তু পশ্চিম তীরে জাপ নৌবহরের কোন সহযোগিতা ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে সৈন্যেরা অবতরণ করিতেছিল। এখানে মনে রাখা দরকার বাঙ্গলা দেশের মত মালয়েও মাছ ও ভাতই প্রধান খাদ্য। জাপ অভিযানের সময় ধানগুলি পাকিয়াছিল, সুতরাং ক্ষেতের মধ্য দিয়া অভ্যন্তর ভাগে অগ্রসর হইবার তেমন বাধা ছিল না। আর মাছের জন্য তাহাদের অভিযান ত্বরান্বিত করছিল! কেন না মাছ ধরিবার জন্য জেলেও যেমন যথেষ্ট ছিল, জেলে ডিঙ্গিও তেমন ছিল প্রচুর। জেলেদের কাছ হইতে এই সমস্ত ডিঙ্গি ও নৌকা কাড়িয়া লইয়া জাপানীরা পশ্চিম তীরের সৈন্য অবতরণে ও চলাচলে প্রয়োগ করিয়াছিল। * এই সমস্ত জেলে ডিঙ্গিবহর জাপানীরা চতুরের মত অন্যভাবেও লাগাইয়াছিল। তাহারা সমুদ্রের জেলে ডিঙ্গির মধ্যে মিশিয়া যাইত। ফলে, তীর হইতে তাহাদিগকে লক্ষ্য করা যাইত না, কিম্বা গুলী করাও যাইত না। কখনও কখনও তাহারা তীরের কাছে আসিয়া উপকূলরক্ষীদের তাড়া খাইয়া দূর সমুদ্রে গোলাগুলীর বাহিরে চলিয়া যাইত এবং জেলে ডিঙ্গীদের সঙ্গে মিশিয়া দিব্যি 'মৎস্য চুরি' করিত! (প্রত্যক্ষদর্শীদের এই বিবৃতিতে মনে হয় যে, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র বর্ণিত ইহা যেন শ্রীকান্তের মৎস্যাভিযান পর্ব্ব ছিল!) কিছু কিছু মোটরচালিত ও বিশেষভাবে নির্ম্মিত অবতরণযান তাহারা সিঙ্গোরা বন্দর হইতে ভূমিপথে পশ্চিম তীরেও লইয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশী নৌকা, লঞ্চ, মোটর বোট ও বার্জ্জ ইত্যাদি

---

* ১৯৪২ সালে বাঙ্গলা দেশে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নৌকা ও জেলে ডিঙ্গির অপসারণ ও পরবর্ত্তী বৎসরে মৎস্য ও অন্নসঙ্কটের কথা পাঠকেরা মালয়ের প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারেন।

অবতরণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। অধিকাংশ সময়েই তাহারা রাত্রিবেলা চুপে চুপে অবতরণ করিত এবং এক জায়গায় বাধা পাইলে, উপরে বা নীচের দিকে অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে নামিবার চেষ্টা করিত। ইহাই ছিল প্রধানতঃ অবতরণ কৌশল ও অনুপ্রবেশ নীতি।

পশ্চিম তীরের উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি রাস্তা ও রেলপথ ধরিয়াই জাপানীরা অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু কার্যতঃ যুদ্ধগুলি সড়ক ধরিয়া ঘটে নাই, ঘটিয়াছে এই সমস্ত সড়কের সন্নিহিত মাঠ ও জঙ্গলে। দক্ষিণ দিকের রাস্তাগুলিতে রবারের গাছ সুবিন্যস্ত অরণ্যের মত রক্ষিত ছিল এবং এগুলির মধ্যে যদিও কোন যানবাহন প্রবেশের সম্ভব ছিল না, তথাপি অনেক অলিগলি ও পথ ছিল। জাপানীরা এই সমস্ত পথেই প্রবেশ করিয়াছিল। মালয় শ্রমিকদের মত তাহাদের পরণে ইউনিফর্ম্ম ছিল। ফলে, অনেক সময় তাহাদিগকে সহসা চিনিতে পারা যায় নাই। তাহাদের স্বল্প পোষাকের মত অস্ত্রশস্ত্রও অত্যন্ত হাল্কা ছিল। সাধারণতঃ টমিগান ও মর্টার এবং যথেষ্ট পরিমাণ গুলীবারুদ সঙ্গে লইয়া চলিত। খাদ্যদ্রব্যও তাহাদের সামান্য থাকিত। এক মুঠা ভাত হইলেই তাহাদের চলিয়া যাইত এবং প্রয়োজনমত জোরপূর্ব্বক মালয়ীদের কাছ হইতে খাদ্য, জীবিত পশু, জুতা বা সাইকেল জোগাড় করিত। মালয়ে কলা ও পেঁপে অফুরন্ত, এগুলির সদ্ব্যবহার করিতেও জাপানীরা কার্পণ্য করে নাই। একবার ১২ জন ইংরাজ সৈন্য থাইল্যাণ্ডের সীমান্তে দল ছাড়া হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহারা জঙ্গলের মধ্য দিয়া ২০০ মাইল অতিক্রম করিবার সময় কেবল মাত্র কলা ও পেঁপে খাইয়া বাঁচিয়াছিল!

মালয়ের এই অভিনব জঙ্গলযুদ্ধে সমষ্টিগত অপেক্ষা ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ওস্তাদিরই বেশী প্রয়োজন ছিল। এমন কি মালয়ের বৃটিশ সেনাপতিও তাহা প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, 'The Japanese are very formidable opponents. They combine the cunning and resourcefulness of the tribesmen of the North-West Frontier of India with the discipline and direction of a modern army.' * জাপানীরা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ শত্রু। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাহাড়িয়াদের ধূর্ত্ততা ও উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে আধুনিক সৈন্যবাহিনীর নিয়ম-শৃঙ্খল ও পরিচালনা একত্রে যুক্ত হইলে যাহা দাঁড়ায় মালয়ের জাপসৈন্যরা

* 'How the Jap Army Fights'—তিনজন মার্কিণ মিলিটারি অফিসারের লিখিত।

তাহাই। নিঃসন্দেহে মালয়ের সর্ব্বত্র জাপানীরা ফন্দিবাজী, ধূর্ত্ততা ও উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে। যে অল্প কয়েকজন জাপানী এই দেশে ছিল, তাহাদের কেহবা ক্ষৌরকাররূপে, কেহবা জেলে সাজিয়া তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে। এই সমস্ত 'গাইডের' সাহায্যে তাহারা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ চিনিয়া গিয়াছে। বিস্তৃত ও বিশদ মানচিত্রের সাহায্যে যাহা না হইত, 'গাইডের' দ্বারা তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ হইয়াছে। তাহারা গাছে চড়িয়া আড়াল হইতে চোরাগোপ্তা গুলী চালাইয়াছে, প্রয়োজনমত নদী সাঁতরাইয়াছে, জঙ্গলের মধ্য দিয়া বন্যপশুর মত অনায়াসে ঢুকিয়া গিয়াছে, সাইকেলযোগে রাস্তা অতিক্রম করিয়াছে, নৌকার সাহায্যে সমুদ্রের ধারে অবতরণ করিয়াছে—এই সমস্তই অভিনব কৌশল ও বুদ্ধির কথা। ইহার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাহিনীর সৈন্যেরা আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, মাঝে মাঝে এই 'অনুপ্রবেশ' নীতিতে বাধা দিতে গিয়া তাহারা ঝোঁপ-জঙ্গল হইতে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ব্যর্থ হইয়াছে। জাপ সৈন্যেরা জঙ্গল যুদ্ধে যেমন মিত্র সৈন্যদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছিল, তেমনই সেই সুযোগে পশ্চিম তীর ধরিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্যবাহিনীর ক্রমাগত পশ্চাতে (rear) অনুপ্রবেশ ও পার্শ্বদেশ (flank) বেষ্টন সম্ভাবনার দ্বারা জাপানীরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিল যে,ক্রমাগত 'withdrawal' বা পিছুহটা ছাড়া আর কোন উপায় রহিল না। দুই সপ্তাহে তাহারা দুইশত মাইল পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল ! অথচ মালয়ের যুদ্ধে জাপানীরা গোলাগুলী ও কামানের তেমন কোন ব্যবহার করে নাই। কয়েকখানা হাল্কা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও কোনও আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রামের পর্য্যায়ভুক্ত ছিল না। জঙ্গল যুদ্ধের এই অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে ছোট ছোট দলের দ্বারা, এমন কি ব্যক্তিগতভাবে এক একজন সৈন্যের দ্বারাও। তাহাদিগকে বলা হইত, 'অমুক স্থান' বা 'অমুক বিষয়' তোমার লক্ষ্যস্থল, সেখানে যাও। সৈন্যেরা এইভাবে যেন পিপীলিকার মত জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া যাইত ও ছড়াইয়া পড়িত। তাহারা পার্শ্বদেশ ছাড়া সম্মুখভাগ আক্রমণ করে নাই এবং তেমন কোন গুরুতর বেয়নেট আক্রমণও করে নাই।

এই অভিনব জঙ্গল যুদ্ধে বিভ্রান্ত, বিহ্বল এবং ক্লান্ত ও পরাজিত হইয়া সাম্রাজ্যবাহিনী একবারে সরিয়া গেল জহোরবারুতে যেখানে সুরু হইয়াছে সিঙ্গাপুরের সীমানা। সেখানে ৩১শে জানুয়ারী তারিখ মালয় যুদ্ধের অবসান ও সিঙ্গাপুর সংগ্রামের আরম্ভ হইল।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ সিঙ্গাপুরের পতন

—১—

দুই সমুদ্রের দুর্গদ্বার

৩০শে জানুয়ারী, '৪২।

সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আজ একটি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ। এই কেন্দ্রের নাম সিঙ্গাপুর। আধুনিক কালের ইতিহাসে ইহা প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। বিগত শতাব্দীতে ১৮১৮ সালে স্যার ষ্টামফোর্ড র‍্যাফলার নামক জনৈক ইংরাজ যখন এই ম্যালেরিয়া আধ্যুষিত দ্বীপে সিঙ্গাপুর সহরের পত্তন করেন, তখন বোধ হয় তিনি কল্পনাও করেন নাই যে, একদা ভাবীকালের পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাষ্ট্রশক্তিগুলি এই সিঙ্গাপুরে মহাযুদ্ধের শিঙ্গা বাজাইবে! প্রশান্ত মহাসমুদ্র ও ভারত মহাসমুদ্র, এই দুই মহাসাগরের নৌ-দুর্গ সিঙ্গাপুর। বৃটেনের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের নৌ-সংগ্রামের রণনীতি এই দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সহরের পত্তন একজন সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা, কিন্তু অসাধারণ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যবসায়িগণ ইহাকে বিলাসের খ্যাতি দিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের আগে এবং কিছু পরেও ইহা ছিল রূপসীদের লীলাকেতন এবং উচ্ছৃঙ্খল ধনীদের আড্ডা। বহু ছায়াচিত্রে সিঙ্গাপুরের বন্দরের নাবিক ও নাগরিকদের বিলাস-রজনীর দৃশ্য দেখা গিয়াছে। টিন ও রবারের ব্যবসা করিয়া এখানকার ইউরোপীয়গণ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। যদিও শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা এখানে মুষ্টিমেয়, তথাপি ইহাদের প্রত্যেকেই টাকার কুমীর। বাসিন্দাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন চীনা, ৮জন ভারতীয় এবং ১২জন মালয় দেশীয়। চীনাদের মধ্যে কয়েকজন বড়লোক আছেন, কিন্তু দেশীয়দের দুর্দ্দশা আমাদের ভারতবর্ষের সাধারণ লোকদের মতই, তাহারা দরিদ্র মজুর মাত্র। আজ জাপানের দৃষ্টি পড়িয়াছে এই সিঙ্গাপুরের উপর। কেবল সামরিক লাভের জন্যই নহে, অর্থনৈতিক সম্পদ এখানে অপরিমিত। জন্তু-জানোয়ার, অরণ্য এবং টিন-রবারের ঐশ্বর্য্যে মালয় উপদ্বীপ যে কোন ধনিক রাষ্ট্রের পক্ষেই লোভনীয়। বৃটেন ও আমেরিকার প্রায় সমস্ত রবার ও টিনই সিঙ্গাপুর হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। গত বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে একমাত্র মার্কিণ গভর্ণমেণ্টই সিঙ্গাপুর হইতে ৭৫ হাজার টন টিন এবং ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টন রবার সরবরাহের জন্য ফরমায়েস দিয়াছিলেন! ইহা হইতেই সিঙ্গাপুরের

ঐশ্বর্য্য ও অর্থ নৈতিক গুরুত্ব অনুভূত হইবে। সিঙ্গাপুরের পতনের দ্বারা সমস্ত রবার ও টিন সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইবে।

যুদ্ধের ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে উহার মূলে একটা প্রকাণ্ড অর্থনৈতিক কারণ রহিয়াছে। প্রাচীনকালে উহার নাম ছিল লুণ্ঠন। ভারতবর্ষ মণিমাণিক্য ও মসলিনের দেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সুতরাং 'শক হুন দল পাঠান মোগল' হইতেই ইংরাজ-ওলন্দাজ পর্য্যন্ত সকলেই এক একবার ভারত ভূমিতে হানা দিয়াছেন। প্রাচীনকালে যাহা দস্যুতা ও লুণ্ঠন নামে অভিহিত হইত আজ উহারই ভদ্রনাম হইয়াছে economic expansion অর্থাৎ অর্থ নৈতিক রাজ্যবিস্তার। বড় বড় বুলি ও তত্ত্বকথার আবিষ্কার হইয়াছে বটে, কিন্তু আসলে যুদ্ধের একটা বড় কারণ যে লুণ্ঠন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই লুণ্ঠন যখন ভদ্রভাবে এবং সঙ্ঘবদ্ধ আকারে দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকে, তখন রাজনৈতিক পরিভাষায় উহাই শোষণ নাম ধারণ করে। জাপানের বর্ত্তমান আক্রমণের পিছনে রহিয়াছে এই শোষণের সুযোগ লাভ। জার্ম্মাণ রণপণ্ডিত ক্লজউইজ এই তথ্য প্রচার করিয়াছিলেন যে, গরীব দেশ আক্রমণ করিয়া লাভ নাই, কারণ যুদ্ধের খরচ পোষায় না! অর্থাৎ আক্রমণ ও দখল করিতে হইলে ঐশ্বর্য্যশালী দেশের দিকে নজর দাও। কারণ, যুদ্ধের খরচও পোষাইবে এবং ভবিষ্যতে কুবেরের ভাণ্ডারও পূর্ণ হইবে। রণনীতিকে এই অর্থনীতির মানদণ্ডে বিচার করিলে ব্রহ্মদেশ, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই জাপানের লক্ষীভূত বলিয়া ধরা যায় এবং সিঙ্গাপুরের নৌ-দুর্গ ঠিক এই মর্ম্মকেন্দ্রে দণ্ডায়মান। সুতরাং উহার গুরুত্ব কে অস্বীকার করিবে?

এই দ্বীপদুর্গ নির্ম্মাণের কাহিনী অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বলিতে পারা যায় যে, সিঙ্গাপুর নৌঘাঁটির নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় ১৯২৩ সালে। ১৯২৪ সালে বিলাতে শ্রমিক গভর্ণমেন্টের আমলে নির্ম্মাণ-কার্য্য স্থগিত থাকে। তারপর রক্ষণশীল দল পুনরায় ক্ষমতা লাভ করিলে নির্ম্মাণ-কার্য্য পুনরারম্ভ হয়। একমাত্র নৌঘাঁটিটি নির্ম্মাণ করিতেই ১ কোটি ১২ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড খরচ হয়। এতদ্ব্যতীত পাকা গাঁথুনী, বিমানশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণে যে খরচ হয় তাহা ধরিলে মোট খরচের পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়ায়। ১৯৩৯ সালে নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সিঙ্গাপুরের পোতাশ্রয়টির স্থান দ্বিতীয়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম পোতাশ্রয় হইতেছে

সাদাম্পটনের কিং জর্জ্জ দি ফিফ্‌থ পোতাশ্রয়। সিঙ্গাপুরের পোতাশ্রয়ে বৃহত্তম রণপোত আশ্রয় লইতে পারে। এখানে একটি ভাসমান পোতাশ্রয় আছে, তাহাতে ৫০ হাজার টনের জাহাজ ধরে। উপকূলভাগে কামান-শ্রেণীতে ১৫ ইঞ্চি ও ১৮ ইঞ্চি মুখের কামান আছে। এই কামানই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। এখানে জাহাজ চালাইবার যে সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত ছিল তাহাতে পৃথিবীর যে কোনও রণবহরের ছয় মাস চলিতে পারে। তৈলের ট্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই মাটির তলায়। মাটির তলায় বহু অস্ত্র-ভাণ্ডারও আছে। উপকূল ভাগস্থ অধিকাংশ পাহাড় কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা। ১৯২৩ সালে সিঙ্গাপুর-জহোর সেতুটিও নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সিঙ্গাপুরকে দুর্ভেদ্য নৌ-দুর্গরূপে গড়িয়া তুলিয়া বৃটেন প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরকে জাপ আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিবারই প্ল্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল একটিমাত্র প্রকাণ্ড রকমের নৌঘাঁটি ও নৌদুর্গের দ্বারাই রণনৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করা যায় না। উহাকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে যে সমস্ত নৌঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই ঘাঁটিগুলিও যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিশালী হওয়া দরকার এবং সেই ঘাঁটিগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত নৌবহর ও বিমানবহরের প্রয়োজন। ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডে কতকগুলি ঘাঁটি আছে বটে, কিন্তু সেই ঘঁটিগুলি জাপানের মত শক্তিশালী নৌ-যোদ্ধার আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে কিনা, তাহাই বিচার্য্য। বৃটিশ রণনীতিবিদগণ সিঙ্গাপুরকে দুর্ভেদ্য নৌদুর্গে পরিণত করিয়া বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সেই বুদ্ধি সর্ব্বত্র প্রসারিত হয় নাই। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে কেবলমাত্র পরাধীন রাজ্যরূপে এবং অষ্ট্রেলিয়াকে কেবল-মাত্র ডোমিনিয়ান হিসাবে না দেখিয়া যদি প্রচুর যুদ্ধ-জাহাজ, বিমানবহর এবং অন্যান্য আধুনিক অস্ত্র ও যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত করা হইত, তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া ১০ হাজার মাইল ও ভারতবর্ষ ৬ হাজার মাইল দূর হইতে বৃটেনের নিকট কিম্বা ৮ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট করুণ আবেদনের জন্য অপেক্ষা করিত না। ডোমিনিয়ান ও সাম্রাজ্য চলিতেছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এবং এই সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বুদ্ধি আজ ধাক্কা খাইতেছে রণনীতির অদূরদর্শিতার মধ্যে। কেবল একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিয়া বাকি অংশগুলিকে পরমুখাপেক্ষী করিয়া রাখিলে বিপদের গুরুত্ব সহজেই বাড়িয়া যায়। কারণ, সেই একটিমাত্র কেন্দ্রের পতন হইলে বাকি



অখিল মুখার্জী চিত্রিত।

অংশগুলি আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। আধুনিক যুদ্ধের আক্রমণ চলে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত ক্রমাগত আঘাতের দ্বারা। এই রণকৌশলকে রোধ করিতে হইলে ঠিক পর পর আত্মরক্ষার কতকগুলি শক্তিশালী ঘাঁটির প্রয়োজন—কেবল একটিমাত্র দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রচারিত ঘাঁটির নহে। জলপথে যুদ্ধ-জাহাজের সহিত স্থলপথে ট্যাঙ্ক ও আকাশপথে এরোপ্লেন সম্মিলিত হওয়ায় ১৯১৪-১৮ সালের রণনৈতিক ধারণার প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের রণনীতি প্রসারিত বা প্রাণপ্রদ হয় নাই। সুতরাং আজ সিঙ্গাপুরে প্রচণ্ড আঘাত হানিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূকম্পের আলোড়নের মত অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইনের মাটি কাঁপিয়া উঠিতেছে! অথচ অষ্ট্রেলিয়ার পোর্ট ডারুইন কিম্বা ভারতবর্ষের কলিকাতা সিঙ্গাপুর হইতে দেড় হাজার মাইল কিম্বা তাহারও অধিক দূরে! বৃটিশ রণনীতিবিদগণ কি পূর্ব্বে এই পরিণতির কল্পনা করিতে পারেন নাই? যদি সিঙ্গাপুরের পতন হয়, তবে জাপানী নৌবহর ও বিমানবহর অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষের সমুদ্রপথে যেমন অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই উপস্থিত হইতে পারিবে, তেমনই প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবে এবং সুয়েজখাল ও এডেনের পর প্রাচ্য সীমানার সমগ্র নৌপথ জাপানীদের আওতায় আসিবে। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সমুদ্রপথের নির্ব্বিঘ্ন যোগাযোগের উপরেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি। সেই ভিত্তির মূলে আজ জাপান আঘাত হানিতেছে এবং সিঙ্গাপুর এই আঘাতের মর্ম্মকেন্দ্র। সুতরাং সমস্ত মানুষের দৃষ্টি আজ এই নৌদুর্গের উপর।

—২—

সিঙ্গাপুরের সংগ্রাম

৩১শে জানুয়ারী, '৪২।

জাপানীরা অতি দ্রুত সিঙ্গাপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। জহোর রাজ্য ও সিঙ্গাপুর দ্বীপের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ প্রণালী আছে এবং যাহার উপর দিয়া একটি বাঁধানো সেতুপথ চলিয়া গিয়াছে, একদিন আগে জাপবাহিনী

সেই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মাত্র ১৮ মাইল দূরে ছিল। কিন্তু আজ সেই ব্যবধানও ঘুচিয়া গিয়াছে। সিঙ্গাপুরের বৃটিশ সেনাপতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, মালয় ও জহোর রাজ্যের যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে খাস সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ সুরু হইল। সিঙ্গাপুরের দ্বীপ ও দুর্গ এক্ষণে প্রত্যক্ষ স্থলপথের আক্রমণে রণক্ষেত্রে পরিণত হইল। 'পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনীকে দক্ষিণ জহোর হইতে সরাইয়া সিঙ্গাপুর দ্বীপে আনা হইয়াছে। জহোর ও সিঙ্গাপুরের সেতু সাফল্যের সহিত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। (৩০শে জানুয়ারী রাত্রিবেলা)* শত্রুপক্ষ ইহাতে কোন বাধা দেয় নাই। প্রায় দুই মাস ধরিয়া বৃটিশবাহিনী মালয়ে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু বিমানশক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং নৌপথে অবাধ গতির সুযোগ শত্রুকে যথেষ্ট সুবিধা দিয়াছে। এক্ষণে প্রাচ্যখণ্ডের এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অবরুদ্ধ সিঙ্গাপুর দ্বীপের দুর্গকেন্দ্রে আরম্ভ হইল। যতক্ষণ না আমরা অধিকতর সাহায্য পাই, ততক্ষণ শত্রুকে ঠেকাইয়া রাখাই আমাদের কর্ত্তব্য।'—ইহাই সিঙ্গাপুর হাই-কমাণ্ডের বাণী।

* এই সেতু ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী যাহা বলিতেছেন, তাহার মর্ম্ম এই—চমৎকার চন্দ্রালোকিত রাত্রি, সারা রাত ধরিয়া দলে দলে সৈন্য, ব্রেনগানবাহী যান, গোলাগুলী, মালপত্রবাহী যানবাহন, এম্বুলেন্স গাড়ী প্রভৃতি সেতুপথের উপর দিয়া চলিয়াছে। ভোরবেলা পৃষ্ঠরক্ষী সৈন্যেরা আসিল। এই পশ্চাদপসরণের ব্যাপারে সেতুর অপর প্রান্ত রক্ষা করিতেছিল গরডন হাইল্যাণ্ডার্স ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যরা যাহারা মুয়ার নদী তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধ সহ্য করিয়াছিল। এই পৃষ্ঠরক্ষীরাও পিছনে হটিয়া গেল। তখন কয়েক মিনিট ধরিয়া সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। রূপালী জ্যোৎস্নায় জহোর প্রণালীর জল চক্ চক্ করিতেছিল। সেতুর দূরপ্রান্ত যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে জহোর বারু—সুলতানের রাজধানী। এই রাজধানীর নূতন অট্টালিকা চন্দ্রালোকে ছায়াচিত্রের পটভূমিকার মত দেখাইতেছিল। আমাদের পথ পরিষ্কারকদল সেতুটি যখন উড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন দেখা গেল দুইটি ছায়ামূর্ত্তি প্রাণপণে দৌড়াইয়া আসিতেছে। তাহারা মালয়ী, শেষ মুহূর্ত্তের সুযোগ যেন মরিয়া হইয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

অবশেষে সেতুটি উড়াইয়া দেওয়ার হুকুম হইল। দুইটি প্রকাণ্ড বিস্ফোরণ হইল। উত্তর প্রান্তের যেখান দিয়া জাহাজ যাতায়াত করিত, সেখানকার ইস্পাতের তৈয়ারী lock system ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় বিস্ফোরণের দ্বারা প্রধান সেতুপথের একটি বৃহৎ অংশ উড়াইয়া দেওয়া হইল। ৬০ ফুট লম্বা ফাঁকের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী সিঙ্গাপুর সহরেও শুনা গেল এবং সমগ্র জহোর তীর কাঁপিয়া উঠিল।

—লণ্ডনের 'ডেলী টেলিগ্রাফ' প্রকাশিত 'Story of the War,' দ্বিতীয় খণ্ড।

দক্ষিণ চীন-সমুদ্র ও থাইল্যাণ্ড হইতে ৭ সপ্তাহ ধরিয়া জাপানীরা মালয়ের যুদ্ধ চালাইতেছে। সেখানকার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এত দুর্ব্বল, ইহা আগে টের পাওয়া যায় নাই। সুতরাং যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ অনুমান করিয়াছিলেন যে, টোকিও হইতে মালয় ও ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে ও শেষ করিতে দীর্ঘ সময় লাগিবে এবং ৬ মাস হইতে ১ বৎসরের আগে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই সংগ্রাম শেষ হইবে না, তাঁহাদের সেই অনুমান আজ ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। অনেক সময় পুঁথি-পত্র ও থিওরি ধরিয়া যুদ্ধ চলে না। সময় ও অবস্থার উপর ইহার গতি নির্ভর করে। জাপান যখন ডিসেম্বর মাসে অতর্কিত আক্রমণ আরম্ভ করে, তখন রণনীতির দিক হইতে জাপানের পক্ষে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় ছিল। রাশিয়া ও বৃটেন বিব্রত এবং আমেরিকা অসতর্ক ছিল। জাপানী আক্রমণের আগে বিশেষজ্ঞগণ ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, গুয়াম্, ওয়েক ও ফিলিপাইন দ্বীপ আমেরিকার হাতেই থাকিবে এবং সেখান হইতে মার্কিণ নৌবহর ও বিমানবহর দক্ষিণ চীন-সমুদ্রে জাপানী শক্তির বিরুদ্ধে অবিলম্বে পাণ্টা আক্রমণ চালাইয়া জাপানকে বিপদে ফেলিবে। ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর হইতে বৃটিশ নৌবহর হংকংয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া মার্কিণ নৌবহরের সহায়তায় জাপানকে ঘায়েল করিবে। থিওরী হিসাবে এই রণনৈতিক পরিকল্পনা চমৎকার ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার কিছুই ঘটিল না। জাপান এক সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে বৃটেন ও আমেরিকার সমস্ত ঘাঁটির উপর একযোগে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে এবং এমন একটা মুহূর্ত্তে আঘাত হানিয়াছে যে, জাপানকে বাধা দেওয়ার সমস্ত দ্বীপ, ঘাঁটি ও বন্দর ইত্যাদি অতি দ্রুত হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী পরিকল্পনাও চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তবে, সমর বিশেষজ্ঞগণ যে সমস্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আজ সত্য হইতে চলিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, হংকং হাতছাড়া হইলে দক্ষিণ চীন-সমুদ্রে জাপ নৌবহরের আধিপত্য ঘটিবে। কারণ, এখান হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত ১৪০০ মাইল সমুদ্রপথ মুক্ত হইবে এবং ম্যানিলা, গুয়াম ও ওয়েক দ্বীপের পতন হইলে মার্কিণ নৌবহর অচল হইয়া পড়িবে। ইহার ফলে বৃটিশ ও মার্কিণ নৌবহর কোনও কেন্দ্রে পরস্পরের সহিত মিলিতে পারিবে না এবং জাপান তিন দিক হইতে সিঙ্গাপুর বেষ্টন করিবে। কিন্তু আজিকার অবস্থা এই পরিকল্পনার চেয়েও শোচনীয়। কারণ, সিঙ্গাপুরকে চারিদিক দিয়াই ঘিরিয়া ধরা হইতেছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের

কারণ ঘটিয়াছে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণের জন্য। রণনীতির জটিল তত্ত্বে প্রবেশ না করিয়াও সাধারণ বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝা যায় যে, পশ্চাৎভাগ হইতে আক্রমণ সর্ব্বদাই ভয়াবহ। সিঙ্গাপুর নৌঘাঁটি ও নৌদুর্গ—উহা ম্যাজিনো লাইনের মত সুরক্ষিত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা নৌযুদ্ধের নৌ-দুর্গকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। উহার সম্মুখভাগ এবং দুই পার্শ্বের উপরই নজর রাখা হইয়াছিল। সিঙ্গাপুরের তীরভূমিতে শ্রেণীবদ্ধ দূরপাল্লার কামান, মেসিনগানের ঘাঁটি, বিমানঘাঁটি, দুর্গের অবস্থান এবং জলপথে মাইনের বেড়াজাল ইত্যাদি লক্ষ্য করিলেই এই তথ্য স্পষ্ট হইবে। কিন্তু মালয়ের ভিতর ঢুকিয়া জহোর রাজ্য পার হইয়া পশ্চাৎ হইতে সিঙ্গাপুরকে স্থলপথের মারণযন্ত্রের দ্বারা আঘাত হানা হইবে, সিঙ্গাপুরের নৌযোদ্ধা ও নৌশিল্পীগণ এই ধারণা করেন নাই। ইহারই জন্য একখানি বিদেশী পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন যে, মালয়ের ভিতর দিয়া সিঙ্গাপুরকে আক্রমণ যুদ্ধের ইতিহাসে একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার হইবে। দুর্গ-প্রাকারের স্থিতিশীল যুদ্ধ আজ গতিশীল যান্ত্রিক সংগ্রামের পাল্লায় পড়িয়াছে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সিঙ্গাপুরের নিকট আজও জাপ নৌবহর সন্নিবেশের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অথচ সিঙ্গাপুর নৌদুর্গের অবস্থা ইতিমধ্যেই বিপন্ন হইয়াছে। ইহার কারণ কি? যে নৌ-রণনীতি কেন্দ্র করিয়া সিঙ্গাপুরকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নূতনতর যান্ত্রিক রণ-কৌশলের মুখে পড়িয়াছে এবং জাপানী রণপরিকল্পনা অগ্রসর হইয়াছে সিঙ্গাপুরের চারিদিকস্থ দ্বীপ, উপদ্বীপ, স্থলপথ ও জলপথ পরিবেষ্টনের দ্বারা। ইন্দোচীন জাপানের আওতায় যাইবার পরেই বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সচেতন হওয়া উচিত ছিল। তাঁহাদের বুঝা উচিত ছিল যে, বিপদের প্রথম সঙ্কেত ওখান হইতেই পাওয়া যাইতেছে। সেই সময় শ্যামদেশ বা থাইল্যাণ্ডের উপর বৃটিশ সামরিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে আজ এত সহজে পশ্চাৎ হইতে সিঙ্গাপুর বিপন্ন হইত না। মালয়ের যুদ্ধে জাপানীরা মোটামুটি তিন দিক ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের দুই তীর এবং মধ্য মালয়ের মাঝামাঝি পথ। তীরভূমি, রেলওয়ে, রাস্তা, জঙ্গল ও নদী এইগুলি তাহাদের গতিপথে ছিল। আজ সিঙ্গাপুরের উপর তাহারা দক্ষিণ মালয় ও জহোরের তিন দিক ধরিয়াই আক্রমণ করিতেছে। পূর্ব্বতীরস্থ পন্টিয়ান বেসার হইতে কতকগুলি রাস্তা সিঙ্গাপুর ও জহোর বারুর প্রধান সড়কের সঙ্গে মিলিয়াছে। একদল

জাপবাহিনী এই দিক দিয়া অগ্রসর হইতেছে। আর একদল সৈন্য কুলাই হইতে জহোরবারু হইয়া জহোরবারু-সিঙ্গাপুরের উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি রাস্তা ধরিয়া আক্রমণ করিতেছে। তৃতীয় দল পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরিয়া এবং যে রাস্তা জহোরবারুর দিকে গিয়াছে, সেখান দিয়া অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্য—এই তিন দিকের বাহিনী একত্রে সিঙ্গাপুরের দুর্গকে বল্লমের অগ্রভাগের মত বিদ্ধ করিতে চাহিতেছে। শত্রু যখন এত দ্রুত এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে এবং আত্মরক্ষাকারী সমস্ত সাম্রাজ্য-বাহিনী খাস সিঙ্গাপুরে সরাইয়া আনা হইয়াছে, তখন বাধ্য হইয়াই অবরোধ যুদ্ধ চালাইতে হইবে। যতক্ষণ প্রচুর সৈন্য, সমরোপকরণ ও যন্ত্র ইত্যাদি আসিয়া না পৌঁছিতেছে, ততক্ষণ এই অবরোধের মধ্যে থাকিয়া আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নাই। মিঃ চার্চ্চিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, সিঙ্গাপুরের প্রতি ইঞ্চি জমিতে জাপানকে শেষ রক্তবিন্দু দিয়া বাধা দেওয়া হইবে। এজন্য যথোপযুক্ত সাহায্যও প্রেরণ করা হইতেছে। আজ সমগ্র পৃথিবী ইহার ফলাফল দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত।

— ৩ —

সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষা

৫ই ফেব্রুয়ারী, '৪২।

আদিম মানুষকে গিরিগুহাতে আশ্রয় লইতে হইত জন্তু-জানোয়ার এবং শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক 'শত্রু'র হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য। বাহির হইতে আক্রমণ এবং ভিতর হইতে আত্মরক্ষা, এই মূল নীতিরই ক্রমবিবর্ত্তন ঘটিয়াছে মানুষের সহিত মানুষের লড়াইয়ে। আক্রমণ করিতে গেলেও সর্ব্বাগ্রে দরকার আত্মরক্ষা, অর্থাৎ নিজের বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন। আবার আত্মরক্ষার জন্যও শেষ পর্য্যন্ত দরকার হয় পাল্টা আক্রমণের! এই সহজ সূত্র ধরিয়াই যুগে যুগে রণনীতির জটিলতর পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন ঘটিয়াছে এবং ইহার সঙ্গে রাশি রাশি অজস্র রকমের অস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় যুদ্ধের সমস্যা গভীরতর রূপ ধারণ করিয়াছে। আত্মরক্ষার যে স্বাভাবিক বুদ্ধি হইতে আদিম মানুষ গিরিগুহাতে আশ্রয় লইত, সেই বুদ্ধিই ক্রমশঃ

রণনীতির দিক দিয়া কেল্লা ও দুর্গের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে। ইতিহাসে এমন ঘটনা বহু আছে, যখন দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস দুর্গের মধ্যে থাকিয়া সৈন্যেরা আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং শত্রুর অবরোধ বেষ্টনীকে ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিয়াছে। আগেকার দিনে পাথরের তৈয়ারী দুর্গগুলিকে ভাঙ্গা সহজ ছিল না, সেদিনের অস্ত্র সহজে পাথর ভাঙ্গিতে পারিত না। এজন্য শত্রুপক্ষ সর্ব্বদাই দুর্গদ্বারের উপর আক্রমণের এবং উহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বারুদ ও গোলাগুলীর আবিষ্কারের ফলে কেবল দুর্গদ্বার নহে, সমগ্র দুর্গই চূর্ণ হইবার আশঙ্কা দেখা দিল। আবার এই গোলাগুলীকে রোধ করিবার জন্য ইস্পাত, লোহা, কংক্রীট ইত্যাদি বহু প্রকার দ্রব্য ও মালমশলা ক্রমে দুর্গগুলিকে আরও শক্ত এবং দৃঢ় করিয়া তুলিল। দুর্গপ্রাকার ও কেল্লার গাঁথুনি ইত্যাদি কি পরিমাণ পুরু করিলে কত ওজনের গোলাবর্ষণ রোধ করিতে পারিবে—রণনীতির নিকট এমন অনেক সমস্যা দেখা দিল। অর্থাৎ আঘাতের প্রচণ্ডতা এবং আত্মরক্ষার সহনশীলতা এই দুইয়ের ক্রমদ্বন্দ্ব চলিতেছে। সৈন্যের পক্ষে যেমন ইহা সত্য, দুর্গের পক্ষেও ইহা তেমন সত্য। এই দ্বন্দ্বের চরম পরীক্ষা গিয়াছে ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে। মেসিনগানের অজস্র গুলীবর্ষণ এবং বড় বড় কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ—পরিখা ও কেল্লার পরীক্ষা হইয়াছে এই দুইয়ের দ্বারা। এই অভিজ্ঞতা হইতে যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে ফ্রান্সে ম্যাজিনো লাইন তৈয়ারী হইয়াছিল। বোমা ও গোলাবর্ষণের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই নূতনতম দুর্গশ্রেণীকে পাতালপুরীর কেল্লায় পরিণত করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ১৯১৪-১৮ সালে যান্ত্রিক যুদ্ধের বীজ মাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে উহার যে ভয়াবহ পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা তখন অনেকের কল্পনায়ই ছিল না। ফলে, দুর্গগুলির পশ্চাতে যে স্থিতিশীল যুদ্ধের নীতি ও ধারণা বহু যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই বজায় ছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালে হিটলারের দুর্দ্ধর্ষ যান্ত্রিক বাহিনী এই স্থিতিশীল যুদ্ধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেয় এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেডানে তাহারা ফ্রান্সের আত্মরক্ষার ব্যূহ অতি দ্রুত চূর্ণ করিয়া ফেলে। বোমারু বিমানের অগ্রগতির জন্য বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজের মূল্য কতটুকু, ইহা যেমন সমর-বিশেষজ্ঞদের

গবেষণার বিষয়, তেমনই আধুনিক গতিশীল যান্ত্রিক যুদ্ধের যুগে বড় বড় দুর্গ ও কেল্লার প্রয়োজন কতখানি, তাহাও বিতর্কের বিষয়।

কিন্তু সিঙ্গাপুরের সমস্যা কেবলমাত্র দুর্গের নহে, উহার সহিত সমুদ্র সংযুক্ত থাকায় এই প্রশ্নটি কিঞ্চিৎ অভিনব ও জটিল। ফলে এখানকার স্থলপথে যেমন, তেমনই বিমানপথে ও জলপথেও প্রচণ্ড সংগ্রামের কাহিনী আমরা পাইব। সাধারণতঃ দুর্গের সংগ্রাম চলে অবরোধ যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া এবং ইতিমধ্যেই সিঙ্গাপুরে অবরোধ আরম্ভ হইয়াছে। জাপানীরা কি পরিমাণ ট্যাঙ্ক দক্ষিণ মালয়ে আমদানী করিতে পারিয়াছে এবং ট্যাঙ্ক যুদ্ধের কতটা অবসর আছে, তাহা জানা যায় নাই।* তবে, বিমানবহর ও নৌবহরের শ্রেষ্ঠতা তাহাদের অনস্বীকার্য্য। কিন্তু অবরোধ যুদ্ধ কেবল বেষ্টনী হইতে প্রত্যক্ষ আক্রমণ কেন্দ্র করিয়াই চলে না, উহার অন্যতর কৌশল হইতেছে বাহির হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ করা। ইহার মধ্যে জল ও খাদ্যদ্রব্য একটি মস্ত বড় প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই সিঙ্গাপুরে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে—প্রচুর জল ও প্রচুর খাদ্য পাওয়া যাইবে তো? ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক দুর্গের পতন হইয়াছে শুধু এই পানীয় জল ও খাদ্যের অভাবে। সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যদের সংগ্রামশক্তি অটুট থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র সরবরাহের অভাবে বহু দুর্ব্বিপাক আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদলের ঘটিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক দেশের ইতিহাস খুঁজিলেই এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। এই সেদিন হংকংয়ের পতনের মূলেও পানীয় জলের অভাবের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। সিঙ্গাপুরের জহোর প্রণালীর সেতুপথটি ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় জল সরবরাহের পাইপ নষ্ট হইয়াছে। এজন্য কর্ত্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। প্রকাশ যে, এই সমস্যা মিটিয়াছে যথোপযুক্ত কূপ খননের দ্বারা। খাদ্যদ্রব্যও নাকি প্রচুর মজুত হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের অবরোধ এই যান্ত্রিক যুগে দীর্ঘকাল চলিবে বলিয়া মনে হয় না। এখানকার রণনৈতিক প্রশ্ন দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে—জাপান কি পরিমাণ শক্তি লইয়া কত দ্রুত সিঙ্গাপুরের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতে পারিবে এবং বৃটেন কতকাল সেই আঘাত সহ্য করিয়া নূতন অস্ত্র, নূতন সৈন্য ও নূতন মালমশলা আমদানি করিতে পারিবে? বৃটেন ও অষ্ট্রেলিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য প্রতিশ্রুতি

* পরে জানা গিয়াছিল যে, জাপানীরা কিছু মাঝারি ধরণের ট্যাঙ্কও আনিয়াছিল।

ও ভরসা দিয়াছেন যে, অতি দ্রুত সর্ব্বপ্রকারের সাহায্য সিঙ্গাপুরে পৌঁছিতেছে। সিঙ্গাপুরে মিত্রপক্ষ পরাজয় স্বীকার করিবেন না, ইহাই তাঁহাদের পণ। কারণ, সিঙ্গাপুরের পতন হইলে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যে শক্তি জাপান অর্জ্জন করিবে, তাহাতে আগামী দীর্ঘকাল জাপান অপরাজেয় থাকিবে। সুতরাং সমগ্র জগৎ প্রত্যাশা করিতেছে যে, মিত্রপক্ষ সিঙ্গাপুরকে শেষ পর্য্যন্ত অজেয় রাখিবেন।

—৪—

সিঙ্গাপুরে অবতরণ

৯ই ফেব্রুয়ারী, '৪২।

পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার পক্ষে ব্রহ্মদেশ যেমন বাহিরের ঘাঁটি এবং সেই ঘাঁটির পতন হইলে ভারতবর্ষের বিপদ যেমন অনিবার্য্য, তেমনই জলপথে সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার বহির্ঘাঁটি ছিল হংকং। রণনীতিবিদ্‌গণ বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে, হংকংয়ের পতন হইলে বৃটিশ নৌবহরকে দক্ষিণ চীন-সমুদ্র হইতে হটিয়া আসিতে হইবে এবং দূর হইতে জাপ নৌবহরকে বাধা দেওয়ার যে সুযোগ তাহাও বিনষ্ট হইবে। ইহার সঙ্গে স্থলপথে আক্রান্ত হওয়ার ফলে সিঙ্গাপুরের বিপদ চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এক এক স্থানের রণনীতি ও রণ-কৌশল সেই স্থানের অবস্থা (local conditions) ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে। সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছিল সম্মুখের দিকে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে। এই ঘাঁটি নৌপথের আক্রমণ ও আত্মরক্ষাকে লক্ষ্য রাখিয়াই তৈয়ার করা হইয়াছিল। কিন্তু শত্রু আজ আসিয়াছে স্থলপথে এবং একথা বলাই বাহুল্য যে, জলপথেও শত্রুপক্ষ প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিবে। অবস্থার গুরুত্ব আরেক দিক দিয়াও লক্ষ্য করিবার মত। সিঙ্গাপুর একটা বড় দ্বীপ নহে, উহা দৈর্ঘ্যে ২৭ মাইল এবং প্রস্থে ১৪ মাইল মাত্র। এই ছোট ভূমির উপর শত্রুপক্ষ সহজেই তাহাদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করিতে পারিবে। এই যুদ্ধ অত্যন্ত হিংস্র ও ভয়াবহ হইবে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত প্রচণ্ড আক্রমণ ও তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ চলিবে।

সিঙ্গাপুরের অল্পপরিসর ভূখণ্ডের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে জাপ স্থলবাহিনী। জাপানীরা দাবী করিতেছে যে, সিঙ্গাপুরের উপর তাহাদের

সর্ব্বপ্রকার আক্রমণ একযোগে আরম্ভ হইয়াছে এবং কিছু কিছু জাপ সৈন্যও নাকি অবতরণ করিয়াছে। আর একটি প্রশ্ন লক্ষ্য করিবার এই যে, সিঙ্গাপুরে যে তিনটি বিমানঘাঁটি ছিল, সেগুলি কোন কাজেই লাগিতেছে না। কারণ, যে জহোর প্রণালী মাত্র দুই মাইল চওড়া, শত্রু তাহারই অপর পারে। শত্রুর এই নিকটবর্ত্তিতার জন্য সিঙ্গাপুরের তিনটি বিমান ঘাঁটির একটিও ব্যবহার করা যাইতেছে না। ঘাঁটিগুলি খোলা বা exposed, অর্থাৎ জাপানী গোলা বা বোমার ইহা সহজ লক্ষীভূত। অথচ ঘাঁটির সুবিধা না থাকিলে বিমানবহরের পক্ষেও উপযুক্ত আক্রমণ ও আত্মরক্ষার কার্য্য চালানো কঠিন। অপর পক্ষে জাপানীরা দক্ষিণ মালয়ের বিমান ঘাঁটিগুলির সুবিধা পাইতেছে এবং তাহারা ক্রমাগত ছোঁ-মারা বিমান ব্যবহার করিতেছে। তাহারা প্রচুর বিস্ফোরক বোমা ফেলিতেছে এবং নীচু দিয়া উড়িয়া গিয়া মেসিনগান চালাইতেছে। সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার ব্যূহ ভাঙ্গিয়া ফেলাই ইহার উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যে কেবল বিমান নহে, কামানের ব্যবহারও চলিতেছে প্রচুর। উভয় পক্ষের গোলন্দাজবাহিনী সক্রিয় হইয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ গিয়াছে প্রধানতঃ গোলাগুলীর যুদ্ধ। পদাতিকবাহিনীর আক্রমণ ও অগ্রগতির আগে বড় বড় কামান হইতে প্রচুর গোলাবর্ষণ করা হইত এবং সেই গোলাবর্ষণের আড়াল ধরিয়া সৈন্যদল অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিত। সেবারের মহাযুদ্ধে এক একটি রণক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে যে, ক্রমাগত ৭ দিন ধরিয়া অজস্র কামানের গোলা দিনরাত্রি বর্ষিত হইয়াছে। হাজার হাজার টন গোলা এক একটি রণক্ষেত্রে নিঃশেষিত হইয়াছে। এই গোলাবর্ষণই পদাতিক দলের আক্রমণকে আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিত। এবারের মহাযুদ্ধে এই রণকৌশলের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বোমারু বিমানের অগ্রগতিই এই পরিবর্ত্তনের কারণ। অনেক সময় গোলবর্ষণের দ্বারা যে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, বোমাবর্ষণের দ্বারাও তাহা চরিতার্থ হইয়া থাকে। দ্রুত এবং ক্ষিপ্র আক্রমণের পক্ষে কামান অপেক্ষা বিমানের উপযোগিতা অনেক বেশী। বিশেষতঃ দূরত্বের ব্যবধান ঘুচাইয়াছে আধুনিক বিমান। পূর্ব্বে দীর্ঘতম দূরপাল্লার কামান যে কাজ করিত আজ সেই কাজ করিতেছে বোমারু বিমান। এই কারণে এবারের যুদ্ধে অগ্রবর্ত্তী গোলন্দাজবাহিনীর কার্য্য করিতেছে বোমারু বিমানের ঝাঁক। তাহারা আগুনে-বোমা ও বিস্ফোরক-বোমা ফেলিয়া এবং উপর হইতে মেসিনগান চালাইয়া প্রতিপক্ষের মধ্যে বিহ্বলতা সৃষ্টি করে, আত্মরক্ষার

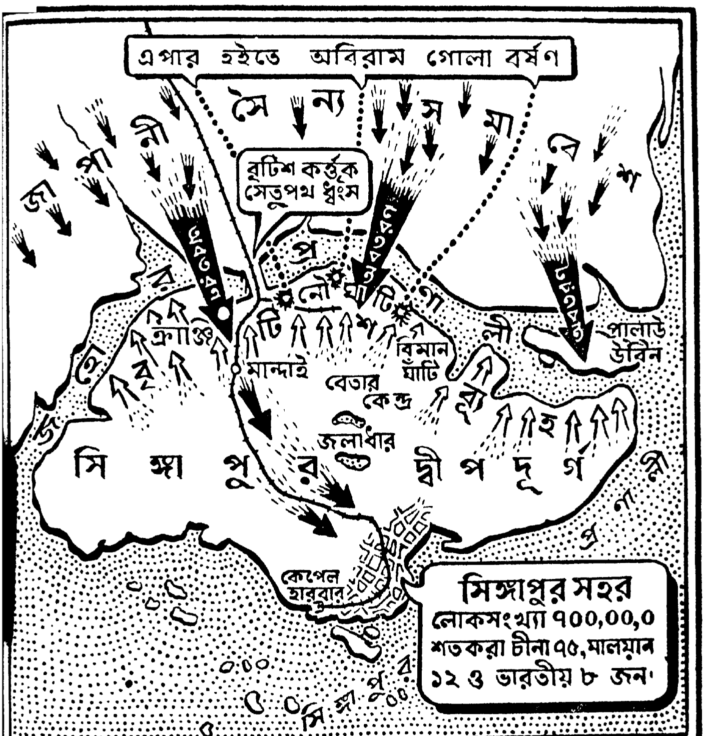
ব্যবস্থায় বিপর্য্যয় ডাকিয়া আনে। কিন্তু জহোর বারু হইতে সমগ্র সিঙ্গাপুর দ্বীপ একান্তরূপে কামানের পাল্লার মধ্যে। বোমাবর্ষী বিমানের সঙ্গে গোলা-বর্ষী কামানের সহযোগিতা চলিতেছে। এই অবস্থার মধ্যে যাহারা আজ সিঙ্গাপুর দ্বীপ রক্ষা করিতেছে, তাহাদের ধৈর্য্য, সাহস ও বীরত্ব অপরিসীম। জাপ সমর-শক্তির সমগ্র প্রচণ্ডতার মুখে সিঙ্গাপুর-রক্ষাকারিগণ দণ্ডায়মান। এই অবরোধ যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করিবে। যদি আত্মরক্ষাকারিগণ এই সঙ্কটজনক অবস্থা সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিতে পারে, তবে রণনীতির দিক দিয়া তাহারা অশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবে।......

১০ই ফেব্রুয়ারী, '৪২।

সিঙ্গাপুরের উপর স্থলপথে প্রত্যক্ষ আক্রমণ স্থরু হইয়াছে। জাপানী সৈন্যেরা সিঙ্গাপুর দ্বীপের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কিম্বা উত্তর-পূর্ব্বে ও উত্তর-পশ্চিমে রাত্রির অন্ধকারে অবতরণ করিয়াছে। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী আকাশ যখন নক্ষত্রখচিত এবং অন্ধকার যখন গাঢ় ছিল, তখন জাপ সৈন্যেরা নৌকাযোগে সিঙ্গাপুরের দুই প্রান্তিক অংশে অবতরণ করে। সিঙ্গাপুর দ্বীপের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে পুলাউ উবিন নামক ৫ মাইল লম্বা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে। এই ছোট্ট দ্বীপটি সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব-প্রান্তিক মালয়ের মধ্যবর্ত্তী কিম্বা জহোর প্রণালীর পূর্ব্বদিকস্থ প্রবেশপথে অবস্থিত। পশ্চিম অংশে তাহারা ক্রানজিতে অবতরণ করিয়াছে, অর্থাৎ তাহারা জহোর প্রণালীকে পশ্চিম দিক দিয়া অতিক্রম করিয়াছে এবং এই অংশ জঙ্গল, জলাভূমি ও রবারের বনে সমাকীর্ণ।* যে সমস্ত জাপানী সৈন্য সিঙ্গাপুর-ভূমিতে নামিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা জানা যায় নাই। তবে প্রকাশ যে, তাহারা ট্যাঙ্ক লইয়া আসিয়াছে। ট্যাঙ্কের মত ভারী জিনিষ নৌকাযোগে আনা সহজ ব্যাপার নহে, এইজন্য সংবাদদাতাগণ এই খবরে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। নৌকাগুলিও আবার সাধারণ নহে, সাম্রাজ্যবাহিনীর গুলী বর্ষণকে উপেক্ষা করিয়াই নৌকাগুলি তীরভূমিতে পৌছিয়াছে। নৌকাগুলি নাকি বর্ম্মের দ্বারা সুরক্ষিত। জাপানীদের পক্ষে জহোর প্রণালী অতিক্রম করিতে পারা অত্যন্ত দুঃসংবাদ। কারণ, তীরবর্ত্তী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া না পড়িলে অথবা তীরভূমি হইতে পশ্চাদপসরণে বাধ্য না হইলে শত্রুর পক্ষে সিঙ্গাপুরে

---

* প্রকৃতপক্ষে এই অংশের অবতরণই প্রধান আক্রমণের পর্য্যায়ভুক্ত ছিল এবং এখান দিয়াই সিঙ্গাপুরকে জাপানীরা ঘায়েল করে। —লেখক।



মনিল মুখার্জী অঙ্কিত। কপিরাইট, যুগান্তর

অবতরণ সম্ভব হইত না। ইহার উপকূলভাগে ১৫ ইঞ্চি ও ১৮ ইঞ্চি মুখের কামান শ্রেণী সজ্জিত আছে, ইহা ছাড়া মেসিনগানের ব্যূহ তো আছেই। এই সমস্ত কামান পৃথিবীর বৃহত্তম কামানগুলির অন্যতম। ইহা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র সিঙ্গাপুর দ্বীপে নৌকাযোগে জহোর প্রণালী পার হইয়া জাপানীদের দুই দিকে আক্রমণ অত্যন্ত অভিনব, সন্দেহ নাই। জাপানীরা পূর্ব্ব দিকে যেখানে অবতরণ করিয়াছে, সেই অংশ ও জহোর প্রণালীর সেতুপথের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত নৌঘাঁটি। কিন্তু এই ঘাঁটি আজ যুদ্ধ-জাহাজের দ্বারা পরিত্যক্ত। কারণ, শত্রুর এত নিকটে জাহাজ থাকিলে বোমা বা গোলা দিয়া সহজেই সেগুলিকে তাহারা ধ্বংস করিতে পারিত। সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত ভাসমান ডক বা পোতাশ্রয়, যাহাতে পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ-জাহাজ আশ্রয় লইতে পারে, সেই ডকটি জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শত্রুর হাতে পড়িবার সম্ভাবনাতেই ডকটি নষ্ট করিতে হইল। একমাত্র খাস ইংলণ্ড ছাড়া পূর্ব্ব এশিয়ায় আর এত বড় পোতাশ্রয় ছিল না। অবশ্য যেখানে নৌবহর নাই সেখানে নৌঘাঁটির মূল্য সামান্য, আবার যেখানে নৌঘাঁটি নাই, সেখানে নৌবহরের মূল্যও সামান্য। আজ সিঙ্গাপুরের যে অবস্থা তাহাতে এই বহুমূল্যবান ডকের জন্য আপশোষ করিয়া লাভ নাই। কারণ, সিঙ্গাপুর দুর্গ সামরিক দিক হইতে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছে; কতকাল আত্মরক্ষা সম্ভব, আজিকার দিনে ইহাই একমাত্র প্রশ্ন।

সিঙ্গাপুরের দুই অংশে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য সিঙ্গাপুরকে দুই পার্শ্ব হইতে ঘিরিয়া ধরা। কোনও বড় রকমের ঘাঁটি আক্রমণ করিতে হইলে কেবল একটিমাত্র বিন্দু হইতেই আঘাত হানিলে চলিবে না। কয়েকটি স্থান হইতে একযোগে আক্রমণ চালাইতে হইবে। যে দুই অংশ হইতে জাপানীরা আক্রমণ চালাইতেছে, উহার মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব বোধ হয় ১০ মাইলের বেশী নহে। যদি ইহাকে দুই বাহুরূপে কল্পনা করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দুই বাহুর পরস্পর বিচ্ছেদ-সীমা অতি সামান্য। সিঙ্গাপুর দ্বীপ ক্ষুদ্র বলিয়াই ইহার উপর দুই পার্শ্বদেশের চাপ এত ঘন ও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কেবল পূর্ব্বে ও পশ্চিমে জাপানীরা অবতরণ ও আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা উত্তরাংশে—ইহাকে আমরা মধ্যবর্ত্তী অংশ বা সম্মুখভাগ বলিয়া ধরিতে পারি—প্রবল ও প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিয়াছে। সিঙ্গাপুরের এই অংশের আত্মরক্ষাকারিগণ ইতিমধ্যেই পশ্চাতে

হটিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা সম্ভবতঃ আরও দক্ষিণে হটিয়া সমুদ্রতট হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করিবে। কিন্তু এই প্রতিরোধ ততক্ষণ শক্তিশালী থাকিবে যতক্ষণ মালাক্কা প্রণালীর উপর বৃটেনের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে। প্রকাশ যে, সুমাত্রায় বৃটেনের বিমান ঘাঁটির জন্য মালাক্কা প্রণালীতে আজও জাপান প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই। ইহা কিঞ্চিৎ আশার কথা। যদি জাপানীরা মালাক্কাতেও অবিলম্বে কর্তৃত্ব খাটাইতে পারে, তবে সিঙ্গাপুরের পশ্চাতের পার্শ্বদেশও বিপন্ন হইবে এবং তাহা মারাত্মক হইবে। জাপ নৌবহর সিঙ্গাপুরের পূর্ব্বদিকস্থ জলপথে পৌঁছিলেও অনুরূপ বিপদ দেখা দিতে পারে। তবে, এই অঞ্চলে জাপ নৌবহরের বিশেষ কোন তৎপরতার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সিঙ্গাপুরকে রক্ষার জন্য অভূতপূর্ব্ব আয়োজন হইয়াছে এবং একটি পিপীলিকাও উহাতে ঢুকিতে পারিবে না, এমন বিজ্ঞাপন দীর্ঘকাল প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুরের গঠন প্রণালী নৌ-যুদ্ধের উপযোগী, স্থলপথের আক্রমণের কোন কল্পনা ইহাতে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, যান্ত্রিক সংগ্রামের যুগে এত অল্প পরিসর ভূমিতে কেবল ইঁট, পাথর, ইস্পাত ও কংক্রীটের আড়ালে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালানো কঠিন। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে অবশ্য লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও তোব্রুকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থানগুলির সঙ্গে সিঙ্গাপুরের তুলনা হয় কিনা, আমরা জানি না। তোব্রুককে ঘিরিয়া রাখিয়া এবং ডিঙ্গাইয়াই জার্ম্মাণবাহিনী লিবিয়ার পূর্ব্ব সীমানায় পৌঁছিয়াছিল। সিঙ্গাপুরের উপর জাপ আক্রমণ-পদ্ধতি তোব্রুকের মত নহে এবং তোব্রুকে জার্ম্মাণীর আক্রমণ জাপানের মত এত প্রচণ্ড হয় নাই। উহার সামরিক ও ভৌগোলিক অবস্থা অন্য ধরণের। আর লেনিনগ্রাদ ও মস্কোর চারিদিকে সিঙ্গাপুরের তুলনায় অনেক বেশী বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ছিল; ক্ষুদ্র অপেক্ষা বিস্তৃততর ভূমিতে সৈন্য চালনা ও সৈন্য খেলাইবার অনেক বেশী সুবিধা পাওয়া যায়। বিশেষতঃ লেলিনগ্রাদ ও মস্কো রক্ষায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে পরিমাণ শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, সিঙ্গাপুরে তাহার একান্ত অভাব। ইহার অর্থ এই নহে যে, সিঙ্গাপুর রক্ষাকারিগণ যথেষ্ট দৃঢ়তা, সাহস বা নৈপুণ্যের সহিত লড়িতেছেন না, ইহার সহজ অর্থ লেনিনগ্রাদ ও মস্কো রক্ষায় যে পরিমাণ সৈন্য, কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ইত্যাদি নিয়োজিত হইয়াছিল, সিঙ্গাপুরে ততখানি সংখ্যা ও পরিমাণের শক্তি সমাবেশ করিতে

পারা যায় নাই। ক্রীটের মত সিঙ্গাপুরেও বিমানশক্তির অভাব এবং আধুনিক যুদ্ধে এরোপ্লেনের প্রচুর সহযোগিতা না পাইলে যুদ্ধ স্বভাবতঃই অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জহোর প্রণালীর দুই তীরে উভয় পক্ষের গোলন্দাজবাহিনী সক্রিয় হইয়াছে এবং জাপ গোলন্দাজের সহিত বিমানবহর সহযোগিতা করিতেছে। গোলা ও বোমার এই প্রচণ্ড বর্ষণকে আড়াল করিয়াই জাপ সৈন্যেরা প্রণালী পার হইতে ও সিঙ্গাপুরের মাটিতে পৌছিতে চেষ্টা করিবে। সরকারীভাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, অবিশ্রান্ত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিয়া জাপানী সৈন্যরা রাত্রিবেলা সিঙ্গাপুরে অবতরণ করিয়াছে। এই গোলাবর্ষণ এত ভয়াবহ হইয়াছে যে, বিগত মহাযুদ্ধের পশ্চিম রণাঙ্গনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।* ১৯১৪-১৮ সালে কামানের গোলা-বর্ষণই ছিল পদাতিক দলের অগ্রগতি ও আক্রমণের সঙ্কেত। এবারের যুদ্ধে

* কর্ণেল টমসনও তাঁহার পুস্তকে ইহার বর্ণনা দিয়া বলিতেছেন—কামান ও বিমানের গোলা অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইয়াছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সিঙ্গাপুর দ্বীপ যে প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণে কাঁপিয়াছিল, বিগত মহাযুদ্ধের ভয়াবহ গোলাগুলী বর্ষণও উহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। বজ্রনাদের মত কামানের গোলায় সমগ্র দ্বীপের অট্টালিকাশ্রেণী কম্পিত হইতেছিল। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে প্রতি মিনিটে ১০০ পাউণ্ড গোলা বর্ষিত হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে ছোঁয়ারা বোমারুও যোগ দিয়াছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিটা অত্যন্ত অন্ধকার ছিল। চাঁদ উঠিবার কথা ছিল রাত্রি ১টায়। সাম্রাজ্যবাহিনীর যে সমস্ত সৈন্য জহোর প্রণালীতে সার্চ্চ-লাইট্ ফেলিয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, রাত্রি ১১টার সময় জাপ গোলন্দাজ তাহাদের উপর কামান দাগিতে সুরু করিল। 'শূন্য ঘণ্টা' নিকটবর্ত্তী হইল, জাপানীরা প্রণালী পার হইতে লাগিল, প্রচুর সংখ্যায়ই তাহারা আসিতে লাগিল। শেষ সার্চ্চলাইটটি নিভিবার আগে উহার উজ্জ্বল শিখায় জলপথ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—দেখা গেল অন্ততঃ ৫০টি নৌকা একসঙ্গে আসিতেছে। এইগুলি বিশেষভাবে তৈয়ারি অবতরণ-যান, প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ ৩০ জন করিয়া সৈন্য ছিল।

জাপানীরা পুঁথিপত্র পড়িয়া নৈশ অভিযানের দুঃখ কষ্ট শিখে নাই। অতএব সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই তাঁহারা অবতরণ করিতে লাগিল। ২৪শে ডিসেম্বর হংকং দ্বীপেও তাহারা ১২ ঘণ্টা গোলাবর্ষণের পর রাত্রি সাড়ে ৯টায় অবতরণ সুরু করিয়াছিল। হংকং রক্ষাকারীগণ গতানুগতিক ভাবে ধরিয়া লইয়াছিল যে, ভোরবেলার আগে তাহারা অবতরণের চেষ্টা করিবে না। কিন্তু জাপানীদের সেই নৈশ অবতরণে ও অভিযানে সহররক্ষাকারীরা অতর্কিত আক্রমণের বিস্ময়ের মধ্যে পড়িল।

—'How the Jap Army Fights'.

সেই ভূমিকায় নামিয়াছে বোমারু বিমান। কিন্তু সর্ব্বত্র একমাত্র বোমারু বিমানের দ্বারা একই প্রকারের ফল লাভ করা যায় না। বিশেষতঃ লক্ষ্যবস্তু যখন ৮।১০ বা ১৫ মাইলের মধ্যে, তখন উহা একান্তরূপে কামানের পাল্লার অন্তর্গত। এত নিকট হইতে কামান দাগিয়া সমস্ত কিছু বিধ্বস্ত করার চেষ্টাই স্বাভাবিক এবং বোমারুর চেয়েও কামানই এই নিকটতর লক্ষ্যের পক্ষে সহায়ক। সিঙ্গাপুরের উপর এই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ বৃটিশবাহিনীকে ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি তারিখ স্মরণ করাইয়া দিবে। পশ্চিম রণাঙ্গনে মাত্র ২৭ হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃটিশবাহিনী ৬৫ হাজার টন পরিমাণ গোলাবারুদ নিঃশেষ করিয়াছিল! এবার সিঙ্গাপুরে কত টন গোলাগুলী নিঃশেষ হইবে কে জানে? জাপানীরা সিঙ্গাপুরের উপর একযোগে কামানের গোলা, বোমারুর বোমা এবং মেসিনগানের গুলী বর্ষণ করিতেছে। সুতরাং একথা বলা অনাবশ্যক যে, সিঙ্গাপুরে অতি গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং উভয়পক্ষে হিংস্র ও নির্ম্মম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই গোলাগুলী হইতে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যগণ পরিখার নীচে আশ্রয় লইয়াছে এবং জাপানীরা এই পরিখা ভাঙ্গিবার জন্য 'মর্টার' ব্যবহার করিতেছে। মর্টার শ্রেণীর কামান সুরক্ষিত দুর্গ প্রাকার ও পরিখা ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জাপানীরা তাহাদের তূণীরের সমস্ত অস্ত্রই একে একে সিঙ্গাপুরের উপর চালাইতেছে। ইহার ফলাফল সারা পৃথিবীতে অপরিসীম কৌতূহল ও উদ্বেগ জাগাইবে।

—৫—

সিঙ্গাপুরের দুর্ভাগ্য

১৩ই ফেব্রুয়ারী '৪২।

যাঁহারা মালয়ের সামরিক অবস্থা এবং সিঙ্গাপুর দ্বীপে জাপ আক্রমণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সিঙ্গাপুরের পতন অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু সেই পতন যে এত দ্রুত হইবে, ইহা কেহ অনুমান করেন নাই। অন্ততঃ দুই তিন সপ্তাহ সিঙ্গাপুরে প্রচণ্ড ও ভয়াবহ সংগ্রাম চলিবে, এমন অনুমান অনেকেই করিয়াছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, মাত্র ৩।৪ দিনের মধ্যেই সিঙ্গাপুরের দুর্ভাগ্য ঘনাইয়া আসিল। সিঙ্গাপুরের নৌদুর্গ

যেমন সামরিক জগতে এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, তেমনি এই দুর্গের এত আকস্মিক পতনও সামরিক ইতিহাসে বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচিত হইবে। মালয়ে জাপ আক্রমণ ও অগ্রগতির লক্ষণ দেখিয়া একথা অনুমান করা গিয়াছিল যে, সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত নৌঘাঁটি ফ্রান্সের সুবিখ্যাত ম্যাজিনো লাইনের মতই শেষ পর্য্যন্ত অকেজো বলিয়া প্রমাণিত হইবে। অবশ্য সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, কিন্তু উহার অবসানে আর বিলম্ব নাই। কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া যে সুবৃহৎ নৌঘাঁটি তৈয়ার করা হইয়াছিল এবং যেখানে বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অব্ ওয়েল্স' ও 'রিপালস্' আসিয়া মাত্র ৭ দিন অবস্থান করিয়াছিল, সেই ঘাঁটি আজ বৃটিশবাহিনী স্বেচ্ছায় নিজ হাতে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। মজুত খাদ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও সামরিক দিক হইতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। যাহাতে শত্রুর হাতে কোন মূল্যবান জিনিষ না পড়ে, সেজন্য 'পোড়া মাটি'-নীতি অনুসৃত হইয়াছে। এই দুর্গের বিপন্ন সৈন্য ও আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র জাহাজ-যোগে অন্যত্র সরাইয়া ফেলা হইতেছে। সম্ভবতঃ জাভা, সুমাত্রা বা দূরবর্ত্তী অষ্ট্রেলিয়ার দিকে প্রস্থান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। হংকং দখলের আগে জাপানীরা উহার আত্মসমর্পণের দাবী করিয়াছিল এবং হংকংয়ের পানীয় জলাধার বিপন্ন হইয়াছিল। সিঙ্গাপুরেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বিনাসর্ত্তে সমগ্র বাহিনীর আত্মসমর্পণ দাবী করা হইয়াছে এবং পানীয় জলের যে দুইটি প্রকাণ্ড আধার ছিল, অন্ততঃ উহার একটি জাপানীদের হাতে পড়িয়াছে। জহোর প্রণালীর সেতুপথ যখন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তখনই সিঙ্গাপুরে জলকষ্ট দেখা দিবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। আজ সমস্ত দিক দিয়াই সিঙ্গাপুরের দুর্ভাগ্য পরিস্ফুট।

সিঙ্গাপুরের পশ্চিম ও উত্তর দিক (মধ্যবর্ত্তী) ধরিয়া যে সমস্ত জাপ সৈন্য অবতরণ করিয়াছে, তাহারাই সিঙ্গাপুর সহরকে বিপন্ন করিয়াছে। এই দুই অংশে বাধা দেওয়া হইয়াছে প্রচুর। কিন্তু জাপানীরা কামান, মেসিনগান, ট্যাঙ্ক ও বিমান একযোগে ব্যবহার করিয়া আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদলকে হটাইয়া দিয়াছে এবং সহরের একাংশে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তর দিকে নৌঘাঁটি হইতে ঘোড়দৌড়ের মাঠ দিয়া পাসির পানজাং পর্য্যন্ত রেখা টানিলে যে লাইন পাওয়া যাইবে সাম্রাজ্যবাহিনী সেই রেখা ধরিয়া জাপানীদিগকে বাধা দিতে চাহিয়াছিল। জাপানীরা জহোর প্রণালীর ভগ্ন সেতুর পুনরায় নির্ম্মাণ

করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ, লণ্ডন হইতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, জাপ সৈন্যেরা ঐ সেতুপথ আংশিকভাবে ব্যবহার করিতে পারিতেছে। আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধে ইস্পাত ও কংক্রীটে সুরক্ষিত ঘাঁটি যে আর দুর্ভেদ্য থাকিতেছে না এবং দুর্গ প্রাকারের স্থিতিশীল যুদ্ধ যে, গতিশীল সংগ্রামের পাল্লায় পড়িয়া ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে, রণনীতির এই তথ্যের উপর বহুবার জোর দেওয়া হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের দ্রুত পতনের মূলে এই রহস্য রহিয়াছে। এই রহস্য বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি সূত্র পাওয়া যাইবে—(১) সিঙ্গাপুর মূলতঃ নৌঘাঁটি ও নৌদুর্গ বা নৌযুদ্ধের উপযোগী, কিন্তু আক্রমণ ঘটিয়াছে স্থলপথে। (২) সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার ও আক্রমণের ব্যবস্থা সম্মুখভাগে কিম্বা সমুদ্রের দিকে। আক্রমণ ঘটিয়াছে একান্তরূপে পশ্চাৎ দিক হইতে যাহা স্বভাবতঃই রণকৌশলের দিক হইতে বিপজ্জনক। (৩) কেল্লা বা দুর্গের যুদ্ধ স্থিতিশীল (war of position), আধুনিক যুদ্ধ একান্তরূপে যান্ত্রিক ও গতিশীল (war of movement) অর্থাৎ বিপরীত রণনীতির পাল্লায় ইহা পড়িয়াছে। এই ধরণের রণকৌশলের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য গভীরতর ও বিস্তৃততর ব্যূহের আত্মরক্ষার (defence in depth) প্রয়োজন এবং সেই ব্যূহের মধ্যে গতিশীল পাল্টা-আক্রমণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। (৪) গোলাগুলী ও অস্ত্রবলে (fire power) জাপানীরা শ্রেষ্ঠ, বিশেষভাবে বিমানশক্তিতে জাপানীরা সিঙ্গাপুরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোন প্রকার বিমান সাহায্য ও নৌবহরের সাহায্য সিঙ্গাপুরে পৌছিতে পারে নাই এবং জাপ আক্রমণ এত দ্রুত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষকে কোন প্রকার অবসরও দেওয়া হয় নাই। এই সমস্ত কারণে সিঙ্গাপুরের সাম্রাজ্য-বাহিনী দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াও জাপানকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। যে নৌদুর্গ পৃথিবীর বিস্ময়রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহা অধিকতর বিস্ময় ও বেদনা বহন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল!

* *
*

নৌদুর্গ জয়ে জাপানীদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে পোর্ট আর্থার বন্দর আক্রমণ ও জয় সামরিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ইহার সহিত সিঙ্গাপুর নৌদুর্গের ইতিহাস যুক্ত হইল। কিন্তু পোর্ট আর্থার দখলের দ্বারা রুশ-জাপান যুদ্ধের অবসান হইয়া থাকিলেও সিঙ্গাপুরের সাফল্যের দ্বারা ইঙ্গ-মার্কিণ-জাপ যুদ্ধের অবসান হইবে না।

বর্ত্তমান রাশিয়ার দক্ষিণ রণাঙ্গন বা উক্রাইনের সহিত কতকটা তুলনা দিয়া বলা যায় যে, কিয়েভ, ওডেসা, খারকোভ, রষ্টোভ, ক্রিমিয়া ইত্যাদি একে একে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করিয়াও জার্ম্মাণী যেমন দক্ষিণ রুশ-রণাঙ্গনের সংগ্রাম শেষ করিতে পারে নাই, উহাকে আরও দূরে ককেশাস ও ইরাণ পর্য্যন্ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছিল, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সংগ্রাম সম্পর্কেও এমন কথা বলা যায়। হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি রণক্ষেত্রেই এই সংগ্রামের চূড়ান্ত মীমাংসা হইতেছে না। জাপানকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে। সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশের দিকে হাত বাড়াইতে হইবে এবং রণক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃততর হইবে। সুতরাং জাপানের যুদ্ধ সিঙ্গাপুরের সীমায়ই শেষ হইতেছে না।

—৬—

সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণ

১৫ই ফেব্রুয়ারী '৪২।

মিত্রশক্তি ও ভারতবর্ষের পক্ষে সিঙ্গাপুরের পতন সংবাদ গভীরতর বেদনা ও উদ্বেগ বহন করিয়া আনিতেছে। যদিও সিঙ্গাপুরের পতন অপ্রত্যাশিত ছিল না এবং উহার অনিবার্য্যতা সম্পর্কে পূর্ব্বেই আভাষ দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি এইটুকু ক্ষীণ আশা ছিল যে, সিঙ্গাপুর রক্ষার জন্য মিত্রশক্তি তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করিবেন। দুই কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। প্রথমতঃ জাপানীরা অতি দ্রুত এমন কৌশলে অগ্রসর হইয়াছে যে, অধিকতর সাহায্য পাঠাইবার সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। সিঙ্গাপুরের উপর জাপ বিমান ও কামানের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাহাজযোগে সিঙ্গাপুরে পৌছানো সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ সিঙ্গাপুরের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ হওয়ায় মিত্রপক্ষ উহার আশা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের শক্তি সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশ রক্ষায় নিয়োগ করিয়াছেন। কারণ, ব্রহ্মদেশের সহিত চীন ও ভারতবর্ষের ভাগ্যসূত্র জড়িত। সিঙ্গাপুর সংগ্রামের সামরিক বৈশিষ্ট্য লইয়া আগে আমরা বহু আলোচনা করিয়াছি, এখানে উহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। শেষের ৩।৪ দিন সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষাকারিগণ অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সহিত লড়িয়াছেন। জাপানীদের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণের মুখে তাঁহারা যথাসম্ভব বীরত্ব ও ধৈর্য্যের সহিত বাধা দিয়াছেন। কিছু কিছু ট্যাঙ্কও তাঁহারা আমদানী

করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ-জাহাজের সাহায্যও কিছু পাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শেষরক্ষা হয় নাই, জাপানীদের শক্তি সমস্ত দিক দিয়াই অত্যন্ত বেশী ছিল। জাপ কামানগুলি যখন পোতাশ্রয়ের উপর গোলাবর্ষণ ও আধিপত্য বিস্তার করে তখনই সিঙ্গাপুরে আর সাহায্য পাঠানো সম্ভব ছিল না। কারণ জাহাজগুলি তীরে ভিড়িতে কিম্বা ঘাঁটির অভাবে সৈন্য ও মালমসলা নামাইতে পারিত না। অন্তিম মুহূর্ত্তে সিঙ্গাপুরের কর্ত্তৃপক্ষ যে সমস্ত সংবাদ পাঠাইলেন, তাহাতে জানা যায় যে, জল, খাদ্য, গোলাবারুদ ও পেট্রোলের অভাবের দরুণ আর প্রতিরোধ চালানো সম্ভব হয় নাই। সাড়ে তিন মাইল স্থানের মধ্যে ১০ লক্ষ লোক আসিয়া জড়ো হইয়াছিল এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল যে, আর ২৪ ঘণ্টার বেশী টিকিয়া থাকার সম্ভাবনা ছিল না। সিঙ্গাপুরের সেনাপতি লেঃ জেনারেল পার্সিভ্যাল আর যুদ্ধ চালানো অসম্ভব বিবেচনা করিয়া জাপানীদের নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। সিঙ্গাপুরের গবর্ণর স্যার সেণ্টন টমাসও সস্ত্রীক বন্দী হইয়াছেন। ফোর্ডের মোটর কারখানায় বসিয়া আত্মসমর্পণের আলোচনা চলিয়াছিল। হংকং হইতে যেমন সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিসহ পশ্চাৎ অপসরণ সম্ভব ছিল না, সিঙ্গাপুরেও তেমন অবস্থারই সৃষ্টি হইয়াছিল। খাস সিঙ্গাপুর দ্বীপে মাত্র ৭ দিন যুদ্ধ হইয়াছে। কত সৈন্য ও সমরোপকরণ জাপানীদের হাতে ধরা পড়িয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। তবে, জাপানীদের মতে সিঙ্গাপুরে ১৫ হাজার বৃটিশ, ১৩ হাজার অষ্ট্রেলিয়ান ও ৩২ হাজার ভারতীয় এই মোট ৬০ হাজার সৈন্য বন্দী হইয়াছে।* ১৬ই ফেব্রুয়ারী সোমবার সকাল ৮ ঘটিকায় ট্যাঙ্ক বাহিনীকে সম্মুখে রাখিয়া জাপানী সেনাপতি লেঃ জেনারেল ইয়ার্মাসিটা সিঙ্গাপুর সহরে প্রবেশ করেন এবং প্রত্যেকটি অট্টালিকায় উদীয়মান সূর্য্যের (জাপানী জাতীয় পতাকা) পতাকা উড়ানো হয়।

প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া সিঙ্গাপুর ঐতিহাসিক দুর্গরূপে দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। এই দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য বৃটেনের প্রতি জাপানের সন্দেহ ও আক্রোশের অন্ত ছিল না। ইহারই উপর নির্ভর করিয়া রক্ষণশীল বৃটিশ রণনীতিবিদ্‌গণ পূর্ব্ব এশিয়া ও ভারতবর্ষের নিরাপত্তা সম্পর্কে দিবাস্বপ্ন

* পরবর্ত্তীকালে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী এক বিবৃতিতে স্বীকার করিয়াছেন যে, মালয়ে মোট ১৮ হাজার অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৩ হাজার ধরা পড়িয়াছে, ২ হাজার পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং বাকি ৩ হাজার সম্ভবতঃ নিহত বা নিখোঁজ হইয়াছে।
—লেখক।

রচনা করিয়াছিলেন। আজ সেই স্বপ্ন একান্ত রূঢ় ও প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! ১৯০৪ সালের পোর্ট আর্থারের মত ১৯৪২ সালের সিঙ্গাপুর নৌদুর্গের গর্ব্ব ও মহিমা প্রচার করিতেছিল। পোর্ট আর্থারের পতন ঘটে দুর্দ্ধর্ষ ও নিপুণ নৌযুদ্ধের দ্বারা, আর সিঙ্গাপুরের বিপদ ঘটিল প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায়! অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সিঙ্গাপুর হাত ছাড়া হইয়া গেল স্থল ও আকাশ পথের আক্রমণের দ্বারা। এই তথ্য হইতেই বৃটিশ রণনীতির ত্রুটি, শৈথিল্য ও দুর্ব্বলতা ধরা পড়িবে। স্পষ্টবক্তা মিঃ চার্চ্চিল সিঙ্গাপুরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র পৃথিবীর উদ্দেশ্য এক বেতার বক্তৃতা দিয়া নিজেদের পরাজয় ও দুর্ভাগ্য অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বাগ্মিতা চমৎকার। কিন্তু রণনীতি ও বাগ্মিতা এক বস্তু নহে। মিঃ চার্চ্চিল বলিতেছেন যে, তিনি যুক্তির দ্বারা একথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, জাপান ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণায় সাহসী হইবে। অথচ এই বক্তৃতার অন্যত্র তিনিই উল্লেখ করিয়াছেন যে, গত ২০ বৎসর ধরিয়া দুর্দ্ধর্ষ জাপ সমরনীতি-বিদ্‌গণ এই সুযোগই খুঁজিতেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা প্রচণ্ড ও ব্যাপক যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন এবং মিঃ চার্চ্চিলের মতে জাপানীরা অসাধারণ যোদ্ধা, অমিতবিক্রমশীলা—জলে, স্থলে, আকাশে তাহাদের শক্তি অভূতপূর্ব্ব। তাহারা নৃশংস, বেপরোয়া, বিশ্বাসঘাতক ও নিপুণ এবং এশিয়ায় তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। শত্রুর এই শক্তি যাহাতে আমরা হীন না ভাবি, সেইজন্য তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন :—

No one must underrate any more the gravity and efficiency of the Japanese war machine. Whether in the air or upon the sea or man to man on land they have alredy proved themselves to be the most formidable, deadly and I am sorry to say, barbarous antagonists.

মিঃ চার্চ্চিলের মুখে এই ভাষা! ইহার আগে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসমুদ্রে ইঙ্গ-মার্কিণ বাঁধ ভাঙ্গিয়া জাপানী শক্তি যেন বন্যার মত সমস্ত কিছু ভাসাইয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কিম্বা পর্ব্বতগাত্র হইতে যেন ভয়াবহ তুষারস্তূপ চারিদিকে ধ্বংসলীলা বিস্তার করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! আজ হংকং, মালয় ও সিঙ্গাপুরে বিদ্যুৎগতি পরাজয়ের পর মিঃ চার্চ্চিল ও তাঁহার সেনাপতিগণ জাপ সমরশক্তির ক্রূরতা সম্পর্কে সচেতন হইয়াছেন এবং

সিঙ্গাপুরের এই শোচনীয় দুর্ভাগ্য সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া কেবল জাপানী শক্তির ভয়াবহতার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন! কিন্তু ইহা কি যুক্তি ও দূরদৃষ্টির কথা? তাঁহার এই বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি তিনটি বিষয় পাওয়া যায়—(৪) জাপ সমর শক্তির প্রচণ্ডতা সম্পর্কে বৃটেনের অজ্ঞতা ও অবিশ্বাস, (২) নানা রণক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সমুদ্রে বৃটিশ শক্তির বিক্ষিপ্ততা এবং (৩) বিশাল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী সংগ্রামশীলতার উপর নির্ভরতা। ধাপে ধাপে এই প্রশ্নগুলির বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতায় ভরসা পাওয়ার মত বস্তু সামান্যই আছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, আগামী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত (১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত তো বটেই) বহু লাঞ্ছনা, বহু প্রকার দুর্গতি আমাদের ঘটিবে। মিঃ চার্চ্চিল সেই শ্রেণীর নিপুণ চিকিৎসক, যিনি ঘড়ি ধরিয়া বলিয়া দিতে পারেন রোগীর আয়ু আর কতক্ষণ আছে! ব্যাধি ও যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা কেবল আয়ুর মিয়াদই জানিতে চাহি না, কিভাবে আমরা বাঁচিতে পারিব, তাহা জানাই আমাদের আসল লক্ষ্য। কেন পরাজয় হইয়াছে এবং আরও কত পরাজয় আমাদের অদৃষ্টে আছে, এই তথ্য জানা নিশ্চয়ই আমাদের উচিত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এবং একমাত্র কথা এই যে, আমরা জাপানকে কিভাবে হারাইতে পারিব? মিঃ চার্চ্চিল আমেরিকার দোহাই দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের উপর ভরসা রাখিয়াছেন। কিন্তু যে রণনীতিবিদ্‌গণ গত ২০ বৎসর ধরিয়া জাপানী সমরায়োজনের তথ্য জানা সত্ত্বেও সিঙ্গাপুর, হংকং ও মালয়কে এমন অরক্ষিত অবস্থায় রাখিতে পারেন এবং যে সেনাপতিগণ উপযুক্ত বিমানবহরের সাহায্য ছাড়া দুইখানি বৃহত্তম রণতরীকে বোমারুর মুখে ঠেলিয়া দেন, যাঁহারা নৌবহর ও বিমানবহরের সমাবেশ ছাড়া এই যান্ত্রিক সংগ্রামের যুগে কেবল পদাতিক-বাহিনী পাঠাইয়া আত্মরক্ষার আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন, তাঁহাদের হিসাব যে ভবিষ্যতেও সত্য ও নিখুঁত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, এতখানি ভরসা আমরা কিভাবে পাইব? বৃটেনের যাঁহারা যুদ্ধ চালনা করিতেছেন, তাঁহাদের কৈফিয়ৎ নানাস্থানে নানা যুক্তি খাটাইতেছে। লিবিয়া সম্পর্কে তাঁহারা আবহাওয়ার দোষ দিতেছেন, ডোভার প্রণালী সম্পর্কে মেঘ ও বৃষ্টির উপর দায়িত্ব চাপাইয়াছেন, আর হংকং-সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেদের আয়োজনহীনতার অপরাধ স্বীকার করিতেছেন এবং ইউরোপ-এশিয়ার রণাঙ্গনের প্রত্যেকটি সম্পর্কে অন্য রণাঙ্গনে সাহায্য পাঠাইবার যুক্তি দেখাইতেছেন! দূরদর্শী

রাজনীতিক ও রণনীতিক আমরা তাঁহাকেই বলিব, যিনি শত্রুপক্ষের সমগ্র শক্তি ও আয়োজন সম্পর্কে সচেতন এবং সেই অবস্থানুযায়ী সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা যথাসময়ে অবলম্বন করেন। কিন্তু এই মানদণ্ডের বিচারে মিঃ চার্চ্চিলের মন্ত্রিসভার যোগ্যতা কতটুকু এবং ১৯৩৯ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মন্ত্রিসভা কয়টি রণক্ষেত্রের জয় দাবী করিতে পারেন? অথচ বিস্ময়ের কথা মিঃ চার্চ্চিলই ভাবী যুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে মিঃ বলডুইনের আমল হইতে চীৎকার করিয়া আসিতেছেন।···

সিঙ্গাপুরের পতনের পর পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও গবেষণা দেখা দেয়। মালয়ে ও জাভায় প্রত্যক্ষদর্শী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উহার পতনের কারণ লইয়া নানা মতামত প্রকাশ করেন। পাঠকদের সুবিধার জন্য এখানে 'রয়টারে'র বিশেষ সংবাদদাতার একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বাটাভিয়া হইতে 'রয়টারে'র বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন :—

"বৃটিশ সৈন্যগণ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যগণ সিঙ্গাপুর দ্বীপে যে বীরত্ব সহকারে শত্রুকে প্রতিরোধ করিতেছিল, তাহাতে দুই দিন আগে সামান্য একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল। অকস্মাৎ সেই আশা চূর্ণ হইয়া গেল এবং সেই জন্যই সিঙ্গাপুরের ক্ষতিটা আরও বেদনাদায়ক।

জাপানীরা বোর্ণিও হইতে সোজাসুজি সুমাত্রার পালেম্বাংয়ে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সিঙ্গাপুর একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কাজে কাজেই ডানকার্ক, গ্রীস এবং ক্রীট হইতে যে ভাবে সৈন্য ও সমরসম্ভার সরাইয়া আনা হইয়াছিল সিঙ্গাপুরের বেলায় তাহা করা সম্ভব হয় নাই। বিমান বিভাগের অধিকাংশ পাইলট এবং কর্ম্মচারীই পলাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু স্থল-সৈন্য বিভাগের লোকক্ষয় এবং রণসম্ভার ক্ষয় নিশ্চয়ই খুব বেশী হইয়াছে। নৌ-বিভাগের কিছু কিছু মজুদ দ্রব্যসম্ভারও বিনষ্ট হইয়াছে।

দৃঢ়তার সহিত বলা হইতেছে বটে যে, সিঙ্গাপুরের যতদূর সম্ভব সবই ছারখার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি জাপানীরা যে সিঙ্গাপুরে বেশ ভাল রকমের অগ্রবর্ত্তী নৌ ও বিমানঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা করার পর জাপানীরা সেখানে বসিয়া উত্তর সুমাত্রা এবং

মালাক্কা প্রণালীর উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে ও অবাধে ভারত মহাসাগরে ও জলপথে রেঙ্গুণে যাতায়াত করিতে পারিবে। বর্ত্তমানে সিংহল ও অষ্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি একমাত্র যবদ্বীপেই ইঙ্গ-মিত্রমণ্ডলের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে। সিঙ্গাপুর হাতে পাওয়ায় জাপানীদের এখন যবদ্বীপ আক্রমণের খুবই সুবিধা হইবে।

সিঙ্গাপুরের রক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচার করা হইয়াছে সত্য। কিন্তু সামরিক দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে উহা কোন কালেই একটা দুর্গ স্বরূপ ছিল না। উহা একটি চমৎকার নৌ-ঘাঁটি ছিল মাত্র। পুরাণে শক্ত বাড়ীর বর্ণনায় পাথরের উপর নির্ম্মিত বাড়ীর কথা আছে। সিঙ্গাপুর তাহার বিপরীত উদাহরণ। উহা পাথরের উপর নির্ম্মিত বাড়ী নহে। এখানকার মাটির তলায় পাথর নাই। ভিত্তি করিবার মত অন্যান্য কোন শক্ত পদার্থ নাই। শক্ত মাটির উপর সামরিক রক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। সেগুলিকে জলাভূমির উপর গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল। সেগুলি বিমান আক্রমণের পক্ষে একেবারে খোলা ছিল। এখানে জিব্রালটারের এবং করিজিডরের মত আত্মরক্ষার প্রাকৃতিক কোন সুবিধা ছিল না। সিঙ্গাপুরকে রক্ষা করবার মত বিমানের সহায়তারও অভাব ছিল। কাজেই ইংরাজদের চৌকীগুলি বোমার ধাক্কায় একেবারে উড়িয়া যায়। ইংরাজ পক্ষের সৈন্যদিগকে যখন সিঙ্গাপুরে সরাইয়া আনা হয়, তখন ওয়াকেফহাল সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দুই তিন দিনের মধ্যেই সিঙ্গাপুরের পতন অবধারিত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যেরা যে দ্বীপটি এতদিন রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তাহাই বিস্ময়ের বলিয়া মনে হয়।

তথাপি একটা কথা এখনও বুঝা যাইতেছে না। জাপানীরা আট সপ্তাহের মধ্যে ছয় শত মাইল কি ভাবে জয় করিয়া মালয়ের প্রধান ভূখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল?

ইহার পিছনে ৪টি কারণ আছে বলিয়া মনে হয়—

(১) ইঙ্গ-মিত্রমণ্ডলের সমর উপকরণের, বিশেষ করিয়া জঙ্গীবিমান ও বিমান-মারা কামানের অভাব ছিল।

(২) মহাসাগরের উপর, এমন কি সঙ্কীর্ণ প্রণালীগুলির উপর ইঙ্গ-মিত্রমণ্ডল হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল।

(৩) চতুর্দ্দিক হইতে যে সমস্ত জাপানী আসিতেছিল ইঙ্গ-মিত্রমণ্ডল

তাহা বন্ধ করিবার মত কোনও কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই।

(৪) এশিয়ার শ্রমিকদিগকে এরূপভাবে সংহত করা যায় নাই যে, গোলাবর্ষণের সময় এবং গোলাবর্ষণের পরও রসদ সরবরাহের কেন্দ্রগুলির কাজ চলিতে পারে।*

একথা অবশ্যই ঠিক যে, ইঙ্গ-মিত্রমণ্ডলের বিমানবলহীনতা এবং নৌবলহীনতাই এই দুর্গতির প্রধান কারণ। তথাপি অপর দুইটি বিষয় যদি ঠিক ঠিক পরিচালিত হইত, তবে জাপানীদের অগ্রগতিতে বিলম্ব হইত এবং সেই অবসরে বিমান ও রণতরীর সাহায্য পৌছিতে পারিত।

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনের জোরই সিঙ্গাপুরের সামরিক শক্তির সর্ব্বপ্রধান ভরসা ছিল! প্রকৃতপক্ষে কোন প্রচণ্ড যুদ্ধের আয়োজন এবং নিখুঁত কোন রণ-পরিকল্পনা ও সেই রণ-পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন সুনির্দ্দিষ্ট রণকৌশল অনুসৃত হয় নাই।†

* *
*

সিঙ্গাপুর দখলের পর জেনারেল তোজো বলিয়াছেন যে, সিঙ্গাপুরের পতনের দ্বারা জাপানী যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়

---

* 'লণ্ডন টাইমসের' সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, সাধারণত: সিঙ্গাপুরের ঘাঁটিতে ১২ হাজার শ্রমিক কাজ করিত, কিন্তু যুদ্ধ বাধিবার পর ৮ শতের বেশী শ্রমিককে পাওয়া যায় নাই, ডকের কাজে কোন কুলী ছিল না। সৈন্যদিগকেই জাহাজ হইতে মালপত্র উঠাইতে বা নামাইতে হইত। এমন কি দেশীয় লস্করের অভাবে ছোট জাহাজ ও লঞ্চগুলিকে পর্য্যন্ত পোতাশ্রয় হইতে ছাড়িতে পারা যায় নাই।

† ইংরাজদের রচিত বর্ত্তমান যুদ্ধের ইতিহাসে সিঙ্গাপুরের পতনকে...'the most humiliating and impressive disaster which the British Empire had suffered for more than a century...' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এশিয়াবাসীর হাতে ইংরাজের এই পরাজয় স্বভাবতঃই সাম্রাজ্যগর্ব্বীদের আত্মসম্মানে লাগিয়াছে, অপর পক্ষে মালয়ে এবং সিঙ্গাপুরে বৃটিশ সেনাপতিদের নেতৃত্বেরও তীব্র সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোন প্রাণপ্রদ উৎসাহ ছিল না। জাপানীদের প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে—'The five or six Japanese divisions had shown themselves first rate soldiers in attack, disciplined, bold and resourceful and most ably led. They had used their advantages with rare skill, the co-ordination of their military effort by land, sea and air had produced the maximum effect.' —Hutchinson's 'Quarterly Record of the War', Vol 10.

কোথায় সুরু হইয়া কোথায় শেষ হইবে, আজিকার দিনে তাহাই সর্ব্বত্র প্রবল গবেষণা উদ্রেক করিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম লক্ষ্য রেঙ্গুণ এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য সুমাত্রা ও জাভা। কিন্তু রেঙ্গুণের দ্বারা যেমন ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম কতকাংশে চরম মীমাংসার দিকে যাইবে, জাভা ও সুমাত্রার দ্বারা উহা তেমন চরম মীমাংসা আনিবে না। কারণ, জাভা ও সুমাত্রা দখলের আশু উদ্দেশ্য হইতেছে এখানকার প্রণালীগুলি করায়ত্ত করিয়া ভারত মহাসাগরে যাতায়াতের পথসমূহ জাপানী প্রভুত্বের মধ্যে আনা। যদি সিঙ্গাপুরে নূতন ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়া জাপান নিকটবর্ত্তী দ্বীপ ও প্রণালীগুলি অধিকার করিতে পারে, তবে, ভারত মহাসাগরে বৃটেন ও অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং সামরিক সরবরাহের পথ একান্তরূপে বিপন্ন হইবে। তথাপি জাভা ও সুমাত্রার যুদ্ধ কেবল সেই সেই স্থানেই শেষ হইতেছে না। এদিকের অভিযানের আসল লক্ষ্য হইতেছে অষ্ট্রেলিয়া, যেমন রেঙ্গুণ অভিযানের আসল লক্ষ্য হইতেছে বর্ম্মা রোড। ব্রহ্মের সড়ক দখলের দ্বারা চীন বিচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইবে, সুমাত্রা ও জাভার পর অষ্ট্রেলিয়া দখলের দ্বারা ভারতবর্ষ অধিকতর বিপন্ন হইবে। কিন্তু জাপানীরা সত্য সত্যই অষ্ট্রেলিয়া দখল করিবে, কিম্বা আকাশ ও স্থলপথে শুধু ধ্বংসকর আক্রমণ চালাইবে, তাহা বলা শক্ত। যতদূর অনুমান করা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের দিকে অভিযানের আগে জাপান পশ্চাৎ বা পার্শ্ববর্ত্তী চীন ও অষ্ট্রেলিয়াকে অটুট রাখিয়া আসিবে না। কারণ, ভবিষ্যতে যদি মার্কিণ নৌবহরকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হইয়া অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছিতে হয়, তাহা হইলে জাপানের পক্ষে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজন অষ্ট্রেলিয়া। অপর দিকে স্থলপথে যাহাতে চীন ব্রহ্ম-যুদ্ধের পর পুনরায় জাপানকে আক্রমণ করিতে না পারে, এজন্য চীনের দিকে যাওয়াও একান্ত সম্ভব। কিন্তু জলপথে গোটা অষ্ট্রেলিয়া দখল না করিয়াও জাপানীদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। যদি যুদ্ধ-জাহাজ ও বোমারু বিমানযোগে অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত নৌঘাঁটি এবং নৌঘাঁটির সংলগ্ন বিমান ঘাঁটিসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে জাপ নৌবহর অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। ঘাঁটির আশ্রয় ছাড়া নৌবহর বা বিমান-বহর দুর পাল্লার অভিযানে বাহির হইতে পারে না। যদি অষ্ট্রেলিয়ার ঘাঁটিগুলি ধ্বংস হইয়া যায়, তবে অনতিদুর ভবিষ্যতে মার্কিণ নৌবহরের পক্ষে ভারত মহাসাগরের প্রান্ত সীমায় আসা সম্ভব হইবে না এবং যদি মার্কিণ

নৌবহরের আগমন কার্য্যতঃ সম্ভব না হয়, তবে নৌরণে পটু জাপানকে ভারত মহাসাগরে বা বঙ্গোপসাগরে একা বৃটেন কতখানি বাধা দিতে পারিবে, তাহা বিতর্কের বিষয়।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন

—১—

'দ্বীপময় ভারতের' দিকে

ফেব্রুয়ারী '৪২।

এবার 'বৃহত্তর ভারতবর্ষের' দিকে তাকানো যাউক—যেখানে ষোড়শ শতাব্দীর আগে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিতেন দ্বীপে, উপদ্বীপে ও সমুদ্রপথে। সুনীল সিন্ধুধৌত তিনটি দেশ এই বৃহত্তর ভারতের কল্পনাকে নাড়া দিয়াছিল—যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও সুমাত্রার এই দূরবর্ত্তী দেশগুলির সহিত শ্যাম, ব্রহ্ম ও মালয়ের ভিতর দিয়া যেমন যোগাযোগ ছিল, তেমনই একদা প্রাচীন ভারতের অর্ণবপোত এই মহাসমুদ্রে বিচরণ করিয়াছিল। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়াছিল এই দ্বীপগুলিতে। আজও প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক হিন্দুর গর্ব্ব-গরিমা খুঁজিয়া বেড়ান এখানকার মন্দিরগাত্রে, প্রস্তর খণ্ডে, রাজদরবারের বিস্মৃত কাহিনীর মধ্যে—আর রসিকজন নৃত্যকলার সন্ধান করেন কোমল দেহা তরুণীদের লীলাচপল ভঙ্গীতে। ভারতবর্ষে যেমন হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে বৈদেশিক আক্রমণে—বহিশত্রুর দুর্দ্দান্ত অভিযানে, বৃহত্তর ভারতবর্ষের বেলাও তাহাই। ইউরোপীয় জাতিগুলি দুঃসাহসিক অভিযানের ইতিহাসে একটা বিস্ময়ের মত। কত শতাব্দী পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি জাতিগুলি অজ্ঞাত পরিচয় মহাসমুদ্রের হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া অতলান্তিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে হানা দিয়াছিল। ইউরোপীয়দের নিকট প্রাচ্যের ভূমিখণ্ড স্বপ্নময় ও স্বর্ণময় দেশ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাদের জাহাজগুলি কেবল ভারতবর্ষের তীরেই ভিড়িল না, ভারতবর্ষ ডিঙ্গাইয়া তাহারা চলিয়া গেল আরও দূরে—যেখানে সুরু হইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সীমান্তবর্ত্তী

দ্বীপমালা। পর্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া হল্যাণ্ড হইতে আগত 'ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' (ইংলণ্ডের অনুকরণে এই কোম্পানীর হুজুগ তখন ইউরোপে সাড়া জাগাইয়াছিল) এই দ্বীপমালা দখল করিয়া বসিল। ১৬০২ খৃষ্টাব্দ হইতেই ক্রমে ক্রমে ওলন্দাজদের অধিকারে আসিল জাভা, সুমাত্রা, সুন্দা, মালক্কা, সেলিবিস, বোর্ণিও, নিউগিনি প্রভৃতি। হল্যাণ্ডের বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল সুদূর প্রাচ্যে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হইয়া গেল এবং হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রশক্তি নিজ হাতে উহার শাসনভার গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত ঔপনিবেশিক রাজ্যের জন্য একজন গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করেন। (ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতবর্ষের অদৃষ্ট একই) ইতিমধ্যে ইংরাজেরা এই নয়ালব্ধ সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশ হাত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ওলন্দাজদের সহিত তাহারা পারিয়া উঠিল না। আজ চারিশত বৎসর পর সেই বিশাল সম্পত্তি, যাহা ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ বা পূর্ব্ব ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত, তাহা ইংরাজেরও নহে, দেশীয় বাসিন্দাগণেরও নহে, আর একটি বিদেশী শক্তি অর্থাৎ জাপানের হাতে গেল। এই সম্পত্তির স্থলভাগের আয়তন ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার বর্গ মাইল, এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৫ কোটি ১৮ লক্ষের বেশী (১৯২৭ সালের হিসাবে), আর অর্থনৈতিক সম্পদের দিক দিয়া ইহার তুলনা খুব কম দ্বীপ ও উপদ্বীপের সহিতই মিলিবে। সোণা, লোহা, কয়লা, টিন, পেট্রোল ইত্যাদি খনিজ সম্পদ, চা, চিনি, কাফি, চাউল, তামাক ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্য, কর্পূর, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি ইত্যাদি মশল্লা, সেগুন, লোহাকাঠ, ওক ইত্যাদি বৃক্ষ ও কাষ্ঠ সম্পদ এবং বিশাল অরণ্যের হস্তি, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, হরিণ, ভল্লুক, বানর ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার জন্তু-জানোয়ারের ঐশ্বর্য্যে এই দেশগুলি স্বর্ণপ্রসূ হইয়া রহিয়াছে। ইহা ছাড়া এইগুলির সামরিক গুরুত্ব তো (strategical importance) আছেই—সেই গুরুত্ব একদিকে সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ এবং আর একদিকে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের জন্য। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে নৌ-আধিপত্য বিস্তার ও রক্ষার পক্ষে ওলন্দাজ দ্বীপগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেখানে অর্থনীতির ঐশ্বর্য্য ও সমরনীতির সৌভাগ্য একত্রিত হয়, সেই মণিকাঞ্চন সংযোগ ক্ষেত্রে কোন্ সাম্রাজ্যলোভী না হাত বাড়াইবে? কাজেই জাপানী ক্ষুধা অস্বাভাবিক নহে।

দ্বীপ ও উপদ্বীপে এই অঞ্চল এত সমাকীর্ণ যে, কেহ কেহ ইহাকে 'দ্বীপময়

ভারত' নাম দিয়াছেন। এই ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এবং ইহার প্রধান নৌ-ঘাঁটি ছিল সুরাবায়া। গত ডিসেম্বর মাসে চার্চ্চিল-রুজভেল্টের ওয়াশিংটন বৈঠকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রামের যে রণ-পরিকল্পনা স্থির হইয়াছিল, জেনারেল ওয়েভেল নিযুক্ত হইলেন উহার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি এবং এই সেনাপতি তাঁহার শিবির স্থাপন করিলেন সুরাবায়া নৌঘাঁটিতে। জাপানীরা প্রায় একযোগে আক্রমণ চালাইল বোর্ণিও, জাভা, সুমাত্রা, টাইমুর, নিউগিনি ইত্যাদির উপর। তাহাদের আক্রমণ পরিকল্পনা যেন পাখার মত ছড়াইয়া পড়িল দ্বীপ হইতে উপদ্বীপে, দেশ হইতে দেশান্তরে, সমুদ্র হইতে প্রণালীপথে এবং প্রণালী হইতে তীরভূমিতে—জাহাজ ও এরোপ্লেন হইল ইহার প্রধান সহায়। ম্যানিলা হইতে সুরাবায়া, ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট হইতে পোর্ট মোর্সবি —এই বিশাল দ্বীপময় সামুদ্রিক দেশে জাপানী সমরশক্তি প্রথমতঃ আকাশ হইতে নামিয়া আসিল একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের মত। তারপর সেই ঝড রণতরী, সৈন্য এবং গোলাগুলীর আশ্রয় করিয়া সমগ্র তীরভূমি ও স্থলভাগ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল অতি দ্রুত—বজ্র ও বিদ্যুতের মত ইহা ফাটিয়া পড়িল সমগ্র ওলন্দাজ সাম্রাজ্যে। ৩১শে জানুয়ারী বাটাভিয়া হইতে সংবাদ আসিল, আর বিলম্ব নাই—

যবদ্বীপের যুদ্ধ ক্রমশঃই আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রামে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ অভিযান নিম্নোক্ত প্রকারে অগ্রসর হইতেছে :—

(১) সিঙ্গাপুরের দিকে অগ্রগতি, এখানে বৃটিশবাহিনী আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে।

(২) পশ্চিম বোর্ণিওতে অবতরণ, অতঃপর সারাওয়াক হইতে আক্রমণ।

(৩) ম্যাকাসার প্রণালী দিয়া আক্রমণ।

(৪) নিউগিনির উত্তর দিকে মিনাহাসা দখল করিয়া লইয়া কেণ্ডারীতে আক্রমণ।

(৫) নিউগিনি এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান। আম্বয়নাতে বর্ত্তমান বিমান আক্রমণ উহারই অপরিহার্য্য অংশ।

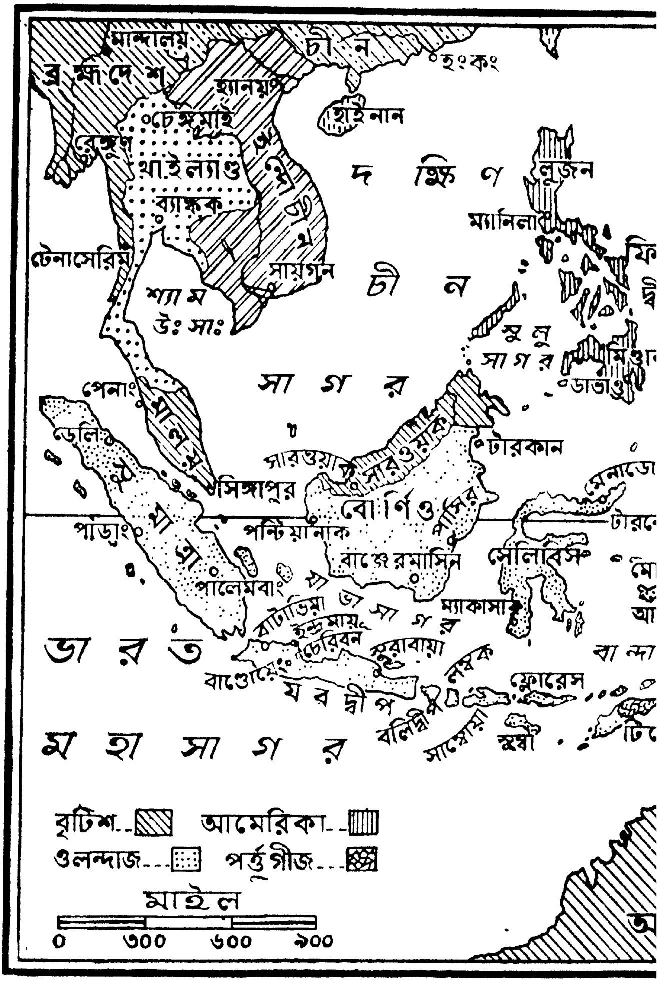
(৬) পশ্চিম বোর্ণিওর সমস্ত বিমানঘাঁটি জাপানীদের হস্তগত হইলে জাভায় ব্যাপকভাবে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা রহিয়াছে। জাভা

আক্রমণের পর জাপানীরা বাঞ্জের মাসিনে ঘাঁটি সকল হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে।

(৭) অষ্ট্রেলিয়ার সহিত মিত্রশক্তির সরবরাহ রক্ষা করিবার কার্য্যে টাইমুর দ্বীপ এক বিশেষ স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। উহাও আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মত এই দ্বীপময় সমুদ্রে পাঠকবর্গের পক্ষে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা কঠিন! মালয়ের শেষ প্রান্ত হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের জলপথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে একে একে বামে ও দক্ষিণে সুমাত্রা, জাভা, বালি, লম্বক, সুম্বা ইত্যাদি এবং বোর্ণিও, সেলিবিস্, মলাক্কা ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জের সারি দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলে পাওয়া যাইবে আম্বয়না।' আম্বয়না মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ। কিন্তু দ্বীপটি ক্ষুদ্র হইলেও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের ইহা দ্বিতীয় নৌঘাঁটি। এখানে একটি চমৎকার বিমান-ঘাঁটিও আছে। (এই সহরের বাসিন্দার সংখ্যা ২ লক্ষ ৭০ হাজার) ওলন্দাজ সাম্রাজ্যকে দ্রুত ঘিরিয়া ধরিবার জন্য ইহার প্রান্তবর্ত্তী নৌ ও বিমান-ঘাঁটি আগে দখলের দরকার। সুতরাং বহির্জগতের নিকট স্বল্প পরিচিত এবং ক্ষুদ্র আম্বয়না জাপানী আক্রমণের লক্ষীভূত হইল। ৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার সকালে বিমান আক্রমণ আরম্ভ হয়। দুই ঘণ্টা ধরিয়া জাপ বোমাবর্ষী বিমানসমূহ জঙ্গী বিমানের সহায়তায় সহরে বোমা ফেলে ও মেসিনগান চালায়। একটি গীর্জ্জা ও একটি স্কুল ভবন ধ্বংস হয় এবং রেডিয়ো ষ্টেশনের ক্ষতি হয়। বেলা ১টার সময় আম্বয়না হইতে একটি শত্রুপক্ষীয় সমরোপকরণবাহী জাহাজ দৃষ্টিগোচর হয়। সন্ধ্যাকালে শত্রুপক্ষের আসল আক্রমণ আরম্ভ হয়। উপকূলের কয়েক স্থানে শত্রুপক্ষীয় ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার ও সমরোপকরণবাহী জাহাজসমূহ দাঁড়াইয়া থাকে। পরদিন সকাল ৬-২০ মিনিটের সময়ও বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বলিতে দেখা যায়। এই সময় শত্রু-জাহাজ ও বিমানগুলি দ্বীপের উপর গোলা ও বোমাবর্ষণ করিতেছিল ও সর্ব্বত্র যুদ্ধ চলিতেছিল।.........

শনিবার সকাল বেলা আম্বয়না দ্বীপে জাপানীরা কিছু স্থল সৈন্য নামাইবার চেষ্টা করে এবং ঐস্থান হইতে কিছু দূরে জাপানীদের ৩খানা ক্রুজার, ৬খানা ডেষ্ট্রয়ার, ৪খানা সৈন্য ও রসদবাহী জাহাজ দেখা যায়। দুই দিনের মধ্যেই আম্বয়নার সহিত বাটাভিয়ার সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। ওলন্দাজ দ্বীপ-পুঞ্জের গবর্ণর-জেনারেল এক বেতার বক্তৃতায় ইহা প্রচার করেন এবং বলেন



জাপানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এখানকার ব্রুনি ও সারাওয়াকে যে চমৎকার পোতাশ্রয় আছে, নৌবহরের ব্যবহারের পক্ষে তাহা মূল্যবান।

আম্বয়নার সহিত বাটাভিয়ার সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। ওলন্দাজ দ্বীপ-পুঞ্জের গবর্ণর-জেনারেল এক বেতার বক্তৃতায় ইহা প্রচার করেন এবং বলেন

যে, আম্বয়নার সহিত সংযোগ নষ্ট হইলেও ওলন্দাজবাহিনী সংগ্রাম করিতেছে —অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই লড়াই চলিতেছে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আম্বয়না ওলন্দাজদিগের হাতছাড়া হইয়া যায়।

ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ বিমানযোগে আক্রমণ, তারপর সৈন্যবাহী ও রসদবাহী জাহাজসহ নৌবহরের আক্রমণ, জাহাজ হইতে প্রচুর গোলাবর্ষণ এবং সেই গোলাবর্ষণের আড়াল ধরিয়া সৈন্যদলের অবতরণ, তারপর তীরভূমিতে উভয় পক্ষের লড়াই—সংক্ষেপে ইহাই জাপানীদের রণকৌশল, দ্বীপগুলিতে তাহারা এই কৌশলই খাটাইয়াছে।

—২—

বোর্ণিও ও সুমাত্রা দখল

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী '৪২।

অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির পর বোর্ণিও সারা পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম দ্বীপ। দৈর্ঘ্যে ইহা ৮৫০ এবং প্রস্থে ৬০০ মাইল, লোকের সংখ্যা ২৫ লক্ষের বেশী হইবে। ইহার খনিজ সম্পদ, শস্য ও অরণ্য সম্পদ অতুলনীয়। তামা, লোহা, টিন, রূপা, সোণা ও হীরা বোর্ণিওতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে কয়লা, রবার ও পেট্রোল তো আছেই। যদিও বোর্ণিও দ্বীপের অধিকাংশের মালিক ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট, তথাপি ইংরাজদের এখানে কিছু অংশ আছে। উত্তর বোর্ণিও, ইহা নর্থ বৃটিশ বোর্ণিও নামে পরিচিত এবং সারাওয়াক—এখানকার মালিক একজন 'রাজা' উপাধিধারী ইংরাজ, যেমন আমাদের দেশে রাজা উপাধিধারী অনেক ভূমধ্যকারী আছেন। তবে, ইংরাজদের মধ্যে এই ধরণের 'রাজা' আর কেহই নাই। ইহা ছাড়া ব্রুনিতে একজন সুলতান আছেন, তবে ব্রুনিও বৃটেনেরই আশ্রিত। বোর্ণিওর আর বাকী অংশ সমস্তই হল্যাণ্ডের। ওলন্দাজ দ্বীপের ঐশ্বর্য্য যেমন লোভনীয় সামরিক দিক দিয়াও উহার গুরুত্ব যথেষ্ট। সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ চীনসাগর ও সুন্দা দ্বীপে নৌ-আধিপত্য বিস্তার ও রক্ষার জন্য বোর্ণিও দীর্ঘকাল ধরিয়া জাপানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এখানকার ব্রুনি ও সারাওয়াকে যে চমৎকার পোতাশ্রয় আছে, নৌবহরের ব্যবহারের পক্ষে তাহা মূল্যবান।

পেট্রোল, রবার ও কয়লা, যাহা আধুনিক যুদ্ধের পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য্য, তাহাও এই অঞ্চল অধিকারের দ্বারা জাপানের করতলগত হইবে। লেঃ কমাণ্ডার ইসিমারু লিখিয়াছিলেন—

The excellent harbours of Brunei and Sarwak could be available for use as bases for Japan's war of attrition in the Greater and Lesser Sunda Isles and for the Fleet covering her expedition to Singapur. The problems of obtaining oil fuel and supplying it to the fleet during its operations in the South China sea, and of obtaining rubber for the munition factories in Japan, would be simplified.—কাজেই বোর্ণিও দখল করিতে হইবে, অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা। জাপানী রণনীতিবিদ সেই আক্রমণের একটা নক্সাও দিলেন—একদা কোনও সেপ্টেম্বরের ভোর বেলা ৬খানা ১০ হাজার টনের ক্রুজার এবং কতকগুলি ডেষ্ট্রয়ার সৈন্যভর্ত্তি জাহাজগুলিকে লইয়া বৃটিশ বোর্ণিওর অদূরে দেখা দিবে। ইহারা দুই দলে ভাগ হইয়া যাইবে—একদল যাইবে ব্রুনি উপসাগরের দিকে এবং আর একদল সারাওয়াকে। রণতরী হইতে বোমারুর দল উড়িয়া গিয়া পোতাশ্রয়ে বোমাবর্ষণ করিবে। তারপর মাইনঝাটানো জাহাজগুলি আগে পাঠাইয়া পিছনে অনুসরণ করিবে ডেষ্ট্রয়ারসমূহ। এই ডেষ্ট্রয়ারগুলিতে থাকিবে প্রথম নৌ-অভিযাত্রী দল। তাহারা অতি দ্রুত অবতরণ করিয়া তীরভূমিতে ছুটিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে দেখা দিবে সৈন্যবাহী পোতগুলি, এক হাজার করিয়া সৈন্য দুই স্থানে নামিবে এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ সহরের দিকে অগ্রসর হইবে। সারাওয়াক বা ব্রুনিতে আত্মরক্ষাকারী সৈন্য কিছুই নাই—আছে কিছু পাহারাদার শান্ত্রী। সুতরাং বাঁশঝাড় কাটিবার মত জাপানী সৈন্যেরা প্রায় বিনা বাধায় অগ্রসর হইবে। রাত্রি ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থান দুইটি জাপানীদের করতলগত হইবে। ১৯৩৬ সাল হইতে এই প্ল্যান। ৬ বৎসর পর মোটামুটি ইহা কার্য্যকরী হইয়াছে। কেবল বৃটিশ বোর্ণিও নহে, গোটা বোর্ণিও দ্বীপই জাপানীরা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কাড়িয়া লইয়াছে।

ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের আক্রমণ দুই পর্য্যায়ের ছিল। প্রথম পর্য্যায়ে জাপানীরা বোর্ণিও, সেলিবিস, বালি ও টিমুর ইত্যাদি দ্বীপগুলি আক্রমণ করে। কারণ, এইগুলি ঠিক ওলন্দাজদের আসল ঘাঁটি জাভা ও

সুমাত্রার বর্হিঘাঁটি বা 'outer defence'এর মত। এই বর্হিঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয় দক্ষিণ মালয় ও দক্ষিণ ফিলিপাইনের অভিযানের শেষে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আক্রমণে তাহারা জাভা ও সুমাত্রা দখল করে। মালয় এবং দক্ষিণ ফিলিপাইনের দাভাও ও মিণ্ডানাও হইতে জাপ রণতরী, বিমানবহর ও বিমানবাহী জাহাজগুলি বোর্ণিও, সেলিবিস ইত্যাদি দ্বীপগুলির জলপথ ও আকাশপথ ধরিয়া অগ্রসর হয়। এই সমস্ত দ্বীপ আদৌ সুরক্ষিত ছিল না। সবশুদ্ধ ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য হয়তো তাহাদের ছিল, কিন্তু এমন কোন উপযুক্ত অস্ত্রসজ্জা ছিল না, যাহা দ্বারা আধুনিক সংগ্রাম চালানো যাইতে পারে। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি এরোপ্লেন ধার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলি সবই পুরানো ধরণের। ইহা ছাড়া মাটিতে আত্মরক্ষার জন্য বিমান-মারা কামানের অভাব ছিল। অপরপক্ষে জাপানীরা সমুদ্রে ও আকাশে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। সৈন্যসংখ্যায় ও অস্ত্রসজ্জায়ও তাহারা শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহারা দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে অগ্রগতির রণনীতি অনুসরণ করিল। উদ্দেশ্য জাভা ও সুমাত্রাকে ক্রমশঃ ঘিরিয়া ধরা। এই রণনৈতিক উদ্দেশ্যকে তাহারা জল ও আকাশপথের অভিযানে যেভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে এবং যেভাবে নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর মধ্যে সংযোগ রচনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজ লেখকেরা পর্য্যন্ত জাপানী নৌবহরের অধিনায়ক এডমিরাল ইয়ামামতোকে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।*

জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগেই উত্তর বোর্ণিওতে জাপ আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইতিপূর্ব্বে যে ব্রুণি পোতাশ্রয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা তাহারা দখল করে (৫ই জানুয়ারী)। ১০ই জানুয়ারী রাত্রিবেলা দক্ষিণ ফিলিপাইনের দাভাও হইতে দুইটি জাপ নৌবহরকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। একটি নৌবহর সেলিবিস দ্বীপের মেনাদোর অদূরে এবং আর একটি নৌবহর উত্তর বোর্ণিওর পূর্ব্ব তীরের তারাকানের অদূরে অগ্রসর হয়। তারাকানের তৈল কূপগুলি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ—এখানকার পেট্রোল এত উৎকৃষ্ট এবং এমন বিশুদ্ধ যে, যুদ্ধজাহাজগুলির পক্ষে ব্যবহারের জন্য এই তৈল পরিষ্কার বা

* 'It must also be admitted that Admiral Yamamoto—or whoever else directed the combined operations of Japan, handled the Japanese forces, naval, military and aerial and the fleets of transports and store-ships employed in the Southern Seas with the highest ability'.—

Hutchinson's 'Quarterly Record of the War', Vol. 10.

সংশোধন করিবার পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয় না। ৬টি ক্রুজার ও অনুরূপ সংখ্যক ডেষ্ট্রয়ারের পাহারায় ১৫টি সৈন্যবাহী জাহাজ তারাকানের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এখানে দুই হাজারের বেশী ওলন্দাজ সৈন্য ছিল না। সুতরাং তাহারা শীঘ্রই পরাভূত হয়। ১৩ই জানুয়ারী জাপানীরা তারাকান সম্পূর্ণরূপে দখল করে। জাপানীদের ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও ওলন্দাজগণ তারাকানের তৈলখনির যন্ত্রপাতি নষ্ট করিয়া ফেলে।

সেলিবিস দ্বীপের মেনাদোর (মিনহাসা উপদ্বীপ) নানা অংশে জাপানীরা প্যারাসুট সৈন্যযোগে আক্রমণ করে। বিমানঘাঁটির পতন হয় এবং ওলন্দাজ সৈন্যেরা পাহাড়ের দিকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু ২১শে জানুয়ারীর মধ্যেই সমস্ত প্রতিরোধ নষ্ট হইয়া যায়। এই সময় মার্কিণ নৌবহর জাপানী জাহাজ ও বিমানগুলির উপর কিছু কিছু আক্রমণ করে এবং এডমিরাল টমাস্ সি-হার্ট প্রাচ্য সমুদ্রের মিত্র নৌবহরসমূহের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। কিন্তু সেই সময় তিনি এত পীড়িত ছিলেন যে, তাহাকে ষ্ট্রেচারে করিয়া তীরে নামাইতে হয়।

জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই দ্বীপগুলির উপকূলভাগে ওলন্দাজ ও মার্কিনীরা জাপ নৌবহর ও বিমানবহরের উপর আক্রমণ চালাইয়া জাপানীদের কিছু ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। কিন্তু এই ক্ষতির নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া কঠিন। কারণ, বর্ণনাগুলি সমস্তই একতরফা। ২১শে জানুয়ারী ওলন্দাজেরা দাবী করে যে, তাহারা তারাকানের আত্মরক্ষার যুদ্ধে বিমান ও সাবমেরিণ আক্রমণ চালাইয়া ২৪টি জাপানী পোত ধ্বংস করিয়াছে। এইগুলির মধ্যে ছিল ২টি ক্রুজার, ৪টি ডেষ্ট্রয়ার, ১১টি সৈন্যবাহী জাহাজ এবং ৩টি তৈলবাহী পোত বা ট্যাঙ্কার। ইহার তিন দিন পর ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার ও সৈন্যবাহী জাহাজ সহ একটি শক্তিশালী জাপ নৌবহর ম্যাকাসার প্রণালীতে উপস্থিত হয়। ওলন্দাজেরা তখন পূর্ব্ব বোর্ণিওর গুরুত্বপূর্ণ তৈলকেন্দ্র বালিকপাপানের লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের তৈলকূপ ও যন্ত্রপাতি ধ্বংস করিয়া ফেলে। ২৫শে জানুয়ারী বাটাভিয়া হইতে স্বীকার করা হয় যে, জাপানীরা পূর্ব্ব বোর্ণিওর বালিকপাপান ও দক্ষিণ সেলিবিসের কেণ্ডারিতে অবতরণ করিয়াছে। উহার আগেই ২৩শে জানুয়ারী তারিখ মার্কিণ বোমারু ও ডেষ্ট্রয়ারগুলি এবং ওলন্দাজ সাবমেরিণ ও বিমানবহর ম্যাকাসার প্রণালীতে জাপ নৌবহরের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে—চারি দিন ধরিয়া এই আক্রমণ চলে। এই আক্রমণে জাপ

নৌবহরের গুরুতর ক্ষতি হয়। প্রথম দিনের যুদ্ধে জাপানীরা স্বীকার করে যে, তাহাদের চারিটি সৈন্যবাহী জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে, তবে, সৈন্যরা আগেই অবতরণ করিয়াছিল। ২৭শে জানুয়ারী তারিখে মার্কিণ ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ারগুলি দাবী করে যে,তাহারা ৭টি জাপ সৈন্যবাহী জাহাজ নষ্ট করিয়াছে, আরও ২টি জখম করিয়াছে। একটি মার্কিণ বিমান ১টি জাপ জাহাজ ধ্বংস করিয়াছে এবং বোধহয় ১টি বিমানবাহী জাহাজ মার্কিণ সাবমেরিণ কর্ত্তৃক নিমজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষতি সত্ত্বেও জাপানীরা বোর্ণিও দ্বীপের নানা অংশে ও অন্যান্য দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সমস্ত খণ্ডযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় জাপানীরা উত্তর বোর্ণিওর পূর্ব্ব তীরস্থ তারাকান এবং সেলিবিস দ্বীপে আক্রমণ ও অবতরণ করে। সেলিবিসে তাহারা প্যারাসুট সৈন্য নামাইয়াছিল, তারপর তিন সপ্তাহের মধ্যে তাহারা সানডাকান, ব্রুনি, সারাওয়াক, বালিকপাপান, বাঞ্জের মাসিন, কুচিন ও রাজধানী পন্টিয়ানাক অর্থাৎ চারিদিক হইতে সমস্ত বোর্ণিও ছাইয়া ফেলে। বিমানযোগে আক্রমণ ও জাহাজযোগে অবতরণ, ইহাই এখানকার রণনীতির বৈশিষ্ট্য। বালিকপাপানে ওলন্দাজ সেনাপতি কয়েক দিন বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু জাপানী শক্তি সমস্ত দিক দিয়াই অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। ওলন্দাজ বিমান ও নৌবহরও কিছু ছিল বটে, তথাপি সত্যকারের যুদ্ধ সম্ভবতঃ এক সপ্তাহের বেশী হয় নাই। তবে জঙ্গলের দিকে হটিয়া গিয়া ওলন্দাজ সৈন্যেরা কিছুকাল গেরিলা যুদ্ধ চালাইয়াছিল।

* *
*

সুমাত্রা দখল :

মানচিত্রের দিকে তাকাইলে মনে হইবে মালয় বা সিঙ্গাপুর হইতে পা বাড়াইলেই সুমাত্রা দ্বীপে পৌঁছানো যায়—কেবল মাঝখানে মালাক্কা প্রণালীর একটা সরু গলি ডিঙ্গাইতে হইবে। বোর্ণিওর মত এই দ্বীপটি ছড়ানো নহে, অভিনব লম্বা আকৃতির। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা লম্বায় ১১০০ মাইল, আর চওড়ায় মাত্র ১০০ এবং কোথাও কোথাও ২৪০ মাইল। লোক সংখ্যা বোর্ণিওর চেয়ে আড়াই গুণ বেশী। ১৯২৭ সালে

এখানে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৬২ লক্ষ ১৯ হাজার। ইহার প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ বোর্ণিওর মতই লোভনীয়। জাপানীদের সুমাত্রা আক্রমণের উদ্দেশ্য হইল একদিকে সিঙ্গাপুর ও মালয়কে বিচ্ছিন্ন করা এবং অন্যদিকে ওলন্দাজদের আত্মরক্ষার আসল ঘাঁটি জাভাকে বিচ্ছিন্ন করা। সুমাত্রা এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। এখানকার যুদ্ধে জাপানীরা গোড়াতেই প্যারাসুট সৈন্যের কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এত ব্যাপকভাবে প্যারাসুট সৈন্যসহ আক্রমণ জাপানীরা আর কোথায়ও করে নাই। জাপানীদের বিমানবাহিনী ও বিমানবহর সম্পর্কে পূর্ব্বে মিত্রশক্তিবর্গের যে ধারণা ছিল, তাহা এই সমস্ত দ্বীপের যুদ্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই আধুনিক কায়দার লড়াইয়ে জাপানীরা জার্ম্মাণ রণকৌশল অনুসরণ করিয়াছে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী বাটাভিয়া হইতে সংবাদ আসে—

গতকল্য (শনিবার) পালেম্বাংয়ে জাপ প্যারাসুট সৈন্যদের অবতরণের পর অদ্য জাপানী সৈন্যগণ জাহাজ হইতে ব্যাপকভাবে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ ঘোষণার পর বলা হইয়াছে যে, এই গুরুত্বপূর্ণ তৈলকেন্দ্রের কলকারখানা ধ্বংসের কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, জাপানীরা মালয়ের পূর্ব্বে অবস্থিত আনাম্বা দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়াছে। দক্ষিণ সেলিবিসে যুদ্ধ চলিতেছে। ম্যাকাসারের নিকট ওলন্দাজ সৈন্যগণ দৃঢ়ভাবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে।

বাটাভিয়া হইতে 'রয়টারের' বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, পালেম্বাংয়ের নিকট জাহাজ হইতে বহু সংখ্যক জাপ সৈন্য অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে অদ্য (রবিবার) জাপানীরা সুমাত্রায় পূরাদমে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। গতকল্য সাত শত প্যারাসুট সৈন্য অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। জাপানীরা ব্যাপকভাবে পালেম্বাং আক্রমণ করিতেছে। ইহা পৃথিবীর একটি বৃহৎ তৈলকেন্দ্র। এখানে একটি বিমান ঘাঁটিও আছে। তৈল শোধনাগার, যন্ত্রপাতি ও তৈলখনিগুলি ধ্বংস করা হইলে ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বেচ্ছায় বৃহত্তম সম্পত্তির ধ্বংস কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। পালেম্বাংয়ে প্রতি বৎসর সাড়ে ৪২ লক্ষ টন তৈল উৎপন্ন হয়। পালেম্বাংয়ের পতন হইলে বাংকা দ্বীপেও জাপ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাংকা অধিকৃত হইলে দক্ষিণ দিক হইতে সিঙ্গাপুরে প্রবেশের পথ বন্ধ

হইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে সিঙ্গাপুর দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে।......

ওলন্দাজ সেনাদপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, শনিবার অনেক জাপ প্যারাস্যুট সৈন্য পালেম্বাংয়ের নিকটে অবতরণ করিয়া আক্রমণ চালায়। একটি জাপ বোমারু বিমান ধ্বংস করা হয়। মোটামুটি হিসাবে জানা গিয়াছে যে, তিনটি স্থানে কয়েক শত প্যারাস্যুট সৈন্য অবতরণ করে। তাহাদের নিকট 'টমিগান' ও 'ট্রেঞ্চ মর্টার' ছিল। তৈল শোধনাগারের দিকেই আক্রমণ চালান হয়, কিন্তু শত্রুপক্ষ তাহা দখল করিতে পারে নাই। আমাদের সৈন্যগণ আক্রমণকারী সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে থাকে। আক্রান্ত দুইটি স্থানে প্যারাস্যুট সৈন্যদিগকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। তৃতীয় স্থানেও আমরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করি। সেখানে একশতেরও কম প্যারাস্যুট সৈন্য জীবিত ছিল। ব্যাপকভাবে সৈন্য অবতরণের আশঙ্কায় শনিবার রাত্রিতে আমরা পালেম্বাংয়ের নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ কলকারখানাগুলি (৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের) ধ্বংস করিতে আরম্ভ করি। অদ্য (রবিবার) বহু সংখ্যক শত্রুসৈন্য অবতরণ করিতেছে। অদ্য প্রাতে ওলন্দাজ বোমারু বিমানসমূহ বাংকা দ্বীপে মাণ্টাকের নিকট তিনটি জাপ সমরোপকরণবাহী জাহাজের ঠিক উপরে বোমা ফেলিয়াছে। দক্ষিণ সেলিবিসে যুদ্ধ চলিতেছে। ম্যাকাসারের নিকটে ওলন্দাজ সৈন্যগণ দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ চালাইতেছে। জাপানীরা মালয়ের পূর্ব্বে আনাম্বাস দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছে। বহিঃপ্রদেশগুলিতে শত্রুপক্ষের অধিকতর তৎপরতার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐদিনই ওলন্দাজ সমর দপ্তরের আর একটি ইস্তাহারে প্রকাশ:—শনিবার সকালে জাপানীরা প্যারাস্যুট সৈন্য লইয়া পালেম্বাংয়ে আক্রমণ করিয়াছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। শত্রুপক্ষ সুমাত্রার বহু স্থানে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালাইয়াছে। কয়েক জায়গায় তাহারা আক্রমণও করিয়াছে। সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত টিনশিল্প-প্রধান বিলিটন দ্বীপের রাজধানী টাণ্ডজং পাণ্ডাংয়ে কয়েকটি বোমা বর্ষিত হইয়াছে। দুইটি জাপ জঙ্গী বিলিটন দ্বীপের বিমান ময়দানে মেশিনগান হইতে গুলীবর্ষণ করে।

জাপানীরা যে সমস্ত দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে, সেখানে তাহারা বিপুল বাধা পাইতেছে। সুমাত্রায় জাপ সৈন্য অবতরণে এক বিরাট সংগ্রামের সূচনা হইয়াছে।

ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ যদিও এক বিরাট সংগ্রামের স্থচনা দেখিয়াছিলেন তথাপি উহা স্থচনাতেই রহিয়া গেল। উভয় পক্ষে বিরাট সংগ্রাম বাধিল না। জাপানীরা পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই তারিখ পালেম্বাং দখল করিয়া লয়। প্রথমতঃ ওখানে তাহারা প্যারাস্থট সৈন্য নামাইয়া দেয়। তারপর তাহারা বহু সংখ্যক জাহাজ লইয়া উপস্থিত হয় এবং সেই সমস্ত জাহাজ হইতে বহু সহস্র সৈন্য পালেম্বাংয়ে অবতরণ করে। মুশি নদী ধরিয়া নৌকাযোগেও অনেক জাপ সৈন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। বোমা ও মেশিনগানের দ্বারা ইহাদিগকে বাধা-দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। বাংকা প্রণালীতে জাপানীদের ৫খানা সৈন্যবাহী জাহাজ ও ২খানা ক্রুজারের উপর মিত্রপক্ষীয় বিমান বোমা-বর্ষণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ঐগুলি ডুবিয়াছে কিনা জানা যায় নাই।

* *

*

ইহার পরেও স্থমাত্রার কোন কোন অঞ্চলে যুদ্ধ চলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। প্যারাস্থট সৈন্যের যুদ্ধ সর্ব্বদাই বিপজ্জনক। খুব দক্ষ, সাহসী এবং মৃত্যুভয়জয়ী সৈন্য ছাড়া প্যারাস্থটবাহিনী গঠন করা কঠিন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষিপ্রতা এবং দুর্দ্দান্ত সাহস তো চাইই, অধিকন্তু দক্ষ বৈমানিকের যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন তাহাও চাই। দীর্ঘকালের উৎকৃষ্ট ট্রেণিং এই সমস্ত সৈন্যের প্রয়োজন। ১৯৪০ সালে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে জার্ম্মাণী যে নূতন কায়দায় লড়াই করিয়াছিল, তাহাতে ব্যাপকভাবে প্যারাস্থট সৈন্যের ব্যবহার হইয়াছিল। বোধহয় ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধে রাশিয়াও ইহার প্রয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু প্যারাস্থট সৈন্যের নির্ম্মম যুদ্ধের আসল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ১৯৪১ সালের ক্রীটে। এই প্রকার সংগ্রাম সামরিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। পর পর কয়েক দিন ধরিয়া হাজারে হাজারে প্যারাস্থট সৈন্য আকাশ হইতে নামিয়াছিল জীবন হাতে করিয়া। পাথরে মাথা ঠুকিয়া মরিবার মত প্যারাস্থট সৈন্যদিগকে আত্মবলি দিতে হইয়াছিল ক্রীটে। তথাপি বৃটিশবাহিনী এই দুর্দ্দান্ত আক্রমণে পরাজিত এবং ক্রীট দ্বীপ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিল। তারপর ইউরোপের পূর্ব্ব রণাঙ্গনে প্যারাস্থট সৈন্যের সংগ্রামের কিছু কিছু সংবাদ আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ব্যাপক আকারের নহে। স্থমাত্রা দ্বীপে জাপানের আক্রমণ ব্যাপক আকারে ঘটিয়াছে এবং তাহা মূলতঃ প্যারাস্থট সৈন্যের সাহায্যে। নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনী

পরে আসিয়া হাজির হয় দলে দলে। প্যারাসুট সৈন্যেরা নিজেরা যেমন ভয়াবহ বিপদ ঘাড়ে করিয়া মাটিতে নামে, তেমনিই আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদলও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়। সাধারণতঃ তাহারা প্রতিপক্ষের একান্ত পশ্চাতে অবতরণ করে এবং যত্রতত্র অবতরণ করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে হাল্কা মেশিনগান হইতে অজস্র গুলী বর্ষণ করিয়া অপরিমিত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তাহারা প্রতিপক্ষের মূল ঘাঁটির সহিত পশ্চাতের যোগাযোগ কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। পিছন হইতে এভাবে আক্রান্ত হওয়ার ফলে আত্মরক্ষাকারী সৈন্যেরা স্বভাবতঃই বিষম বিপদে পড়ে। কারণ, পশ্চাতের এই আক্রমণের সঙ্গে সম্মুখ বা দুই পার্শ্ব দিয়াও শত্রুর স্থলসৈন্য আধুনিক মারণাস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। এই অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য যদি পূর্ব্ব হইতে প্রচুর আয়োজন না থাকে, তবে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদল বেশীক্ষণ টিকিতে পারে না। সুমাত্রায়ও সম্ভবতঃ ইহাই ঘটিয়াছিল। (বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই)। ক্রীটের প্যারাসুট সৈন্যের আক্রমণে জার্ম্মাণী গ্রীসের দক্ষিণ প্রান্ত-ভূভাগের সহায়তা পাইয়াছিল। ক্রীট হইতে উহার দূরত্ব ৬০ মাইলের বেশী ছিল না। কিন্তু জাপানী বিমান সৈন্যেরা সুমাত্রা আক্রমণে কোন স্থলবর্ত্তী বিমান ঘাঁটির সাহায্য পাইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই। অবশ্য পূর্ব্বাহ্নে বোর্ণিও দখল করায় তাহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু বোর্ণিও হইতে সুমাত্রা আকাশ-পথে কয়েক শত মাইল হইবে। সুতরাং প্যারাসুট সৈন্যেরা বোধহয় সেখান হইতে আসে নাই। তাহারা আসিয়াছে বিমানবাহী জাহাজ ও যুদ্ধ-জাহাজ হইতে। এই জাহাজগুলিকেই তাহারা ঘাঁটির মত ব্যবহার করিয়া সুমাত্রার আকাশে পাখীর ঝাঁকের মত উড়িয়াছিল। কার্পাস তুলা আকাশে ফাটিয়া ছড়াইয়া গেলে যেমন দৃশ্যের অবতারণা হয়, শত শত বিমান-ছত্রীর (প্যারাসুট সৈন্য) একযোগে আকাশ হইতে অবতরণের চেষ্টা নিশ্চয়ই অনুরূপ দৃশ্যের সূচনা করিয়াছিল! সুমাত্রায় আত্মরক্ষার কোন ব্যাপক আয়োজন ছিল না স্থলপথে, আকাশপথে ও সমুদ্রপথে জাপানের ত্রিধারার আক্রমণকে রোধ করিতে পারে, এমন ব্যবস্থার সম্ভব ছিল না। একথা মনে রাখা দরকার ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের আসল শক্তির উৎস হল্যাণ্ড। কিন্তু ১৯৪০ সালেই হল্যাণ্ড জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছিল। যেখানে মাতৃভূমি অপরের করতলগত, সেখানে উহার ঔপনিবেশিক 'সন্তান রাষ্ট্রের' পক্ষে এতবড় যুদ্ধ-

চালানো স্বভাবতঃই সম্ভব নহে। অপরপক্ষে মিত্রশক্তিপুঞ্জও জাপানের ব্যাপক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং বোর্ণিও, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপের দ্রুত পতনে বিস্ময়ের কোন করণ নাই।

—৩—

বালি ও জাভার পথে

ফেব্রুয়ারী '৪২।

ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বলি দ্বীপ ও যব দ্বীপ কিম্বা বালি ও জাভা ভারতবর্ষের নিকট অনেকটা পরিচিত। কয়েক বৎসর আগে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সমাজে বৃহত্তর ভারতের যে আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহাতে এই দ্বীপের কথা যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছিল। কবি রবীন্দ্রনাথের 'দ্বীপময় ভারত' ভ্রমণের পর হইতে বালি ও জাভার সঙ্গে ভারতবর্ষের যেন একটা নিয়মিত যোগ সৃষ্টি হইয়াছিল। বালি, জাভা ও মাদুরার স্থাপত্যশিল্প এবং নৃত্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে কোথাও বোধহয় বলি দ্বীপের মত এত বেশী মন্দির নাই। ভ্রমণকারী ও শিল্পীদের নিকট বলিদ্বীপ তীর্থস্থানীয়। দ্বীপটি অতি ঘন বসতিপূর্ণ এবং ক্ষুদ্র, এখানে ধান জন্মে প্রচুর। জাভার ইহা একান্ত নিকটবর্ত্তী। মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ ও অগভীর বলি প্রণালী ছাড়া আর কোন ব্যবধান নাই। বস্তুতঃ বলি দ্বীপের উপকূল হইতে যবদ্বীপের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এবং বেতার কেন্দ্রের দূরত্ব দেড় মাইলেরও কম। এই দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা ১০ লক্ষ হইবে। বোর্ণিও ও সুমাত্রার পরেই জাভা প্রকাণ্ড দ্বীপ। সুমাত্রা ও জাভা কাছাকাছি, মনে হয় একটি দ্বীপই মধ্যপথে সুন্দা প্রণালীর দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। বোর্ণিও ও যবদ্বীপের মধ্যে জাভা সাগর। ইহাও সুমাত্রার মত লম্বা আকৃতির, দৈর্ঘ্যে ৬৩২ মাইল এবং প্রস্থে ৩৫ হইতে ১২১ মাইল। মাদুরা দ্বীপসহ ইহার লোক সংখ্যা ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ। ইহাও প্রাকৃতিক সম্পদে উন্নত। এই দ্বীপের ভিতরের দিকটা পাহাড়ে আচ্ছন্ন, তবে উত্তর উপকূলে অনেকগুলি উপসাগর থাকায় বন্দর ও পোতাশ্রয়ের পক্ষে এই দিকটা উৎকৃষ্ট। ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৌঘাঁটি সুরাবায়া এবং রাজধানী বাটাভিয়া—এইগুলি উত্তরবর্ত্তী উপকূলে। ইহা ছাড়া দক্ষিণে জেলিয়াৎজাপ নামেও একটি ঘাঁটি আছে। সিঙ্গাপুরের পর সুরাবায়াই দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রশক্তির একমাত্র বড় ঘাঁটি ছিল।

এই ঘাঁটিগুলির উপর জাপানী আক্রমণ সুরু হয় ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে।

ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের প্রাণকেন্দ্র জাভা। সুতরাং জাভাকে প্রাণপণ শক্তিতে রক্ষা করা হইবে এবং সেখানে উপযুক্ত আয়োজন আছে, সিঙ্গাপুরের পতনের পর একথা বার বার ঘোষিত হইয়াছিল। একজন বিশেষজ্ঞ ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখ জানাইলেন :—

'সিঙ্গাপুরের শোচনীয় দুর্গতি এবং বোর্ণিও অঞ্চলে জাপানীদের অগ্রগতি সত্ত্বেও ওলন্দাজদের সমর প্রবৃত্তি অটল রহিয়াছে। জাপানীরা যবদ্বীপ জয় করিতে পারিবে, এ ধারণা তাহারা মনের কোণেও স্থান দেয় না। অন্য কোন দেশ টের পাইবার আগেই ওলন্দাজরা জাপানীদের অভিসন্ধির কথা টের পাইয়াছিল। ভিসি সরকারকে বাধ্য করিয়া জাপানীরা যখন ইন্দোচীনের উত্তর খণ্ড অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তখন হইতেই ওলন্দাজরা পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ রক্ষার ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করে। তাহারা আমেরিকাতে দুই কোটি পাউণ্ড মূল্যের বিমান এবং অন্যান্য সমরোপকরণের অর্ডার দেয়। তাহারা জঙ্গলের মধ্যে এমন কতকগুলি বিমান ময়দান গড়িয়া তোলে যে, অজানা লোকের পক্ষে সেগুলি আকাশ হইতে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। যবদ্বীপের রাস্তাঘাটগুলি অতি চমৎকার। যে কোন স্থানেই বিপদ দেখা দেউক না কেন ঐ সমস্ত পথ দিয়া ত্বরায় সৈন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। ওলন্দাজদের নৌ-বহর ইতিমধ্যেই তাহাদের রণশক্তির প্রমাণ দিয়াছে। গতকল্য জাপানীরা একটি প্রবল বিমানবহর লইয়া সুরাবায়া আক্রমণ করিতে যাইয়া যেরূপ নাজেহাল হইয়া আসিয়াছে, তাহাতেই ওলন্দাজ বৈমানিকদের শৌর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের জন্য যে সমস্ত রণবল প্রেরিত হইতেছিল সেই সমস্ত রণবলের সুবিধাও তাহারা পাইবে। যবদ্বীপীরা কোনপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠিত হইবে না। প্রতি পর্ব্বত কন্দর গহন অরণ্য এবং গ্রাম হইতে তাহারা যুদ্ধ করিবে। যবদ্বীপ শত্রুহস্তে সমর্পণ করা হইবে না, যবদ্বীপ পরিত্যাগ করা হইবে না, ইহাই তাহাদের দৃঢ় পণ। আর্থিক তথা রণনীতি উভয়দিক হইতেই পূর্ব্ব এশিয়াতে যবদ্বীপ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। স্থানটির আয়তন ছোট হইলেও এখানে এমন কতকগুলি জিনিষ প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে জাপানের যাহা একান্ত অভাব। তদুপরি এই স্থানটি প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশের প্রধান দ্বার।'

একথা সত্য যে, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একমাত্র যবদ্বীপ বা জাভাতেই জাপানীরা অপেক্ষাকৃত প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়াছিল এবং ওলন্দাজ সামরিক কর্তৃপক্ষ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াছিলেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী '৪২।

জাভা ও বালির উপর জাপানীরা প্রায় একই সঙ্গে আক্রমণ চালায়। সুরাবায়ার নৌঘাঁটির উপর প্রথমতঃ বিমান আক্রমণের পর, তাহারা নৌবহর-যোগে অগ্রসর হয়। জাভা সাগরে প্রকাণ্ড নৌ-সংগ্রামের সূচনা হয়। কিন্তু প্রথম দিনের সংবাদেই দেখা যায় জাপানীরা বলি দ্বীপে সৈন্য নামাইয়া দিয়াছে এবং বলি দ্বীপ দখলের লড়াই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বালিতে জাপানীদের আক্রমণ দেখিয়া মনে হয় যে, পূর্ব্ব যবদ্বীপে ও সুরাবায়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার আয়োজনও সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। ওদিকে সুমাত্রার অধিকাংশ জাপানীদের হস্তগত হওয়ায় তাহারা সেখান হইতেও পশ্চিম যবদ্বীপে আক্রমণ চালাইতে পারিবে।

২২শে ফেব্রুয়ারী।—জাপ আক্রমণ পরিকল্পনা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতেছে। তাহারা তিনটি তীক্ষ্ণধার ফলকের আকারে যবদ্বীপের উপর আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। পশ্চিম দিকে সুমাত্রা হইতে, উত্তর দিকে বোর্ণিও ও সেলিবিস হইতে এবং পূর্ব্ব দিকে বলি দ্বীপ হইতে আক্রমণ চলিতেছে। জাপানীরা বলি দ্বীপ আক্রমণ করার পূর্ব্বেই অনুমিত হইয়াছিল যে, চতুর্দ্দিক হইতে যবদ্বীপকে ঘিরিয়া ধরিবার আয়োজন হইয়াছে। স্থলপথে ও জলপথে মিত্রবাহিনী ও নৌবহর তাহাদিগকে প্রবলভাবে বাধা দিতেছে।

শুক্রবার সমস্ত রাত্রি ও আজ সমস্ত দিন বলি দ্বীপ দখলের জন্য যুদ্ধ চলিয়াছে। যুদ্ধের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই, তবে, শনিবার সন্ধ্যাকালে নৌ-দপ্তর জানাইতেছেন যে, বৃহস্পতিবার রাত্রিতে মার্কিণ ও ওলন্দাজ যুদ্ধজাহাজের আক্রমণে দুইখানি জাপানী ক্রুজার ও দুই-খানি জাপানী ডেষ্ট্রয়ার গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একখানি জাপানী ক্রুজার বিস্ফোরিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু উহা ক্ষতিগ্রস্ত ক্রুজার অথবা অপর কোন জাহাজ তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। প্রকাশ, মিত্রবাহিনী সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইতেছে। মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর দিবাভাগে তাহাদিগকে সাহায্য করে। বর্ত্তমান যুদ্ধ যে বিরাট আকারে আরম্ভ হইয়াছে, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। ম্যাকাসার প্রণালীর যুদ্ধের

তুলনায় বলি দ্বীপের নিকটে অনেক বড় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, টর্পেডো লাগিয়া শত্রুর একখানা ক্রুজারে আগুন ধরে ও আধ ঘণ্টা পরে উহা ফাটিয়া যায়। এইবার সর্ব্বপ্রথম ওলন্দাজ ক্রুজারগুলি আক্রমণ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে উহাদিগকে ভিন্নরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে সুরাবায়া ও যবদ্বীপের পূর্ব্ব অঞ্চল দখলের যুদ্ধের ইহাই প্রথম পর্য্যায়। বলি দ্বীপের চতুষ্পার্শ্বর্ত্তী সমুদ্রে খরস্রোত বহিয়া থাকে; সমুদ্রের মধ্যে বহু প্রবাল চূড়া আছে—উত্তাল তরঙ্গ উহার উপর প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। সর্ব্বোপরি ঐ অঞ্চলে হিংস্র হাঙ্গরগুলি ঘোরাফেরা করে। কেবলমাত্র অগভীর খোলের জাহাজই উপকূলের নিকটে যাইতে পারে। সুতরাং অবতরণ করিতে হইলে জাপানী সৈন্যদিগকে উপকূল হইতে যথেষ্ট দূরে জাহাজ রাখিয়া নৌকায় চড়িতে হইবে। তারপর তাহাদিগকে বহুদূর গিয়া ডাঙ্গায় নামিতে হইবে, নৌকায় যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ তাহাদিগকে রক্ষা করার বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকিবে না। অবশ্য প্রবাল চূড়ার জন্য মিত্রপক্ষীয় সাবমেরিণগুলিও ঐ অঞ্চলে যাইতে পারিবে না। সুতরাং উভয় পক্ষেই বিঘ্নের প্রশ্ন আছে।

জেনারেল ওয়েভেলের দপ্তর হইতে প্রকাশ যে, মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর শত্রু-জাহাজের উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইয়াছে। বলি দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে বোমারু বিমানগুলি শত্রু-সৈন্যবাহী একখানা বড় জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে এবং কয়েকখানি ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ারের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। আর দুইখানি ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ারের উপর আক্রমণকালে শত্রু-জাহাজের উপর কতকগুলি বোমা পড়িতে দেখা যায়। বলি দ্বীপের গেস আসর নামক স্থানে সৈন্য নামাইতে নিযুক্ত শত্রু-জাহাজের উপর মিত্রপক্ষীয় ছোঁমারা বিমানগুলি আক্রমণ চালাইয়াছিল। ৪ খানি শত্রু-জাহাজের উপর কতকগুলি বোমা পড়িতে দেখা যায়।

মুসা নদীতে শত্রু-বাণিজ্য-জাহাজের উপর আমাদের বিমানবহর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইয়াছে। ৮ হাজার টনের এক খানি শত্রু-জাহাজের উপর বোমা পড়ে, ৫ হাজার টনের একখানি জাহাজের কাপ্তেনের সেতুর উপর বোমা পড়ে, ৮ হাজার টনের আর একখানি জাহাজের অতি নিকটে বোমা পড়িয়াছিল।

বাংকা প্রণালীতে একখানি সৈন্যবাহী জাহাজের উপরও বোমা পড়িয়াছিল। ৫ হাজার টনের আর একখানা বাণিজ্য-জাহাজের উপর বোমা পড়িয়াছিল।

বলি দ্বীপের অদূরে মিত্রপক্ষীয় নৌবহরের আক্রমণকালে শত্রুর একখানা ক্রুজার ও একখানা ডেষ্ট্রয়ারে টর্পেডো লাগিয়াছে, আর একখানা ক্রুজারে টর্পেডো দ্বারা আঘাতের পরে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে একখানা জাহাজ খণ্ডখণ্ড হইয়া গিয়াছে।

* *
*

জাভা সাগরের নৌযুদ্ধ

২৭ শেফেব্রুয়ারী, '৪২।

মিত্রপক্ষ দাবী করিতেছেন যে, বলি দ্বীপের নিকট জাভা সাগরের প্রচণ্ড নৌযুদ্ধে জাপানীদের মোট ৪১টী জাহাজ বিনষ্ট ও ১৫টি জাহাজ জখম হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও জাপানীরা বলি দ্বীপে অবতরণ করিয়া উহার অংশ-বিশেষ, এমন কি বিমান ঘাঁটি দখল করিয়া ফেলিয়াছে।

জাভা সাগরের নৌযুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিণ সমর বিভাগ জানাইতেছেন— 'বলি দ্বীপের উপকূলের নিকটে জাপ নৌবহরের উপর আক্রমণ চালাইবার সময় ওলন্দাজ বিমানসমূহও যোগদান করিয়াছিল। জাপ নৌবহরে দুইটি ক্রুজার, চারিটি অথবা পাঁচটি ডেষ্ট্রয়ার ও চারিটি সৈন্যবাহী জাহাজ ছিল। নৌবহরটিকে বলি দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলের নিকটে দেখা যায়। বড় বড় মার্কিণ বোমারু ও ছোঁমারা বিমান উহার উপর আক্রমণ চালায়। বোমারুগুলি ক্রুজারগুলির উপর সরাসরি তিনটি কিংবা ততোধিক বোমা নিক্ষেপ করে। সৈন্যবাহী জাহাজগুলির উপর দুইটি বোমা সরাসরি গিয়া পড়ে। মার্কিণ ছোঁমারা বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বোমা একটি ক্রুজার ও একটি সৈন্যবাহী জাহাজের গায়ে লাগে। চারিটি জাপ-জঙ্গী গুলীর আঘাতে পড়িয়া গিয়াছে। এই আক্রমণে কোন মার্কিণ বিমানের ক্ষতি হয় নাই। ইহার পর ১৬ খানা জঙ্গীর সাহায্যে ৭খানা মার্কিণ ছোঁমারা বিমান পুনরায় জাপ জাহাজগুলির উপর হানা দেয়।

এই সংগ্রামে একটি জাপ ক্রুজার গুরুতরভাবে জখম হয়। দুইটি মার্কিণ জঙ্গী ও দুইটি ছোঁমারা বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। আর একবার বলি দ্বীপের নিকটে তিনটি বড় বড় মার্কিণ বোমারু আর একটি জাপ ক্রুজারের উপর আক্রমণ চালায় এবং উহার উপর তিনটি বোমা ফেলে। ইহার পর আর একবার 'উড়ন্ত কেল্লা' শ্রেণীর তিনটি মার্কিণ বোমারু জাপ জাহাজসমূহের উপর হানা দেয়। কিন্তু এই শেষোক্ত আক্রমণের ফল কি হইয়াছে জানা যায় নাই। এই সম্পর্কে আর একটি চমকপ্রদ বর্ণনা এই যে, বলি দ্বীপের অদূরে ওলন্দাজ ও মার্কিণ রণপোত এবং বিমান একযোগে জাপানী যুদ্ধজাহাজ এবং পারাপারের জাহাজগুলির উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে দারুণ শায়েস্তা করিয়াছে। ওলন্দাজরা বিস্ময়কর বদ্ধপরিকরতার সহিত যুদ্ধ করিয়া জাপানীদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, তাহাদের নিজেদের দাওয়াই কত তিতা! জাপানীদের ক্ষতির লেখাজোখা নাই! ভাইস-এডমিরাল হেলফ্রিস সবেমাত্র নৌবাহিনীর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।* এই পদ গ্রহণ করিয়াই তিনি তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সকল দিক ভাল করিয়া হিসাব করিয়া তিনি এমন এক স্থানে জাপানী নৌবহর আক্রমণ করিয়া বসেন, যেখানে জাপানের পক্ষে তাহার প্রধান বহরের সাহায্য পাইবার সুবিধা নাই। জলভাগে ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ার এবং আকাশপথে বিমানসহ তিনি জাপানীদের উপর হানা দেন। জাপানীদের যে ঠিক কত ক্ষতি হইয়াছে তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। তবে, তাহাদের অন্ততঃ ৪১টি জাহাজ যে বিনষ্ট এবং ১৫টি যে জখম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিত্রপক্ষের মাত্র একটি ডেষ্ট্রয়ার মারা গিয়াছে। তারপর আরও একটা কথা আছে। আকাশ হইতে যেমন বোমা ফেলা হইয়াছে, যুদ্ধ-জাহাজ হইতে তেমনই টর্পেডো মারা হইয়াছে ও কামানের গোলা ছাড়া হইয়াছে। টর্পেডো ও কামানের গোলাগুলী সম্ভবতঃ আকাশ হইতে ফেলা বোমা অপেক্ষা অনেক বেশী মারাত্মক হইয়াছে। কাজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, জখমী জাহাজগুলির কয়েকটি একেবারে অচল হইয়াই পড়িয়াছে।

* ১২ই ফেব্রুয়ারী এডমিরাল হার্ট দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের মিত্রপক্ষীয় নৌবহরের অধিনায়কত্বে ইস্তফা দেন এবং ওলন্দাজ নৌবহরের ভাইস-এডমিরাল হেলফ্রিস তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন। ভাইস-এড্মিরাল সি ই গ্লাসফোর্ড মার্কিণ নৌবহরের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন।

জাপানীরা সম্ভবতঃ ম্যাকাসার প্রণালী ছাড়া অন্য কোথাও এত বড় মার খায় নাই।…

উপরে মিত্রপক্ষের যে সমস্ত আশাব্যঞ্জক রোমাঞ্চকর বর্ণনা দেওয়া গেল, তাহা হইতে এমন ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, জাপানীরা সহজে জাভা দখল করিতে পারিবে না। কারণ, সমুদ্রপারবর্ত্তী দ্বীপ দখলের জন্য যে নৌবহরের প্রয়োজন যদি তাহা ঘায়েল হইয়া যায়, তবে সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করা যায় না। ফলে জাহাজযোগে সৈন্যদল আনয়ন বা অবতরণ সম্ভব নহে। কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে যে অতিশয়োক্তি ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, ইহার দুই দিন পরেই যব দ্বীপের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। জাপানীরা উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কতকগুলি ঘাঁটি দখল করিয়া লইল। জেনারেল ওয়েভেল, যিনি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক ছিলেন, তিনি তাঁহার প্রধান শিবির সুরাবায়া পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া যান।* জাভা রক্ষার ভার ওলন্দাজ সেনাপতিদের হাতে দেওয়া হয়। জাভার রাজধানীও ব্যাণ্ডোয়েংয়ে স্থানান্তরিত হয়। যদি জাভা সাগরের নৌযুদ্ধে জাপানীদের চূড়ান্ত পরাজয় হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এত দ্রুত যব দ্বীপের বিপদ ঘটিত না। অপর পক্ষে জাপানীরা দাবী করিয়াছিল যে, জাভার নৌ-যুদ্ধে বিশেষভাবে ওলন্দাজবহর ঘায়েল হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষের দাবীর অতিশয়োক্তি বাদ দিলে ইহাই মনে হইবে যে, জাপানীরা প্রচুর ক্ষতি সত্ত্বেও জাভার নানা স্থানে সৈন্য নামাইতে পারিয়াছে অর্থাৎ নৌবহরের ক্ষতির দ্বারা তাহাদের অভিযানের গতি রুদ্ধ হয় নাই।

---

* জাভায় জাপানীদের আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার কিছু আগেই জেনারেল ওয়েভেল ওলন্দাজ সেনাপতি জেনারেল টের পুরটেনের (Ter Poorten) হাতে অধিনায়কত্ব ছাড়িয়া দিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। ২রা মার্চ্চ তারিখের বৃটিশ সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, মালয়ের পতন হওয়ায় এবং জাপানীরা সুমাত্রায় প্রবেশ করায় ব্রহ্মদেশ ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় ওলন্দাজদের হাতেই সৈনাপত্য অর্পণ করা উচিত। জেনারেল ওয়েভেল ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন, ব্রহ্ম-চীনের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের জন্য তাঁহাকে দায়িত্ব দেওয়া হইল।

নৌযুদ্ধের ফলাফল :

প্রকৃতপক্ষে জাভা সাগরের নৌযুদ্ধে মিত্রপক্ষের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তীকালে লণ্ডন 'ডেলী টেলিগ্রাফে'র প্রত্যক্ষ্যদর্শীর বিবৃতি হইতে জানা গিয়াছে।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে যখন বুঝা গেল যে, যবদ্বীপে জাপানী আক্রমণ আসন্ন, তখন মিত্রপক্ষীয় নৌবহর কিছু বেকায়দায় পড়িল। কেন না, জাপানী আক্রমণ ও অবতরণের জন্য অপেক্ষা করিলে এই নৌবহর মিছামিছি ধরা পড়িবে। সুতরাং এড্‌মিরাল হেলফ্রিস্ এক বুদ্ধিসম্মত রণকৌশল স্থির করিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মিত্রপক্ষীয় নৌবহর আগেই জাপানী জাহাজগুলিকে আক্রমণ ও আঘাত করিবে। কারণ, সেই অবস্থায় জাপ জাহাজগুলি নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এবং তাহাদের অভিযান প্রতিহত কিম্বা মিত্র যুদ্ধজাহাজগুলি জাপ নৌবহরকে ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারিবে। জাভা অভিযানে যে জাপ নৌবহর নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে আনুমানিক ১৪টি ক্রুজার, (কতকগুলি ৮ ইঞ্চি ব্যাসের কামান ছিল), ১১টি বিমানবাহী বা সীপ্লেনবাহী জাহাজ, ৫৫টি টর্পেডো-পোত এবং ২৫টি সাবমেরিণ ছিল। এই নৌবহর ৫০টি সৈন্যবাহী জাহাজকে রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। সমস্ত বহরটি দুই বা তিন দলে বিভক্ত ছিল, রক্ষাকারী প্রধান বহরটি সুরাবায়ার উত্তর-পশ্চিমে চৌকি দিতেছিল।

মিত্রপুঞ্জের নৌবহরে ছিল ওলন্দাজ ক্রুজার 'ডি রুয়েটের' ও 'জাভা', মার্কিণ ক্রুজার 'হাউষ্টন', বৃটিশ ক্রুজার 'এক্সিটর', অষ্ট্রেলিয় ক্রুজার 'পার্থ' ও 'হোবার্ট', এবং ডেষ্ট্রয়ার ছিল ৪টি—বৃটিশ 'ইলেক্‌ট্রা', 'জুপিটার' ও 'এন্‌কাউণ্টার' এবং ওলন্দাজদের 'কোর্টেনার'। সম্ভবতঃ এইগুলি ছাড়া কয়েকটি পুরাণো মার্কিণ ডেষ্ট্রয়ারও ছিল।

২৭শে ফেব্রুয়ারী সকালবেলা মিত্র যুদ্ধজাহাজের লস্করেরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কারণ, আগের দিন তাহারা সমস্ত রাত্রি জাভা উপকূলের অদূরে জাপ জাহাজের আশায় 'যুদ্ধং দেহি' অবস্থায় কাটাইয়াছে। বেলা ১০টার সময় তিনটি জাপানী বিমান এই বহরের উপর ব্যর্থ আক্রমণ চালায়, তারপর একখানা জাপ সীপ্লেন ইহাদিগকে অনুসরণ করে। এড্‌মিরাল ডুরম্যান এড্‌মিরাল হেল্‌ফ্রিসকে বেতারযোগে জানান যে, তাঁহার লস্করেরা অত্যন্ত

ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তিনি সুরাবায়ার ঘাঁটিতে ফিরিয়া যাইতে চাহেন। যখন এই বহরটি বেলা সাড়ে ৩টার সময় বাউয়েন দ্বীপ ও সুরাবায়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছিল, তখন এডমিরাল ডুরম্যানকে বেতার যোগে জানানো হয় যে, তাঁহাদের ৫০ মাইল উত্তরে ৬টি জাপানী যুদ্ধ-জাহাজ ও অনেকগুলি সৈন্যবাহী জাহাজ দেখা গিয়াছে। এড্মিরাল হেলফ্রিস অবিলম্বে এই শত্রু বহর আক্রমণের হুকুম দেন। অপরাহ্ণ ৪টা ১৪ মিনিটের সময় জাপানী নৌবহরের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে—অনেকগুলি ক্রুজার ও ১৩টি ডেষ্ট্রয়ার এই স্কোয়াড্রনে ছিল, একটি জাপ ডেষ্ট্রয়ার দল আক্রমণ চালায় এবং তাহা প্রতিহত হয়। অষ্ট্রেলিয় ক্রুজার 'পার্থ' একটি জাপ ক্রুজারকে আঘাত করে। তখন শত্রুর দ্বিতীয় ডেষ্ট্রয়ার দল আক্রমণ করে। মিত্র পক্ষীয় জাহাজগুলি যখন আক্রমণ এড়াইয়া যাইবার চেষ্টায় ছিল, তখন বৃটিশ ক্রুজার 'এক্সিটরের' বয়লার ঘরে একটি গোলার আঘাত লাগে। ফলে 'এক্সিটর' এমন জখম হয় যে, বাধ্য হইয়া উহাকে রণক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতে হয়। ওলন্দাজ ডেষ্ট্রয়ার 'কোর্টেনার'ও একটি জাপ টর্পেডোর ঘায়ে ডুবিয়া যায়। তবে, উহার অধিকাংশ লস্কর রক্ষা পাইয়াছিল। ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া উহারই আড়ালে যখন জাপানী নৌবহর সরিয়া পড়িতেছিল, তখন বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ারগুলি উহাকে আক্রমণ করে। ফলাফল বিশেষ জানা যায় নাই, তবে বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার 'ইলেক্ট্রা' তিনটি জাপ ডেষ্ট্রয়ারের সহিত সংঘর্ষের পর নিমজ্জিত হয়। এই যুদ্ধ পরস্পরের অনেক দূর ব্যবধান হইতে চলিতেছিল। মিত্র-পক্ষীয় ক্রুজারগুলি যখন ধূম্রজাল হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহারা আরও নিকট পাল্লার মধ্যে শত্রুবহরকে আক্রমণ করিল। আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে জাপানী জাহাজগুলি সরিয়া পড়িল, তাহাদের ৮ ইঞ্চি কামানের একখানা ক্রুজার জ্বলিতেছিল। এড্মিরাল ডুরম্যান তাহাদিগকে উত্তর-পূর্ব্বদিকে পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু তখন দিনের আলো পড়িয়া আসিতেছিল বলিয়া তাহাদের আর সংস্পর্শে আসা গেল না। রাত্রি হইলে পর আবার মিত্রবাহিনী চারিটি শত্রু জাহাজের সম্মুখীন হইল। কিন্তু এই সংঘর্ষের ফলাফল অনিশ্চিত ছিল। তখন এড্মিরাল ডুরম্যান চাহিলেন শত্রু জাহাজগুলিকে ঘুরিয়া গিয়া 'কনভয়' আক্রমণ করিতে। কিন্তু জাপ জাহাজ-গুলির দ্রুততার জন্য তাহা সম্ভব হইল না। তখন তিনি জাভার উপকূল-ভাগ রক্ষার জন্য দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল পশ্চিম


দক্ষিণ চীন সমুদ্র
ওলেল
পাসির
ডেলি
আচিন
পেনাং
সেরুয়াই
মালয়
কুয়ান্টান
সেলাংগর
পেকান
মেডান
তানজং বালি
কুয়ালালামপুর
মাবলিং
বিলিক
মালাক্কা
বাটু
সিঙ্গাপুর
বেংকালিস
সিরোগা
নিয়াস
সিয়াক
বিষুব রেখা
নাটুমা
কুচিন
সারওয়াক
পন্টিয়ানাক
বোর্ণিও
বাটু
রিংগাট
পাডাং
পোরা
মুনটক
জাম্বি
বাংকা
তানজং
বিলিটন
ভারত
নাসাউ
পালেমবাং
বেংকুলেন
জাভা সাগর
মহাসাগর
কাউয়ের
তেলকবেটং
বাটাভিয়া
সুন্দা প্রণালী
আঞ্জের
চেরিবন
সামারাং
জাভা
মাইল
০ ১০০ ২০০
অনিল

কপিরাইট, যুগান্তর

দিকে ঘুরিয়া গিয়া জাভা আক্রমণকারী জাপসৈন্য-জাহাজগুলিকে বাধা দেন। এভাবে পশ্চিমদিকে ঘুরিবার আধ ঘণ্টা পর বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার 'জুপিটার' জলের নীচের বিস্ফোরণে অকেজো হইয়া যায়। চারি ঘণ্টা পরে উপকূলের কাছে জাহজটি ডুবিয়া যায়। লস্কররেরা অনেকেই রক্ষা পাইয়াছিল।

রাত্রি সাড়ে ১১টার সময় দুইটি শত্রুজাহাজ রেমবংয়ের ১২ মাইল উত্তর-বর্ত্তী উপকূল ও মিত্র জাহাজগুলির মধ্যে দেখা দিল। তাহাদিগকে আক্রমণ করা হয় এবং অনেক গোলা বর্ষিত হয়। এই সময় ওলন্দাজ ক্রুজার 'ডি রুয়েটার' (এড্‌মিরাল ডুরম্যানের ফ্ল্যাগসিপ) একটি গোলার আঘাতে জখম হয়। ক্রুজারটি শত্রুর টর্পেডো এড়াইবার জন্য তৎক্ষণাৎ গতি পরিবর্ত্তন করে। কিন্তু 'ডি রুয়েটার' ও 'জাভা' দুইটি ওলন্দাজ ক্রুজারই জলের নীচের বিস্ফোরণে ডুবিয়া যায়। ইহাতে মনে হইতেছে জাপানীরা রেমবংয়ের নিকট অবতরণকে আড়াল করিবার জন্য সাবমেরিণ দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।*

মিত্রপক্ষীয় যে সমস্ত জাহাজ রক্ষা পাইয়াছিল, সেগুলিকে উদ্ধার করা একটা কঠিন সমস্যার মত দেখা দিল। কারণ, জাভার দুই প্রান্তবর্ত্তী সুন্দা প্রণালী ও লম্বক প্রণালী এই উভয় জলপথেই শত্রুর আধিপত্য ছিল। অষ্ট্রেলিয় ক্রুজার 'পার্থ' জখমি অবস্থায় বাটাভিয়ার বন্দরে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রির অন্ধকারে সুন্দা প্রণালী দিয়া সে সরিয়া পড়িতে চাহিল, রাত্রি সাড়ে ১১টার সময় সংবাদ দেয় যে, সে শত্রু-জাহাজের পাল্লায় পড়িয়াছে। তারপর 'পার্থ' এবং মার্কিণ ক্রুজার 'হাউষ্টন' এই দুইয়েরই কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নিঃসন্দেহে জাহাজ দুইটি ডুবিয়া গিয়াছে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী বাক্সা প্রণালী দিয়া কয়েকটি মার্কিণ ডেষ্ট্রয়ার ত্রাণ পাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সরকারীভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে যে, 'পিলস্‌বারি' ও 'এড্‌সাল' জাহাজ দুইটি ডুবিয়া গিয়াছে। ১লা মার্চ্চ তারিখ বৃটিশ ক্রুজার 'এক্সিটর', ডেষ্ট্রয়ার 'এন্‌কাউণ্টার' এবং মার্কিণ ডেষ্ট্রয়ার 'পোপ' বাক্সা প্রণালী দিয়া পলায়নের জন্য রওনা হইয়াছিল। কিন্তু জাপানী ক্রুজারের হাতে সেগুলিও নিমজ্জিত হইয়াছে। মিত্রপক্ষের ক্ষতির কাহিনীর এখানেই শেষ নহে। বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার 'ষ্টংহোল্‌ড্', মার্কিণ গানবোট 'এস্‌ভিলা' এবং ইহা ছাড়া আরও ৬টি অন্যান্য (এগুলির মধ্যে ৩টি বাণিজ্য-জাহাজ) পোত

* "Hutchinson's Quarterly Record of the War"—Vol. 10.

নিমজ্জিত হইয়াছে। নৌযুদ্ধের পর রাত্রিবেলা জাপানীরা জাভা উপকূলের তিন স্থানে অবতরণ করিতে আরম্ভ করে।

জাভা সাগরের নৌযুদ্ধ সম্পর্কে মিত্রপক্ষীয় মহল হইতে গোড়ায় যে সমস্ত সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে যথেষ্ট অতিশয়োক্তি ও মিথ্যা ছিল। জাপানীদের কয়েকটি জাহাজ (নিমজ্জিত ও জখমিসহ ৭ খানার বেশী নহে—এই সংখ্যাও আবার নিশ্চিত নহে!) নষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু মিত্রপক্ষীয় নৌবহরের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। জাভায় দ্রুত জাপ অবতরণের মূলে ইহাও একটী বড় কারণ।

—৪—

যব দ্বীপের পতন

৬ই ও ৯ই মার্চ্চ '৪২।

জাভার পশ্চিমে সুমাত্রা, উত্তরে বোর্ণিও এবং পূর্ব্বে সেলিবিস, এগুলি জাপান আগেই দখল করিয়া লইয়াছিল। তারপর অতি দ্রুত বলি দ্বীপ দখল করিয়া জাপানীরা এই তিন দিক হইতে জাহাজ, বজরা ও বিমানবহরের সাহায্যে যবদ্বীপকে ঘিরিয়া ধরিল। তিনটি ফলকের মত তাহারা জাভাকে তিন স্থানে বিদ্ধ করিল। পশ্চিম প্রান্তে বানটামে নামিয়া একদল রাজধানী বাটাভিয়াকে দক্ষিণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিল। বাটাভিয়া হইতে ১০০ মাইল দক্ষিণে ব্যাণ্ডোয়েং, বাটাভিয়ার পর এখানেই ওলন্দাজদের প্রধান সমরশিবির স্থাপিত হইয়াছিল। জাপানীরা এই দুই সহরের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়া ইহাদিগকে দুই প্রান্তে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল অবলম্বন করিল। দ্বিতীয় দল ইন্দ্রমায়ুতে অবতরণ করিয়া প্রথম দলকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যাণ্ডোয়েংর দিকে অগ্রসর হইল। জাভার প্রধান নৌঘাঁটি সুরাবায়া, ইহার পশ্চিমে রেমবং। জাপানীদের তৃতীয় দল রেমবংয়ে নামিয়া সুরাবায়ার দিকে অভিযান করিল। সহজ ভাষায় বলা যাইতে পারে পশ্চিমে বাটাভিয়া, পূর্ব্বে সুরাবায়া এবং দক্ষিণে ব্যাণ্ডোয়েং—জাভার এই তিন প্রাণকেন্দ্র জাপানীরা একই সঙ্গে বর্শার অগ্রভাগের মত বিদ্ধ করিতে থাকে। উত্তর দিকে বিস্তৃত সমতলভূমিতে জাপানীদের আক্রমণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। কারণ, প্রকৃতির কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু

যব দ্বীপের অন্যতম ঘাঁটি ব্যাণ্ডোয়েং পর্ব্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। জেলিয়াৎ-জাপ নামক একটি ভালো পোতাশ্রয়ের সহিত ইহা রেলপথ ও রাজপথের দ্বারা সংযুক্ত। জাপানীরা ব্যাণ্ডোয়েংর দিকে সাঁড়াশির আকারে চাপ দিল—পশ্চিম উপকূল এবং ইন্দ্রমায়ু হইতে। বিভিন্ন স্থান হইতে একযোগে আঘাত হানিয়া জাপানীরা শীঘ্রই ওলন্দাজদের আত্মরক্ষার ব্যূহগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। রণকৌশলের দিক হইতে তাহারা কিঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। বৃহৎ ও ভারী যন্ত্র এবং প্রকাণ্ড আকৃতির অস্ত্র তাহারা জাভায় আনে নাই। তবে যাহা কিছু অস্ত্র, যন্ত্র ও বিমান এবং সৈন্যদল তাহারা লইয়া আসিয়াছিল, সেগুলি সমস্তই সংখ্যাশক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। বে-সরকারী অনুমান এই যে, অভিযাত্রী জাপবাহিনীতে ৭ ডিভিসন বা কম-পক্ষে ১লক্ষ সৈন্য ছিল। ট্যাঙ্ক, ট্রেঞ্চমর্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিতেও জাপানীরা শ্রেষ্ঠ ছিল। অর্থাৎ সমস্ত দিক দিয়াই ওলন্দাজদের তুলনায় জাপানের শক্তি পাঁচগুণ বেশী ছিল। যেখানে আক্রমণকারী এত বেশী শক্তি নিয়োগ করিতে পারে, সেখানে কেবল সংখ্যার দ্বারাই আত্মরক্ষাকারীকে ঘায়েল করা যায়। তথাপি ওলন্দাজবাহিনী যথেষ্ট বীরত্ব এবং দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াছিল। কৌশলের দিক দিয়া জাপানীরা স্থানে স্থানে অনুপ্রবেশ নীতি বা infiltration tactics অবলম্বন করিয়াছিল। ছোট ছোট দল হাল্‌কা অস্ত্রশস্ত্র অর্থাৎ রাইফেল, মেসিনগান ও ক্ষুদ্রাকৃতির মর্টার লইয়া যত্রতত্র অবতরণ করিয়া দেশের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিতেছিল। ইহাদের পরণে গুরুতর বর্ম্মাচ্ছাদন ছিল না। হাল্কা রবারের জুতা ও হাফ-প্যাণ্টই ইহাদের পোষাক। ইহারা সাধারণতঃ ছোট মেশিনগান বা রাইফেল হাতে সাইকেলে চড়িয়া অলিগলি দিয়া ইচ্ছামত আক্রমণ চালাইয়াছে। এই প্রকার রণকৌশলের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া দেওয়া এবং আভ্যন্তরীণ যাতায়াতের ও খবরাখবরের ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া স্থানীয় আত্মরক্ষাবাহিনীর পশ্চাতে ঘোরতর বিপর্য্যয় আনয়ন করা।……

শেষের দিকে জাপ আক্রমণের গতি বিশ্লেষণ করিলে দ্বীপ দখলে জাপানীদের কৌশল কিঞ্চিৎ স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

পশ্চিম জাভায় ইন্দ্রমায়ু হইতে বান্‌টাম পর্য্যন্ত ৩০ মাইল প্রশস্ত হইয়া দ্বীপের উত্তর অংশে বরাবর সমতলভূমি বিস্তৃত। এই ভূমির পশ্চিমভাগে সমুদ্রকূলে জাভার রাজধানী বাটাভিয়া অবস্থিত। জাপানী বোমারুদল প্রথমে

নির্ম্মমভাবে বোমাবর্ষণ করিয়া বান্‌টাম ও ইন্দ্রমায়ু অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সমরশক্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। এইভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার পর জাপানীরা সৈন্যের পর সৈন্যদলকে স্বল্প ও হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া জাহাজযোগে এই সমতলভূমিতে অবতরণ করাইয়া দেয়। বান্‌টামে যে দল অবতরণ করে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল বাটাভিয়ার দক্ষিণ দিয়া অগ্রসর হইয়া এই সহরকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ইন্দ্রমায়ুতে যে দল অবতরণ করে প্রথমে তাহাদের মতলব ছিল, বরাবর সমুদ্রকূলের সমতলভূমি ধরিয়া বাটাভিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া—অর্থাৎ ছোটখাট সাঁড়াশী আক্রমণে বাটাভিয়াকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা। এই অবস্থার সম্মুখীন হইবামাত্র মিত্রপক্ষ বাটাভিয়া ত্যাগ করিয়া দ্বীপের দক্ষিণ অংশে উচ্চভূমির উপর অবস্থিত ব্যাণ্ডোয়েং-এ সামরিক কেন্দ্র সরাইয়া লন। ফলে বান্‌টাম হইতে যে শত্রুদল অগ্রসর হইতেছিল তাহারা সহজেই বাটাভিয়া দখল করে এবং ইন্দ্রমায়ু হইতে পশ্চিমমুখী শত্রু বাহু বাটাভিয়ার দিকে আর না গিয়া ব্যাণ্ডোয়েংকেই লক্ষ্য করে। এই পথেই সোয়েবঙ্গ সহর ও কালিকাজাতি বিমান ঘাঁটি। জাপানীরা প্রবল বোমাবর্ষণ করিয়া বিমান ঘাঁটি বিধ্বস্ত করে। ওলন্দাজবাহিনী অপূর্ব্ব বীরত্বসহকারে শত্রুর এই বাহুকে—যেখানে সমতলভূমি শেষ হইয়া উচ্চ ভূমি সুরু হইয়াছে, সেখানে পাল্টা-আক্রমণে বাধা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বোমারু ও জঙ্গী বিমানের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদের সে আক্রমণ মন্দীভূত হইয়া যায়।

জাপানীরা দাবী করে যে, ব্যাণ্ডোয়েংর যুদ্ধে ওলন্দাজ ও মিত্রপক্ষীয় মোট ৯০ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সমগ্র জাভার সৈন্যই এভাবে ধরা দিয়াছে। সিঙ্গাপুরের যুদ্ধে নৌবহরের পাত্তা ছিল না, কিন্তু জাভার সংগ্রামে উভয় পক্ষের নৌবহরেরই তীব্র দ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছে এবং যদিও সিঙ্গাপুরের তুলনায় জাভায় জাপ আক্রমণ খুব কেন্দ্রীভূত ছিল না, তথাপি যুদ্ধের ফলাফল সিঙ্গাপুরের চেয়ে কম শোচনীয় হয় নাই। বন্দীর সংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছিল, মিত্র নৌবহর সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছিল এবং ভারত মহাসাগরে পৌছিবার জন্য সুন্দা, বালি ও লম্বক এই তিনটি প্রণালী-পথ খুলিয়া গেল। ইহা ছাড়া সুরাবায়ার উৎকৃষ্ট নৌঘাঁটি এবং জাভার অগাধ ঐশ্বর্য্যও জাপানীদের হাতে আসিল।

* *
*

৯ই মার্চ্চের মধ্যে জাভার অধিকাংশ স্থানে ওলন্দাজদের প্রতিরোধশক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং জাপানীরা একে একে বাটাভিয়া, সুরাবায়া, ব্যাণ্ডোয়েং ইন্দ্রমায়ু ইত্যাদি দখল করিয়া লয়। যব দ্বীপের কেন এই দ্রুত শোচনীয় পরিণতি ঘটিল সেই সম্পর্কে ওলন্দাজদের একটি আধা-সরকারী বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য এখানে উহার অধিকাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ৭ই মার্চ্চের বিবরণে বলা হইয়াছে—

'জাপানীরা অধিকতর বলসহ সুবিখ্যাত টুংকুয়াপ্রবু আগ্নেয়গিরির উত্তর-ভাগে রক্ষীব্যূহ ভেদ করিবার ফলে যবদ্বীপের অবস্থা, বিশেষ করিয়া এই দ্বীপের পশ্চিম খণ্ডের অবস্থা সঙ্কটজনক করিয়া তুলিয়াছে। ওলন্দাজ পক্ষীয় সৈন্যগণ শত্রুদিগকে প্রাণপণ বাধা দিয়াছিল। কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অনেক কম বলিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। অধিকন্তু জাপানী বিমান এরূপ প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে যে, আর উপযুক্ত প্রতিরোধ করার কোন শক্তি ওলন্দাজদের নাই। এই আগ্নেয়গিরির উত্তরভাগস্থ সানুদেশ অতি শান্তিপূর্ণ স্থান ছিল। সহস্র সহস্র লোক এই অঞ্চলের রমণীয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইত। এখন এখানে যে ধ্বংসলীলা চলিতেছে তাহা সত্যই হৃদয়বিদারক। ওলন্দাজদের যখন মনে পড়ে যে, মালয় রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় তাহাদের বিমানবলের অধিকাংশ অযথা ক্ষয় হইয়াছে, তখন তাহাদের দুঃখ আরও বৃদ্ধি পায়। মালয় এবং সিঙ্গাপুরের তুলনায় যবদ্বীপের অবস্থা অধিকতর প্রতিকূল। কেন না, এখানে জাপানীদের শক্তি ওলন্দাজদের চেয়ে অন্ততঃ পাঁচ গুণ বেশী হইবে। বিমানবলের তুলনাই হয় না। এবিষয়ে জাপানীরা সম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

'৮ই ডিসেম্বর যখন জাপানীরা আমেরিকা ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ মিত্রবর্গের সাহায্যকল্পে সমগ্র বিমান ও নৌ-শক্তি নিয়োগ করে। যে সমস্ত দেশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, সে সমস্ত দেশেই ওলন্দাজদের এই কার্য্য প্রশংসিত হইয়াছে। এই কার্য্যের মধ্যে একটা বিপদও ছিল। কারণ, ইহাতে ওলন্দাজদের শক্তি দ্রুত ক্ষয় হইয়াছে। কিন্তু অবিলম্বে সাহায্য আসিয়া পৌছিবে, এই ভরসাতেই ঐ বিপদের ঝুঁকি লওয়া হইয়াছিল। বস্তুতঃ এরূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল যাহাতে ত্বরায়

সাহায্য আসিয়া পৌছিতে পারে। মিত্রবর্গের পূর্ব্ব এশিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্র যবদ্বীপে স্থাপন করা হয়। তাহাতেই বুঝা যায় যে, মালয় ও সিঙ্গাপুরের পতন হইলে যবদ্বীপকে ঘাঁটি করিয়াই মিত্রবর্গ পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিবেন। বহু সৈন্য আনিয়া যাহাতে দ্রুত সমাবেশ করা যায় তেমন ব্যবস্থাও করিয়া রাখা হইয়াছিল। আশা করা গিয়াছিল যে, যদি জাপানীদিগকে কিছুকাল ঠেকাইয়া রাখা যায়, তবে সে সমস্ত সৈন্য আসিয়া পড়িবে এবং তাহাদিগকে কাজে লাগানো যাইবে।

'জানুয়ারী মাসে বহিঃপ্রদেশগুলি একে একে হাতছাড়া হয়। তখন আশা করা গিয়াছিল যে, ঐ প্রদেশগুলি আপাততঃ হাতছাড়া হইলেও ফেব্রুয়ারী মাসে সাহায্য আসিয়া পৌছিবেই। তাহা হইলেই যবদ্বীপকে রক্ষা করা যাইবে এবং পরে সেখান হইতে পাল্টা আক্রমণ করা যাইবে। কিন্তু এই প্রত্যাশিত সাহায্য কোনও কালেই আসিল না। প্রকৃতপক্ষে জাভায় মিত্রপক্ষের সৈন্য অতি কম। তাহারা ওলন্দাজ ও যবদ্বীপী সৈন্যদের পাশে দাঁড়াইয়া সোৎসাহে যুদ্ধ করিতেছে বটে, কিন্তু জাপানীদের গতি রোধ করিতে পারে নাই। আক্রমণাত্মক কার্য্যে ওলন্দাজ রণবহর ও বিমানগুলি খুব সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হইয়াছে খুবই বেশী। তাহাদের ক্ষয় পূরণের জন্য নূতন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। যে কয়টি মার্কিণ বোমারু আসিয়াছিল সেগুলিকে রক্ষা করিয়া চলার মত এবং বিমান ময়দানগুলি রক্ষা করার মত জঙ্গীর অভাবে মার্কিণ বোমারু-গুলির কার্য্যকারিতা অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। যে কয়টি জঙ্গীবিমান ছিল সেগুলিও যোগ্যতায় জাপানীদের সমকক্ষ নহে। ফলে, জাপানীদের বড় বড় বোমারুর আক্রমণ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে মিত্রপক্ষের আক্রমণ শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে।

'ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় যে, যবদ্বীপ কার্য্যতঃ চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। সংখ্যাবলে বলীয়ান শত্রুরা যে সময় যবদ্বীপ আক্রমণ করে, সে সময় ওলন্দাজ রণবহরের সারভাগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই ক্ষতির দুঃখ বড় বটে, কিন্তু সন্তুষ্টির কথা এই যে, এই ক্ষতি বৃথা যায় নাই। ওলন্দাজ নৌবহর মরণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছে। ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী জাভা সাগরে যে যুদ্ধ হয়, উহার ফলে সুরাবায়া ঘাঁটি ক্রুজারের পক্ষে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। এই ঘাঁটিটিকে বড় বোমারুর আক্রমণ

হইতে রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। গত শনিবার রাত্রিতে যখন জাপানীরা আক্রমণ করে তখন তাহাদিগকে প্রবল বাধা দেওয়া হয়। নামিতে চেষ্টা করিতে যাইয়া অনেক জাপানী নিহত হয় বটে, কিন্তু ওলন্দাজ পক্ষেও প্রচুর লোক ক্ষয় হয়। অত্যধিক সংখ্যায় জাপানীরা আসিয়া বান্‌টাম, ইন্দ্রমায়ু এবং রেমবংয়ে কম পক্ষে ৭ ডিভিসন সৈন্য নামায়। জলে ও আকাশে এভাবে প্রতিরোধ দূর হওয়ার পর জাপানীরা কার্য্যতঃ খোলা মাঠ পাইয়া বসে। তাহারা যত খুসী সৈন্য ও সমরসম্ভার নামাইবার সুবিধা লাভ করে। তাহাদিগকে বাধা দিবার মত কিছুই থাকে না। জাপানীরা ইন্দ্রমায়ু হইতে সোয়েবঙ্গ এবং কালিকাজাতি বিমানঘাঁটি পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। তাহারা টংকুয়াপ্রবুর উত্তরভাগস্থ প্রান্তরে আসিয়াও পৌছে। জাপানীদের পরবর্ত্তী উদ্দেশ্যের প্রতীক্ষা না করিয়াই ওলন্দাজরা তাহাদিগকে পাল্টা আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে।

'ব্যাণ্ডোয়েং হইতে কালিকাজাতি বিমান ঘাঁটিতে যে আক্রমণ হয়, তাঁহাতে প্রমাণিত হয় যে, স্থল সেনারা যত অসমসাহসিকই হউক না কেন, বিমানবলের দ্বারা সুরক্ষিত না থাকিলে তাহারা কিছুতেই আক্রমণ চালাইতে পারে না। ওলন্দাজ সৈন্যদিগকে জাপানীদের ছোঁমারা বিমান অবিরাম বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি তাহাদের সাহস অতি দুর্দ্ধর্ষ ছিল। এক একটি ওলন্দাজ সৈন্য যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই নরমেধ যজ্ঞের বিশাল অগ্নিকুণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোনও উপায়ই তাহাদের ছিল না। ইন্দ্রমায়ুতে যে সমস্ত জাপানী অবতরণ করিয়াছিল, তাহাদের উপর স্থানে স্থানে প্রত্যাক্রমণ হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসীম সাহসের সহিত এই প্রত্যাক্রমণ ঘটিয়াছিল। দুই এক স্থানে পার্শ্ব আক্রমণ অংশতঃ সফলও হইয়াছিল। কিন্তু মোটের উপর এই সমস্ত প্রত্যাক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। এখানেও সেই একই কাহিনী। আকাশপথ রক্ষা না করিতে পারিলে স্থলসৈন্য কোন কাজেই লাগে না।

'যবদ্বীপে যেখানে হাজার হাজার বিমানের প্রয়োজন ছিল, সেখানে বিমান সংখ্যা ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। ফলে বাটাভিয়াস্থ ওলন্দাজ সৈন্যগণ বাটাভিয়া ছাড়িয়া ব্যাণ্ডোয়েংয়ে চলিয়া যায়। এই স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ যে, এখান হইতে যুদ্ধ করা অনেক সুবিধাজনক। সোয়েবঙ্গ হইতে ব্যাণ্ডোয়েংর প্রবেশপথটি রক্ষা করা প্রধান কার্য্য হইয়া

দাঁড়ায়। এখানে ওলন্দাজ সৈন্যেরা ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব বীরত্বের অধ্যায় রচনা করে। দুই দিন পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের বিশ্রাম না লইয়াও তাহারা এই প্রবেশপথটি রক্ষা করে। কিন্তু শেষে উহা রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে।'

* *
*

এই বর্ণনার মধ্যে যে শোচনীয় অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে উহার বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। ক্রীট হইতে মালয় এবং যবদ্বীপ পর্য্যন্ত মিত্র-শক্তির সেই এক কাহিনী। বিমানবল, সৈন্যবল, অস্ত্র ও সমরোপকরণের শক্তি সমস্তই কম এবং এত কম যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বত্র বিদ্যুৎগতি ভাগ্য বিপর্য্যয়। বালি ও জাভার পতনের সঙ্গে ওলন্দাজদের সুদূর প্রাচ্যের ঐশ্বর্য্যশালী সাম্রাজ্য জাপানের হাতে চলিয়া গেল। নূতন সাম্রাজ্যবাদ পুরাণো সাম্রাজ্যবাদকে গ্রাস করিল!

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ফিলিপাইনের পতন

—১—

ফিলিপাইনের বিপদ

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমাদের দেশে একেবারে অপরিচিত নহে। আমেরিকার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল স্বাধীনতা আন্দোলন করিয়া ফিলিপাইন দ্বীপ পরাধীন ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অতি সংক্ষেপে ইহার পরিচয় দিয়া বলা যাইতে পারে যে, জাপান ও ফরমোজা হইতে দক্ষিণে, গুয়াম হইতে পশ্চিমে, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ হইতে উত্তরে এবং দক্ষিণ চীন সাগর হইতে পূর্বদিকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। ৭ হাজার ৮৩টি দ্বীপ লইয়া ফিলি-পাইন গঠিত। কিন্তু এই অসংখ্য দ্বীপের সমস্তগুলির নামাকরণও সম্ভব হয় নাই। ইহার মধ্যে মাত্র কয়েকটি বড় দ্বীপই উল্লেখযোগ্য। ফিলিপাইন দ্বীপের উৎপত্তি মূলতঃ আগ্নেয়গিরি হইতে, সুতরাং ইহাতে অনেক বড় বড় পাহাড় এবং অসংখ্য হ্রদ ও নদী আছে। সমতল ভূমি উর্ব্বর ও শস্যশালী এবং খনিজ সম্পদও এখানে প্রচুর। ইহার মধ্যে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য সোণা, তারপর রূপা, তামা, সীসা, লোহা, প্লাটিনাম, ম্যাঙ্গানিজ এবং গন্ধক ইত্যাদিও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার তামাক ও চুরুট প্রসিদ্ধ। অরণ্য ভূমিতে মূল্যবান বৃক্ষ ও জন্তু-জানোয়ার আছে। এই দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ১ লক্ষ ১৫ হাজার বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ১২৩৫৩৮০০। ফার্ডিনাণ্ড ম্যাগেলান নামে প্রসিদ্ধ পর্ত্তুগীজ নাবিক ১৫২১ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ প্রথম আবিষ্কার করেন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে অনেকগুলি লড়াইয়ের পর স্পেনীয়গণ এই দ্বীপ দখল করেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা স্পেনের অধিকারে থাকে। তারপর উহা সন্ধিপত্রানুসারে আমেরিকার দখলে যায়। কিন্তু ফিলিপাইনের অধিবাসীরা আমেরিকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং দুই বৎসর পর সেই বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। পরবর্ত্তীকালে দীর্ঘকালের আন্দোলনের ফলে এবং মার্কিণ গণতান্ত্রিক নীতির প্রভাবে একমাত্র দেশরক্ষা বিভাগ ও যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে ফিলিপাইনের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়।......

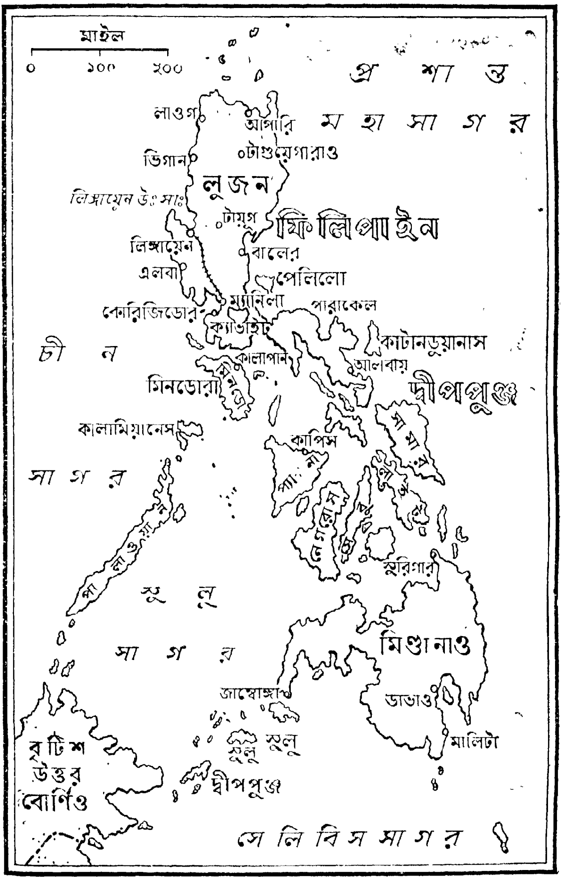
মার্কিণ নৌবল ও নৌ-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য জাপান যেমন যুদ্ধের গোড়াতেই বিভিন্ন মার্কিণ নৌঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল, ফিলিপাইনের উপরও তেমনই তাহাদের আক্রমণ নিবদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধকে আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব এবং মাত্র কয়েকটি তারিখ উল্লেখ করিয়া ইহার চূড়ান্ত গতি নির্ণয় করিব।

* *
*

৩০শে ডিসেম্বর '৪১।

হংকং ও গুয়ামের পতনের পর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বিপদ অনিবার্য্য ছিল। কারণ, দুই পার্শ্বের ইঙ্গ-মার্কিণ নৌ-ঘাঁটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় ফিলিপাইনকে কেবলমাত্র নিজের আভ্যন্তরীণ আত্মরক্ষার শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। আধুনিক যুদ্ধের দূরবর্ত্তী ঘাঁটিসমূহ নষ্ট হইয়া গেলে আভ্যন্তরীণ আত্মরক্ষার ব্যূহগুলির উপর এত প্রচণ্ড চাপ কেন্দ্রীভূত হয় যে, শত্রুর তুলনায় অপরিমিত শক্তি ছাড়া উহাকে রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু শত্রুর তুলনায় অধিক শক্তি থাকা দূরের কথা ফিলিপাইনের সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্র সংখ্যা অনেক কম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মার্কিণ সেনাপতি জেনারেল ম্যাক-আর্থার এত কম শক্তি লইয়া লড়িতেছেন যে, রাজধানী ম্যানিলার পতন আসন্ন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া ফিলিপাইনের উপর আক্রমণ চলিতেছে এবং এই আক্রমণ প্রচণ্ডভাবে সুরু হইয়াছে ২২শে ডিসেম্বর হইতে। ঐ দিন ৮০খানা জাপানী জাহাজকে ম্যানিলার ১৫০ মাইল উত্তরে লিঙ্গায়েন উপসাগর (উত্তর ফিলিপাইনের লুজন দ্বীপ) অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছিল। এই সমস্ত জাহাজে ৮০ হাজার হইতে ১ লক্ষ জাপ সৈন্য ছিল। শক্তিশালী নৌ ও বিমানবহরের সহযোগিতায় জাপবাহিনী অগ্রসর হইয়াছে এবং রাত্রি বেলা বহু স্থানে অবতরণ করিয়াছে। সাধারণতঃ দূর হইতে জাহাজযোগে অভিযান এবং প্রচুর সৈন্যের অবতরণ অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সমর বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, এই ধরণের অভিযান দুরূহতম রণনীতির পর্য্যায়ে পড়ে। কারণ, জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর পরিপূর্ণ সহযোগিতা ও ঘড়ির কাঁটার মত সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্ত্তিতার প্ল্যান ছাড়া এই ধরণের অভিযান চলিতে পারে না। জাপানীরা ৮০ খানা জাহাজযোগ ১ লক্ষ সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইল, দূর হইতে

ফিলিপাইনের সমরকর্ত্তাগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, অথচ এই প্রকাণ্ড নৌবহরকে তাঁহারা সমুদ্রপথে ঠেকাইতে পারিলেন না! এতগুলি জাহাজের একযোগে আগমন ঝাঁক বাঁধিয়া পক্ষীদলের উড়িবার মত এবং যে কোন কাঁচা



শিকারীও এই ঝাঁকের উপর গুলী চালাইলে বহু পাখী মারিতে পারিতেন! কিন্তু ৮০ খানা জাপ জাহাজের কয়খানা ফিলিপাইনের হাতে মারা পড়িয়াছে, তাহার কোন সংবাদ নাই। ইহার পরেই ফিলিপাইনের উপর আক্রমণ

প্রচণ্ড হইয়াছে, শত্রুকে দূরে বাধা দিতে না পারিলে হাতের কাছে প্রতিরোধ করা একান্ত কঠিন।

ফিলিপাইনকে সাধারণতঃ তিন অংশে ভাগ করা যায়। উত্তরাংশে লুজন, মধ্য অংশে সামার এবং দক্ষিণাংশে মিণ্ডানাও দ্বীপ। জাপানীরা প্রথমতঃ উত্তরাংশেই সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র আক্রমণ চালাইয়াছে। কারণ, ইহারই নিম্নাংশে রাজধানী ম্যানিলা। এই ম্যানিলার উপর উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে একযোগে চাপ পড়িয়াছে। প্রধানতঃ লিঙ্গায়েন উপসাগরের তীর ধরিয়া এবং কোরিজিডোর নৌদুর্গের উপর লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ চালানো হইয়াছে। আক্রমণের প্রথম পর্ব্ব সুরু হইয়াছে তীব্র বোমা বর্ষণের দ্বারা। মনে হয় প্রচুর এরোপ্লেনের সাহায্যে নৌবহর অগ্রসর হইয়াছে এবং এই এরোপ্লেনকে উপযুক্ত বাধা দিতে না পারাতেই জাপ সৈন্যেরা দলে দলে জাহাজযোগে অবতরণ করিতে পারিয়াছে। কোরিজিডোরকে এখানকার জিব্রাল্টার নৌদুর্গের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। ম্যানিলার দিকে প্রবেশ পথে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত ঘাঁটি। লিঙ্গায়েন ও কোরিজিডোরকে দুই দিক হইতে একই সময়ে বিপন্ন করিয়া ম্যানিলার উপর প্রবল চাপ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মাঝখানে পড়িয়া কর্ত্তৃপক্ষ ম্যানিলাকে অতি দ্রুত 'অরক্ষিত সহর' বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।* নৌ-দুর্গকে ঘায়েল করিবার প্রধান সম্বল যুদ্ধজাহাজ হইতে গোলাবর্ষণ। কোরিজিডোরে গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ দুইই ঘটিয়াছে এবং জেনারেল ম্যাক-আর্থারের সৈন্যদল অতি শীঘ্র আরও দক্ষিণে হটিতে বাধ্য হইয়াছে। জাপানের দুই বাহু ম্যানিলা হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণে সম্মিলিত হইবে বলিয়া প্রকাশ।

ফিলিপাইনের অবস্থা দুঃখজনক। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার যে পরিমাণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা করা হয় নাই। অন্যথা দূর হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া কিভাবে দলে দলে জাপানী পদাতিক, ট্যাঙ্কবাহিনী এবং অশ্বারোহী বাহিনী ফিলিপাইনে অবতরণ করিল? প্রকাশ যে, যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ (veteran) সেনানীগণ এই সমস্ত জাপবাহিনীর সহিত রহিয়াছে এবং তাহারা আধুনিক যুদ্ধের সমস্ত সাজসরঞ্জাম (modern

* ২৭শে ডিসেম্বর তারিখ ম্যানিলাকে 'খোলা' বা অরক্ষিত সহর বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও জাপানীরা দুই ঘণ্টা ধরিয়া সহরের উপর বোমা বর্ষণ করে। এই বোমা বর্ষণের ফলে ম্যানিলা সহরে প্রভূত প্রাণহানি ও সম্পত্তি হানি হইয়াছে।

equipment) লইয়া অবতরণ করিয়াছে এবং অশ্বারোহীবাহিনীও সঙ্গে আনিয়াছে। আধুনিক যুদ্ধে ট্যাঙ্কের আধিপত্যের দরুণ ঘোড়া বাতিল হইয়া গিয়াছিল। কেবল রুশ রণাঙ্গনের জার্ম্মাণ যুদ্ধে শীতকালে সোভিয়েট সৈন্যেরা অশ্বারোহীবাহিনী ব্যবহার করিয়াছিল। রাশিয়ার কসাকবাহিনী উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য, ইহাদিগকে আধুনিক কায়দায় সজ্জিত করিয়া জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং সেই যুদ্ধ ঘটিয়াছে সম্পূর্ণরূপে স্থলপথে। কিন্তু ২৯শে ডিসেম্বর প্যাম্পাগনা প্রদেশে জাপানীরা দূরবর্ত্তী সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া জাহাজযোগে অশ্বারোহী সৈন্য নামাইয়াছে!—এই সংবাদ কিঞ্চিৎ বিচিত্র সন্দেহ নাই। ফিলিপাইনের এই যুদ্ধ লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রচুর বিমানবহর ও নৌবহর একযোগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতেছে। বিমান-বহরকে এডভান্স গার্ড বা অগ্রবর্ত্তী প্রহরীবাহিনীরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রচুর বোমাবর্ষণ করিয়া তাহারা নৌবহরের অভিযান-পথ এবং রাত্রির অন্ধকারে সৈন্যদলের অবতরণ সহজতর করিয়াছে। অধিকন্তু তীরে অবতরণ করিয়া তাহারা ট্যাঙ্কের সাহায্যে যান্ত্রিক যুদ্ধ চালাইয়াছে। সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, জার্ম্মাণীর স্থলযুদ্ধের যান্ত্রিক ব্লিজক্রিগের সঙ্গে জাপানী নৌযুদ্ধের স্বাভাবিক রণপটুতাকে সম্মিলিত করা হইয়াছে। ইহারই ফল দেখিতেছি আমরা ফিলিপাইনের রণক্ষেত্রে, যাহার পরিণাম সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্বাহ্নে সজাগ ছিলেন না। সুতরাং দুর্গতি দ্রুত ঘনাইয়া আসিল।

—২—

ম্যানিলার পতন

২রা জানুয়ারী '৪২।

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার পতন হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রে মিত্রশক্তির আত্মরক্ষার পক্ষে ইহা গুরুতর ক্ষতি ঘটাইবে। গুয়াম হইতে ফিলিপাইন পর্য্যন্ত সমস্ত নৌ-ঘাঁটি একে একে জাপানীদের দখলে যাওয়ায় মার্কিণ নৌবহরের মহড়া ক্রমশঃ অচল অবস্থায় আসিয়া পৌছিতেছে। সম্প্রতি কম্যাণ্ডার কিংহাল এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, সাধারণতঃ নৌযুদ্ধে কেবল নৌবহরের কথাই জনসাধারণ মনে রাখে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই মূল তথ্য জানেন না যে, সুরক্ষিত নৌ-ঘাঁটি বা naval base

ছাড়া কোন নৌবহরই কার্য্যতঃ যুদ্ধ চালাইতে পারে না। সুতরাং নৌ-সংগ্রাম ও নৌবহরের পক্ষে নৌ-ঘাঁটিগুলি একান্ত জরুরী প্রয়োজনের মত। ওয়েক, গুয়াম, ম্যানিলা, হংকং, সাংহাই, পেনাং—এই ঘাঁটিগুলি অতি দ্রুত জাপানীদের হাতে গেল। মিত্রশক্তির পক্ষে এই অবস্থাটা অত্যন্ত ক্লেশকর। জাপানীরা যে কৌশলে আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহাতে ম্যানিলার পতন অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। তাহারা জলে, স্থলে ও আকাশে একযোগে অভিযান করিয়াছে। দূর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ২৪ দিনে ২৬০ মাইল স্থলপথে অতিক্রম কিম্বা ১২০ মাইল দূরে লিঙ্গায়েন উপসাগরে নামিয়া ১৮ দিনের মধ্যে ম্যানিলা সহর দখল ব্লিজক্রিগের লক্ষণ উদ্ঘাটিত করিতেছে। মাইল হিসাবে দৈনিক অগ্রগতির বিচার করিলে কিম্বা প্রতিপক্ষের সামরিক শক্তির একান্ত দুর্ব্বলতার কথা চিন্তা করিলে জার্ম্মাণীর তুলনায় জাপানী আক্রমণের গতি যথেষ্ট কম বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে জার্ম্মাণী পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও রাশিয়ার স্থলপথে এবং সমতল ভূমিতে স্বচ্ছন্দ যুদ্ধ চালাইয়াছিল, মাঝখানে কোন জলপথের ব্যবধান ছিল না। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এখানে প্রথমেই বিশাল সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, তারপর আকাশে বিমানশক্তির আধিপত্য বিস্তার করিয়া তীরে সৈন্য নামাইতে হইয়াছে এবং তারপর স্থলপথে আধুনিক সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকায় ইতালীর বিরুদ্ধে বৃটেনের প্রথম অভিযানের সঙ্গে ইহার কিছু তুলনা দেওয়া যাইতে পারে এবং সেখানেও নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর মধ্যে অনুরূপ সংযোগ ঘটাইয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তবে এক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের তুলনায় ফিলিপাইনের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। প্রকাশ যে, সেখানে মার্কিণ সৈন্য ছিল ৬ হাজার, খাস ফিলিপাইনের সরকারী সৈন্য ছিল ২০ হাজার, 'স্কাউট সৈন্য' (মার্কিণ অফিসারদের অধীনে এক শ্রেণীর দেশীয় সৈন্য) ১২ হাজার এবং ৫ মাসের ট্রেনিংপ্রাপ্ত রিজার্ভ সৈন্য ছিল ১ লক্ষ। * বলা বাহুল্য যে, এই মোট সৈন্য-সংখ্যা বড় রকমের অভিযানের পক্ষে সহায়ক

* সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংখ্যাটিও সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কেননা, হাচিন্সন প্রকাশিত যুদ্ধের ইতিহাসে ৫০ হাজারের বেশী সৈন্যের উল্লেখ নাই। অর্থাৎ এই ৫০ হাজার ছাড়াও ১ লক্ষ রিজার্ভ সৈন্য ছিল কিনা বুঝা যাইতেছে না। অন্য কোথাও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

নহে। বিশেষতঃ, ট্যাঙ্ক ও বিমানের প্রাচুর্য্য না থাকিলে আধুনিক যুদ্ধ বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হয়। তথাপি মার্কিণ সেনাপতি জেনারেল ম্যাক-আর্থার ২০০ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে যথেষ্ট বীরত্ব ও দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াছেন এবং এখনও তিনি ম্যানিলার উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে কোরিজিডোর নৌ-দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া আরও সংগ্রাম চালাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাঁহার এই দৃঢ় সঙ্কল্প প্রশংসনীয়, কিন্তু উত্তর ফিলিপাইনে জাপানীরা যেভাবে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে ম্যানিলার পতনের পর জেনারেল ম্যাক-আর্থার আর কত দিন লড়িতে পারিবেন, তাহাই প্রশ্ন।

ফিলিপাইনের দুর্দ্দশার জন্য কেবল জাপানী নৃশংসতা ও বিশ্বাসঘাতকোচিত আক্রমণের উপর দোষ দিলেই চলিবে না। মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের ঢিলেমি এবং শৈথিল্যের কথাও চিন্তনীয়। গত ২০।২২ বৎসর ধরিয়া নৌবিশেষজ্ঞগণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপ-মার্কিণ সংগ্রামের সম্ভাবনা এবং উহার গতিপ্রকৃতি লইয়া আলোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন যে, হাওয়াই, ওয়েক, গুয়াম ও ফিলিপাইনে যদি সুরক্ষিত আধুনিক নৌঘাঁটি ও নৌদুর্গ নির্ম্মিত না হয়, তাহা হইলে ভাবী নৌযুদ্ধে আমেরিকা বিপদে পড়িবে। কিন্তু ১৮৯৯ সালে স্পেনের নিকট হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার হাতে আসিবার পর আধুনিক নৌ-সংগ্রামের চাহিদা মিটাইবার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। যে পরিমাণ কয়লা, পেট্রোল, রসদ, গোলাবারুদ, কামান, বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক যন্ত্রপাতি এবং জাহাজ মেরামতি কার্য্যের উপযোগী ব্যবস্থা ইত্যাদি আধুনিক নৌবহরের ঘাঁটির পক্ষে প্রয়োজন, তদনুরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই। ক্যাভাইট, (ম্যানিলা) ওলোঙ্গাপো এবং পোলক, এই তিনটির মধ্যে প্রথমটি অবশ্য উন্নত ধরণের ছিল, কিন্তু বাকি দুইটি মার্কিণ সামরিক কর্ত্তাদের নিকট গুরুত্ব অর্জ্জন করে নাই। ম্যানিলার পতনের পর উহার নৌঘাঁটি ক্যাভাইট পরিত্যক্ত হইয়াছে * এবং ওলোঙ্গাপোও বর্ত্তমানে

---

* ২রা জানুয়ারী ওয়াশিংটনে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, জেনারেল ম্যাক্-আর্থারের মার্কিণ ও ফিলিপিনো সৈন্যেরা ফিলিপাইন রক্ষার শেষ সংগ্রামে যেন দেওয়ালে পিঠ দিয়া লড়িতেছে। রাজধানী ম্যানিলার সঙ্গে ম্যানিলা উপসাগর হইতে ১০ মাইল দূরে ক্যাভাইটের বিখ্যাত নৌঘাঁটিও হারাইতে হইয়াছে। এই নৌঘাঁটি নির্ম্মাণে ২৪ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। আত্মরক্ষাকারীরা এক্ষণে ম্যানিলার উত্তরে শক্তঘাঁটি আগলাইয়া আছে।

—'ডেলী টেলিগ্রাফ' প্রকাশিত 'Story of the war'. vol. II.

আত্মরক্ষার কোন কাজে আসিবে না। আমেরিকার অভিজ্ঞ এবং প্রবীণ নৌ-সেনানীগণ ম্যানিলায় ব্যয়বহুল আধুনিকতম দুর্গাদি নির্ম্মাণের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহাদের যুক্তি ছিল এই যে, শক্তিশালী মার্কিণ নৌবহরের সাহায্য ছাড়া ফিলিপাইন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না এবং ফিলিপাইনে কোন প্রকাণ্ড নৌবহরের পক্ষে সামান্য কিছুকাল অবস্থানেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একজন মার্কিণ বিশেষজ্ঞ বহুকাল আগে মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'The Philippines are there for Japan whenever she likes to take them and nothing can prevent her from seizing them when she feels disposed to do so. As at present circumstanced, we could do nothing whatever to protect them in time of war. If we were foolish enough to locate a fleet at Manila the history of Port Arthur would repeat itself, with us in the role of the Russians. * 'ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যে ভাবে আছে, তাহাতে জাপানীরা যে দিন খুসী উহা দখল করিতে পারে এবং আমাদের (মার্কিণ) কোন সাধ্য নাই যে, তাহা ঠেকাইতে পারি। যদি কোন দিন মূর্খের মত ম্যানিলায় কোন নৌবহরের সন্ধান পাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে পোর্ট আর্থার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে এবং আমরা (মার্কিণ) রাশিয়ানদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছি।' অর্থাৎ পোর্ট আর্থারে রাশিয়া যেভাবে হারিয়াছিল, তেমন শোচনীয় পরাজয় ঘটিবে ফিলিপাইনে আমেরিকানদের। এই প্রসঙ্গে আরও ভাবিবার কথা এই যে, আমেরিকা জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়াই ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিয়াও দেশরক্ষার ব্যবস্থা ও নৌঘাঁটিগুলি নিজেদের হাতে রাখিয়াছিল। তথাপি আমেরিকা অসতর্ক ছিল এবং এত অসতর্ক যে, জাপানীরা এক মাসের মধ্যে ওয়েক ও গুয়াম হইতে ম্যানিলা পর্য্যন্ত দখল করিয়া লইল। নৌবিশেষজ্ঞগণ গুয়াম ও ফিলিপাইনকে আমেরিকার আত্মরক্ষার পক্ষে সিঙ্গাপুরের অনুরূপ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই গুরুত্ব কাগজে কলমেই রহিয়া গিয়াছে।

* 'Strategy in the Pacific' গ্রন্থে হেক্টর সি বাইওয়াটার কর্তৃক উদ্ধৃত পত্রাংশ।

—৩—

দীর্ঘ অবরোধের অবসান

এপ্রিল ও মে, '৪২।

পাহাড়, নদী, অরণ্য ও সমুদ্র আত্মরক্ষার দিক দিয়া বরাবরই অত্যন্ত সহায়ক ছিল। আধুনিক যান্ত্রিক-যুদ্ধ যদিও এই বিঘ্ন বহুলাংশে অতিক্রম করিয়াছে, তথাপি দক্ষ সেনাপতি ও উৎকৃষ্ট রণকৌশলের যোগাযোগ ঘটিলে এই প্রাকৃতিক বিঘ্ন যান্ত্রিকযুগেও আত্মরক্ষার বিস্ময় দেখাইতে পারে। ফিলিপাইনের বাতান উপদ্বীপের সংগ্রাম ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দীর্ঘ অবরোধ-যুদ্ধের ইতিহাসে ইহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মার্কিণ ও ফিলিপিনো সৈন্যের সহায়তায় জেনারেল ম্যাক-আর্থার শ্রেষ্ঠতর জাপানী সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তিন মাসের অধিক কাল আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধে এই কৃতিত্ব আর কোন সেনাপতি ও সৈন্যদলই দেখাইতে পারে নাই। জেনারেল ম্যাক-আর্থার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতি-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ছিলেন এবং অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে ফিলিপাইনেরও কমাণ্ডার ছিলেন। জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সময় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করেন এবং ম্যাক্-আর্থার সানন্দে তাঁহার অবসর জীবনের বিশ্রাম সুখ ত্যাগ করিয়া ফিলিপাইনের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি জেনারেল ওয়েনরাইটের হাতে অধিনায়কত্ব অর্পণ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। কারণ, অষ্ট্রেলিয়ার রণনৈতিক অবস্থা ক্রমে ঘোরালো হইয়া আসিতেছিল।

ফিলিপাইন যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, উত্তরে ও দক্ষিণে একে একে দ্বীপগুলি জাপানের দখলে গেলেও বাতান উপত্যকায় ম্যাক্-আর্থার ও কোরিজিডোর দুর্গে ওয়েনরাইট প্রবল প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাইতে থাকেন। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজধানী ম্যানিলার অতি দ্রুত পতনের পর কেহই প্রত্যাশা করেন নাই যে, জাপবাহিনীকে গোটা ফিলি-পাইন দখল করিতে এবং ম্যানিলা উপসাগরের প্রবেশপথে কোরিজিডোর দুর্গের অবরোধ ভাঙ্গিতে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। জেনারেল ম্যাক্-আর্থার ম্যানিলার পতনে বিচলিত না হইয়া আরও ১৫ মাইল

পিছনে হটিয়া গিয়া নূতন ব্যূহ রচনা করেন। কোরিজিডোর হইতে উত্তর-পশ্চিমে ৩০।৩৫ মাইল দূরে বাতান উপদ্বীপের এক কোণে প্রধান ব্যূহ রচিত হয়। এই অংশের ভৌগোলিক অবস্থা রণনীতির উপর প্রচুর প্রভাব খাটাইয়াছে। বিশেষভাবে মানচিত্র লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, দক্ষিণ চীন-সমুদ্রের পূর্ব্বাংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়া ম্যানিলা উপসাগরের সঙ্গে মিশিয়াছে। এই ম্যানিলা উপসাগরের প্রবেশপথ বেশ সঙ্কীর্ণ। ইহার বামদিকে কোরিজিডোর এবং ডানদিকে ক্যাভাইট। এই দুই নৌঘাঁটি ও নৌদুর্গ যেন দুই পার্শ্ব হইতে (প্রকৃতপক্ষে ক্যাভাইট আরও ভিতরে, পূবদিকে) ম্যানিলা উপসাগর ও সহরকে পাহারা দিতেছে। ভিতরের দিকে প্রবেশ করিয়া ম্যানিলা উপসাগর বিষম চওড়া হইয়া গিয়াছে। ফলে সাফল্যের সঙ্গে এই মুখ বন্ধ করিতে পারিলে ভিতরের দিকে শত্রুকে বোধহয় রোধ করা যাইত। কোরিজিডোরের উত্তরে এবং পাম্পাগণা ও জাম্বেলিস প্রদেশের প্রান্তদেশে বাতান উপদ্বীপ অবস্থিত। অরণ্যময় দুরূহ পার্ব্বত্য প্রদেশ এই বাতান। এখানকার পাহাড়গুলির চূড়া কোনটা ৪৭০০ ফুট এবং কোনটা বা ৫২০০ ফুটের উর্দ্ধে। কিন্তু পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতাই একমাত্র বড় কথা নহে, দুর্গম শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য এবং কঠিন ও দুরারোহ পার্ব্বত্যভূমি জেনারেল ম্যাক্-আর্থারের সহায়ক হইল। আমাদের রাজপুত ইতিহাসে রাণাপ্রতাপ যেমন মেবারের পতনের পর আরাবল্লী পর্ব্বত হইতে আকবরের মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, জেনারেল ম্যাক্-আর্থারও তেমনি ম্যানিলার পতনের পর বাতান উপদ্বীপের পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে ফিলিপাইন দ্বীপের সংগ্রাম চালাইলেন। উভয়ে প্রায় একই প্রকারের ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন।

জেনারেল ম্যাক্-আর্থারের দক্ষিণ ব্যূহ পাম্পাঙ্গা নদীর জলাভূমি পর্য্যন্ত এবং বাম ব্যূহ কাবুসিলান পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। এই অবস্থার মধ্যে জাপানীরা মাত্র ১৯ মাইলেরও অনধিক রণক্ষেত্র জুড়িয়া ট্যাঙ্ক আক্রমণের সুযোগ পাইল। এভাবে জাপানী জেনারেল মাসারু হোমা ও মার্কিণ জেনারেল ম্যাক্-আর্থারের মধ্যে যে অবরোধ সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তাহা ভাঙ্গিবার জন্য জাপানীরা তিন মাসের অধিক কাল ধরিয়া নৌবহর, বিমানবহর ও স্থলবাহিনীর দ্বারা প্রচণ্ড আক্রমণ করিতে থাকে। কিন্তু মার্চ্চ মাসের প্রথমসপ্তাহের মধ্যেও চূড়ান্ত ফলাফল না পাইয়া ভগ্নহৃদয় জাপ সেনাপতি জেনারেল হোমা হারিকিরি

বা আত্মহত্যা করেন বলিয়া গুজব রটে। জাপানীদের ইহাই স্বাজাতিক ধর্ম্ম। অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে কিংবা কোন আশা না থাকিলে জাপানীরা ধর্ম্ম ও সম্রাটের নামে 'হারিকিরি'র দ্বারা আত্মবিসর্জ্জন করে। জেনারেল হোমার রণনৈতিক ব্যর্থতার পর মালয় ও সিঙ্গাপুর বিজয়ী খ্যাতনামা জেনারেল ইয়া-মাসিতা ফিলিপাইন অভিযানের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন।* সান ফার্ণাণ্ডোতে তিনি তাঁহার প্রধান শিবির স্থাপন করেন। ফিলিপাইন দ্বীপ অতি বিচিত্র আকৃতির। উহা যেন একটা লম্বা ফিতার মত, এই ফিতা কোথাও কোথাও ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া যেন বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য দ্বীপ, উপদ্বীপ, উপসাগর, খাঁড়ি, জলপথ ও প্রণালী। জাপানীরা বিমান আধিপত্য বিস্তার করিয়া উহার ফাঁকে ফাঁকে দ্বীপ ও উপদ্বীপে নৌবহরসহ ঢুকিয়া পড়ে এবং প্রচুর স্থলসৈন্য নামাইয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাংশের মিন্দোরো, প্যানে, সেবু, ইত্যাদি দ্বীপ এবং দক্ষিণে মিণ্ডানাও দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া লয়। এই দক্ষিণবর্ত্তী মিণ্ডানাও দ্বীপ ও উহার ড্যাভাও বন্দরে জাপানীরা তাহাদের ফিলিপাইন অভিযানের প্রধান ঘাঁটি করিয়াছিল বলিয়া মার্কিণীদের ধারণা। এই ঘাঁটি হইতে তাহারা সুমাত্রায়ও আক্রমণ চালাইয়াছিল। উভয় পক্ষের কামান, বিমান, ট্যাঙ্ক ও নৌবহরের (ফিলিপাইনে উল্লেখযোগ্য নৌবহর ছিল না) মধ্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া তীব্র ও তিক্ত দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। বাতান উপদ্বীপের পাহাড়ে ও জঙ্গলে কি ধরণের যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা ম্যাক-আর্থারের প্রদত্ত একটি চমৎকার বীরত্বের কাহিনী উদ্ধৃত করিতেছি। কাহিনীটি এই:—

"আইগরাইট সম্প্রদায় খাস ফিলিপাইনের আদিবাসী, তাহারা খৃষ্টান নহে। উত্তর লুজনের বনতক পার্ব্বত্য অঞ্চলে তাহারা বাস করে। তাহারা খুব পরিশ্রমী এবং শান্ত স্বভাবের লোক। কিন্তু ভয় কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানে না। তাহাদের অনেকে ফিলিপাইনের স্বদেশী সেনাদলে সৈনিকের

* জেনারেল হোমার আত্মহত্যার গুজব মিত্রপক্ষের মিথ্যা প্রচারকার্য্য বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ, ইহার স্বপক্ষে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে, একথা ঠিক যে, জেনারেল ম্যাক-আর্থারের পর মেজর-জেনারেল ওয়েনরাইট যেমন মার্কিণবাহিনীর তেমনই জেনারেল হোমার পর লেঃ জেনারেল ইয়ামাসিতা বাতান যুদ্ধে জাপ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন, ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই হোমার আত্মহত্যা প্রমাণিত হয় না। বরং ইহা মার্কিণ সেনানী পরিবর্ত্তনেরই জবাব বলিয়া মনে হয়।—লেখক।

কাজ করে। তাহারা যে প্রকৃষ্ট যোদ্ধা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি একদিন জাপানীরা একটি স্থান আক্রমণ করে। আইগ-রাইটদের একটি 'কোম্পানী' সেই স্থানটি রক্ষা করিতেছিল। শৃগালের গর্ত্তের মত গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহারা সেই গর্ত্ত হইতে যুদ্ধ করিতে থাকে। কোন প্রকার কাতরতা প্রকাশ না করিয়া এবং কোনও প্রকার পলায়নের চেষ্টা না করিয়া আইগরাইটরা সেই গর্ত্তে দাঁড়াইয়া একে একে সকলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। কিন্তু বৃথা একজনও মরে নাই, প্রত্যেকে বহু জাপানী নিধন করিয়া পরে নিজে নিহত হয়।

"এই স্থানটী পুনরধিকার করার জন্য আমাদের পক্ষ হইতে পাল্টা আক্রমণের আদেশ দেওয়া হয়। একটি ট্যাঙ্ক দল ও একটি পদাতিক দলকে এই কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। এই পদাতিক দল আইগরাইটদের লইয়া গঠিত। তাহারা তাহাদের স্ব-সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃবৃন্দের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। যে অঞ্চলে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল সেই অঞ্চল বাঁশের জঙ্গলে ভরা। সেই অঞ্চলের তরাই খণ্ড এক প্রকার দুর্ভেদ্য, অতি ঘন ঝোড জঙ্গলের মধ্য দিয়া ট্যাঙ্ক চলা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ম্যাক-আর্থারের সৈন্যদের উপস্থিতবুদ্ধি অসামান্য। এই সূত্রে সেই উপস্থিতবুদ্ধি কাজে লাগিল। কোনও কথা না বলিয়া আইগরাইট দলের সেনানায়ক তাঁহার লোকদিগকে ট্যাঙ্কের ছাদে উঠিতে আদেশ দিলেন। ঝোড় জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহারা ট্যাঙ্ক চালকদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। মার্কিণ চালকগণ বদ্ধ গাড়ীর মধ্যে বসিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল, আর খোলা ছাদে দাঁড়াইয়া আইগরাইটরা তাহাদিগকে যষ্টির সাহায্যে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। তারপর শত্রুর কাছাকাছি আসিলে খোলা ছাদের উপর হইতে আইগরাইটরা অবিরাম অটোমেটিক পিস্তল চালাইতে আরম্ভ করিল। বহু ভয়ঙ্কর প্রভাত বাতান দেখিয়াছে, কিন্তু সে দিনের মত প্রভাত বুঝি কোন কালেও দেখা যায় নাই। আইগরাইটদের সে কি উন্মাদনা! বন্দুক বা জঙ্গলের সাধ্য কি সেই দুর্দ্দাম গতি রোধ করিতে পারে। সে গতি রোধ করার ক্ষমতা একমাত্র মৃত্যুর। বাতান উপদ্বীপ অনেক স্থানই রক্তরঞ্জিত হইয়া আছে,কিন্তু এত রক্তের খেলা অন্য কোথাও দেখা যায় নাই। যুদ্ধের শেষে দেখা গেল যে, আমাদের ট্যাঙ্ক এবং আইগরাইট সৈন্যদের অবশিষ্ট ভাগ যুদ্ধক্ষেত্রে রহিয়াছে, কিন্তু জাপানী পদাতিকদল একেবারে উৎসাদিত হইয়াছে।"

জেনারেল ম্যাক-আর্থার তাঁহার অধীনস্থ সেনানায়কদিগকে সমবেত করিয়া আইগরাইটদের এই বীরত্বের কাহিনীটি বর্ণনা করিয়া বলেন—"পৃথিবীর বহু রণক্ষেত্রে অসীম সাহস ও অপরিসীম বীরত্বের কার্য্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বহু পরিত্যক্ত আশা আমি সফল হইতে দেখিয়াছি। পরিখায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া লোককে আমি এমন বীরত্বের পরিচয় দিতে দেখিয়াছি যাহা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নহে। কিন্তু ট্যাঙ্কের উপর দাঁড়াইয়া আইগরাইটরা যে অসম সাহসিকতা দেখাইয়াছে, তাহার সহিত কিছুরই তুলনা হয় না। সেই অসমসাহসিকতা দর্শনে হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যায়।"

* *
*

ফিলিপাইনের সৈন্যেরা জাপানীদের ক্রূরতার মুখে এমন বহু বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে। তথাপি শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা সম্ভব হয় নাই। কারণ, জাপানীরা প্রয়োজনমত দলে দলে হাজার হাজার নূতন সৈন্য আমদানী করিতে পারিয়াছে। বিমানপথে ও সমুদ্রপথে কর্ত্তৃত্বের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। অপর পক্ষে আমেরিকা বাতান ও কোরিজিডোর রক্ষী ক্লান্ত সৈন্যদিগের ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ করিতে পারে নাই। নূতন সৈন্য ও নূতন অস্ত্র আমদানী করিতে না পারিলে অবরোধ সংগ্রাম অনিশ্চিতকাল পর্য্যন্ত চালানো যায় না। তথাপি আত্মরক্ষার দৃঢ় সংগ্রাম চলিতে থাকিল এবং ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাস অতিক্রান্ত হইল। এপ্রিল মাস হইতে কামানের গোলা ও বিমানের বোমা বৃষ্টিধারার মত বর্ষিত হইতে লাগিল এবং ইহার সঙ্গে নূতন নূতন জাপ-সৈন্য যোগ দিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত একমাত্র কোরিজিডোরেই ২০৬ বার বিমান আক্রমণের সাইরেণ বাজিয়াছে এবং ৯ই এপ্রিলের পর এক সপ্তাহের মধ্যে ৬৫ বার বিমান আক্রমণ হইয়াছিল। ইহা হইতেই কোরিজিডোর দুর্গে আত্মরক্ষার দৃঢ়তা ও জাপ আক্রমণের প্রচণ্ডতা অনুভূত হইবে। কামানের গোলাবর্ষণও দুই পক্ষ হইতে চলিয়াছিল প্রচুর। মার্চ্চ মাসের একটি মার্কিণ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ—

'ম্যানিলা উপসাগরের দক্ষিণ তীরস্থ জাপ কামান শ্রেণী আমাদের পোতাশ্রয়ের রক্ষা ব্যবস্থার উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে এবং ফোর্ট ফ্রাঙ্ক ও ফোর্ট ড্রামের উপর কামানের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করিতেছে। একটি গোলায় বহু লোক হতাহত হইয়াছে। আমাদের দুর্গগুলি হইতে পাণ্টা

গোলাবর্ষণ করা হইতেছে। বাতান রণাঙ্গনের সর্ব্বত্র শত্রুপক্ষীয় টহলদার সৈন্যগণ আক্রমণমূলক কার্য্য চালাইতেছে এবং স্থানে স্থানে প্রায়ই সংঘর্ষ হইতেছে। ক্যাভাইট প্রদেশের উপকূলে যেখানে জাপ কামানশ্রেণী স্থাপিত, সেখান হইতে দুই মাইলের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর ফোর্ট ফ্রাঙ্ক ও ফোর্ট ড্রাম অবস্থিত। অন্যান্য আমেরিকান দুর্গগুলি উপকূল হইতে অন্ততঃ দশ মাইল দূরে ম্যানিলা উপসাগরের উত্তর অংশে রহিয়াছে।'

গোটা এপ্রিল মাস ধরিয়া এবং মে মাসের প্রথম সপ্তাহে যুদ্ধের উপসংহারের দিকে এই প্রকার নিকটবর্ত্তী ঘাঁটি ও একান্তরূপে কামানের পাল্লার মধ্যে অজস্র গোলা বর্ষিত হইয়াছে। নৌদুর্গ ভাঙ্গিবার পক্ষে কামানের গোলা একটা প্রধান সহায়। জাপানীরা ইহার ব্যবহারে ত্রুটি করে নাই। ৮ই এপ্রিল ওয়াশিংটন হইতে খবর আসে যে, নিছক সংখ্যার জোরেই জাপানীরা বাতান রক্ষী মার্কিণ সৈন্যদিগকে 'শৃগাল গর্ত্ত ও বনজঙ্গল' হইতে তাড়াইয়া দিবে। তারপর জেনারেল ওয়েনরাইট কোরিজিডোর দুর্গে কতদিন আত্মরক্ষা করিবেন? কারণ, বাতানের প্রান্ত হইতে কোরিজিডোরের দূরত্ব মাত্র ৫ মাইল। সুতরাং ওয়াশিংটনের সামরিক মহল মনে করিলেন যে, বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মার্কিণ ও ফিলিপিনো সেনাদলের প্রতিরোধ চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে জাপানীরা বাতানের নূতন অভিযানে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতেছে। আর এক পক্ষকালের মধ্যেই তথায় বর্ষা আরম্ভ হইবে। নূতন এই আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে জাপানীরা বিরাট শক্তি সমাবেশ করিয়াছে। তথায় একটি জাপ সেনাদলে দুই হইতে ছয় ডিভিসন পদাতিক সৈন্য ও গোলন্দাজ ও অন্যান্য সৈন্য আছে; উহাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাজার হইতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার। ফিলিপাইন রক্ষাকারী সেনাদলের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী।

প্রকৃতপক্ষে বাতান-রক্ষী সৈন্যের সংখ্যা ৩৭ হাজারের বেশী ছিল না, কেহ কেহ অবশ্য ৪০ হাজারও অনুমান করেন এবং কাহারও কাহারও মতে জাপানীরা শেষ পর্য্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য ফিলিপাইনে আনিয়াছিল এবং ইহাদের সঙ্গে আধুনিক যুদ্ধের সমুদ্রপারবর্ত্তী দেশ আক্রমণের উপযোগী সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রসজ্জা ও অস্ত্রসজ্জা ছিল। এই প্রচণ্ড সংগ্রাম-শক্তির দ্বারা জাপানীরা বাতানের ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে এবং ১০ই এপ্রিল বাতানের যুদ্ধ শেষ হয়।

ইহার পর বাকী রহিল ফিলিপাইনের জিব্রাল্টার অর্থাৎ কোরিজিডোর দুর্গ। কিন্তু অতি দ্রুত ইহারও মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। ১৫ই এপ্রিল ওয়াশিংটনের সামরিক মহল অনুমান করিলেন—

'জাপানীরা শীঘ্রই পার্ব্বত্য দুর্গ সমন্বিত করিজিডোর দ্বীপ আক্রমণের চেষ্টা করিবে। করিজিডোর ও প্রধান ভূমিখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানের জল শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আক্রমণ চালাইবে। কয়েক দিনের মধ্যেই ওখানে বর্ষাকাল আরম্ভ হইবে। জাপানীরা বাতান উপকূল ও ম্যানিলা উপসাগর কূল—এই দুই দিক হইতেই আসিতে পারে। সেনাবাহী বজরাগুলির সঙ্গে সঙ্গে সামরিক রক্ষী-জাহাজ ছোট ছোট কামান লইয়া অগ্রসর হইবে। উপসাগরে ইতিমধ্যে এইরূপ জাহাজ চলা ফেরা করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জাপানীরা দ্বীপটির উপর আবহাওয়ার অবস্থা অনুসারে প্রবলভাবে বোমা বা কামানের গোলা বর্ষণ করিবে। তারপর বজরাগুলি নানাদিক হইতে আসিয়া দ্বীপে ভিড়িবে। ইহাই জাপানীদের রণ-পদ্ধতি।'

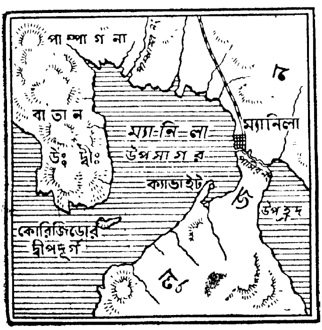
এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই। বাতান ও ক্যাভাইট হইতে প্রকাণ্ড রকমের কামান দাগিয়া ও বোমা ফেলিয়া জাপানীরা কোরিজিডোর দুর্গের শেষ আত্মরক্ষার প্রাচীর ও ব্যূহ ভাঙ্গিয়া ফেলে। ৬ই মে তারিখে কোরিজিডোর সহ ম্যানিলা উপসাগরের সমস্ত দ্বীপ-দুর্গের পতন ঘটে এবং জেনারেল ওয়েনরাইট সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করেন। কোরিজিডোর দুর্গে শেষ আক্রমণের সময় ৩ হাজারের কিছু বেশী সৈন্য ছিল। বাতানে ২৫ হাজার মার্কিণ ও ফিলিপিনো সৈন্য ও ২৫ হাজার অসামরিক লোক ছিল। ইহারা সকলেই জাপানীদের হাতে বন্দী হয়। বাতান উপদ্বীপ ও কোরিজিডোর দুর্গের ঐতিহাসিক অবরোধ সংগ্রামের এখানেই শেষ হয়। জাপানী আক্রমণ অপেক্ষা মার্কিণ আত্মরক্ষার রণনীতিই এখানে অধিকতর প্রশংসার যোগ্য।

—৪—

বাতান যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য

মার্চ্চ ও এপ্রিল, '৪২।

ফিলিপাইনের যুদ্ধে ম্যানিলার অতি দ্রুত পতন হইয়া থাকিলেও বাতানের সংগ্রাম ঐতিহাসিক কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। কেননা, জাপানের বিরুদ্ধে অন্য কোন রণক্ষেত্রেই এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া প্রতিরোধ যুদ্ধ চলে নাই। জেনারেল ম্যাক-আর্থার পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ম্যানিলাতে জাপানের বিরুদ্ধে লড়িয়া সুবিধা হইবে না—বাধাদান ও আত্মরক্ষার যাহা কিছু সংগ্রাম, সমস্তই বাতান উপদ্বীপ হইতে চালাইতে হইবে। এখানে আত্মরক্ষার ব্যূহ ও ঘাঁটিগুলি আগেই তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছিল। ম্যানিলার দক্ষিণে মার্কিণ ও ফিলিপিনো সৈন্যেরা যখন সম্মুখে ও পার্শ্বদেশে



জাপানীদের দ্বারা পিষ্ট হইল, তখন তাহারা অনেক কষ্টে ম্যানিলার উত্তরবর্ত্তী আত্মরক্ষাকারীদের সহিত যোগসূত্র স্থাপনে কৃতকার্য্য হইল। এই উত্তর দিকের সৈন্যেরাও জাপানীদের চাপে পশ্চিম অভিমুখে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। অর্থাৎ ম্যাক-আর্থারের পরিকল্পনানুযায়ী তাহারা বাতানেই ঘাঁটি লইতেছিল। পূর্ব্বেই বাতানের ভৌগোলিক অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। বাতান উপদ্বীপের তিন দিকেই সমুদ্র, মনে হয় উহা যেন জলের মধ্যেই ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং উহার দক্ষিণ প্রান্তে বিখ্যাত করিজিডোর দুর্গ। ফলে প্রকৃতির স্বাভাবিক বিঘ্নের সহিত মানুষের রচিত কেল্লা একত্রিত হইয়া বাতান উপদ্বীপকে রক্ষা করিতেছিল, জাপানীরা এজন্য প্রথম প্রথম কিছু সুবিধা করিতে পারিল না। ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় তাহারা এখানে কিছু সৈন্য নামাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইল। তখন তাহারা বাতানের পশ্চিম উপকূলে মন দিল। বাতানের যে

অংশটায় রণক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেখান হইতে পশ্চিম উপকূল ছিল পিছনের দিকে। সুতরাং এখানে সৈন্য নামাইয়া দিয়া আত্মরক্ষাকারীদের বিপন্ন করিবার চেষ্টা হইল। রাত্রিবেলায় জাপানীরা অবতরণের চেষ্টা করিল। কিন্তু এবারেও অবতরণের নৌকা বা বজরাগুলি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তথাপি কয়েকটি ছোট ছোট দল তীরে নামিতে পারিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। তখন লিঙ্গায়েন উপসাগর দিয়া নূতন সৈন্য আমদানী করা হইল। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি দল মার্কিণীদের বামপার্শ্ব দিয়া চুপি চুপি 'গড়াইয়া' পড়িতে চাহিল। কিন্তু ইহাদের তেমন শক্তি ছিল না, কিম্বা পাণ্টা আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাও করিতে পারিল না। ইহাদের সমর্থনে জাপানীরা আরও সৈন্য নামাইবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু মার্কিণীদের গোলাগুলীর আঘাতে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। তখন স্থলপথে আক্রমণের বদলে কিছুকাল ধরিয়া বিমানপথের আক্রমণই উগ্র হইয়া উঠিল। আত্মরক্ষাকারীদের বিমানবল বিশেষ কিছুই ছিল না—যেটুকুও ছিল, তাহাও জাপ আক্রমণে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দিনের পর দিন জাপ বৈমানিকেরা বাতান রক্ষাকারীদের উপর বোমা বর্ষণ করিতে লাগিল, বস্তুতঃ আকাশপথে তাহাদের একাধিপত্য ছিল। এদিকে ম্যানিলা উপসাগরের ক্যাভাইট্ নৌঘাঁটি হইতে জাপানী গোলন্দাজেরা বাতানের পশ্চাতে ও পার্শ্বদেশে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। সুবিক উপসাগরের কূলে আরও সৈন্য নামিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর শেষেও স্থলপথের সংগ্রামে বিশেষ কিছু হইল না, বরং মার্কিণীরাই কয়েকটি জাপ ঘাঁটি কাড়িয়া লইল এবং পাণ্টা আক্রমণের বিরুদ্ধেও সেই ঘাঁটিগুলি আগলাইয়া রহিল।*

এই প্রসঙ্গে মার্কিণ সমর বিভাগ ও জেনারেল ম্যাক-আর্থারের বিজ্ঞপ্তি হইতে কিছু কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে। ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের মার্কিণ সমর বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ—"গত ২৪ ঘণ্টায় বাতান উপদ্বীপে শত্রু আমাদের সৈন্যদলের বাম ও দক্ষিণপার্শ্ব আক্রমণ করিয়াছিল, জাপানীদের প্রচুর ক্ষতি সাধন করিয়া এই সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। লেঃ জেনারেল নারার অধীনে ১৬ নং ও ৬৫ নং জাপ ডিভিসন রণাঙ্গনের পূর্ব্ব ও পশ্চিম অংশে আক্রমণ চালাইয়াছিল। জাপানীদের দুইটি বাহু একত্রে একই সময়ে আঘাত হানিয়াছিল।

* 'To Stalingrad and Alamein'—by *Strategicus.*

"পশ্চিম উপকূলে আমাদের পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ রহিয়াছে—এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জাপানীরা সেখানে সোজা 'মাথা ঢুকাইবার' মত আক্রমণ চালাইল। তাতুরাই শ্রেণীর সুনির্দ্দিষ্ট বাছাই করা জাপ সৈন্যেরাই এই আঘাত হানিল। তাহারা পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন বিন্দুতে একই সঙ্গে আক্রমণ চালাইল—যেন একটি থাবার বিভিন্ন নখ দিয়া স্থানগুলি বিদীর্ণ করিতে চাহিল। ঝোঁপে জঙ্গলে আমাদের পদাতিকেরা গোলন্দাজ ও মর্টার কামানের সাহায্যে হিংস্র লড়াই করিয়াছিল, শত্রু উপকূল ভাগে হটিতে বাধ্য হইল। যাহারা জলপথে পালাইতে চাহিল, তাহারা ডুবিয়া মরিল, বাকি সৈন্যেরা হয় ধৃত, না হয় নিহত হইল।

"রণাঙ্গণের পূর্ব্বাংশে ৬৫ নং জাপ ডিভিসন সম্মুখভাগ আক্রমণ করিতে চাহিল এবং পিলার (দক্ষিণতম বাতানের পূর্ব্বাংশ) অঞ্চলে আমাদিগকে বেষ্টন করিতে উদ্যত হইল। জাপ পদাতিকেরাই একই সময়ে সম্মুখভাগ আক্রমণ ও বেষ্টন নীতি অনুসরণ করিতে চাহিল। কিন্তু আমাদের গোলন্দাজ-বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে সম্মুখভাগের আক্রমণ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং জাপানীদের প্রচুর ক্ষতিসহ বেষ্টনকৌশলও ব্যর্থ হইল।"

পশ্চিম উপকূলের লড়াই সম্পর্কে জেনারেল ম্যাক-আর্থারের একটি বিবৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিতেছেন, "পশ্চিম উপকূলে শত্রুর সমস্ত আঘাতই এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনা হইয়াছে। এই বেপরোয়া দুঃসাহসিক অভিযানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শত্রু সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। প্রথম আঘাত হানিবার জন্য (shock units) যাহাদিগকে ট্রেণিং দেওয়া ও বাছাই করা হইয়া থাকে, তাহাদিগকেই নিয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে।"

জাপ সৈন্যদিগকে প্রশংসা করিয়া জেনারেল ম্যাক-আর্থার বলিতেছেন,

"They resisted with the courage which is characteristic of Japanese troops, but at the end were glad to surrender. They are being treated with respect and consideration which their gallantry so well merits."—"যে সাহসিকতা জাপ সৈন্যদের বৈশিষ্ট্য, তাহা লইয়াই তাহারা আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু শেষে আনন্দের সঙ্গেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। যে বীর্য্যবত্তার জন্য তাহারা সম্মান ও সুবিবেচনা পাইবার যোগ্য, তাহাদের প্রতি তেমন আচরণই করা

হইতেছে।” জেনারেল ম্যাক-আর্থার ইহা দ্বারা সেনাপতির উপযুক্ত গুণ ও মর্য্যাদাবোধেরই পরিচয় দিয়াছেন।

এভাবে আত্মরক্ষাকারীদের সঙ্গে জাপানীরা কিছুদিন পর্য্যন্ত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না এবং বাতানের পার্ব্বত্য ব্যূহও তাহারা কিছুতেই ভাঙ্গিতে পারিল না—যেন একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু ঘাঁটি যতই শক্তিশালী হউক না কেন, উপযুক্ত সামরিক শক্তির প্রয়োগে একদিন উহা ভাঙ্গিবেই। জাপানীরা এই প্রকার অচল অবস্থা বরদাস্ত করিবে কেন? বাতান রঙ্গমঞ্চে এই সময় সহসা পট-পরিবর্ত্তন হইল। জেনারেল হোমার বদলে লেঃ জেনারেল ইয়ামাসিতা বাতান যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন এবং অপর দিকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নির্দ্দেশে জেনারেল ম্যাক-আর্থার বাতানের ‘শৃগালগর্ত্তে’ তাঁহার মূল্যবান শক্তি নষ্ট না করিয়া অষ্ট্রেলিয়া রক্ষার জন্য প্রেরিত হইলেন।

১৭ই মার্চ্চ জেনারেল ম্যাক-আর্থার তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র, সেনানীমণ্ডলীর কর্ম্মাধ্যক্ষ ব্রিগাডিয়ার জেনারেল আর ই সাদারল্যাণ্ড ও এইচ, এইচ, জর্জ্জ এবং অন্যান্য অফিসারসহ বিমানযোগে অষ্ট্রেলিয়ায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার এই অষ্ট্রেলিয়া যাত্রাও একটা দুঃসাহসিক অভিযানের মত ছিল। তিনিও তাঁহার দলবল বাতান হইতে চারিটি দ্রুতগামী মোটর-টর্পেডো বোটে রাত্রিবেলা রওনা হইলেন এবং সমুদ্রপথে জাপানীদের সতর্ক নৌপাহারা এড়াইয়া একটি অপ্রকাশিতনামা দ্বীপের ‘আড্ডায়’ পৌছিলেন। সেখানে তিন দিন ও তিন রাত্রি উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায় কাটাইবার পর ‘উড়ন্ত কেল্লা’ শ্রেণীর দুইটি মার্কিণ বোমারু হাজির হইল এবং ম্যাক-আর্থার ও তাঁহার দলবল সেই বোমারুযোগে অষ্ট্রেলিয়ার পোর্ট ডারুইনে পৌছিলেন।

মেজর জেনারেল জোনাথন ওয়েনরাইট্, যিনি উত্তরাংশের সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছিলেন, তিনিই এক্ষণে বাতান যুদ্ধের ভার পাইলেন। মার্কিণ ও ফিলিপিনো সৈন্যরা বাতান রক্ষার জন্য অভূতপূর্ব্ব দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম চালাইয়াছে, সন্দেহ নাই। তথাপি এই যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত যে জয়লাভের আশা ছিল না, তাহা পূর্ব্বাহ্নেই উপলব্ধি হইয়াছিল। খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র, হাসপাতাল ও এরোপ্লেন ইত্যাদি নানা দিকেই প্রচুর অভাব দেখা দিতে লাগিল। ১৯৪০ সালে ফ্রান্স ও বেলজিয়মের সঙ্কটের সময় বে-সামরিক নর-নারী শত্রু সৈন্যদলের আগমনভীতিতে দিগ্বিদিকে ছুটাছুটি

করিয়া যেমন অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল, রাজধানী ম্যানিলার পতনের পর ফিলিপিনো নর-নারীও তেমন বাতানে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, ফিলিপিনো-মার্কিণ সৈন্যদলের কাছাকাছি থাকিলে তাহারা আশ্রয়ও পাইবে এবং জাপ সৈন্যদের অত্যাচার হইতে নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিবে। কিন্তু তাহারা নির্ব্বিঘ্ন ছিল না। ২৫ হাজার নর-নারী বাতানের সঙ্কীর্ণ অংশে ভীড় করায় খাদ্যদ্রব্য, আশ্রয় ও ঔষধপত্রের প্রশ্ন সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল। নারীরা জাপ সৈন্যদের হাত হইতে নিজেদের সম্মান ও সতীত্ব রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু অনেকের অদৃষ্টেই নিদারুণ লাঞ্ছনা ঘটিয়াছে। বিশেষভাবে তরুণীদের উপর বলাৎকার হইয়াছে।*

ম্যানিলা ও অন্যান্য স্থান হইতে ফিলিপিনো স্ত্রীপুরুষ ও শিশুদের বাতান অভিমুখে পলায়নের পথ জাপানীরা কতকটা স্বেচ্ছায়ই ছাড়িয়া দিয়াছিল। কারণ, তাহারা জানিত যে, বাতানে বেশী খাদ্যদ্রব্য নাই। ফলে বে-সামরিক নর-নারীর ভীড়ে সৈন্যদের খাদ্যভাণ্ডার আগেই ফুরাইয়া যাইবে। সুতরাং এই সমস্ত পলায়মান নর-নারী খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রশ্নের বিচারে নিজেদের অজ্ঞাতসারে জাপানকেই সাহায্য করিতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষের সতর্কতা ও নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা ধনপ্রাণের ভয়ে বাতানে যাইতে বিরত হয় নাই। সেই সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী নর-নারী ও শিশুর দুর্দ্দশাও অবর্ণনীয় হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছিল। যদিও অনেক মেয়ে মুখে হাসি

---

* জেনারেল ম্যাক-আর্থারের এডিকং কর্ণেল ক্যারলো রমোলো বাতান যুদ্ধ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে ফিলিপিনো মেয়েদের উপর বলাৎকারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। বাতানের গ্রাম্য অঞ্চলে জাপ সৈন্যেরা মেয়েদের সন্ধানে ঢুকিত। একটি জাপ সৈন্যকে কোনও গ্রাম্য গৃহের রান্নাঘরে ঢুকিয়া একটি যুবতীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিতে দেখা গিয়াছে। এরলিন্দা নাম্নী একটি সুন্দরী তরুণী ও আর একটি যুবতীর মৃতদেহ একটা 'শৃগাল গর্ত্তে' পাওয়া গিয়াছিল। এরলিন্দা তাহার স্বদেশের সহরে সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় সুন্দরী শ্রেষ্ঠা (Beauty Queen) বলিয়া ঘোষিতা হইয়াছিল। তাহাকে ও অপর তরুণীটিকে জাপ সৈন্যেরা বহুবার বলাৎকার করিয়া গর্ত্তে ফেলিয়া দেয়। তাহাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত ও থেতলাইয়া গিয়াছিল। জাপানীরা এভাবে জোর করিয়া বহু নারীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে।

'I Saw the Fall of the Philippines'.

—by Colonel Carlos P. Romulo.

টানিয়া কথা বলিতেছিল, তথাপি সেই হাসির তলায় ভয় চাপা ছিল। আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড়ের জন্য বাতানে খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধপত্রের চরম সঙ্কট দেখা দিয়াছিল। জেনারেল ম্যাক-আর্থারের এডিকং স্বয়ং রমোলো লিখিয়াছেন,—

"All Bataan seemed tragic and terrible to me. The field hospitals were made of tents and bamboo structure, and inside and out of them the earth was trampled into inches of dust. The ambulances brought the wounded there in storms of dust. Boys were operated upon without disinfectants, in tents cloudly with dust. Fires burned before the hospital and over them were pans where instruments were always boiling. The doctors and nurses did their best. But it was impossible to fight disease and gangrine without sufficient instruments, without medicines or anaesthetics, or towards the end without even the simplest of antiseptics. The men who lay on the canvass beds in the open hospitals of Battan·····had no protection against either disease or bombs." "সমগ্র বাতানের অবস্থা আমার নিকট মর্ম্মান্তিক ও ভয়াবহ বলিয়া মনে হইতেছিল। রণক্ষেত্রের হাসপাতালগুলি তাঁবু ও বাঁশ দিয়া তৈয়ার হইয়াছিল এবং এগুলির ভিতরে ও বাহিরে পায়ের চাপে মাটী গুড়া হইয়া কয়েক ইঞ্চি পুরু ধূলায় পরিণত হইয়াছিল। এই ধূলি ঝড়ের ভিতর দিয়াই এম্বুলেন্সযোগে আহত সৈন্যদের আনা হইতেছিল। ধূলায় মেঘাচ্ছন্ন তাঁবুর ভিতরে বীজাণুশোধক ঔষধ ছাড়াই সৈন্যদিগকে অস্ত্রোপচার করা হইত। হাসপাতালের সামনে সর্ব্বদাই আগুন জ্বালাইয়া রাখা হইত এবং প্যানে জল ফুটাইয়া যন্ত্রপাতিগুলি সর্ব্বদাই সিদ্ধ করা হইত। ডাক্তার ও নার্স্‌গণ তাঁহাদের যথাসাধ্য করিতেছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট যন্ত্রপাতি, ঔষধ ও বেদনা নিরোধক ভেষজ ছাড়া ব্যাধি ও গলিত ক্ষতের বিরুদ্ধে লড়াই করা অসম্ভব ছিল। শেষের দিকে অতি সাধারণ ক্ষত নিরোধক ঔষধও মিলে নাই। বাতানের খোলা হাসপাতালের ক্যানভাসের বিছানায় শায়িত সৈন্যদিগকে ব্যাধি বা বোমা, কোন কিছুর হাত হইতেই রক্ষা করিবার উপায় ছিল না।"

এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে মার্কিণ ও ফিলিপিনো সৈন্যগণকে প্রায় চারি

মাস লড়িতে হইয়াছিল। অপর পক্ষে জাপানীরা সমস্ত প্রকার খাদ্য, ঔষধপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যে সুসজ্জিত হইয়া বাতান আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের আয়োজন নিখুঁত ও সম্পূর্ণ ছিল। কর্ণেল রমোলো বলিতেছেন—

"The Japanese had everything, we had not in the way of food and equipment and medicine. They had gas-masks with spare lenses, quinine, chlorine to purify water, bandages, toothbrushes, and extra socks—articles that to us were remembered luxuries. They had food brought into their rear lines from our conquered provinces. In fact, so completely was the Japanese army organised that it even carried its own division of prostitutes, vulgarly known to our Fil-american forces as 'shock absorbers.' Some of these girls served as assistants in the women's nursing corps, but the majority were there for purely professional reasons. In everyway the Japanese were prepared."

"খাদ্য, ঔষধপত্র, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি যেমন আমাদের কিছুই ছিল না, জাপানীদের তেমনই সমস্ত কিছু ছিল। তাহাদের অতিরিক্ত 'লেন্স'সহ গ্যাস-মুখোস ছিল, কুইনাইন, পানীয় জল পরিষ্কারের জন্য ক্লোরিন, ব্যাণ্ডেজ, টুথ-ব্রাশ এবং অতিরিক্ত মোজা ছিল—অর্থাৎ যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের কাছে বিলাস বস্তুরূপে স্মরণীয়, জাপানীদের তাহা সমস্তই ছিল। আমাদের বিজিত দেশগুলি হইতে তাহারা পিছনের ব্যূহগুলিতে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া মজুত করিয়াছিল। বস্তুতঃপক্ষে জাপানী সৈন্যদল এতটা নিখুঁত ও সঙ্ঘবদ্ধ ছিল যে, তাহাদের দলের সঙ্গে এক বাহিনী বেশ্যা পর্য্যন্ত ছিল—এই বেশ্যাদিগকে মার্কিণ-ফিলিপিনো সৈন্যেরা অশ্লীল ভাষায় 'আঘাত-সহকারিণী' বলিয়া অভিহিত করিত। এই সমস্ত স্ত্রীলোকের কেহ কেহ নারী সেবিকা-বাহিনীর (নার্স) সহকারীরূপে কার্য্য করিত বটে, কিন্তু অধিকাংশই সৈন্যদলে কেবল মাত্র বেশ্যাবৃত্তির জন্য থাকিত। জাপানীরা এভাবে সমস্ত প্রকারেই প্রস্তুত ছিল।*

* কেবল জাপানী সৈন্যদলে বেশ্যার কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। প্রকৃতপক্ষে সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য অধিকাংশ সাম্রাজ্যবাদীয় দেশেই স্ত্রীলোকের ব্যবস্থা

এই প্রস্তুতি কেবলমাত্র অস্ত্র হইতে গণিকা পর্য্যন্তই প্রসারিত ছিল না, সমুদ্রপথের তথ্য পর্য্যন্ত তাহাদের নখদর্পণে ছিল। জাপানীরা ফিলিপাইনের আক্রান্ত স্থানের চতুর্দ্দিকস্থ জলরাশি, স্রোত, গভীরতা, উপকূল ইত্যাদি সমস্ত কিছুর সংবাদই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, উপকূলভাগের একটি স্থানে একদিন সমুদ্র স্রোতে কতকগুলি বোতল ভাসিতে দেখা গেল। বোতল!—ব্যাপার কি? সেগুলি তুলিয়া খোলা হইল এবং দেখা গেল যে, এইগুলির মধ্যে জাপসৈন্যদের প্রতি নির্দ্দেশক কতকগুলি বার্ত্তা বা message রহিয়াছে। বার্ত্তাবাহী এই বোতলগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৌছিবার কথা ছিল এবং উহার দ্বারা জাপসৈন্যদিগকে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহারা যেন উপসাগর সাঁতরাইয়া পার হয়, পার হইলেই তাহারা দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের জন্য নৌকা অপেক্ষা করিতেছে।

সমুদ্রস্রোতে ভাসমান বোতলবাহী এই বার্ত্তা হইতেই পাঠকেরা বুঝিতেছেন যে, জাপানীদের প্রস্তুতি, কৌশল ও চতুরতা কি বিস্ময়কর ছিল। মালয়ের জঙ্গলে তাহারা যে বুদ্ধি ও চাতুর্য্যনীতির চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছিল, ফিলিপাইন বা বাতানের জঙ্গলেও তাহার অভাব ছিল না। কর্ণেল রমোলো তাঁহার পুস্তকে বলিয়াছেন :—

'The Japanese are masters of deception. Their forte is trickery. Where we crawled on all fours they wriggled on their bellies, as inconspicuously as snakes.'—'জাপানীরা চাতুর্য্যনীতির ওস্তাদ ছিল। এই চতুরতাই ছিল তাহাদের একটা মস্ত শক্তি। আমরা যেখানে হাতে ও পায়ে হামাগুড়ি দিয়া যাইতাম, তাহারা সেখানে সাপের মত স্বচ্ছন্দে বুকে হাঁটিয়া চলিত!'

মালয়ের জঙ্গলে জাপানীদের যে ওস্তাদি দেখা গিয়াছে, বাতানেও তাহার অভাব ছিল না। জঙ্গলের মধ্যে সাপের মত বুকে হাঁটিয়া যেমন চুপি চুপি তাহারা প্রবেশ করিত, তেমনই যাহাতে পায়ের কোন শব্দ না হয়, এজন্য রবারের সোল্‌ওয়ালা জুতা তাহারা ব্যবহার করিত। গাছের পাতা দিয়া

থাকে। আমাদের খাস কলিকাতায়ও মিত্র সৈন্যদের জন্য গণিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং এজন্য সরকারী ব্যবস্থায় গণিকালয়ও বাড়িয়াছে। ইহা ছাড়া সৈন্যদলের সঙ্গেও নানাভাবে স্ত্রীলোক থাকে, যদিও প্রকাশ্যে তাহারা বেশ্যা বলিয়া পরিচিত নয়।—লেখক

ছোট্ট ছোট্ট জাল তৈয়ার করিয়া তাহারা মাথায় ঢাক্না দিত। কিন্তু ইহার মধ্যেও আবার বৈশিষ্ট্য ছিল। যে সৈন্য যে গাছে চড়িয়া চোরাগোপ্তা গুলী চালাইত তাহাকে সেই গাছেরই পাতা জোগাড় করিয়া মাথায় ঢাক্না তৈয়ার করিতে হইত। তাহারা দিনের বেলায় গাছগুলি চিনিয়া রাখিত, তারপর হামাগুড়ি দিয়া চুপি চুপি ঢুকিয়া সেই গাছের পাতা সংগ্রহ করিত। এভাবে তাহারা আত্মগোপন বা 'camouflage' এর নিতান্ত সহজ, অথচ অসাধারণ কৌশল অনুসরণ করিত। মার্কিণ ও ফিলিপিনো সৈন্যদের তুলনায় জাপানীদের আর একটা সুবিধা এই ছিল যে, খাদ্যদ্রব্য তাহাদের প্রায় লাগিত না! মার্কিণ-ফিলিপিনো সৈন্যেরা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া যে ন্যূনতম খাদ্যের ব্যবস্থা করিত, জাপানীদের কাছে সেই খাদ্যই ছিল একটি বিলাসের বস্তু! গ্রীষ্মপ্রধান দেশের যুদ্ধের জন্য জাপানীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের কষ্ট কম হইত এবং মার্কিণ-ফিলিপিনো সৈন্যদের তুলনায় অনেক বেশী তাহারা সহ্য করিতে পারিত।

জাপানী সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে ফিলিপাইনের কর্ত্তাদের ধারণা ছিল যে, সৈন্যগুলি বুঝি নিতান্ত যন্ত্রচালিতবৎ, তাহাদের নিজস্ব কোন আলাদা অস্তিত্ব নাই। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যেক জাপানী সৈন্যই নিজের পরিকল্পনা অনুসারে নিজের উদ্যমে যুদ্ধ করিতে পারিত। তাহারা একাদিক্রমে দিনের পর দিন জঙ্গলের মধ্যে একাকী কাটাইতে পারিত—অন্ধকারে তাহারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাইত এবং দিনের বেলা অদৃশ্য হইয়া যাইত। এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত রণ-কৌশলের জন্য মার্কিণ-ফিলিপিনো সৈন্যেরা প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং কৌশলগুলি যথেষ্ট সফল হইয়াছিল।

সিঙ্গাপুরে জাপানীরা ইংরাজদিগকে রণ-কৌশলের ধাপ্পা দিয়া বোকা বানাইয়াছিল। তাহারা এমন একটা ধারণার প্রচার করিয়াছিল যে, তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে প্রকাণ্ড সৈন্যদলের সমাবেশ করিয়াছে। এজন্য তাহারা অনেক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল, দলে দলে মোরগ ছাড়িয়া দিয়া মুর্গীর ডাকে পাড়া কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল—ভাবখানা এই যে, 'দেখ কত সৈন্য এখানে তাঁবু ফেলিয়াছে এবং আয়োজনটাই বা কত বড়!' বাতানেও তাহারা এই সমস্ত ধাপ্পা দিয়াছিল। ইহার সঙ্গে তাহারা আরও ছলচাতুরি অবলম্বন করিল, তাহারা মৃত ফিলিপিনো সৈন্য ও অফিসারদের পোষাক পরিয়া ভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিল। একবার একজন জাপানী সৈন্য ফিলিপিনো

অফিসারের পোষাক পরিয়া কয়েকটি ফিলিপিনো-মার্কিণ সৈন্যকে একটি জাপ মেসিনগানের ঘাঁটির দিকে লইয়া গেল, ফিলিপিনো-মার্কিণ সৈন্যেরা কোন সন্দেহ করে নাই। জাপ ঘাঁটির নিকটবর্ত্তী হইলে দলের মার্কিণ ক্যাপ্টেন পেটে গুলীবিদ্ধ হইয়া নিহত হন। দুইটি ফিলিপিনো সৈন্য মাটীর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করে। অতঃপর তাহারা জাপ ছদ্মবেশীকে গুলী করিয়া মারে এবং মেসিনগানের ঘাঁটিটা দখল করে।

শ্রেষ্ঠতর, সঙ্ঘবদ্ধ ও চতুর জাপ সৈন্যদের সঙ্গে এইভাবে দিনের পর দিন বাতানের পাহাড়ে ও জঙ্গলে যুদ্ধ চলিল। কিন্তু রসদ, ঔষধপত্র ও প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জামের অভাবে ফিলিপিনো সৈন্যেরা বড়ই বে-কায়দায় পড়িল। তথাপি তাহাদের উৎসাহ এবং দেশপ্রেমের কোন অভাব ছিল না, এমন কি জেনারেল ম্যাক-আর্থারের অষ্ট্রেলিয়া গমন সংবাদেও সৈন্যদলের মধ্যে নৈরাশ্য দেখা দিল না। এই সময় বাতানের 'শৃগালগর্ত্তে' সৈন্যদের মুখে মুখে একটা চমৎকার ছড়া চলতি হইয়াছিল। রণক্ষেত্রের সর্ব্বত্র সৈন্যদের মুখে ইহা শুনা যাইত। ছড়াটি এই :—

"We're the battling bastards of Bataan,
No Mama, no Papa, no uncle Sam". *

অর্থাৎ

"বাতান-রক্ষী জঙ্গী মোরা বে-আইনী সন্তান,
(মোদের) মাও নেই, বাবাও নেই, নেইকো খুড়ো শ্যাম।"

বাস্তবিক এই অপূর্ব্ব ছড়ার দুই লাইনের মধ্যে সমগ্র সামরিক অবস্থা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'শ্যাম খুড়ো' বা মার্কিণ মুল্লুক হইতে নূতন সাহায্য আসিল না এবং বাতানের মা-বাপ শূন্য বে-আইনী সন্তানেরা' শৃগাল-গর্ত্তের পরিখা হইতে মাত্র একবেলা দুই মুঠা ভাত খাইয়া প্রবল বিক্রমে প্রতিরোধ চালাইতে লাগিল। যুদ্ধের ক্লান্তি ও ব্যাধিকে তাহারা যেন অস্বীকার করিতে চাহিল। কিন্তু জাপানীরা এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলিতে দিতে পারে না। জেনারেল ইয়ামাসিতা (মালয় ও সিঙ্গাপুর বিজয়ী) পূর্ণোদ্যমে আক্রমণের জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করিলেন। এই সময় তাঁহার হাতে কয়েক ডিভিসন

---

* 'I Saw the Fall of the Philippines'
—by Colonel Carlos P. Romulo.

সৈন্য ছিল, ইহা ছাড়া লুজোনের অন্যান্য অংশেও দুই ডিভিসন সৈন্য ছিল। ২৪শে মার্চ্চ তিনি জেনারেল ওয়েনরাইট্‌কে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু মার্কিণ সেনাপতি সম্মত হইলেন না। তখন করিজিডোর দুর্গের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ সুরু হইল। জেনারেল ইয়ামাসিতা প্রথম পর্য্যায়ের আক্রমণেই প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কিম্বা করিজিডোর হইতে পলায়নের পথ বন্ধ করিতে চাহিলেন।

২৮শে মার্চ্চ তারিখ বাতানে যে ব্যাপক আক্রমণ সুরু হইল, ৯ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত ধারায় চলিল। জেনারেল ইয়ামাসিতা তাঁহার প্রধান আক্রমণ আরম্ভ করিলেন সন্ধ্যার পর। বোধ হয় আধুনিক সমরাস্ত্রের স্থির লক্ষ্যকে এড়াইবার জন্যই তিনি রাত্রিবেলার আশ্রয় লইয়াছিলেন। বাহিরের ঘাঁটিগুলিতে জাপানীরা যে আক্রমণ চালাইল, দ্রুত পাল্টা আক্রমণের দ্বারা আবার সেগুলি উদ্ধার করা হইল। কিন্তু সবচেয়ে বড় আক্রমণ ঘটিল ৩১শে মার্চ্চ রাত্রিবেলা। আত্মরক্ষার ঘাঁটিগুলির ঠিক মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া এই আক্রমণ সাধিত হইল। বড় বড় মর্টার কামানের গোলাগুলী আড়াল করিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত জাপানীরা ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল এবং তীব্র হাতাহাতি যুদ্ধের পর স্থানটি জাপানীরা দখল করিয়া লইল। পরদিন রাত্রিবেলা আবার আক্রমণ সুরু হইল। এবার আত্মরক্ষার প্রধান ব্যূহে জাপানীরা প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা একটা ছিদ্রের সৃষ্টি করিল। প্রবল পাল্টা আক্রমণের দ্বারা এই রন্ধ্র বন্ধ করিবার চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু আত্মরক্ষাকারী ক্লান্ত সৈন্যেরা পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইল। ৩রা এপ্রিল রাত্রিবেলা স্থলপথের এই আক্রমণে জাপানী নৌবহর জলপথ হইতেও সহযোগিতা করিল। পূর্ব্ব পার্শ্বে জাপানীরা অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছিল এবং সেখানে সমুদ্র হইতে জাপসৈন্যেরা ফিলিপিনোদের পশ্চাতে অবতরণের চেষ্টা করিল। প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া অবতরণের নৌকাগুলি প্রথম প্রথম তাড়াইয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু পরদিন রাত্রিবেলা আরও প্রচুর সংখ্যায় বড় বড় কামান লইয়া নৌকাগুলি দেখা দিল এবং সেগুলি সাফল্যের সঙ্গে আত্মরক্ষার পশ্চাৎ ব্যূহ আক্রমণ করিল। এভাবে কয়েকদিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চলিল—ট্যাঙ্ক, মর্টার, কামান, বন্দুক, ছোঁমারা বিমান ইত্যাদি সমস্ত একযোগে আক্রমণ চালাইল। আত্মরক্ষাকারী ক্লান্ত সৈন্যেরা যতই ঘাঁটি ছাড়িয়া পিছু হটিতেছিল জাপানীদের আক্রমণও যেন ততই কঠোর হইতে লাগিল। ৭ই এপ্রিল

রাত্রিবেলা আত্মরক্ষার প্রধান ব্যূহ পশ্চাতে স্থানান্তরিত করিয়া পুনর্গঠন করিতে হইল। কিন্তু তখন স্পষ্টই বুঝা গেল যে, আর আশা নাই। জেনারেল ওয়েনরাইটের রিপোর্টের জবাবে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জানাইলেন যে, অবস্থানুযায়ী যে কোন ব্যবস্থা যেন তিনি অবলম্বন করেন। ৯ই এপ্রিল জেনারেল ওয়েনরাইট্ বাতান হইতে দুই মাইল সঙ্কীর্ণ প্রণালী পার হইয়া করিজিডোর দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং ঐ দিনই বাতানের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, রক্ষা করিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বাতানের যুদ্ধে গোড়া হইতে খাদ্যদ্রব্যের অভাব ছিল। ব্রিগাডিয়ার জেনারেল হার্লির উপর ভার ছিল বাতানের অবরুদ্ধ সৈন্যদলকে খাদ্য ও সরবরাহ জোগাইবার জন্য। কিন্তু প্রত্যেক ৩ খানা পোতের মধ্যে মাত্র ১খানা পোত ঠিকমত পৌছিতে পারিত। শেষের দিকে খাদ্য ও ঔষধপত্র একবারে ফুরাইয়া গেল, সৈন্যদলের মধ্যে ম্যালেরিয়া ও আমাশয় দেখা দিল। বাতানে ২৫ হাজার অসামরিক লোকজন ও ৪০ হাজার সৈন্য ছিল, ইহার মধ্যে ৫ হাজার সৈন্য হয় পীড়িত কিম্বা আহত ছিল। *

বাতানের পর করিজিডোর দুর্গে গিয়া জেনারেল ওয়েনরাইট্ আর এক মাসকাল আত্মরক্ষা করিলেন। অবশ্য এক মাস বলিলে ভুল হইবে। কেননা, এতদিন ধরিয়া আক্রমণ চলে নাই। যে মুহূর্ত্তে বাতান উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের ঢালু জায়গা হইতে (যে স্থান বড় বড় কামানের ঘাঁটির পক্ষে চমৎকার) অজস্র গোলাগুলী এবং আকাশপথে বোমা বর্ষিত হইতে লাগিল, সেই মুহূর্ত্তেই করিজিডোর দুর্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ৬ই মে সেই যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

---

* 'To Stalingrad and Alamein'—by *Strategicus*.

সপ্তম অধ্যায় ঃ দক্ষিণ ব্রহ্মের পতন

—১—

মৌলমেন ও টেনাসেরিম

৩১শে জানুয়ারী, ৪২।

[ব্রহ্মদেশ দখলের আসল যুদ্ধ সুরু হইয়াছিল ফেব্রুয়ারীর শেষে। কিন্তু মৌলমেন ও মার্ত্তাবান হইতে সুরু করিয়া দক্ষিণতম ব্রহ্মের টেনাসেরিম বিভাগ মালয় যুদ্ধের পর্ব্বাংশেই ধরা যাইতে পারে। মালয় ও দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্ম একই ভূভাগের সংলগ্ন, এমন কি অবিচ্ছিন্ন বলিয়া এই অংশের যুদ্ধ অনিবার্য্যরূপে মালয় সংগ্রামের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। জাপানীদের রণনীতি একটা প্রকাণ্ড বেড়াজালের মত দক্ষিণ ব্রহ্ম, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইনকে যেন একই সময়ে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। সুতরাং ভৌগোলিক সীমার বিচ্ছেদের জন্য দেশগুলি পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে এই দেশগুলিতে প্রায় একই সময়ে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।]

রণনৈতিক চাতুর্য্যের একটা প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, বহু স্থানে একই সময়ে আক্রমণ করিয়া প্রতিপক্ষকে বিহ্বল করা এবং কতকগুলি স্থানে প্রচণ্ড শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রতিপক্ষের শক্তিকে নানাস্থানে ছড়াইয়া দেওয়া বা বিচ্ছিন্ন করা। ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রায় সমস্ত স্থানেই জাপান আক্রমণ চালাইতেছে এবং কতকগুলি অংশে প্রচণ্ড শক্তির সমাবেশ করিয়াছে। ফলে, বৃটিশপক্ষ কোন স্থানেই সাফল্যের সহিত দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কারণ, জাপানের মত অনুরূপ সংখ্যাশক্তি লইয়া মিত্রপক্ষ কোথাও প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেছে না। মালয়, ব্রহ্মদেশ ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ—প্রধানতঃ এই তিন রণভূমিতে মিত্রপক্ষের শক্তি বিক্ষিপ্ত ও ছড়ানো, তাহাদের আয়োজন জাপানের মত নহে এবং জাপান আক্রমণ করিতেছে বলিয়া আত্মরক্ষাকারীদিগকে আক্রমণকারীর পরিকল্পনার নিকট নত হইয়া চলিতে হইতেছে। জাপান যে কৌশলে ও যে শক্তিতে যুদ্ধ চালাইতেছে, তাহাতে আগামী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহার জয়লাভ আদৌ

বিস্ময়কর হইবে না। যেখানে শক্তির সমতা নাই, সেখানে উৎকৃষ্ট যোদ্ধার পক্ষে অগ্রগতি অত্যন্ত সহজ।

এই সহজ অগ্রগতির দৃষ্টান্তই আমরা পাইতেছি মালয় ও দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধে। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রতিদিন সংবাদ পাইতেছি যে, যেখানে আসিয়া জাপান দাঁড়াইতেছে, সেখান হইতেই বৃটিশ সৈন্য কেবল withdraw বা ঘাঁটি ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে। এই পরিত্যাগ বা পশ্চাদপসরণ পরাজয়েরই নামান্তর মাত্র। আমরা চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি যে, একে একে দক্ষিণ ব্রহ্মের সমস্ত ঘাঁটি জাপানীরা দখল করিয়া লইতেছে। প্রথমে গিয়াছে ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট, অতি সহজে ইহা দখল হইয়াছে। তারপর মালয়ের যুদ্ধের জন্য এই দিকে ততটা জোর দেওয়া হয় নাই। কিন্তু সিঙ্গাপুরের দিকে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ব্রহ্মের আক্রমণও ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে। ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টের পতনের পর টেনাসেরিম বিভাগের উপর আক্রমণ সুরু হইয়াছে এবং এই বিভাগের মারগুই, টেভয়, মৌলমেন ইত্যাদি দখল হইয়া গিয়াছে। টেনাসেরিম বিভাগকে আমাদের বাঙ্গলা দেশের চট্টগ্রাম বিভাগের সহিত তুলনা দেওয়া যায়। চট্টগ্রাম বিভাগও দীর্ঘ সমুদ্রতটবর্ত্তী এবং দক্ষিণ দিকে ইহা ক্রমশঃ নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পাহাড়, অরণ্য, খরস্রোতা নদী এবং সমুদ্রতীর ও বন্ধুর ভূমি চট্টগ্রামের বৈশিষ্ট্য। টেনাসেরিম বিভাগও অনুরূপ এবং ইহার পাশাপাশি চলিয়াছে থাইল্যাণ্ডের সীমা—ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ইহা প্রায় পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক বিচারে ইহা একটি যোজক মাত্র এবং এই ধরণের যোজকে যুদ্ধ চালানো অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ, উহার এক পার্শ্বে (থাইল্যাণ্ড) শত্রু এবং অন্য পার্শ্বে সমুদ্র। রণনীতির সাধারণ ধর্ম্মানুসারে সমুদ্রের পট-ভূমিকায় সঙ্কীর্ণ যোজকে আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালানো দুঃসাধ্য। প্রচুর সৈন্যদলকে ইচ্ছামত মহড়ায় খেলানো যায় না, অথচ সম্মুখভাগে শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ এবং পশ্চাতে অগাধ সমুদ্র। এই সমুদ্রকে কাজে লাগানো যাইত, যদি প্রচুর সংখ্যক জাহাজ ও নৌসৈন্যের সমাবেশ করা যাইত। (বিমানবহরের সহযোগিতা যে প্রয়োজনীয় তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র)। থাইল্যাণ্ডের সীমা হইতে মিট্টা হইয়া টেভয়ের দিকে এবং কাওকারিক হইয়া মৌলমেনের দিকে জাপানীরা যে সম্মুখবর্ত্তী চাপ দিয়াছিল, উহা প্রতিরোধ করা সহজ হইত যদি পশ্চাৎবর্ত্তী সমুদ্র হইতে যুদ্ধ-জাহাজ ও

বিমানবহরের যথোপযুক্ত সহযোগিতা পাওয়া যাইত। কিন্তু এই রণকৌশল বৃটিশবাহিনী খাটাইতে পারিতেছে না উপযুক্ত সংখ্যাশক্তির অভাবে।

সালুইন, থাটন, আমহার্ষ্ট, টেভয় এবং মারগুই—এই কয়টি জেলা লইয়া টেনাসেরিম বিভাগ গঠিত। এই জেলাগুলির পূর্ব্বাংশ পর্ব্বতবহুল এবং গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন। এই সমস্ত পর্ব্বতের শৃঙ্গ কোথাও কোথাও এক হাজার হইতে তিন হাজার এবং তিন হাজার হইতে সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। তবে থাটন জেলায় জঙ্গল বেশী থাকিলেও উহা সালুইন বা আমহার্ষ্ট জেলার মত ততটা পর্ব্বতবহুল নহে এবং এই জেলার থাইল্যাণ্ড সীমান্ত দিয়া কতকগুলি গিরিসঙ্কট ও রাস্তা আছে। এই রাস্তাগুলি প্রধানতঃ শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। টেভয় এবং মারগুই জেলায়ও অনুরূপ কয়েকটি trade route বা ব্যবসায়-বাণিজ্যের রাস্তা আছে এবং এইগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮২৬ সালে বৃটিশ কর্ত্তৃক এইগুলি দখলের আগে এক শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া এই জেলাগুলিতে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ চলিয়াছিল। টেনাসেরিম বিভাগ যেখানে সঙ্কীর্ণ যোজকের মত ক্রমশঃ দক্ষিণে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, উহার একদিকে বঙ্গোপসাগর ও অন্যদিকে শ্যামোপসাগর এবং এই স্থানটি বোধ হয় ৩০ মাইলের বেশী চওড়া নহে। ফলে, এই সামান্য পথটুকু অতিক্রম করা সহজ ছিল এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে দূরবর্ত্তী আরব ও ভারতবর্ষের ব্যবসায়-বাণিজ্য এই পথ দিয়া সুদূর প্রাচ্য পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। আজ দক্ষিণ ব্রহ্ম আমাদের নিকট অপরিচিত হইয়া থাকিলেও এবং যুদ্ধের কল্যাণে আমরা নূতন করিয়া ভূগোল শিখিলেও এই অংশটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিতান্ত কম ছিল না। টেনাসেরিম বিভাগের এই জেলাগুলি আজ একে একে জাপানীরা দখল করিয়া লইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত বিখ্যাত মৌলমেন বন্দরেরও পতন হইয়াছে। রেঙ্গুণের পর মৌলমেন সমগ্র ব্রহ্মদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর। কেবল বন্দর নহে, রেঙ্গুণ হইতে সিঙ্গাপুর যাইবার পক্ষে ইহা একটি বড় রকমের বিমান ঘাঁটি। ইরাবতীর পর ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ নদী সালুইন, এই নদীর মোহনার নিকট মৌলমেন অবস্থিত এবং ইহা আমহার্ষ্ট জেলার অন্তর্গত। সেগুন কাঠের যে ঐশ্বর্য্যের জন্য ব্রহ্মদেশ লোভনীয়, সেই সেগুন কাঠ সালুইন নদী দিয়া ভাসাইয়া মৌলমেনে আনা হইত এবং মৌলমেন ইহার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে টেনাসেরিম বিভাগের এই অংশটা মালয়ের যুদ্ধের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ছিল। ব্যাঙ্কক হইতে যে রেলপথ মালয়ে গিয়াছে, জাপানীদের উহাই ছিল প্রধান সরবরাহের পথ। ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টের বিমানঘাঁটি এই সরবরাহপথের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। সুতরাং ডিসেম্বরের মধ্যভাগে জাপানীরা উহা দখল করিয়া লয়। আত্মরক্ষার পক্ষে এই স্থানগুলি একবারে খোলা বা exposed ছিল—টেভয় এবং মারগুই বিমানঘাঁটির অবস্থাও অনুরূপ ছিল। আর লড়াই করিবার জন্য টেভয়তে ছিল এক ব্যাটেলিয়ন ও দক্ষিণে মারগুইতে ছিল আর এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য। ১৩ই ডিসেম্বর মারগুইতে প্রথম বোমা বর্ষিত হয়, তারপর আরও কয়েকবার জাপানীরা সেখানে হানা দেয়। ডিসেম্বরের শেষে জেনারেল ম্যাকলিয়ড্, যিনি এতদিন বর্ম্মা যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন, তিনি জেনারেল হাটনের হাতে সৈন্যাপত্য অর্পণ করেন। জেনারেল হাটন ভারতবর্ষে জেনারেল ওয়েভেলের সেনানীমণ্ডলীর কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ব্রহ্মদেশের বাধাবিঘ্ন ও সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তাঁহার কিছু ধারণা ছিল। তথাপি ১৯শে জানুয়ারী যখন টেনাসেরিম বিভাগের উপর জাপানীরা আক্রমণ করে, তখন অতি সহজেই টেভয় দখল হইয়া যায়। টেভয় একাধারে বন্দর ও বিমানঘাঁটি এবং ইহার দক্ষিণে ছিল মারগুই। সুতরাং মুষ্টিমেয় জাপসৈন্য যখন চতুরের মত টেভয় কাড়িয়া লইল, তখন স্বভাবতঃই উহার নীচের দিকে মারগুইও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ফলে, মারগুই আক্রান্ত হইবার আগেই উহার রক্ষী সৈন্যদিগকে জাহাজযোগে সমুদ্রপথে সরাইয়া ফেলিতে হইল।*

টেভয়ের পর মৌলমেনের বিপদ দেখা দিল দুই দিক হইতে—দক্ষিণ ও পূব। মৌলমেনের দক্ষিণের রাস্তা এবং সহর অঞ্চল ও সালুইন নদীর মোহনা সমস্তই আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত হইয়া গেল। ২১শে জানুয়ারী তারিখে শ্যামদেশীয় সৈন্যেরা মায়াওয়াড্ডির পূর্ব্বে ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিল এবং ঐ দিনই একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ পাইল যে, মৌলমেনের ৪৫ মাইল পূর্ব্বে কাওয়াকারিক গিরিসঙ্কটে (Pass) তীব্র লড়াই সুরু হইয়াছে। একটি ভারতীয় ব্রিগেড ও একটি গুর্খা ব্যাটেলিয়ন (৭নং) এই গিরিসঙ্কটের মুখ রক্ষা করিতেছিল। অপর পক্ষে এক ডিভিসন জাপসৈন্য ইহাদিগকে আক্রমণ করিল। কেবল শত্রুসৈন্যের আধিক্যের জন্যই গিরিসঙ্কটের সঙ্কট দেখা দিল না,

* 'To Stalingrad and Alamien'—by Strategicus.

প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এই সৈন্যেরা কার্য্যতঃ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া মৌলমেনের সহিত ইহার যোগাযোগ ছিল —দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাস্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়ায় ৪৫ মাইলের দ্বিগুণ পথ অতিক্রম করিতে হইত। সুতরাং পশ্চাৎ অপসরণ বা নূতন সৈন্য আমদানী, যাহাই করা হউক না কেন, এই দীর্ঘ রাস্তা ঘুরিয়া আসিতে হইত। এই অবস্থায় মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যসৈন্যের পক্ষে লড়াই করিয়া শেষ হইয়া যাওয়া কিম্বা মৌলমেনের দিকে পিছু হটিয়া আসা ছাড়া উপায় ছিল না। তথাপি এখানে সাম্রাজ্যসৈন্য ও জাপানীদের মধ্যে যথেষ্ট লড়াই হইয়াছিল। যদি জাপানীরা গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়া আসিত, তাহা হইলে বোধহয় ইঁদুর কলে পড়িয়া তাহারা পিষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু জাপানীরা অত্যন্ত চালাক, তাহারা প্রত্যাশিত পথে আসিল না। তাহারা গিরিসঙ্কট এড়াইয়া পাহাড়ের পায়েহাঁটা পথে দুরূহ রাস্তা ধরিয়া আসিয়া হাজির হইল। সংখ্যাশক্তির আধিক্যের সঙ্গে এই কৌশলের দ্বারা জাপানীরা কাওয়াকারিকে বাজীমাৎ করিল। 'লণ্ডন টাইমসে'র মতে এখানে ভারতীয় 'পথ পরিষ্কারকের দল' (Indian sappers and miners) শত্রুর আগমন পথ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এবং ফেরী ও মোটরবোটযোগে সরবরাহ জোগাইয়া সাম্রাজ্য সৈন্যদলকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

কাওয়াকারিকে পরাজিত হইয়া সাম্রাজ্যসৈন্যেরা মৌলমেনে হটিয়া আসিল। টেনাসেরিম বিভাগের এই সংগ্রামে জাপানীরা দুই ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত একমাত্র মূল্যবান বিমানঘাঁটি ছাড়া সামরিক দিক হইতে কোন বড় সম্পদ হাতছাড়া হয় নাই। যদি যথোপযুক্ত বিমান শক্তি এবং বিমানঘাঁটি রক্ষার মত উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে ঘাঁটিগুলির জন্য নিশ্চয়ই আপশোষ হইত। কিন্তু মৌলমেনের পতন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেন না, ইহা দ্বারা রেঙ্গুণে পৌছিবার দুয়ার খুলিয়া গেল। আসলে টেনাসেরিম বিভাগের যুদ্ধ ছিল মৌলমেন দখলের সংগ্রাম এবং টেনাসেরিমের উপকূলভাগ হাত করিয়া জাপানীরা মৌলমেনকে পিছন হইতেও বিপন্ন করিয়া তুলিল।

মালয়ের যুদ্ধে জাপানীদের যে রণচাতুর্য্য দেখা গিয়াছিল, এখানেও তাহার অভাব ঘটে নাই। সমুদ্র হইতে আত্মরক্ষার ঘাঁটি দখল করা, জঙ্গলের ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়া এবং দেশীয় লোকদের সাহায্যে অজানা রাস্তা

পার হওয়া ইত্যাদি সমস্ত কৌশলই অনুসৃত হইয়াছিল, ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ সঙ্ঘবদ্ধ বর্ম্মীদের দল দুরধিগম্য জঙ্গলের মধ্য দিয়া জাপানীদিগকে পথ দেখাইয়া দিল। জাপানী অফিসারেরা ইহাদের 'সেনাপতি' সাজিলেন। অপরপক্ষে ইংরাজ সৈন্যদের কাছে ওখানকার রাস্তাঘাট অজানা ছিল। কেবল তাহাই নহে, জাপ রণনীতি এখানে বিভিন্ন বাহুর মধ্যে গ্রন্থি বন্ধনের বা Joint সৃষ্টিরও পরিচয় দিল। অর্থাৎ তাহারা যেন নানাদিক হইতে মৌলমেনকে একত্রে আক্রমণ করিল। অস্ত্রের মধ্যে জাপানীরা এখানে সচল মর্টার কামান ব্যবহার করিতে লাগিল। এই সমস্ত কামানের পাল্লা ও লক্ষ্যভেদ (range and accuracy) বৃটিশবাহিনীর কাছে আদৌ প্রীতিকর ছিল না।

কাওয়াকারিক হইতে সাম্রাজ্যবাহিনী মৌলমেনের উপকূলবর্ত্তী সমতলভূমিতে আসিয়া আশ্রয় লইল এবং ৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার এই বন্দর ও বিমান ঘাঁটি দখলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গোড়া হইতেই বৃটিশ পক্ষ এমন বেকায়দায় পড়িল যে, তাহারা যেন চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইতে লাগিল। বর্ম্মীদের সাহায্যে তাহারা অজানা জঙ্গলের মধ্য দিয়া বিমানঘাঁটিতে প্রচুর সংখ্যায় আসিয়া হাজির হইল। এই অতর্কিত আক্রমণের বিস্ময় সত্ত্বেও সকালের দিকে জাপানীদের গতি রোধ করা হইল। কিন্তু বিকালের দিকে আরও নূতন সৈন্য আসিয়া যোগ দিল। তখন সাহসের সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া অতি কষ্টে জাপানীদিগকে রোধ করা হইল। কিন্তু বিমানঘাঁটি হাতছাড়া হইয়া গেল এবং আত্মরক্ষাকারীরা খাস মৌলমেন সহরে হটিয়া আসিল। সেখানে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া যুদ্ধ চলিল এবং ভোরবেলা পর্য্যন্ত বৃটিশ পক্ষ ঘাঁটি আগলাইয়া রহিল বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইয়া সাম্রাজ্যসৈন্যরা বন্দরের সুরক্ষিত জেটির দিকে চলিয়া আসিল। এই নিকটপাল্লার যুদ্ধে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের দ্বারা জাপানীদের প্রচুর ক্ষতিসাধনপূর্ব্বক সাম্রাজ্যসৈন্যরা সমস্ত রসদসম্ভার ও সাজসরঞ্জাম মৌলমেন হইতে সরাইয়া ফেলিল এবং তাহারা নৌকাযোগে মার্ত্তাবানে পশ্চাদপসরণ করিল। জাপানীদের ক্রমাগত বোমা ও মর্টার কামানের গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়াই সাম্রাজ্যবাহিনীকে মৌলমেন ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল। ইহার পাল্টা জবাবে বৃটিশ গোলন্দাজরাও গোলাগুলী চালাইতে থাকে এবং এই গোলাবর্ষণের আড়াল ধরিয়াই সাম্রাজ্যসৈন্যরা মৌলমেন হইতে প্রস্থান করে। *

* 'To Stalingrad and Alamien'—by *Strategicus.*

মৌলমেনের পতনের দ্বারা দক্ষিণ ব্রহ্মের একটি শ্রেষ্ঠ ঘাঁটি হাতছাড়া হইয়া গেল। কেবল দক্ষিণ ব্রহ্ম নহে, রেঙ্গুণেরও প্রত্যক্ষ বিপদ ঘনাইয়া আসিল। কারণ, মৌলমেন হইতে মার্ত্তাবান ও পেগু হইয়া রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত রেলপথের সংযোগ। মৌলমেন ও মার্ত্তাবান পরস্পর নদীমোহনার দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং এখান হইতে রেঙ্গুণের দূরত্ব বোধ হয় ১৫০ হইতে ১৭০ মাইলের মধ্যে। অপর পক্ষে বিমানপথের দুরত্ব ১০০ মাইলের বেশী হইবে না। সুতরাং মৌলমেনের বিমান ঘাঁটি হইতে রেঙ্গুণের উপর জাপ বোমারুর উৎপাত আরও বৃদ্ধি পাইবে। জাপানীরা মৌলমেন হইতে নৌকাযোগে মার্ত্তাবান হইয়া পেগু রেলপথ ধরিয়া রেঙ্গুণে পৌছিতে চেষ্টা করিবে। তাহারা ইতিমধ্যেই মার্ত্তাবান ও রেঙ্গুণে বোমাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে। জাপানীদের পদাতিকবাহিনী যে এই দিকে অগ্রসর হইবে, বোমাবর্ষণ তাহারই ইঙ্গিতমাত্র। মৌলমেনের যুদ্ধে জাপানীরা নাকি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য হাতী ব্যবহার করিয়াছিল। আধুনিক যুদ্ধের পক্ষে ইহা একটা ব্যতিক্রম মাত্র। ট্যাঙ্ক ও বোমারুর যুগে বেশী পরিমাণ হস্তীযুথের ব্যবহার সম্ভব নহে। কারণ, প্রতিপক্ষের বোমা, গুলী বা গোলাবর্ষণে বিশালকায় হস্তীর ক্ষেপিবার সম্ভাবনা আছে। ঢাল, তরোয়াল ও বর্শাফলকের যুদ্ধ ইহা নহে। তথাপি জঙ্গলের মধ্যে হাতি ব্যবহার করিয়া তাহারা সরবরাহ ব্যবস্থার সুবিধা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

—২—

মার্ত্তাবান ও সালুইন

১১ই ফেব্রুয়ারী, '৪২।

ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট হইতে মৌলমেন পর্য্যন্ত জাপানীরা গোটা দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্ম দখল করিয়া লইয়াছে। জঙ্গল, পাহাড়, নদী বা সঙ্কীর্ণ যোজকের জন্য তাহাদের এই অভিযান বাধাগ্রস্ত হয় নাই। এক্ষণে সালুইন নদীর তীরে যুদ্ধ চলিতেছে। ইরাবতীর পরেই সালুইন ব্রহ্মদেশের বড় নদী। এই নদীর মোহনার এক তীরে মৌলমেন এবং অপর তীরে মার্ত্তাবান। জাপানীরা মার্ত্তাবানের উপর কামান দাগিতেছে এবং বোমা ফেলিতেছে। সেখানকার অবস্থাও সঙ্কটজনক। 'রয়টারের' মতে মার্ত্তাবানে আর আত্মরক্ষা করা

চলিবে না। কারণ, সালুইনের যেখানে জাপানীরা পৌছিয়াছে, সেখান হইতে মার্তাবান মাত্র পৌণে এক মাইল দূর। কেবল তাহাই নয়, সালুইন যেন দুই বাহু দিয়া মার্তাবান অঞ্চলকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ফলে, সামরিক দিক হইতে মার্তাবান 'বিপজ্জনক পকেটে' পরিণত হইয়াছে এবং এই পকেটে আত্মরক্ষা করিতে গেলে বেষ্টিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইহার চেয়ে বরং উত্তর দিকে সরিয়া গেলে জাপানীদের আরও ভালোভাবে বাধা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উত্তর দিকের অবস্থা কি জাপানকে সুবিধা দিবে না? উত্তর দিকে প্রাকৃতিক বিঘ্ন কম, মাটি শক্ত ও সমতল। যুদ্ধ সেখানে কঠিন হয়, যেখানে পাহাড়, জঙ্গল ও সমুদ্রের বিপুল বিঘ্ন থাকে। আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রামের পক্ষে শক্ত ও সমতল মাটী আদর্শস্থানীয়।* সুতরাং মার্তাবান ছাড়িয়া উত্তর দিকে ঘাঁটি করিলেই জাপানীরা জব্দ হইবে, এমন আনুমানিক সান্ত্বনায় লাভ নাই। কিন্তু মার্তাবান পরিত্যক্ত হইলে জাপানীরা রেলপথের সুবিধা পাইবে এবং এই রেলপথ পেগু ঘুরিয়া রেঙ্গুণে গিয়াছে। অপর দিকে বিমানপথে রেঙ্গুণের দূরত্ব এক্ষণে মাত্র ১০০ মাইল। সুতরাং বোমারুর উৎপাত আরও বাড়িবে এবং এই সেদিনও শেষরাত্রি চার ঘণ্টাকাল ধরিয়া জাপানীরা রেঙ্গুণে হানা দিয়াছে। অতএব ক্রমাগত স্থানত্যাগের দ্বারা আত্মরক্ষার সুবিধা হইবে, এমন ভরসা পাওয়া কঠিন। অবস্থার এই গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মের স্বরাষ্ট্র-সচিব মেজর মঙ্ বলিয়াছেন যে, Any further withdrawal will be dangerous—আরও বেশী পিছু হটিলে ঘোরতর বিপদ হইবে। মেজর মঙের মতে অবস্থা একেবারে নৈরাশ্যব্যঞ্জক না হইলেও গুরুতর। যেখানে স্বয়ং মন্ত্রীর এই অভিমত, সেখানে সন্দেহের অবসর কম।

১১ই তারিখের সেনাবিভাগীয় বিজ্ঞপ্তিতেও দেখা যায় যে, জাপানীদের এক শক্তিশালী বাহিনী নৌকায় আরোহণ করিয়া মার্তাবানের উত্তর-পশ্চিমে অবতরণ করিয়াছে। মার্তাবানের পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের বিভিন্ন স্থানে শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে বটে, কিন্তু মার্তাবান সহর শত্রুর দখলে গিয়াছে। উত্তরে পা-আন এলাকায় সারাদিন তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছিল। এখানে বহুসংখ্যক জাপ সৈন্য এক প্রকাণ্ড ব্যূহ রচনা করিয়া সালুইন নদী অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই এলাকায় আক্রমণ চালাইয়া বহু অসুবিধা সত্ত্বেও অবস্থা

* ইহা সেই সময়ের অনুমান মাত্র ছিল, আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধ বলিতে যাহা বুঝায় ব্রহ্মদেশে তাহা ঘটে নাই।—লেখক

আয়ত্তে আনা হইয়াছে বলিয়া বাহ্যতঃ মনে হয়। কিন্তু শত্রুপক্ষীয় বিমানসমূহ বৃটিশবাহিনীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে এবং মেসিনগান চালাইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী খবরেও দেখা যায় যে, মার্ত্তাবান এলাকায় মিত্রপক্ষীয় স্থলবাহিনীর উপর শত্রু বিমান প্রবল আক্রমণ করে। সালুইন রণাঙ্গনে পা-আন এলাকায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু সালুইন রণক্ষেত্রের অবস্থাও অতি দ্রুত খারাপ হইয়া পড়ে। শত্রুর আক্রমণে, মিত্রপক্ষীয় ব্যূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং সঙ্কট দেখা দেয়। টেনাসেরিম বিভাগের মারগুই, টেভয় ইত্যাদি যে সমস্ত বিমানঘাঁটি জাপানীরা দখল করিয়াছিল, সেই সমস্ত ঘাঁটি তাহারা কাজে লাগাইতে থাকে এবং সেখান হইতেই তাহারা সালুইন তীরের মিত্রবাহিনীর উপর বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। এদিকে মৌলমেন হইতেও তাহারা মার্ত্তাবানের উপর কামান দাগিতেছিল।

বিমানশক্তির শ্রেষ্ঠতার জন্য জাপানীরা যেমন নৌকাযোগে মার্ত্তাবানে অবতরণে সমর্থ হয়, তেমনই কতকটা ইচ্ছামত কৌশল অনুসরণেরও সুযোগ পায়। অপর পক্ষে ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যদল এই বিমানশক্তির অভাবে অত্যন্ত বেকায়দায় পড়ে। এই সময় এক ব্যাটেলিয়ন ইংরাজ সৈন্য (King's Own Yorkshire Light Infantry) শান রাজ্য হইতে এখানকার যুদ্ধে আসিয়া যোগ দেয়। ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে তাহাদের ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই জঙ্গল যুদ্ধের ছিল না। জাপানীদের মার্ত্তাবান অধিকার সম্পর্কে একথা জানা গিয়াছে যে, বহুসংখ্যক জাপ সৈন্য কিছু উত্তরে সালুইন নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া পার্ব্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে। এভাবে তাহারা মার্ত্তাবানের পশ্চাদ্ভাগে পৌঁছে এবং মার্ত্তাবান হইতে উত্তরে থাটনের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহা বন্ধ করিয়া দেয়। আঁর একদল জাপ সৈন্য সমুদ্র হইতে মার্ত্তাবানের দক্ষিণে অবতরণ করিয়া তাহাদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করে। উত্তর দিক হইতে জাপানীদের এই বেষ্টনী ভেদ করিয়া মার্ত্তাবানের বৃটিশ সৈন্যদের উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন গুর্খা ও একদল বৃটিশ সৈন্য অবরুদ্ধ সহর হইতে বাহির হয়। তাহারা মার্ত্তাবান-থাটন পথে না যাইয়া উহার পূর্ব্বদিকস্থ দুর্গম অঞ্চল দিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। গুর্খা সৈন্যগণ মারাত্মক কুক্‌রির দ্বারা জাপব্যূহের ভিতর দিয়া পথ করিয়া লয়। এদিকে বেলুচী সৈন্যগণ মৌলমেনের ২৫ মাইল উত্তরে পা-আনের খেয়াঘাটে প্রচণ্ড জাপ আক্রমণের সম্মুখীন হয়। সালুইন নদী পার হইবার জন্য তিন ব্যাটেলিয়ন জাপ

সৈন্য মৌলমেনের সঙ্গে পা-আনও আক্রমণ করে। জাপানীরা পা-আন এলাকার দুই দিক হইতে সাঁড়াশীর আকারে আক্রমণ চালাইয়া বেলুচীদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। ইহার পর দুই পক্ষে তুমুল লড়াই চলে। জাপানী-দের চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং জাপ বোমারুবহর স্থলবাহিনীর সহিত সহ-যোগিতা করে। এইভাবে মার্ত্তাবান দখল শেষ হয় এবং পা-আন হইতেও জাপানীরা সালুইন নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

—৩—

দক্ষিণ ব্রহ্মের নদীপথে

২০শে ফেব্রুয়ারী, '৪২।

দক্ষিণ ব্রহ্মের টেনাসেরিম বিভাগের যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিতেছে। এই বিভাগের একমাত্র থাটন বাদে আর সমস্ত জেলাই জাপানীরা দখল করিয়া লইয়াছে। এক নিঃশ্বাসে এইটুকু বলা যায় যে, মৌলমেন হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ও সমুদ্রতীর জাপানীদের করায়ত্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা জল, স্থল ও আকাশপথের প্রভূত সুবিধা পাইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহারা রেঙ্গুণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দক্ষিণ ব্রহ্মে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এই দিকের যুদ্ধে নদীতীর প্রাধান্য লাভ করিবে। রেঙ্গুণ যেমন রেঙ্গুণ নদীর তীরে, মৌলমেন ও মার্ত্তাবান তেমনই সালুইন নদীর মোহনায় এবং সালুইন ও ইরাবতীর মধ্যে সিতাং আর একটি বড় নদী। এই নদীগুলির আবার কয়েকটি ছোট ছোট শাখা নদী আছে। উহার মধ্যে বিলিন ও ডনথামি আজিকার যুদ্ধের জন্য উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। সিতাং ও সালুইনের মধ্যে বিলিন নদী, বিলিন সহরও এই নদীর তীরে। এই নদীটি মার্ত্তাবান উপসাগরে পড়িয়াছে। ডনথামি নদী মার্ত্তাবানের কিছু উপরে সালুইন নদীর সহিত মিশিয়াছে। সালুইন নদী অতি দীর্ঘ, কিন্তু ইরাবতীর যেমন হাজার মাইল জলপথ ষ্টীমার ও নৌকাযোগে ব্যবহার করা যায়, সালুইন তেমন নহে। এই নদীর মাত্র ৮০ মাইল জলপথ ষ্টীমারে যাতায়াত করা যায়। সালুইন নদী মোহনার এক তীরে মার্ত্তাবান ও অন্য তীরে মৌলমেন—অর্থাৎ উপরের দিকে

মার্ত্তাবান ও নীচের দিকে মৌলমেন। এই দুই সহর ষ্টীমার লাইনের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। রেঙ্গুণ হইতে পেগু এবং পেগু হইতে মার্ত্তাবান পর্য্যন্ত রেলপথ গিয়াছে। মার্ত্তাবান হইতে ষ্টীমারযোগে মৌলমেন হইয়া আবার রেলপথ দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্মের দিকে চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে জাপানী ও সাম্রাজ্যবাহিনীর মধ্যে এই অঞ্চলেই যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি হইয়াছে। সহজ ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, উপরে থাটন, নীচে মার্ত্তাবান এবং ইহার সঙ্গে পা-আন সহর ও সালুইন, বিলিন ও ডনথামি নদী—এই অংশটার মধ্যেই মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ পাঞ্জা লড়িতেছে। এক্ষণে সাম্রাজ্যবাহিনী দাঁড়াইয়াছে বিলিন নদীর তীর ধরিয়া, এখানে রহিয়াছে তাহাদের দক্ষিণ বাহু বা right flank, আর বাম বাহু বা left flank রহিয়াছে থাটনের নীচে ডনথামি নদীর ধারে। কিন্তু জাপানীরা দুই দিক দিয়াই সাম্রাজ্যবাহিনীর দুই বাহু বিপন্ন করিতে পারে। পা-আন হইতে থাটন মাত্র ২৫ মাইল পশ্চিমে, জাপানীরা এখানে সালুইন নদী অতিক্রম করিয়াছে। ভারতীয় বেলুচী সেনাদের সহিত পা-আনে জাপানীদের তীব্র সংঘর্ষ হইয়াছিল, বেয়নেট যুদ্ধের দিক হইতে এই সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য ছিল। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যরা পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইয়াছে এবং জাপবাহিনী এখানে শক্ত হইয়া বসিয়াছে। এই দিক দিয়া তাহারা সাম্রাজ্যবাহিনীর বাম বাহু (যাহা থাটনের কিছু দক্ষিণে) এবং মার্ত্তাবান উপসাগরে জাহাজযোগে সৈন্য নামাইয়া সাম্রাজ্যবাহিনীর দক্ষিণ বাহু বিপন্ন করিতে পারে। আবার থাটনের দিক হইতে বিলীন নদীতীরস্থ সাম্রাজ্যবাহিনীর অবস্থা এখানেও সামরিক দিক হইতে নৈরাশ্যব্যঞ্জক। যেখানে সৈন্যবাহিনীর দুই পার্শ্বই দুই বা তিন দিক হইতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, সেখানে শত্রুকে সাফল্যের সহিত বাধা দেওয়া সহজ নহে। যদি থাটনে ও বিলিন নদীতীরে জাপ-বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে না পারা যায়, তবে থাটনের রেলপথ ও রাস্তা করায়ত্ত করিয়া স্থলপথে জাপানীরা রেঙ্গুণকে আরও বিপন্ন করিতে পারিবে।

মৌলমেনের ৪০ মাইল উত্তরে বিলীন নদীতীরে সাম্রাজ্যবাহিনী নূতন ব্যূহ রচনা করিয়াছে এবং জাপানীরা রেঙ্গুণের ১০৫ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছে। ছয় দিনে জাপানীরা ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে। বিলিন সহর হইতে পেগু ৫৫ মাইল, উৎকৃষ্ট রাস্তা ও রেলপথের দ্বারা ইহা সংযুক্ত। বিলিন নদীর পর সিতাং নদী এবং সিতাং হইতে পেগু পর্য্যন্ত শুষ্ক সমতলভূমি, যাহা

যান্ত্রিক বা পদাতিকবাহিনীর সংগ্রামের পক্ষে উৎকৃষ্ট। সুতরাং জাপানীদের এই দিক দিয়া অগ্রগতি এবং সাম্রাজ্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণ রেঙ্গুণের পক্ষে মোটেই শুভ নহে। ব্রহ্মের যুদ্ধ ক্রমশঃই প্রচণ্ড ও ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে। সিঙ্গাপুরের যুদ্ধের জন্য তাহাদের আক্রমণ এতদিন কিছু মন্দীভূত ছিল, কিন্তু সিঙ্গাপুরের পতনের পর একদিকে জাভা, সুমাত্রা এবং অন্য দিকে ব্রহ্মদেশের উপর জাপ আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হইবে।

চুংকিং হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের জন্য ৩০ হাজার জাপ সৈন্য ইন্দোচীনে পৌছিয়াছে,আরও দুই ডিভিসন (বর্ত্তমানে জাপানীদের এক ডিভিসনে বোধ হয় ২৫ হাজার সৈন্য আছে) জাপ সৈন্য ইতিপূর্ব্বেই ব্রহ্মদেশে গিয়াছে এবং মালয়ের যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় আরও দুই ডিভিসন সৈন্য সেখান হইতে আনা হইযাছে। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ আক্রমণে মোট জাপানী সৈন্যের সংখ্যা এক লক্ষ হইবে। এই এক লক্ষ সৈন্যের গতিরোধ করিতে হইলে অনুরূপ সংখ্যক সৈন্য ও সমরোপকরণ তো দরকার বটেই, অধিকন্তু সংখ্যাশক্তির দিক দিয়াও সাম্রাজ্যবাহিনীর আরও বেশী শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। দেড় লক্ষ হইতে দুই লক্ষ সৈন্য এবং উপযুক্ত বিমানবহর ও অস্ত্র-শস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। জাপানীদের বিরুদ্ধে চীনা সৈন্যরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে এবং মার্শাল চিয়াং কাইশেকের সহযোগিতায় প্রচুর চীনা সৈন্য ব্রহ্মদেশে সমবেত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের সমস্যা এই যে, কেবল man power বা সৈন্যসংখ্যার প্রাচুর্য্য থাকিলেই চলিবে না, material বা সমরোপকরণেরও প্রাচুর্য্য থাকা চাই। জাপানী যুদ্ধে আধুনিক সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু জার্ম্মাণ যুদ্ধের মত ইহাতে যান্ত্রিকপদ্ধতির আধিপত্য নাই। যুদ্ধক্ষেত্রের ভৌগোলিক রূপই ইহার অন্যতম কারণ। সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, অরণ্য, দ্বীপ, প্রণালী, উপদ্বীপ ও যোজক—এইগুলিই ইঙ্গ-জাপ রণক্ষেত্রের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্য ট্যাঙ্ক অপেক্ষা বোমারু বিমান, মর্টার কামান ও পদাতিকবাহিনীই প্রাধান্য অর্জ্জন করিতেছে। জাপানীরা রণক্ষেত্রের এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বিঘ্নকে অতিক্রম করিবার নৈপুণ্যও দেখাইয়াছে এবং এশিয়া ভূখণ্ডে বহু বৎসর ধরিয়া সংগ্রামরত থাকায় জাপানীরা এই অঞ্চলের যুদ্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। অপরপক্ষে ভারতীয় এবং চীনা সৈন্যদেরও অভিজ্ঞতা ও সাহস আছে—যদিও সে অভিজ্ঞতা জাপানীদের অনুরূপ নহে। যদি মিত্রপক্ষ

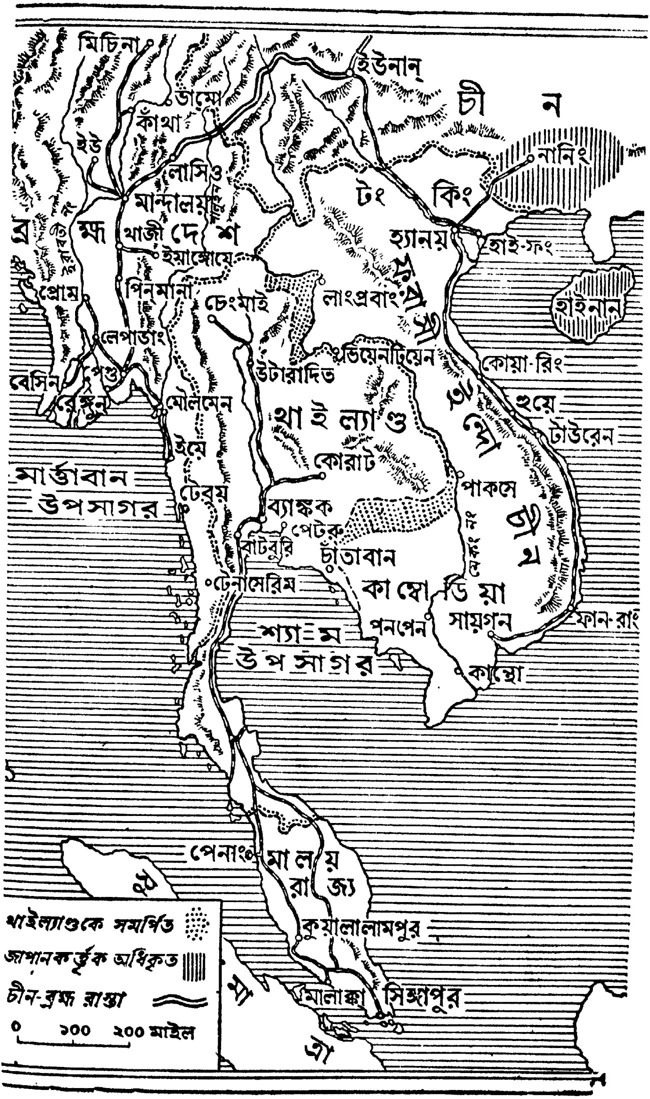
উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য ও সমরোপকরণ জুটাইতে পারেন, তবে রেঙ্গুণে না হউক, অন্ততঃ উত্তর ও মধ্য ব্রহ্মে তাঁহারা জাপানীদিগকে দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করিয়া রাখিতে পারিবেন। চুংকিং হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীনের পক্ষে ব্রহ্মদেশই যুদ্ধ চালনার শেষ সামরিক ঘাঁটি (Last line of operational bases) এবং এই শেষ ঘাঁটি রক্ষার জন্য চীনা সৈন্যরা শেষ রক্তবিন্দু দান করিবে। ব্রহ্মদেশ ও রেঙ্গুণ কেবল চীনেরই আত্মরক্ষার শেষ ঘাঁটি নহে, উহা ভারতবর্ষের আত্মরক্ষারও শেষ দূরবর্ত্তী দুর্গদ্বার।

—৪—

রেঙ্গুণ অভিমুখে

২২শে ফেব্রুয়ারী, '৪২।

সিঙ্গাপুরের যখন পতন হইয়াছিল, তখন একথা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল যে, মিত্রশক্তির পক্ষে সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব আর ততখানি নাই। এক্ষণে রেঙ্গুণই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, চীনের সরবরাহ ব্যবস্থা ও ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার পক্ষে রেঙ্গুণের মূল্য অপরিসীম। সুতরাং যেভাবেই হউক, রেঙ্গুণকে রক্ষা করা হইবে। কিন্তু গত ৮।১০ দিন ধরিয়া থাটন জেলা ও বিলিন নদীর ধারে যে যুদ্ধ চলিতেছিল এবং তাহাতে যে ফলাফল হইয়াছে, তাহাতে রেঙ্গুণের অদৃষ্ট সম্পর্কে ভরসা পাওয়া কঠিন। যতদিন সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ চলিতেছিল, ততদিন দক্ষিণ ব্রহ্মে জাপানীরা প্রবল আক্রমণ করিতে পারে নাই। তথাপি তাহারা সেই সুযোগে মৌলমেন ও মার্ত্তাবান দখল করিয়া লইয়াছিল। আজ সিঙ্গাপুর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া এবং সেখানে জাপ নৌবহর আনিবার ব্যবস্থা করিয়া জাপানীরা ব্রহ্মদেশে প্রবল চাপ দিয়াছে। মৌলমেন হইতে মার্ত্তাবান হইয়া তাহারা প্রথমে পা-আন দখল করিয়াছে, সেখান হইতে তাহারা একযোগে বিলিন ও সিতাং নদীর দিকে নজর দিয়াছে। বিলিন নদীতীরে বোধ হয় ৪।৫ দিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই যুদ্ধের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখ সাম্রাজ্যবাহিনী বিলিন নদীতীর হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়া সিতাং নদীর আড়ালে নূতন ব্যূহ রচনা করিয়াছে। পা-আন হইতে থাটন ও বিলিনের



মিচিনা
ইউনান্
চীন
ভামো
কাঁথা
ইউ
লাসিও
নানিং
মান্দালয়
টংকিং
ব্রহ্মদেশ
থাজী
হ্যানয়
হাই-ফং
ইয়াঙ্গোয়ে
হাইনান
প্রোম
পিনমানা
চেংমাই
লাংপ্রবাং
লেপাডাং
ভিয়েনটিয়েন
কোয়া-রিং
বেসিন
পেগু
উটারাদিত
হুয়ে
রেঙ্গুন
মৌলমেন
থাইল্যাণ্ড
টাউরেন
ইয়ে
কোরাট
মার্ত্তাবান উপসাগর
টেবয়
ব্যাঙ্কক
পাকসে
পেটরু
রাটবুরি
চাঁতাবান
টেনাসেরিম
কাম্বোডিয়া
পনপেন
সায়গন
ফান-রাং
শ্যাম উপসাগর
কাম্বো
পেনাং
মালয় রাজ্য
কুয়ালালামপুর
মালাক্কা
সিঙ্গাপুর
থাইল্যাণ্ডকে সমর্পিত
জাপানকর্ত্তৃক অধিকৃত
চীন-ব্রহ্ম রাস্তা
০ ১০০ ২০০ মাইল

দিকে দুই পার্শ্ব ধরিয়া যেভাবে জাপানীরা আক্রমণ চালাইয়াছিল তাহাতে বিলিন নদীতটে মিত্রবাহিনীর আত্মরক্ষা যে বেশী দিন সম্ভব ছিল না, একথা তখনই স্পষ্ট হইয়াছিল। জাপানীরা বিলিন নদী অতিক্রম করিতে গিয়া রবারের নৌকা ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু এখানকার সংগ্রাম আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের ধারা পূরাপূরি অনুসরণ করিয়াছিল বলিয়া কিম্বা ট্যাঙ্কের কোন ব্যবহার এখানে হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই—হইয়াছে হাতাহাতি যুদ্ধ ও পরস্পরের বেয়নেটের সংঘর্ষ। হাতাহাতি যুদ্ধ এবং কামান ও রাইফেলের ব্যব-হারে জাপ সৈন্যের তুলনায় ভারতীয় সৈন্যরা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই অনেকের ধারণা। ভারতীয় সৈন্যরা যুঝিতেছে নিজেদের দেশে—এখানকার নদী, জঙ্গল ও পথঘাট ব্রহ্মদেশীয় বা ভারতীয় সৈন্যদের নিকট সুপরিচিত। এই অবস্থায় বিলিন নদী হইতে সাম্রাজ্য-বাহিনীর পশ্চাদপসরণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও দুঃখের কথা।

সালুইন ও বিলিন নদীর পর এক্ষণে বাকি রহিল সিতাং নদী, তারপরেই পেগু ও রেঙ্গুণ। রেলপথ ও পাকা রাস্তার দ্বারা এইগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত। প্রকাশ যে, জাপ সৈন্যরা রেঙ্গুণ সহর হইতে মাত্র ৭০ মাইল দূরে আছে। জঙ্গলাকীর্ণ ভূমির যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। এক্ষণে সুরু হইল উৎকৃষ্ট সমতলভূমি। পদাতিক সৈন্যের পক্ষে সমতলভূমির মত লোভনীয় কিছু নাই। অপর পক্ষে জঙ্গল ও নদীর যুদ্ধে জাপানীরা যে ওস্তাদি দেখাইয়াছে, তাহাও বার বার স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, জঙ্গল, পাহাড়, নদী বা সমতলভূমি যে কোন স্থানেই যদি জাপানীরা ক্রমাগত সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইয়া আত্মরক্ষার ব্যূহ ভাঙ্গিতে থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশ রক্ষা পাইবে কিসের জোরে? ভারতীয় পদাতিকবাহিনীর দ্বারাও যদি জাপ পদাতিক বাহিনীকে ঠেকানো না যায়, তবে রেঙ্গুণের দশা কি হইবে? রেঙ্গুণ সমুদ্রতীর হইতে মাত্র ২১ মাইল। এখানকার নদীর মোহনা গঙ্গার মোহনার মত নহে, গঙ্গার মোহনা ধরিয়া বড় বড় জাহাজের পক্ষে ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী কলিকাতায় প্রবেশ সহজসাধ্য নহে। কিন্তু ষ্টীমার, নৌকা ও বড় জাহাজ অপেক্ষাকৃত সহজে রেঙ্গুণ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে। সিঙ্গাপুর ও পেনাং হইয়া জাপানী নৌবহর যে কোন মুহূর্ত্তে রেঙ্গুণের দিকে অভিযান করিতে পারে এবং বঙ্গোপসাগরে ইতিপূর্ব্বেই তাহারা সক্রিয় হইয়াছে। এইজন্য বন্দর হিসাবে রেঙ্গুণ পরিত্যক্ত হইয়াছে, উহার জলপথে মাইন বসানো হইয়াছে শত্রুপক্ষের নৌবহরকে বাধা দেওয়ার জন্য। রেঙ্গুণ এক্ষণে আর বন্দর নহে

এবং নাগরিক পরিপূর্ণ সহরও নহে। একমাত্র যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যাহাদের উপস্থিতি প্রয়োজন, তাহারা ছাড়া আর বাকি সমস্ত নাগরিককে রেঙ্গুণ হইতে সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। দলে দলে নরনারী ষ্টীমারে, নৌকায়, মোটরে ও পায়ে হাঁটিয়া রেঙ্গুণ ছাড়িয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। রেঙ্গুণ খাস রণক্ষেত্রের মর্য্যাদায় উন্নীত হইল। কিন্তু ইহা আনন্দের কথা নহে। একদিকে সিতাং নদীতট হইতে পেগু হইয়া জাপ পদাতিকবাহিনী এবং অন্য দিকে মার্ত্তাবান উপসাগর দিয়া জাপ নৌবাহিনী রেঙ্গুণের উপর আক্রমণ চালাইবে। ইহার সঙ্গে জাপানী বিমানবহর যে সহযোগিতা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সিঙ্গাপুর যুদ্ধের সময় যেমন তোব্রুকের তুলনা দিয়া 'ষ্টেটসম্যান' দীর্ঘ অবরোধ যুদ্ধের ব্যর্থ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, রেঙ্গুণ সম্পর্কেও তথাকার গভর্ণর তেমনই তোব্রুকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। লাট সাহেবের এই কথার মধ্যে আশা আছে বটে, কিন্তু সামরিক দিক হইতে খুব ভরসা আছে কিনা জানি না। কারণ, তোব্রুকের সঙ্গে রেঙ্গুণের তুলনা দেওয়াই ভুল।* তোব্রুক লিবিয়ার মরুভূমির একটা ছোট বন্দর, উহা সমুদ্রের উপকূলে এবং সেই সমুদ্রে ভূমধ্যসাগরীয় বৃটিশ নৌবহরের একাধিপত্য ছিল এবং বিমানবহরও সক্রিয় ছিল। অপর পক্ষে ভূমধ্যসাগরের এই অংশে জার্ম্মাণবাহিনীর কোন নৌবহর ও নৌ-আধিপত্য ছিল না। তাহারা সোজা ট্যাঙ্ক চালাইয়া বেঙ্গাজী ও ডের্ণা হইতে তোব্রুককে বামদিকে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বিমানশক্তিও তাহাদের যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং তোব্রুকের পক্ষে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করা

---

* লেখকের এই মতবাদ পরবর্ত্তী কালে ইংরাজ সমর ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন। যেমন, ছদ্মনামা 'Strategicus' তাঁহার পুস্তকে মন্তব্য করিতেছেন—

"When it was stated that Rangoon 'will be held to the last', the ingenious could find some justification in the term 'to the last', but when this hypothetical defence was linked with the name of Tobruk, it was completely misleading."

হাচিন্সনের সমর-ইতিহাসেও ('Quarterly Record of the War') অনুরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে :—

"But the increasing numbers of the Japanese and their overwhelming seapower made a prolonged defence of Rangoon impossible. In the circumstances it was unfortunate that the British authorities in Burma had given out that Rangoon would be defended to the last."

অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু রেঙ্গুণের অবস্থা কি ? সিঙ্গাপুর, পেনাং ও ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট এবং মালয় উপদ্বীপের ও দক্ষিণ ব্রহ্মের সমস্ত নৌঘাঁটি ও বিমানঘাঁটি জাপানীদের দখলে যাওয়ায় সমুদ্রপথে জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমুদ্রপথ দিয়া রেঙ্গুণ বিপন্ন এবং যদি কোন বন্দর সমুদ্রের দিক দিয়া বিপন্ন হয়, তবে উহার অদৃষ্ট সম্পর্কে নিতান্ত উদ্বেগ বোধ না করিয়া উপায় নাই। কেবল জলপথই নহে, রেঙ্গুণ স্থলপথ দিয়াও বিপন্ন হইয়াছে এবং সেই বিপদ আরও প্রত্যক্ষ। যদি সিতাং নদীর তটে জাপানীদিগকে রোধ করা না যায়, তবে পেগু হইতে রেঙ্গুণের দিকে জাপ-বাহিনী স্থলপথে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইবে। জাপানীরা সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। যদি স্থলপথে পদাতিকবাহিনী, আকাশে বিমান এবং জলে যুদ্ধজাহাজ একত্রিত হয়, তবে এই ত্রিধারার সংগ্রামে রেঙ্গুণের সঙ্কট কত ভয়াবহ হইবে, তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক।

—৫—

সিতাং নদীর যুদ্ধ

— • —

২৩শে ফেব্রুয়ারী, '৪২।

পা-আন ও থাটনের পর বিলিন ও সিতাং নদীর যুদ্ধ সুরু হইল। মৌলমেনের পতনের দ্বারা যেমন রেঙ্গুণ অভিমুখে অগ্রসর হইবার দ্বার খুলিয়া গেল, তেমনই সিতাং যুদ্ধের ফলে রেঙ্গুণের ভাগ্যও নির্ণীত হইয়া গেল। জাপানীরা বুদ্ধিমানের মত হিসাব করিয়াছিল যে, সিতাংয়ের সেতুমুখ (bridgehead) দখল করিতে পারিলে পেগুর রাস্তা মুক্ত হইবে এবং পেগুর ভিতর দিয়া রেঙ্গুণে পৌছানো যাইবে। সিতাংয়ের এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল সিতাং নদীর মোহনার কাছে। জেনারেল হাটন পূরা এক ডিভিসন (১৭নং) সৈন্য লইয়া ভাবিলেন এবার সত্য সত্যই জাপানীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়ানো যাইবে। জাপানীরা রবারের নৌকায় বিলিন নদী অতিক্রম করিতে লাগিল এবং বিলিন ও সিতাংয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সুরু হইল। বার বার বেয়নেটের আক্রমণে বার বার ঘাঁটিগুলির হাত বদল হইল। কিন্তু

স্পষ্টই বুঝা গেল যে, জাপানীরা দুই পার্শ্বদেশের যে অনুকূল অবস্থায় রহিয়াছে এবং যেভাবে রণভূমির উপর আধিপত্য খাটাইতেছে, তাহাতে তাহাদিগকে হটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। ইতিমধ্যে বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল। সুতরাং সিতাং নদীতীরের প্রতি ইঞ্চি ভূমিতে লড়িবার সম্ভাবনা দূর হইয়া গেল এবং নদী পার হইয়া আরও পিছনের দিকে হটিবার সিদ্ধান্ত হইল। সিতাং নদীর নীচের দিকটা স্রোতবহুল, সুতরাং বিঘ্ন হিসাবে ইহা গুরুতর। তটবর্ত্তী প্রচুর ধান্যক্ষেত্র—এই ক্ষেতের মধ্যে 'অনুপ্রবেশ' কৌশল খাটানো সম্ভব নহে, সুতরাং জাপানীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ইহাই উপযুক্ত স্থান—বৃটিশ কর্ত্তারা এই ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেন। কিন্তু জাপানীরাও সহজ শত্রু নহে, তাহারা যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। তাহারা জানে যে, যেখানে পাহাড় ও জঙ্গলের অনুপ্রবেশ কৌশল নাই, সেখানে সমতলভূমির যুদ্ধে সহজ জয়লাভ অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং লোকক্ষয়ও বেশী হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং মিত্রবাহিনী যাহাতে সিতাং পার হইয়া নূতন ব্যূহে দাঁড়াইতে না পারে, জাপানীরাও সেই দিকে লক্ষ্য রাখিল।

কিন্তু সিতাংয়ের পূর্ব্ব তীর হইতে পশ্চিম তীরে সরিয়া আসিতে হইলে সিতাং নদীর রেলওয়ে ব্রিজ বা সেতুটি রক্ষা করা দরকার। অন্যথা মিত্র-সৈন্য পার হইয়া আসিবে কিরূপে? বিলিন্‌ ও সিতাংয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দাঁড়াইয়া জাপানীরা যেমন বৃটিশবাহিনীর বাম পার্শ্ব বিপন্ন করিয়া তুলিতেছিল, তেমনই বৃটিশ সৈন্যরা যাহাতে আদৌ সেতুমুখে পৌছিতে না পারে, এজন্য তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে চাহিল। বর্ম্মীদের সাহায্যে জঙ্গলের মধ্য দিয়া একদল জাপসৈন্য দুঃসাহসের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং বৃটিশ সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে সেতুমুখ দখল করিতে চাহিল। যে বৃটিশ সৈন্যরা পথ কাটিয়া সেতুটির দিকে পিছু হটিতেছিল, তাহারা অকস্মাৎ বাম দিক হইতে আর একদল জাপ সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কেবল তাহাই নহে, থাটন হইতে রেলপথ ধরিয়া যে জাপ সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছিল, তাহারাও বৃটিশ সৈন্যদের পিছনে আসিয়া হাজির হইল। যুগপৎ পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগে আক্রান্ত হওয়া যে কোন সৈন্যদলের পক্ষেই ভয়াবহ। কৌশল হিসাবে জাপানীদের এই মহড়া যেমন চমৎকার ছিল, তেমনই আত্মরক্ষাকারীদের বিপদও অবর্ণনীয় ছিল। তথাপি তাহারা বেপরোয়া যুদ্ধ চালাইল, এদিকে জাপানীরা আত্মরক্ষাকারীদের পিছু হটিবার প্রধান লাইনের উপর আসিয়া

পড়িল। বার বার পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া বৃটিশ ও গুর্খা সৈন্যরা ঘাঁটি আগলাইতে চাহিল এবং এভাবে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তাহারা সেতুমুখ রক্ষা করিল বটে, কিন্তু শেষে দেখা গেল জাপানীদিগকে আর প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে। তখন সেতুটি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। মন্দের ভালো হিসাবে ইহা ছাড়া উপায় ছিল না, কিন্তু নদীর পারে তখনও অনেক সৈন্য রহিয়া গেল এবং যে যুদ্ধ ঘটিল তাহা যেমন তিক্ত, তেমনই হতবুদ্ধিকর ও বেপরোয়া হইয়াছিল।*

বৃটিশবাহিনীর যে তিন ব্রিগেড্ সৈন্য এখানে অদ্ভুত লড়াই করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক ব্রিগেড্ সত্য সত্যই সেতুমুখ পুনর্দখল করিয়াছিল। কিন্তু পুনর্দখলের পর দেখা গেল যে, সেতুটি ইতিমধ্যেই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর একদলও নদী পার হওয়ার জন্য শত্রুব্যূহের মধ্যে পথ কাটিয়া আসিয়া হাজির হইল, কিন্তু দেখিল ভগ্ন সেতু বুকে লইয়া খোলা নদী পড়িয়া আছে! এই সমস্ত সৈন্যরা ক্রমাগত বোমা, মেসিনগানের গুলী ও মর্টারের গোলা বর্ষণ 'মাথায় করিয়া' জঙ্গল ও ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া নদীর ধারে আসিয়া হাজির হইল। যখন দেখিল যে সেতু নাই, তখন তাহারা দ্বিধাহীনচিত্তে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সিতাং এখানে ৫০০ গজ চওড়া, কুটীল আবর্ত্ত রচিয়া বেগবান স্রোত দ্রুত বহিয়া যাইতেছে। ক্লান্ত সৈন্যরা সাঁতার কাটিল, কিম্বা কাঠ, ভাঙ্গা টুকরা ও অন্যান্য যাহা কিছু পাইল, তাহাই আশ্রয় করিল। সুস্থকায়েরা আহতদিগকে সাহায্য করিল এবং যাহারা সাঁতার জানিত না, তাহাদিগকে সন্তরণপটুরা হাত ধরিয়া আনিতে লাগিল। নদীর কোন কোন অংশে ভারতীয়েরা ও বর্ম্মীরা দুঃসময়ে বন্ধুর মত কাজ করিল, কিন্তু কোন কোন বৃটিশ সৈন্য শত্রুভাবাপন্ন বর্ম্মীদের হাতে পড়িল, কতকগুলি জলে ডুবিয়া মরিল, অনেকেই নিহত হইল। 'Strategicus' বলিতেছেন—

'The outnumbered 17th division had been outmanoeuvered and lost very heavily. As a division it may be said to have been wiped out at this engagement. The vast bulk of the transport had been abandoned and almost all the equipment. On the evening of the 24th the division could muster no more than 1,420 rifles......'

---

* **'To Stalingrad and Alamien'**— ***by Strategicus.***

সৈন্য সংখ্যার শ্রেষ্ঠতায় ও রণকৌশলের শ্রেষ্ঠতায় জাপানীরা ১৭নং ডিভিসনকে একবারে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিল। কার্য্যতঃ ডিভিসন হিসাবে এই সৈন্যদলের অস্তিত্ব লোপ পাইল। প্রচুর যানবাহন ও প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসজ্জা শত্রুর হাতে ফেলিয়া আসিতে হইল। এই ডিভিসনে (বোধ হয় ২০ হাজার সৈন্য) ১৪২০টির বেশী রাইফেল অর্থাৎ রাইফেলধারী হিসাবে অনুরূপ সংখ্যক সৈন্যের বেশী পাওয়া গেল না! বিপর্য্যয় হিসাবে ইহা নিদারুণ, সন্দেহ নাই। পরে এই বাকী মুষ্টিমেয় সৈন্যদিগকে লইয়া দুইটি ছোটখাটো ব্রিগ্রেড্ গঠন করা হইয়াছিল এবং তাহারা ভারতেও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

সিতাং নদীর এই সেতু-যুদ্ধ সম্পর্কে 'লণ্ডন টাইমসের' নয়াদিল্লীস্থিত সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, তিন দল সৈন্য সিতাংয়ের সেতুমুখ রক্ষার জন্য সন্নিবেশ করা হইয়াছিল। ২২শে এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী সারদিনরাত্রি সেতুমুখ কেন্দ্র করিয়া প্রচণ্ড হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সেতুটি বারবার হাতছাড়া ও বারবার দখল হইতে লাগিল। শত্রুর বোমা ও তরোয়ালের বিরুদ্ধে কুক্‌রি ও সঙ্গীণ ব্যবহৃত হইল। অনুমান এই যে, জাপানীদের অন্ততঃ দুই হাজার সৈন্য হতাহত হইয়াছে। কিন্তু জাপানীরা কার্য্যতঃ ১৭ নং ডিভিসন ও সেতুটির মধ্যে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত শত্রুর চাপ এত বৃদ্ধি পাইল যে, গোলাগুলী উপেক্ষা করিয়াই ইঞ্জিনীয়ারগণ বিস্ফোরকযোগে সেতুটি উড়াইয়া দিল। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষ এত ঝাঁকুনি খাইয়াছিল যে, ক্লান্ত ও আহত বৃটিশ সৈন্যদিগকে ট্রেণ ও যানবাহনযোগে সরাইয়া আনিতে পারা হইত। এজন্য নদীতীরে যানবাহন জড়ো করাও হইয়াছিল, কিন্তু সিতাংয়ের সেতুটি হারাইবার জন্য ফলাফল বিপর্য্যয়কর হইয়াছিল। গুর্খা ও একদল ইংরাজ সৈন্যের অদ্ভুত চেষ্টায় কিছুটা রক্ষা পাওয়া গিয়াছিল। অনেকেই নদী সাঁতরাইয়া ওপারে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের যন্ত্র ও অস্ত্রপাতি সমস্তই ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

সিতাং সেতুমুখের এই বিপর্য্যয় অবিলম্বেই রেঙ্গুণের বিপদ ডাকিয়া আনিল। কিন্তু সিতাং নদী কি সত্য সত্যই এমন একটা সামরিক বিঘ্নের মত ছিল, যাহা জাপানীরা অতিক্রম করিতে পারিত না? যদি ১৭নং ডিভিসন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এবং এভাবে জাপানীদের রণকৌশলে বেকায়দায় না পড়িয়া পূর্ব্বাহ্ণেই চলিয়া আসিত, তাহা হইলে কি ক্ষতি হইত?—এমন প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। কারণ, সেতু ছাড়াও সিতাং পার হওয়া যে

জাপানীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না, উহার প্রমাণ স্বয়ং সাম্রাজ্যসৈন্যেরা। ১৭নং ডিভিসনের যে তিন ব্রিগেড্ রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারাতো ক্লান্তি সত্ত্বেও নদী পার হইয়াই আসিয়াছিল। অতএব জাপানীরাও সিতাং অতিক্রম করিতে পারিত এবং নদী অতিক্রমণে জাপানীদের পটুতা মালয়ে বহুবার দেখা গিয়াছে। সেখানে তাহারা কোন 'পণ্টুন ব্রিজ' ব্যবহার করে নাই। ইহা ছাড়া নদীতে যে সমস্ত দেশী নৌকা ছিল, সেগুলি সরাইবার, ধ্বংস করিবার বা অকেজো করিবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সুতরাং সিতাংয়ের সেতুমুখ রক্ষার জন্য ১৭নং ডিভিসনের এভাবে আত্মবলী দেওয়া বুদ্ধিসম্মত হইয়াছে কি না, তাহা নিশ্চয়ই সামরিক দিক হইতে বিবেচ্য।*

—৬—

পেগু ও রেঙ্গুণের বিপদ

—: ০ :—

২৮শে ফেব্রুয়ারী, '৪২।

ফেব্রুয়ারীর শেষভাগ হইতে সিতাং নদী অতিক্রম করার পর জাপানীদের পেগু ও রেঙ্গুণ অভিযানের গতি বৃদ্ধি পায়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী সংবাদ আসে যে, জাপানীরা পেগু সহর বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে এবং রেঙ্গুণ হইতে উত্তর-গামী পথটিও বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে। চিয়াংমাইয়ে প্রধান ঘাঁটি করিয়া পাপুন হইতে উক্ত পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সিতাং নদীর পূর্ব্ব তীর ধরিয়া জাপ সৈন্যরা উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর বৃটিশ সৈন্যরা সিতাং নদীর পশ্চিম তীরে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। পশ্চাদপসরণের পর বৃটিশ সৈন্যগণ নদীর রেলওয়ে সেতু ধ্বংস করিয়াছে। বৃটিশ পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে সত্য, কিন্তু জাপানীদের প্রচণ্ড ক্ষতি হইয়াছে। সিতাং নদীর পূর্ব্ব তীরে জাপানীদিগকে প্রায় ১০ দিন ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছিল। যুদ্ধারম্ভ হওয়ার পর বোধ হয়

* সিতাং নদীর যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষের গুরুতর ক্ষতির কথা পরবর্ত্তীকালে জেনারেল ওয়েভেল কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য ব্রহ্মযুদ্ধের উপসংহারে উল্লেখ করা হইয়াছে—লেখক।

ফিলিপাইন ব্যতীত আর কোথাও প্রতিপক্ষকে এত বেশীদিন প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। ইহাতে যে সময় পাওয়া গিয়াছে, তাহা বৃটিশবাহিনীর ভবিষ্যৎ সংগ্রামে বিশেষ কাজে লাগিবে। 'এসোসিয়েটেড প্রেসে'র সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন :—বৃটিশ ও সাম্রাজ্যবাহিনীর যে সকল সৈন্য সিতাং নদীর তীরবর্ত্তী ব্যূহ রক্ষা করিতেছে, রেঙ্গুণ রক্ষার পরবর্ত্তী চরম যুদ্ধের জন্য নূতন সৈন্য আনিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রেঙ্গুণ এই ব্যূহ হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব্বে বিলীন নদীর তীর বরাবর জাপবাহিনীকে বাধা দিয়া যে সময় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই নূতন সৈন্য আমদানী সম্ভব হইয়াছে। জাপানীরা যে কোন সময় সিতাং নদীর পশ্চিম তীরে হানা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। রেঙ্গুণের সামরিক বিজ্ঞপ্তিতেও বলা হইয়াছে যে, জাপবাহিনী এ পর্য্যন্ত যদিও সিতাং নদী পার হইবার চেষ্টা করে নাই, তথাপি উক্ত নদীর পূর্ব্ব তীরে বহু সংখ্যক জাপ সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে। শ্যাম ও ইন্দোচীন হইতে বহু সংখ্যক জাপ সৈন্য আনা হইতেছে। জাপানীরা জানে যে, একবার যদি তাহারা নদী পার হইতে পারে, তবে রেঙ্গুণে পৌঁছিবার সর্ব্বশেষ প্রাকৃতিক বাধা তাহারা অতিক্রম করিবে। সেই জন্য গুরুতর ক্ষতি সহ্য করিতেও তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারা যদি সিতাং নদী পার হইতে না পারে, তথাপি পেগুর পতন হইলে তাহারা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গতি পরিবর্ত্তন করিয়া রেঙ্গুণ অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিবে। পেগু হইতে রেঙ্গুণের দূরত্ব মাত্র ৫৪ মাইল।

ইহার পর ২৮শে তারিখ লণ্ডন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রেঙ্গুণের চারিদিকের অবস্থা সঙ্কটজনক। রেঙ্গুণের কর্ত্তৃত্বভার সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা বেশী থাকায় এবং তাহারা খুব বেশী চাপ দেওয়ায় বৃটিশবাহিনীকে সিতাং নদীর পশ্চিম দিকে সরিয়া আসিতে হইয়াছে। জাপানীরা পেগুর নিকট রেলপথ বিচ্ছিন্ন করার দাবী করিয়াছে। এই দাবী বোধ হয় সত্য। কারণ, এই অঞ্চলে তাহারা প্রবল চাপ দিয়াছিল। রেঙ্গুণ হইতে বলা হইয়াছে যে, 'গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যাধিক শত্রু সৈন্যের সহিত তিনদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া এবং বহু সংখ্যক শত্রুসৈন্য হতাহত করিয়া আমাদের সৈন্যগণ বিলীন রণাঙ্গন ত্যাগ করে। ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হইয়াছিল যে, তাহারা আমাদের অনুসরণ করিয়া আসিতে পারে নাই। তবে, হস্তীসহ বৃহৎ এক দল সৈন্য শত্রুপক্ষের সাহায্যের

জন্য নদীতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসে। শত্রুরা যাহাতে সিতাং নদীর তীরে পৌছিতে না পারে, তজ্জন্য আমাদের সৈন্যগণ উক্ত নদীতীরে হটিয়া যায়। কিন্তু সেখানে বৃহৎ একদল শত্রুসৈন্য আমাদের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটিগুলির উপর এরূপ কঠোর চাপ দেয় যে, আমাদের ব্যূহ আরও শক্ত করিবার জন্য আরও পশ্চাদপসরণ করিয়া সিতাং নদীর পশ্চিম তীরে চলিয়া আসে।

ইহার পর জাপানীরা সিতাং নদী অতিক্রম করে এবং ৩রা মার্চ্চ তারিখ সরকারীভাবে স্বীকার করা হয় যে, সিতাং রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সংঘর্ষের পর জাপানীরা সিতাং নদী পার হইয়া পেগুর ১৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাও নামক স্থানে উপস্থিত হয়। সমগ্র ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষ রক্ষার ভার জেনারেল ওয়েভেলের উপর অর্পিত হয়। তিনি সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। অপর পক্ষে উত্তর ব্রহ্মে বহু সংখ্যক চীনা সৈন্যের (জাপানীদের মতে ৫ ডিভিসন) সমাবেশ হয়। মার্কিণ সেনাপতি জেনারেল ষ্টিলওয়েল উত্তর ব্রহ্ম এবং বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল আলেকজেণ্ডার দক্ষিণ ব্রহ্ম রণাঙ্গনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ওদিকে জাপানীরাও এই দুই অংশে চাপ দিবার জন্য তৈয়ারী হয়।

এতদিন দক্ষিণ ব্রহ্মের উপরেই জাপানীদের চাপ প্রবল ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা উত্তর ব্রহ্মের দিকেও মন দিয়াছে। রণনীতির সাধারণ ধর্ম্মানুসারে ইহা অপ্রত্যাশিত নহে। যখন কোন দেশকে আক্রমণ করা হয়, তখন কৌশলী শত্রু কেবল একদিকেই কিম্বা একই অঞ্চলের বিভিন্ন দিকেই অগ্রসর হয় না। প্রতিপক্ষকে ধাপ্পা দেওয়া কিম্বা প্রতিপক্ষের সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন করার জন্য তাহারা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন অংশের উপর আক্রমণ করিতে থাকে। এই বিষয়ে জার্ম্মাণ রণনীতিই সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণ, ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ এবং বিভিন্ন দিকে একই সঙ্গে অভিযান ইত্যাদি জার্ম্মাণ রণকৌশলের বৈশিষ্ট্য। পোল্যাণ্ডে তাহারা একই সময়ে তিনদিকে, পশ্চিম ইউরোপের (ফ্রান্স, বেলজিয়ম, লাক্সেমবুর্গ, হল্যাণ্ড) বিভিন্ন দিকে ও বিভিন্ন অংশে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার দীর্ঘ দেড় হাজার মাইল রণক্ষেত্রে একই সময়ে অভূতপূর্ব্ব প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিপক্ষের সমগ্র সৈন্যবাহিনী বিচ্ছিন্ন করা, কোন অংশে যাহাতে আত্মরক্ষার জন্য কেন্দ্রীভূত করা না যায়, সেজন্য বাধা দেওয়া এবং ব্যাপক ও আকস্মিক আক্রমণে বিহ্বল করিয়া দেওয়া। আজ জাপানীরা ব্রহ্মদেশে যে আক্রমণ চালাইতেছে, উহা আর অতর্কিত নহে। তবে তাহারা ব্যাপকভাবে

বিভিন্ন অংশে একই সময়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া আত্মরক্ষায় বিভ্রাট বাধাইতে চাহিতেছে। থাইল্যাণ্ড বা শ্যামদেশের উত্তরাংশ যেখানে ব্রহ্মের সহিত মিশিয়াছে, জাপ সৈন্যরা সেখানে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইয়াছে। এই দিকে ৭০ হাজার জাপ সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে। এই সৈন্যদলের প্রধান আড্ডা চেঙ্গমাইতে। চেঙ্গমাই একটি বড় বিমান ঘাঁটি এবং ইহা ব্যাঙ্ককের সহিত রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। ব্রহ্মদেশের শানরাজ্য, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড অর্থাৎ তিনটি সীমানা যেখানে পরস্পরের সহিত হাত ধরিয়াছে, সেইদিকেই জাপানীদের প্রচণ্ড অভিযান আসন্ন। যে ৭০ হাজার সৈন্য এইদিকে সমাবেশ করা হইয়াছে, উহার মধ্যে ৩০ হাজার সৈন্য চেঙ্গমাইতে, আরও ৩০ হাজার উত্তরবর্ত্তী চিয়েংরাইতে এবং বাকী ১০ হাজার মেকং নদীতটে সমাবেশ করা হইয়াছে। মেকং নদী ব্রহ্ম-শ্যাম ও ইন্দোচীনের সীমানাপথে প্রবাহিত। এই সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্য উত্তর ব্রহ্মের শান রাজ্যগুলি আক্রমণ। দক্ষিণে রেঙ্গুণ ও পেগুর দিকে যখন অভিযান চলিতেছে, তখন উত্তর দিকে শান রাজ্যসমূহের প্রতিও আক্রমণ চালানো হইবে।

ইন্দোচীন ও শ্যাম জাপানীদের কবলে যাওয়ায় ব্রহ্মদেশের বিপদ এত গুরুতর হইয়াছে। কারণ, এই দুই দেশই ব্রহ্ম সীমান্তের সঙ্গে সংযুক্ত। যদি সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যগুলিতে পূরাপূরি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহা হইলে আক্রমণের পক্ষে যে সুবিধা পাওয়া যাইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আধুনিক যুদ্ধে শত্রুকে যত দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল। কারণ, ট্যাঙ্ক ও বিমানের জন্য আজ দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়াছে। রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের আগে সোভিয়েট রাশিয়া কর্ত্তৃক পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার সীমান্তবর্ত্তী অংশগুলি দখলের পশ্চাতে রাশিয়ার মনে এই আশঙ্কাই ছিল। তাহারা আত্মরক্ষার সামরিক প্রয়োজনে এইগুলি দখল করিয়াছিল। যদি মিত্রপক্ষ থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীন পূর্ব্বাহ্নে দখলে আনিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজ ব্রহ্মদেশ এত বিপদে পড়িত না। আজ জাপানীরা ব্রহ্মের দুই দিকে অগ্রসর হইবার জন্য শ্যামের সীমানা অঞ্চলে নূতন নূতন বিমান ঘাঁটি ও রাস্তা তৈয়ার করিতেছে। পাপুন হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে তাহারা একটি সামরিক রাস্তাও ইতিমধ্যে তৈয়ার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যদি এভাবে তাহারা রাস্তা ও ঘাঁটি তৈয়ার করিতে পারে, তবে তাহারা একই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে পারিবে এবং এই আক্রমণ

সাঁড়াশির চাপের আকার ধারণ করিবে কিনা তাহা আর কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝা যাইবে। সিতাং ও পেগু অভিমুখে জাপানীরা যেভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে রেঙ্গুণের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়াছে।

সিতাং নদী পার হওয়ার আগে যুদ্ধের গতি কি আকার ধারণ করিতে পারে এবং জাপানীদের সামরিক হালচাল কি হইতে পারে, সেই সম্পর্কে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন—

'যুদ্ধের গতি দেখিয়া মনে হয়, জাপানীরা সিতাং নদীর মোহনা হইতে প্রায় ১০০ মাইল উত্তরে ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া বৃটিশ বাহিনীর পার্শ্বদেশ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিবে। টাঙ্গুর নিকটবর্ত্তী উক্ত অঞ্চলে এবং উহার ৫০ মাইল উত্তরে ব্রহ্ম ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী গিরি-সঙ্কটের পথ তাহারা ব্যবহার করিতে পারে। অদ্য টাঙ্গুতে প্রচণ্ড বোমা বর্ষিত হইয়াছে। *বস্তুতঃ এরূপ বিমান আক্রমণ সেখানে এপর্য্যন্ত আর কখনও হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, জাপানীরা চীন-ব্রহ্ম রাস্তার এই স্থানটিতে স্থলপথে আক্রমণের মতলব করিতেছে। প্রধান জাপ বাহিনীকে এখন পর্য্যন্ত সিতাং নদীর পূর্ব্ব তীরে ঠেকাইয়া রাখা হইলেও তাহাদের টহলদার সৈন্যগণ ব্রহ্ম-চীন পথের নিকটবর্ত্তী স্থান সাময়িকভাবে ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নহে এবং রেঙ্গুণ ও সমগ্র নিম্ন ব্রহ্ম এখনও বিশেষ বিপন্ন। উত্তর-পশ্চিম থাইল্যাণ্ডে বহু জাপ সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। এই সকল সৈন্য শীঘ্রই দক্ষিণ শান রাজ্য আক্রমণ করিবে বলিয়া মনে হইতেছে।'

এই সময় দক্ষিণ ব্রহ্মের নানা সহরে জাপানী বোমারু প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে থাকে। রেঙ্গুণ, পেগু, টাঙ্গু ইত্যাদিতে প্রবল বোমা বর্ষিত হওয়ায় লক্ষ লক্ষ নর-নারী ঘরবাড়ী সম্পত্তি ফেলিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে থাকে। বিশেষভাবে ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়গণ, যাহাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ হইবে, তাহারা ভারতবর্ষের দিকে ছুটিতে থাকে। লক্ষ লক্ষ নর-নারীর ব্রহ্মদেশ ত্যাগ এক বৃহৎ সমস্যার সৃষ্টি করে। তাহাদের কষ্ট, লাঞ্ছনা এবং ক্ষয় ও ক্ষতির পরিমাণ অবর্ণনীয়।

---

* টাঙ্গু একটি বড় রেলওয়ে কেন্দ্র, রেঙ্গুণ হইতে ইহা ১৬০ মাইল উত্তরে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী টাঙ্গুতে যে ভীষণ বোমাবর্ষণ হয়, তাহাতে সমস্ত সহরটি ধ্বংস হয় এবং ৪০০ লোক নিহত হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বর্ম্মী।—লেখক।

ছোট সহরে ও গ্রামাঞ্চলেও জাপানীদের বোমারু অবিরত ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতেছিল। ইহার একটি চমকপ্রদ বর্ণনা পাঠকদের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য উল্লেখ করিতেছি।

সিতাং নদীর রণাঙ্গনস্থিত 'এসোসিয়েটেড প্রেসে'র সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, 'জাপানীরা স্থলপথে ক্রমে ক্রমে চীন-ব্রহ্ম রাজপথের দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের রেলপথের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তার বিভিন্ন অংশে প্রবল বোমা-বর্ষণ করিতেছে। আমি কয়েকটি গ্রামে জাপ বিমান-হানার নমুনা দেখিয়াছি। ভস্মীভূত গ্রামগুলিতে উদ্‌ভ্রান্ত গ্রামবাসিগণ তাহাদের সম্পত্তির দগ্ধাবশেষের দিকে তাকাইয়া তাহাদের কাহিনী যখন বিবৃত করিতেছিল, তখন মাথার উপর গাছের ডালে বসা শকুনিগুলি আব-হাওয়াকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। কয়েকটি ছোট সহরে ভাঙ্গাচোরা দরজা, জানালা, জনহীন পথ এবং নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু পথচারী কুকুরের চীৎকার শোনা যাইতেছিল ; সহরগুলির সমস্ত লোক সহর ছাড়িয়া অভ্যন্তর প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে। বহুবার আক্রান্ত টাঙ্গু নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ সহর পরিত্যাগের কয়েকটি মিনিট পরেই অনেক জাপ বোমারু বিমান পুনরায় সহরটি আক্রমণ করে। সন্ধ্যাবেলা আমি পুনরায় উক্ত সহরে ফিরিয়া গিয়া দেখি বিরাট অগ্নিকাণ্ড সুরু হইয়াছে এবং অগ্নিশিখা পাঁচ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠায় চতুর্দ্দিকে কয়েক মাইল দূর হইতে তাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। জাপানীরা বৃহৎ বিস্ফোরক ও অগ্নি-বোমা বর্ষণ করিয়া সমগ্র বাজার অঞ্চলে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। অর্দ্ধ বর্গমাইল স্থান অগ্নিময় নরককুণ্ডে পরিণত হইয়াছে। সামরিক ও অ-সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য অবস্থা ধীরে ধীরে আয়ত্তে আনিতেছেন। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার সামরিক উদ্দেশ্যেই এই সকল বিমান আক্রমণ চালানো হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণকে ইহার জন্য বিপুল কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে।'

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ব্যাপক বোমারু আক্রমণের ফলে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে।

—৭—

রেঙ্গুণ ও পেগু পরিত্যাগ

১০ই মার্চ্চ, '৪২।

জাপানীরা যেন এক প্রবল ধাক্কায় সিতাং নদী অতিক্রম করিয়া ১৮ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পেগু হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী বাও গ্রামে জাপানীদের সহিত বৃটিশ পক্ষের সংঘর্ষ হয়। ইহা কোন বড় যুদ্ধ নহে, একান্তরূপে খণ্ডযুদ্ধ মাত্র। বৃটিশ পক্ষের প্রহরী সৈন্যদলের সহিত সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, প্রধান বৃটিশ বাহিনী সিতাংয়ের পশ্চিম তীর হইতেও সরিয়া গিয়াছে। বোধ হয় তাহারা সিতাং নদীর নিম্ন অববাহিকার দিকে ঘাঁটি লইয়াছে। জাপানীরা রেঙ্গুণের ৬০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। পেগু ও রেঙ্গুণ উৎকৃষ্ট রেলপথ ও সড়কের দ্বারা সংযুক্ত। চীন-ব্রহ্ম রাস্তার ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি। চাউলের কেন্দ্র হিসাবে ইহা বিখ্যাত। রেঙ্গুণ বন্দরটি এমন স্থানে অবস্থিত যে, পূর্ব্বদিক হইতে স্থলপথে আক্রমণ হইলে ঐ বন্দর রক্ষা করা দুঃসাধ্য। এদিকে বাও হইতে পেগু হইয়া রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা ও রেলপথ আছে, জাপানীরা তাহার সুবিধা পাইবে। তাহা ছাড়াও বিপদ আছে। রেঙ্গুণ অঞ্চলে খুব ভালো ভালো বিমানশালা রহিয়াছে। এগুলি জাপানীদের হাতে পড়িবে। জাপানীরা এই সমস্ত বিমানশালা হাতে পাইলে পূর্ণ উদ্যমে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ চালাইতে পারিবে। তদুপরি হয়তো পূর্ব্ব ভারতের নানাস্থানে অনবরত হানাও দিতে পারিবে। জাপানীরা যে সুনিয়মিতভাবে অগ্রসর হইতে এবং শেষ পর্য্যন্ত সিতাং নদী পার হইতে পারিয়াছে, ইহার কারণ এই যে, তাহারা বিমানবলে অধিকতর বলীয়ান ছিল। সেই বিমানবল তাহারা স্থলযুদ্ধের সাহায্যে নিয়োগ করিতে পারিয়াছে।

৬ই মার্চ্চ সংবাদ আসে যে, বৃটিশবাহিনী মান্দালয় ও প্রোমের পথে সরিয়া গিয়াছে। পেগুতে যদি বড় রকমের সংগ্রামের ইচ্ছা বা সুবিধা থাকিত, তাহা হইলে প্রধান বাহিনী নিশ্চয়ই এত সহজে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে

মান্দালয় ও প্রোমের পথে অপসারিত হইত না। জাপানীরা ভবিষ্যতে এ পথে মান্দালয় ও রেঙ্গুণের যোগাযোগ নষ্ট করিবে, সম্ভবতঃ এজন্যই পূর্ব্বাহ্ণে বৃটিশ সৈন্য সেই পথ আগুলিয়া বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে পেগুর রণক্ষেত্রে কিছু ট্যাঙ্ক আসিয়া হাজির। এই পর্য্যন্ত দক্ষিণ ব্রহ্মে কোন পক্ষেই ট্যাঙ্কের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং হঠাৎ কিছু পরিমাণ ট্যাঙ্ক পাইয়া বৃটিশ পক্ষের সৈন্যরা বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল। পদাতিক ও গোলন্দাজবাহিনী মিলিয়া পেগুর দিকে অগ্রগামী জাপ সৈন্যদিগকে যথেষ্ট বাধা দিতে লাগিল। কিছু কিছু ক্ষতিও তাহারা সাধন করিল। কিন্তু জাপানীদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। জাপানীরা বাও ও পায়াজি দখল করিয়া ফেলিল। ৮ই তারিখের সংবাদে দেখা যায় যে, পেগুতে কয়েক দিন আগের মত প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। জাপানীরা এখন গভীর অরণ্যময় প্রদেশ হইতে উন্মুক্ত ধান্যক্ষেত্রপূর্ণ অঞ্চলে বাহির হইয়া আসিতেছে। এইস্থানে বৃটিশবাহিনী তাহাদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেছে। সম্প্রতি আনীত বৃটিশ ট্যাঙ্কসমূহ বহু শত্রুসৈন্য হতাহত করিতেছে। মার্ত্তাবান হইতে যে রাস্তাঘাট পেগুর সহিত মিলিয়াছে, জাপানীদের সমর-সম্ভার প্রধানতঃ সেই রাস্তা দিয়াই আসিতেছে। জাপানীদের যোগাযোগের এই দীর্ঘপথ উন্মুক্ত স্থানে পড়ায় বৃটিশ বিমানসমূহ উহার উপর নির্ম্মমভাবে আক্রমণ চালাইয়াছে। বে-সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, এই সড়কের উপর ৬ মাইল দীর্ঘ জাপ সমর-সম্ভারবাহী যানবাহন শ্রেণীর উপর বিমান হইতে বোমা ও মেসিনগানের গুলীবর্ষণ করা হইতেছে। সমর-সম্ভারবাহী হস্তিযূথ আতঙ্কে ভার ফেলিয়া দিয়া জঙ্গলে পলাইয়া গিয়াছে।

তথাপি দক্ষিণ ব্রহ্মে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কেননা, সংখ্যা-শক্তি ও রণকৌশলের দিক হইতে জাপানীরা শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহারা প্রত্যাশিত উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়া আসে নাই—আসিয়াছে অরণ্যভূমির কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া। জঙ্গল যুদ্ধের ইহা বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয়। অপ্রত্যাশিত জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসায় তাহারা রণকৌশলের বিস্ময় সৃষ্টি করিতে পারিতেছিল। মালয়ে জাপানীরা যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, ব্রহ্মদেশে তাহাদের আক্রমণ কৌশল তাহা হইতে পৃথক নহে। মালয়ে যেমন করিয়াছিল ব্রহ্মেও তাহারা সেইরূপ বড় বড় দলে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্ত্তে ১০।১২ জন সৈন্য এক এক দলে বিভক্ত হইয়া এবং সাধারণতঃ সাইকেল ও ছোট বেতারযন্ত্র লইয়া

অগ্রসর হইয়াছে। সদর ঘাঁটির সহিত সংবাদ আদান প্রদান করিবার জন্যই এই সকল বেতারযন্ত্র সঙ্গে লওয়া হইয়াছে। কামান ও অন্যান্য সমর-সম্ভার শ্যামদেশীয় হাতীর পিঠে চাপাইয়া জঙ্গল পথে আনয়ন করা হইয়াছে। সম্ভব হইলেই তাহারা জঙ্গল-যুদ্ধকে 'স্নায়ু যুদ্ধে' পরিণত করিয়াছে। তাহারা বন্দী ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যদিগের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এবং পরস্পরের সহিত ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়াছে।

জাপানীরা পেগুর সন্নিকটে আসিয়া পড়ায় এবং রেঙ্গুণ জলে স্থলে ও আকাশপথে একান্তরূপে বিপন্ন হওয়ায় ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীকে রেঙ্গুণ হইতে সরাইয়া লওয়া হয়। নয়াদিল্লী হইতে ৯ই মার্চ্চ ঘোষণা করা হয় যে, দুইদিন আগে রেঙ্গুণের কলকারখানা, ডক ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া দিয়া রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কর্ম্মচারীদের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের গভর্ণর বেতারযোগে এক বিদায় বক্তৃতা দেন। রেঙ্গুণে ধ্বংস কার্য্য সমাপ্ত করিবার আগে পর্য্যন্ত অ-সামরিক কর্ম্মচারী, লোকজন ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরাইয়া ফেলা হয়। রেঙ্গুণের প্রথম দিনের বিমানহানায় যে অভূতপূর্ব্ব ক্ষতি হইয়াছিল, বিমান আক্রমণের ইতিহাসে তাহা অভিনব। সরকারী মতে দুইবার প্রচণ্ড বিমানহানায় রেঙ্গুণে ১১০২ জন নিহত ও ১৬৫০ জন আহত হইয়াছিল। কিন্তু বে-সরকারী মতে রেঙ্গুণে হতাহতের সংখ্যা ৫ হাজারের কম নহে। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত সংবাদ ব্রহ্মদেশ ছাড়াইয়া কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। লক্ষ লক্ষ লোক পাগলের মত ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া জলপথে ও স্থলপথে (স্থলপথেই বেশীর ভাগ) আসাম, চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় আসে। ব্রহ্ম প্রত্যাগত ও অবর্ণনীয়রূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত নর-নারী ব্রহ্মদেশ ও রেঙ্গুণ সম্বন্ধে নানা সত্য মিথ্যা আজগুবি গুজব প্রচার করিতে থাকে। সেই হিড়িকে কলিকাতা হইতেও কয়েক লক্ষ লোক গ্রাম্য অঞ্চলে সরিয়া পড়ে।

৯ই মার্চ্চ লণ্ডন হইতে ঘোষণা করা হয় যে, পেগু এখনও যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র। রেঙ্গুণ-মান্দালয় রোড বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে বলিয়া জাপানীরা দাবী করিতেছে—ইহা ছাড়া রেলপথও দুই স্থানে তাহারা বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। সম্ভবতঃ রেঙ্গুণের উত্তরে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়াই তাহারা অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে। এইভাবে পেগু অঞ্চলের জঙ্গলের মধ্যে তাহারা

প্রবেশ করিতে পারিলে রেঙ্গুণ হইতে প্রোম যাইবার অবশিষ্ট রাজপথটিও বিপন্ন হইবে। জাপানীরা ব্রহ্মদেশে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিতেছে বলিয়া জানা যায় নাই। 'কিন্তু স্থলবাহিনীর দিক হইতে যদি তাহাদের সংখ্যাধিক্য থাকে, তবে যে ভাবে তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে ঘেরাও করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা ব্যর্থ করা সহজ নহে। সাম্রাজ্যবাহিনী ব্রহ্মদেশে যে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মদেশে পূর্ব্বেও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও তাহা চলিতে থাকিবে। ব্রহ্মদেশে বৃটিশ সাঁজোয়াবাহিনী রহিয়াছে। তথাপি কি কারণে রেঙ্গুণ ত্যাগ করা হইল, সেই সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল বলিতেছেন—

পেগুতে বৃটিশ সৈন্যের একাংশ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় এবং পেগু নদীর উত্তর তীরে ও রেঙ্গুণ নদীর পশ্চিম তীরে শত্রু সৈন্য অবতরণ করায় রেঙ্গুণ হইতে অপসরণের প্রয়োজন হয়। শত্রুদের এই অবতরণের সময়ে রেঙ্গুণ নদীর মোহনায় ভারতীয় নৌবহরের জাহাজ 'হিন্দুস্থান' অবতরণকারীদলকে আক্রমণ করে। একখানি ছোট জাহাজ আটক করা হয়, অবশিষ্টগুলি শেষ পর্য্যন্ত সৈন্যসামন্ত প্রভৃতি নামাইয়া দিতে সমর্থ হয়। ঐগুলির উপর বৃটিশ বিমানসমূহ আক্রমণ চালাইয়াছিল। ধৃত জাহাজখানিতে একজন জাপ অফিসার ও ৫৫জন বিশ্বাসঘাতক বর্ম্মী ছিল। পেগু অঞ্চলে শত্রু সৈন্য পেগুর পার্ব্বত্য জঙ্গলের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। পেগুতে নিযুক্ত বৃটিশ বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শক্তিশালী সাঁজোয়া জঙ্গী-মোটরযানসহ শত্রু পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

শত্রুসৈন্য অবতরণের ফলে সমস্ত অসামরিক শাসন বন্ধ হইয়া যায়। তখন রেঙ্গুণ ছাড়িয়া চীনাদের সহিত একযোগে মধ্য ব্রহ্মে সংগ্রাম চালাইবার সিদ্ধান্ত করা হয়।

রেঙ্গুণ হইতে ছাড়িয়া আসিবার সময় শত্রুসৈন্য মাণ্ডবীর (?) নিকটে রেঙ্গুণ-প্রোম পথটি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, এই স্থানটি রেঙ্গুণের ২৫ মাইল উত্তরে। ট্যাঙ্ক ও পদাতিকবাহিনী লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম আক্রমণে শত্রুকে হটান যায় নাই। পরে প্রচণ্ড আক্রমণ করা হয়। প্রচণ্ড সংগ্রামে উভয়পক্ষের গুরুতর ক্ষতি হয় এবং ব্যূহ ভেদ করা হয়। জাপানীরা রাস্তা আটক করিবার কার্য্যে জঙ্গী ও ছোঁমারা বিমানসমূহ ব্যবহার করে। ইহাতে উহারা অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে।

বে-সরকারীভাবে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, অনুমান একশত জাপ সৈন্য পেগুর উত্তরে রেঙ্গুণ ও মান্দালয়ের মধ্যবর্ত্তী রাজপথ অতিক্রম করিয়া গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া পশ্চিমে থারাবড্ডীর দিকে যাইতেছে। থারাবড্ডী রেঙ্গুণ-প্রোম রাজপথের উপর এবং রেঙ্গুণের উত্তরে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

সম্ভবতঃ জাপানীদের উদ্দেশ্য হইতেছে রেঙ্গুণ হইতে উত্তর ব্রহ্মে যাইবার পথে বাধা সৃষ্টি করা। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, উক্ত জাপ সৈন্যদল থারাবড্ডীতে পৌঁছিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা ঐ অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করা হইবে। এইভাবে শাসনকার্য্যে বিঘ্ন ঘটানোই জাপানীদের মতলব। জাপ সৈন্যরা দিনের বেলায় জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং অন্ধকার হইলেই বাহির হয়।

পরবর্ত্তী এক সংবাদে জানা যায় যে, জাপানীরা ইরাবতী নদীর তটবর্ত্তী থারাবড্ডী সহরও দখল করিয়া লইয়াছে।

মার্চ্চ মাসের প্রথমভাগেই রেঙ্গুণ ও পেগু ইঙ্গ ভারতীয় বাহিনী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল। পেগুতে কিছু যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সেই যুদ্ধ সম্ভবতঃ পশ্চাৎরক্ষী সৈন্যদের দ্বারা হইয়াছে—প্রধান বাহিনী নিরাপদে যাহাতে পিছু হটিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই পেগুর উপকণ্ঠে বাধা দেওয়া হইয়াছিল। জাপানীরা চাহিয়াছিল যাহাতে রেঙ্গুণ হইতে জেনারেল আলেকজেণ্ডারের সৈন্যরা পরিত্রাণ পাইতে না পারে। এজন্যই রেঙ্গুণ হইতে বাহির হইবার প্রধান সড়ক, যাহা উত্তরাভিমুখে ৪০০ মাইল দূরবর্ত্তী মান্দালয়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই পথটিও তাহারা পেগু আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। কিন্তু বৃটিশ পক্ষে কিছু ট্যাঙ্ক আমদানী হওয়ায় জাপানীদের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেদ করিয়া মূল বৃটিশবাহিনী রেঙ্গুণ ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে চলিয়া যাইতে সমর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই তিন দিক বেষ্টিত হওয়ায় জেনারেল আলেকজেণ্ডারের সৈন্যরা বিনা যুদ্ধে রেঙ্গুণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মের গভর্ণর রেঙ্গুণ সহরে অবরোধ যুদ্ধ চালানো হইবে এবং তাহা তোব্রুকের মতই দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিবে বলিয়া যে বীরত্বব্যঞ্জক ঘোষণা জারি করিয়াছিলেন, তাহা শোচনীয় ব্যর্থতায় পরিণত হয়। কারণ, অবরোধ যুদ্ধ দূরের কথা, খণ্ডযুদ্ধও রেঙ্গুণে অনুষ্ঠিত হয় নাই। তাড়াতাড়ি লোকাপসরণ ও ধ্বংস কার্য্য সাধন করিয়া রেঙ্গুণ হইতে সরিয়া

পড়া হয়। রেঙ্গুণের ৬ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত মাত্র সামান্য কয়েক হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। ইহার সঙ্গে পোড়ামাটীর নীতি অনুসৃত হওয়ায় রেঙ্গুণ শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিতেছেন যে, পোড়ামাটীর নীতি অনুসরণের জন্য রেঙ্গুণে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ৪০ মাইল দূর হইতে অগ্নিশিখা দেখা গিয়াছিল। সমগ্র সহরে প্রচণ্ডভাবে আগুন জ্বলিয়া উঠে। দৃশ্যটা যেন ডানকার্কেরই মত। জলপথে এবং স্থলপথে বিপন্ন নগরীকে রক্ষা করা যাইবে না বলিয়া সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যখনই বুঝিতে পারিলেন, তখনই ব্যাপকভাবে পোড়ামাটী নীতি অনুসৃত হয়। ডক, গুদাম, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি অসামরিক জিনিষগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। কর্ণপটাহভেদী বিস্ফোরণের পর আগুন জ্বলিয়া উঠে। অসামরিক দ্রব্যগুলি বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সিরিয়ামের বিরাট তৈল শোধনাগার ধ্বংসকার্য্যে এমন একজন লোককে নিয়োগ করা হইয়াছিল যিনি গত বৎসর রাশিয়ানদের ধ্বংস কার্য্য দেখিয়া আসিয়াছিলেন। ৩০০ মাইল উত্তরে তৈলকূপ হইতে যে বিরাট নলের দ্বারা সিরিয়ামে তৈল আনা হইত, তাহাও কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৭ই মার্চ্চ রেঙ্গুণ সরকারীভাবে পরিত্যক্ত হয়, আর ৮ই মার্চ্চ সকালে জাপানীরা রেঙ্গুণে প্রবেশ করে। রেঙ্গুণের পতনের দ্বারা ব্রহ্ম যুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র নষ্ট হইয়া গেল এবং চীন ব্রহ্মের সংযোগও বিনষ্ট হইতে বসিল। শত্রু ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

—৮—

রেঙ্গুণ পরিত্যাগের কারণ

২০শে মার্চ্চ, '৪২।

রেঙ্গুণ ও পেগুসহ গোটা দক্ষিণ ব্রহ্ম অতি দ্রুত জাপানীদের দখলে যাওয়ায় স্বভাবতঃই ব্রহ্ম রক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে নানা সংশয় দেখা দেয়। মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ বা দক্ষিণ ব্রহ্ম কোথাও যেন মিত্রপক্ষ জাপানের সম্মুখে দাঁড়াইতেই পারিতেছে না। ক্রমাগত পশ্চাদপসরণের একঘেয়ে কাহিনী শুনা যাইতেছে। রেঙ্গুণের পতনের পর

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়েভেল নয়াদিল্লী হইতে দক্ষিণ ব্রহ্মের দুর্ভাগ্যের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলেন—জাপানীদের দক্ষিণমুখী অভিযানের গতি রোধ করিবার জন্য যথাসময়ে আমরা নূতন স্থলসৈন্য ও বিমানসৈন্য সেই অঞ্চলে আনিতে পারিব কিনা, ইহাই ছিল আমাদের প্রথম চিন্তা। কিন্তু সময়ের সহিত প্রতিযোগিতায় আমরা পিছনে পড়িয়া যাই। অপ্রত্যাশিত দ্রুততার সহিত জাপানীরা অগ্রসর হয় এবং আমাদের নূতন রণ-সম্ভার পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যায়। মালয়, সিঙ্গাপুর বা ব্রহ্মদেশ—গোটা সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। এই স্থানে প্রস্তুত থাকিতে হইলে বিপন্ন মধ্যপ্রাচ্য ও বৃটেন হইতে সৈন্য আনিতে কিংবা রাশিয়াকে সাহায্য প্রেরণ বন্ধ করিতে হইত। তবে, সুদূর প্রাচ্যে আমাদের যে সৈন্য ছিল, তাহাদের প্রস্তুতি, শিক্ষা ও পরিচালনা সংক্রান্ত ত্রুটিবিচ্যুতি চাপা দিবার জন্যই আমি ইহা বলিতেছি না। কিন্তু ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ হইতে আমরা শত্রুর উপর জলে, স্থলে ও আকাশে কয়েকবার বড় রকমের আঘাত হানিয়া তাহাদের গুরুতর ক্ষতি সাধন করিয়াছি। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও আমাদের ক্ষতির পরিমাণই অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। মালয়ে ভারতীয় সৈন্যদিগকে খুব অসুবিধার মধ্য দিয়া যুদ্ধ চালাইতে হইয়াছে। এই স্থানে শত্রুপক্ষ আকাশে ও সাগরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মালয় রক্ষাকল্পে যে সমস্ত সৈন্য নিয়োগ করিতে হইয়াছিল, তাহারা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ছিল না অথবা ঘন জঙ্গলে যুদ্ধ চালাইবার উপযোগী খুব সামান্য শিক্ষাই লাভ করিয়াছিল। রেঙ্গুণ ও দক্ষিণ ব্রহ্মের এক বৃহৎ অংশের হস্তচ্যুতি কোন কোন বিষয়ে সিঙ্গাপুরের চেয়েও গুরুতর ক্ষতিজনক, সন্দেহ নাই। ব্রহ্ম সম্পর্কেও মালয়ের কথাই খাটে। আমরা যথোচিত প্রস্তুত ছিলাম না। সামরিক সাহায্য দেরীতে আসিয়া পৌছিয়াছে এবং নূতন সৈন্যেরাও যথেষ্ট ট্রেণিং লাভ করে নাই।

জেনারেল ওয়েভেলের এই বক্তব্যের সঙ্গে আর একটি বিবরণও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বিবরণীতে রেঙ্গুণ ত্যাগের কারণ অতি সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। মান্দালয় হইতে জনৈক বিশেষ সংবাদদাতা 'ষ্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

"ইচ্ছা করিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত হয় নাই। বৃটিশ সেনানায়কদিগকে বাধ্য হইয়াই এই সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের

সমক্ষে দুইটি সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা যদি সেনাবল অটুট রাখিয়া রেঙ্গুণ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে উত্তর ব্রহ্মের তৈল খনিগুলি রক্ষা করিতে পারেন। পক্ষান্তরে যদি তাঁহারা রেঙ্গুণে থাকেন, তবে পরাজয় অবধারিত। কেন না, সংখ্যাবলে দ্বিগুণ কি তিনগুণ শত্রুর হস্ত হইতে রেঙ্গুণ রক্ষা করা অসম্ভব। এমন অবস্থায় জেনারেল আলেকজেণ্ডার রেঙ্গুণ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন। রেঙ্গুণ পতনের কাহিনীর আরম্ভ ৫ই মার্চ্চ হইতে। ঐ তারিখ রেঙ্গুণ হইতে ৫০ মাইল দূরে পেগুর পূর্ব্ব ও উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে জাপানীরা ইংরাজ সৈন্যদের উপর বিষম চাপ দিতে থাকে। জাপানীদের তুলনায় ইংরাজ পক্ষের সৈন্যেরা অনেক দুর্ব্বল ছিল। ঐ অঞ্চলে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা অসুবিধাজনক প্রতিপন্ন হয়। তথাপি ৬ই তারিখে আমরা দুই একটি ছোটখাটো আক্রমণ করি এবং কয়েকটি ট্যাঙ্কমারা কামান দখল করি। শত্রুরা সিতাং নদী পার করিয়া ৩টি হাল্কা ট্যাঙ্ক আনিয়াছিল, আমরা সেই ট্যাঙ্ক তিনটিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিই। এদিকে পশ্চিম দিক হইতে শত্রুরা আসিয়া রেঙ্গুণের রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ইংরাজ সৈন্যরা শত্রুব্যূহ ভেদ করার জন্য একটা নূতন চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। ঠিক এই সময় আর একটা নূতন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় এবং তাহা এই যে, বহু সংখ্যক শত্রু রেঙ্গুণ নদীর পশ্চিমে অবতরণ করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ৬।৭ শত হইবে। তাহারা যে স্থানে অবতরণ করিয়াছিল, সে স্থানে তাহাদের অনুরক্ত লোক পাইবার সম্ভাবনা ছিল। দেখা গেল যে, শত্রুরা ইচ্ছা করিলেই রেঙ্গুণের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত খালের পথটি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে। এমন কি, তাহারা খাস রেঙ্গুণ বন্দরে যাইয়াও হাজির হইতে পারে। আর একটা কথাও বিবেচনা করিতে হইল। রেঙ্গুণ নদীর পরপারে সিরিয়ামে যে সমস্ত তৈলাধার আছে, তাহা রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নাই। তথায় যে অল্পসংখ্যক রক্ষী থাকে, শত্রুরা তাহাদিগকে সহজেই পরাভূত করিয়া ফেলিতে পারে। তৈলাগারগুলি বিনষ্ট করার জন্য যে ব্যবস্থা করা ছিল, তাহাও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতে পারে। তাহা হইলে তৈলাগারগুলি আর উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। এদিকে আবার খবর পাওয়া গেল যে, এক জাঙ্গাল নূতন সৈন্য ট্যাঙ্কসহ পেগুর দিক হইতে প্রোমের পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে। অর্থাৎ রেঙ্গুণ হইতে আমাদের বাহির হইবার একমাত্র পথটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। ৬ই মার্চ্চ তারিখে উক্ত জাপানী জাঙ্গাল আসিয়া প্রোম রোঁডটি

বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। তখন ইংরাজরা ঠিক করে যে, রেঙ্গুণের সমস্ত বিনষ্ট করিয়া দিয়া তৈলাঞ্চলগুলি রক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত। শনিবার বৈকাল ২টার সময় হইতে রেঙ্গুণের ধ্বংস কার্য্য আরম্ভ হয়। ঐ দিন প্রাতে ইংরাজ সৈন্যেরা রেঙ্গুণ ত্যাগ করিয়া প্রোম রোড ধরিয়া বাহির হইয়া যাইতে থাকে। কিছু দুর যাইয়াই রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্তা করিয়া লওয়ার প্রথম কয়েক দফা চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ৭ই মার্চ্চ রাত্রে ইংরাজ সৈন্যদিগকে রেঙ্গুণ হইতে ২১ মাইল দূরবর্ত্তী কৈচাঁন গ্রামের নিকটে অবস্থান করিতে হয়। কৈচাঁনের কিছু পূর্ব্বে হেলগু নামক স্থানে আমাদের যে সমস্ত সৈন্য প্রহরায় রত ছিল, তাহাদিগকে কৈচাঁনে ডাকিয়া পাঠানো হয়। এদিকে পেগুতে অবরুদ্ধ সৈন্যদলকে যে কোন প্রকারে পথ বাহির করিয়া আসিতে আদেশ দেওয়া হয়। ৮ই মার্চ্চ তারিখে ইংরাজ সৈন্যেরা রাস্তা করিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত শত্রুদিগকে আক্রমণ করে। ৯।১০ মাইল দূরে থুয়ারী নামক স্থানে রাস্তাটি একেবারে আটক দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ পক্ষের আক্রমণ সফল হয় এবং একটা রাস্তা করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু পরে শত্রুসৈন্য কৈচাঁন এবং থুয়ারীর মধ্যে রাস্তার দুই দিকে দাঁড়াইয়া ইংরাজ সৈন্য এবং তাহাদের গাড়ীগুলির উপর গুলী চালাইতে থাকে। কিছুকাল পরে পেগু হইতে ট্যাঙ্ক আসিয়া পড়ে এবং ১১টার সময় রাস্তা পরিষ্কার হইয়া যায়। তারপর সুনিয়মিতভাবে সৈন্যেরা চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে। পথিমধ্যে শত্রুরা আমাদের সৈন্যদের উপর বোমা বর্ষণের প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু আমাদের পক্ষের বিমানগুলি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া চলায় ক্ষতি খুব বেশী হয় নাই। ইত্যবসরে পেগুতে অবরুদ্ধ সৈন্যগণ অদ্ভুত পরাক্রমে শত্রুদের প্রভুত ক্ষতি সাধন করিয়া বাহির হইয়া আসিতে সমর্থ হয় এবং সন্ধ্যার মধ্যেই কৈচাঁনের নিকট মূল সৈন্যদলের সহিত মিলিত হয়। ইহার ফলে ৯ই মার্চ্চ প্রাতঃকালের মধ্যেই রেঙ্গুণে আমাদের যে সমস্ত সৈন্য ছিল, তাহারা সকলে সরিয়া পড়িতে সমর্থ হয় এবং রেঙ্গুণ হইতে প্রোম রোডের ধারে ৫০ মাইল দূরে তাইচি গ্রামে সমাবিষ্ট হইতে সমর্থ হয়।

"রেঙ্গুণের যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছে পেগু হইতে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত শত্রুদের আক্রমণের ক্ষিপ্রতা। টেনাসেরিম বিভাগের পার্ব্বত্য অঞ্চলে শত্রুরা অপূর্ব্ব রণকৌশল দেখাইয়াছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু সকলের মনেই একটা আশা ছিল যে, সিতাংয়ের পশ্চিমে ধান্যক্ষেত্রগুলির

উপর শত্রুদের গতিরোধ করা যাইবে, এই অঞ্চলে আমাদের অনেক ট্যাঙ্ক ছিল। একটা অসুবিধা ছিল—জঙ্গলের দরুণ বড় বড় কামান ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় নাই। ব্রহ্মদেশে ভালো রাস্তা খুব কম আছে। টেনাসেরিম অঞ্চলে ইংরাজদের পক্ষে যোগাযোগ রক্ষা করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রহ্মদেশে টেলিফোন এবং বেতার ব্যবস্থা তেমন উন্নত নহে। বড় রকমের যুদ্ধে উহা কাজে লাগানো যায় না। ফলে, সহরে জঙ্গী কার্য্যালয় হইতে সুদূরে অবস্থিত সেনাদলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। রেঙ্গুণের পতনের ইহাই কতকগুলি আপাতদৃশ্যমান কারণ। ইহা ছাড়া ব্রহ্মদেশের লোকদিগকে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। গত ২৩শে ডিসেম্বর যখন প্রথম বোমা বর্ষিত হয়, তখন হইতেই সমগ্র ব্রহ্মে সাংঘাতিক আতঙ্কের সঞ্চার হয় এবং দলে দলে নর-নারী পলায়ন করিতে থাকে।"

*　　*

*

পেগু ও রেঙ্গুণের ব্যর্থতার উপরে যে বর্ণনা দেওয়া হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, দক্ষিণ ব্রহ্ম রক্ষার তেমন কোন বিস্তৃত ও উৎকৃষ্ট আয়োজন ছিল না। উপযুক্ত সমর-সম্ভার ও উপযুক্ত সৈন্য সংখ্যা ছিল না। যথাসময়ে সৈন্য ও সমরোপকরণ পৌছিতে পারে নাই। সৈন্যদের ট্রেণিং ভালো ছিল না এবং জঙ্গল যুদ্ধের আদৌ কোন নৈপুণ্য তাহাদের ছিল না। একাংশ রক্ষা করিতে গিয়া আরেক অংশ তাহারা হারাইয়াছে এবং এক পথে পাহারা দিতে গিয়া অন্য পথে শত্রুরা আসিয়াছে। উৎকৃষ্ট কোন রণপরিকল্পনা ও উপযুক্ত শক্তি সমাবেশের অভাবই এই ছত্রভঙ্গের মূল কারণ। টেনাসেরিমের পার্ব্বত্য অঞ্চলে জাপানীদের জঙ্গল যুদ্ধের নৈপুণ্য ও সিতাং পার হইয়া অতি দ্রুতগতিতে রেঙ্গুণে উপস্থিতি—এই দুই প্রশ্নও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া আরও দুইটি বিশেষ কারণও আছে, রণনীতির দিক হইতে যাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ মিত্রপক্ষকে জাপানীদের বিরুদ্ধে বরাবর উত্তর দক্ষিণভাবে লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল এবং এই সৈন্যদের নিকট রসদ ও আহার পৌছাইবার জন্য পশ্চাতে যে রেল লাইন বা রাস্তা ছিল সেগুলি সমস্তই সৈন্য-লাইন বা মহড়ার সমান্তরালে অবস্থিত। বিপক্ষের তুলনায় হাতে প্রচুর শক্তি না থাকিলে এইভাবে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করাতে সমূহ

বিপদ আছে। কেন না, শত্রুপক্ষ যদি কোনমতে এই সমান্তরালে অবস্থিত যাতায়াত ব্যবস্থাকে কোন এক স্থলে বিদ্ধ করিতে পারে, তবে হয় বাম না হয় দক্ষিণ অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ সে অংশে আহার ও রসদ পাঠাইবার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ব্রহ্ম যুদ্ধে পেগু দখলের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা ঘটিয়াছিল। পেগু দখল হওয়াতে এই স্থান হইতে দক্ষিণে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত যে সৈন্য ছিল তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম যুদ্ধের দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, রণাঙ্গনের গভীরতা বেশী ছিল না। জার্ম্মাণ ও জাপানী রণনীতিতে দেখা গিয়াছে, তাহারা বিপক্ষের দুর্ব্বল স্থান দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন ও বিমূঢ় করিতে চায়। এই অবস্থায় সম্মুখ লাইনের পশ্চাতে যদি প্রশস্ত স্থান থাকে, তবে ইচ্ছামত সৈন্যদলকে আগাইয়া বা পিছাইয়া শত্রুর বিচ্ছিন্ন করিবার মতলব ব্যর্থ করা সম্ভব। কিন্তু ব্রহ্ম রণাঙ্গনে ইহার অভাব ঘটিয়াছিল। রেঙ্গুণ-প্রোম রাস্তা হইতে পূর্ব্ব সীমান্ত মাত্র দেড়শত মাইল। মাইল হিসাবে দেড়শত নিতান্ত কম নহে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রহ্মের বিচিত্র ভৌগোলিক সংস্থান আত্মরক্ষার রণনীতিতে প্রচুর বাধা জন্মাইয়াছিল। বিলিন, সিতাং, সালুইন, ইরাবতী ইত্যাদি নদীগুলি সব উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি, রেলপথগুলি উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি এবং রাস্তাগুলিও তাহাই। ফলে, সৈন্য লাইনের সঙ্গে রসদ ও যন্ত্রাদি সরবরাহের ব্যবস্থাও সমান্তরাল রেখায় পড়িয়া যায়। সুতরাং কোন এক অংশ বিচ্ছিন্ন হইলে রসদ ও সমর সম্ভার প্রেরণের যোগাযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি রণাঙ্গনের গভীরতা বা depth থাকিত, সহজ কথায় যদি বেশী পরিমাণ চওড়া জায়গা থাকিত, তবে, ইচ্ছামত পিছনে বা পার্শ্বে সরিয়া যাওয়ার সুবিধা থাকে এবং তাহা দ্বারা শত্রুর কোন এক অংশের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু রেলপথ, নদী ও রাস্তা ইহার অধিকাংশই লম্বালম্বি থাকায় চওড়া ভূমির মহড়ার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। ইহার সঙ্গে অরণ্য এবং উপযুক্ত সংখ্যক উৎকৃষ্ট রাস্তাঘাটের অভাবের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে—যাহা শত্রুর পক্ষে বিঘ্নজনক ছিল, তাহাই শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষারও প্রকাণ্ড বাধারূপে দেখা দিল।

—৯—

দক্ষিণ ব্রহ্মের রণকৌশল

২২ শে মার্চ্চ, '৪২।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে রেঙ্গুণ ও পেগু বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক পরিত্যাগের ঘটনাবলী এবং তৎ সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোনও স্থানের যুদ্ধ উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে কেবল একপক্ষের সৈন্য সংখ্যার দুর্ব্বলতা, সমর-সম্ভারের অল্পতা বা অপর পক্ষের শ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি জানিলেই চলিবে না। পরস্পরের রণনৈতিক চাল এবং রণকৌশলের বৈশিষ্ট্যও জানা দরকার। এই রণনৈতিক চাল ও রণকৌশল রণভূমির ভৌগোলিক সংস্থানের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু পাহাড়, জঙ্গল, নদী ইত্যাদির সংস্থান অনুসারে রণনীতি ও রণকৌশলের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হয়। ভৌগোলিক অবস্থার কথা পূর্ব্বে একাধিকবার বলা হইয়াছে। এখানে বিশেষ-ভাবে আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যাইতে পারে। দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে সমুদ্রতীর একটানা নহে। ভাঙ্গা চিরুণীর দাঁতের মত যেন স্থানে স্থানে হঠাৎ দেশগুলি সরু হইয়া সাগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণ ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীন প্রভৃতিকে এই দাঁতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রধান ভূমিখণ্ড হইতে এই বর্দ্ধিত অংশ-গুলিকে দখল করিবার বেলায় জাপানীরা এক বিশেষ কৌশল গ্রহণ করিয়াছে। মালয় যুদ্ধের সময় আমরা দেখিয়াছিলাম, জাপানীরা প্রথমেই ইহার উত্তরাংশে টেনাসেরিম অঞ্চলে দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্ম আক্রমণ করিয়া সমগ্র মালয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। এইরূপে বিচ্ছিন্ন করিবার পর তাহারা জলে স্থলে নানাভাবে আক্রমণ করিয়া সে যুদ্ধের অবসান ঘটায়। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া যখন দুইটি শক্তি মুখোমুখী হয়, তখন সাধারণতঃ পরস্পরের লক্ষ্য থাকে, কিভাবে অপরের গোটা সৈন্যদলকে বা তাহার অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পিষিয়া মারা যায়। এই একই নীতি অনুসরণ করিয়া মালয় উপদ্বীপের সঙ্কীর্ণ যোজকে আঘাতের দ্বারা জাপানীরা মিত্রপক্ষের শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। জাপানীরা দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধে অনুরূপ কৌশল গ্রহণ করিয়াছিল।

ইরাবতীর অববাহিকা পেগুর নিকটে শেষ হইলে ব্রহ্মদেশের সমুদ্রতীর একটানা থাকিত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এই অববাহিকা যেন গলা বাড়াইয়া দুই শত মাইল সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। জাপানীরা যখন সিতাং নদী অতিক্রম করিয়া পেগুর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন মিত্রপক্ষ ভাবিয়াছিলেন শত্রু সৈন্য পেগু-রেঙ্গুণ রাস্তা ও সমভূমির দক্ষিণে রেঙ্গুণের দিকে অগ্রসর হইবে। কিন্তু তাহা ঘটিল না। জাপানীরা এই বর্দ্ধিত ভূখণ্ডকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সোজা পশ্চিম দিকে রেঙ্গুণ-প্রোম রাস্তার দিকে ধাবিত হইল। তাহার পশ্চিম মালয়ে যেভাবে সৈন্যের অগ্রগতি দ্রুত করিবার জন্য জাহাজ ও বজরা যোগে মিত্রপক্ষের পশ্চাতে ছোট ছোট সৈন্যদলকে অবতরণ করাইয়া দিয়াছিল, এখানেও সেইভাবে যখন তাহাদের প্রধান সৈন্যদল প্রোমের রাস্তার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে একদল জাপানী সৈন্য রেঙ্গুণের দক্ষিণে জাহাজযোগে অবতরণ করে। মিত্রপক্ষ সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে একযোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া রেঙ্গুণ ছাড়িয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। যে সৈন্যদল পেগুর সম্মুখে যুদ্ধ করিতেছিল তাহারাও শত্রুর দ্বারা পেগুর পশ্চিম ও উত্তর হইতে আক্রান্ত হইয়া বেষ্টিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই দলকে যে কোন ভাবে বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া প্রধান দলের সহিত যোগ দিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। রেঙ্গুণের কল কারখানা ও তৈলাধারগুলি ধ্বংস করিয়া মিত্রপক্ষের প্রধান দলটি উত্তর ব্রহ্মে সরিয়া যাইবার আশায় প্রোমের রাস্তায় অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু ২৫ মাইল অগ্রসর না হইতেই তাহারা দেখে জাপানীরা ইতিমধ্যে প্রোমের রাস্তা অতিক্রম করিয়া আরও পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। শত্রুর এই লাইনকে ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইবার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে পেগুর সৈন্যবাহিনী ও ট্যাঙ্কবাহিনী এই দলের সহিত যোগ দিতে সক্ষম হওয়ায় দ্বিতীয় আক্রমণ ব্যাপকভাবে করা সম্ভব হইয়াছিল। এই আক্রমণের মুখে জাপানীরা দাঁড়াইতে সক্ষম না হইয়া পথ ছাড়িয়া দেয় এবং মিত্রপক্ষ নির্ব্বিবাদে প্রোমের দিকে পশ্চাদপসরণ করিয়া আসে। এখানেই দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। জাপানীরা মালয়ের মত এখানেও বর্দ্ধিত ভূমিখণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপদ্বীপ দখল করিতে চাহিয়াছিল এবং এই উপদ্বীপে অবস্থিত মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনীকে সিঙ্গাপুরের মত ঘিরিয়া মারিতে চাহিয়াছিল। মিত্রপক্ষের সাহসিকতায় দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সফল

না হইলেও এই কৌশলের ফলে ইরাবতীর অববাহিকা অতি সহজে শত্রুর হস্তগত হইয়াছে।

দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার এই যে, জাপানীরা সমতল ভূমির যুদ্ধ অপেক্ষা জঙ্গল-যুদ্ধ বাছিয়া লইয়াছে। জেনারেল ওয়েভেল তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, মিত্রবাহিনী জঙ্গল-যুদ্ধে অভ্যস্ত না থাকায় মালয়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। জঙ্গল-যুদ্ধের প্রধান অসুবিধা এই যে, সৈন্য দলগুলির মধ্যে পরস্পরের যোগাযোগ রাখা কষ্টকর হইয়া পড়ে। বিভিন্ন যুদ্ধগুলি দেখিয়া মনে হয় মিত্রবাহিনী এখনও মামুলী ধরণে বিশাল সৈন্যসংখ্যা লইয়া সমতালে চলিতে চাহে। কিন্তু কোন বিশাল বাহিনীর পক্ষে এইরূপ শৃঙ্খলা ও যোগাযোগ রক্ষা করিয়া বনের মধ্যে চলাফেরা করা এক দুরূহ সমস্যা। বনের মধ্যে যুদ্ধরত অবস্থায় যেমন একটি দলের পক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী দল কতখানি হটিল বা অগ্রসর হইল তাহা অনুমান করা কষ্ট, তেমনি রাস্তাঘাটের অভাবে আবশ্যকমত হঠাৎ কোন এক স্থানে বিশাল সৈন্যদল সমাবেশ করিয়া শত্রুব্যূহ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করাও একান্ত শক্ত। অপর পক্ষে জাপানীরা জার্ম্মাণ রণনীতির অনুপ্রবেশ কৌশল অনুসরণ করিয়া ছোট ছোট দলে পিপীলিকার মত বনের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের যেমন পরস্পরের যোগাযোগ রাখিবার দায়িত্ব দেওয়া হয় না, তেমনি ভারী অস্ত্রশস্ত্র দিয়া ইহাদের গতিও মন্থর করার চেষ্টা হয় না। ইহারা খুসীমত কোথাও উলঙ্গ হইয়া নদী পার হইতেও যেমন দ্বিধা করে না, তেমনি বনের মধ্যে হাতীর পিঠে চড়িয়া দুর্গম অরণ্যে পথ করিয়া লইতেও দেরী করে না। এই 'বেতাল যুদ্ধে' মিত্রপক্ষ অভ্যস্ত নহে। জাপানীরা হয়তো এই সুযোগ গ্রহণের আশায়ই সমতল ভূমি ছাড়িয়া পেগুর পশ্চিমে বনাকীর্ণ স্থান বাছিয়া লইয়াছিল। ইরাবতী অববাহিকার সমতল ভূমিতে পেগু-ইয়োমার জঙ্গলময় উচ্চভূমি দক্ষিণে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলের পূর্ব্বে মার্ত্তাবান উপসাগর ধরিয়া বরাবর পেগু হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত একখণ্ড সমতল ভূমি চলিয়া গিয়াছে। আবার ইহার পশ্চিমে বিরাট সমতল ভূমি ইরাবতী নদী বরাবর সাগর পর্য্যন্ত অবস্থিত। এই অঞ্চলে দাঁড়াইলে বাঙ্গলার কৃষিক্ষেত্রের দৃশ্যই মিলিবে। মিত্রপক্ষ ভাবিয়াছিলেন শত্রুরা পেগু-রেঙ্গুণ সমতল ভূমি ধরিয়া দক্ষিণে নামিবে এবং সেই আশায় এখানে ট্যাঙ্কবাহিনীও সমাবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানীরা তাঁহাদের রণনীতির সুযোগ ও

সুবিধা বুঝিয়া জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে যুদ্ধের মীমাংসা করিতে চাহিয়াছে। উত্তর ব্রহ্ম অধিকতর জঙ্গলাকীর্ণ; সেইজন্য মিত্রপক্ষকে শত্রুর এই কৌশলের কথা মনে রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

কোনও স্থান আক্রমণ করিবার আগে বিপক্ষের সৈন্য সমাবেশ, উহার যুদ্ধ চালনার শক্তি ইত্যাদির যেমন খবর রাখা দরকার, তেমনই অনুমান করিতে হইবে যে, বিপক্ষীয় দল কি ধরণের রণনীতি ও রণকৌশলের জন্য প্রস্তুত। যদি সাধারণ পুঁথিগত ও সাধারণ বুদ্ধিগত রণনীতি অনুসৃত হয়, তবে স্বভাবতঃই কোন অভিনবত্ব বা অপ্রত্যাশিত কোন বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করা যায় না। যেখানে সমতল ভূমির সুযোগ রহিয়াছে, সেখানে আধুনিক সৈন্যদল সেই ভূমির সুযোগ লইতে যাইবে—ইহা সাধারণ বুদ্ধির কথা এবং এই সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা কোন অভিনবত্ব আশা করা যায় না। এ জন্য জাপানীরা চতুরের মত পেগু অঞ্চলের সমতল ভূমিপথে এবং উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়া অগ্রসর হইল না, তাহারা গেল অধিকতর কষ্টকর জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি দিয়া। ইহার জন্য আক্রমণকারী বৃটিশবাহিনী তেমন প্রস্তুত ছিল না। তাহারা অপেক্ষাকৃত সহজ ভূমিতে শত্রুর আগমনের অপেক্ষা করিতেছিল। ফলে, বিপরীত ও অপ্রত্যাশিত রণকৌশলের পাল্লায় পড়িয়া বৃটিশবাহিনীকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইল এবং অতি দ্রুত দক্ষিণ ব্রহ্ম হাতছাড়া হইয়া গেল। জাপানী রণ-কৌশলের এই বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই স্মরণযোগ্য এবং শিক্ষাপ্রদ।

অষ্টম অধ্যায় ঃ উত্তর ব্রহ্মের পতন

—:*:—

—১—

উত্তর ব্রহ্ম অভিমুখে

২৫শে মার্চ্চ, '৪২।

ভৌগোলিক দিক হইতে তুলনা দিয়া বলা যায় যে, পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ যেমন গোটা বাঙ্গলা দেশের দুই অংশ, তেমনই উত্তর ব্রহ্ম ও দক্ষিণ ব্রহ্ম সমগ্র ব্রহ্মের প্রধান দুই অংশ। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্রহ্ম দেশের অধিকাংশ নদী ও রেলপথ উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি এবং এই দেশও দুই অংশে বিভক্ত। যদিও কলিকাতা সহর সমগ্র বাঙ্গলার রাজধানী, তথাপি পশ্চিম বাঙ্গলা ও পূর্ব্ব বাঙ্গলার কথা উল্লেখ করিয়া যেমন বলা যায় যে, কলিকাতা পশ্চিম বাঙ্গলার এবং ঢাকা পূর্ব্ব বাঙ্গলার রাজধানী, তেমনই রেঙ্গুন সহর সমগ্র ব্রহ্ম দেশের রাজধানী হইলেও এবং কলিকাতার মত রেঙ্গুণ ব্রহ্মদেশের আসল প্রাণকেন্দ্র হইলেও মান্দালয় উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী—যেমন ঢাকা পূর্ব্ব বঙ্গের।

নিঃসন্দেহে রেঙ্গুণ দখলের দ্বারা জাপানীরা ব্রহ্মের এই প্রাণকেন্দ্র কাড়িয়া লইয়াছে। তথাপি উত্তর ব্রহ্মের গুরুত্ব রহিয়াছে। উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী মান্দালয় দখল না হইলে গোটা ব্রহ্মদেশের উপর আধিপত্য করা যায় না। কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে গোয়ালন্দকে যেমন রেল ও ষ্টীমার পথের একটী গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বলা যায় এবং ইহা যেমন কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে কতকটা মাঝামাঝি বিন্দুর মত, টাঙ্গু সহরও তেমনই রেঙ্গুণ ও মান্দালয়ের মধ্যে মাঝামাঝি বিন্দুর মত। রেঙ্গুণ-মান্দালয় রোড—যাহা উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মকে সংযুক্ত করিয়াছে এবং লাসিও হইতে যাহা চীন-ব্রহ্ম সড়কের সহিত সংযুক্ত, টাঙ্গু তাহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এদিকে রেঙ্গুণ হইতে উত্তর-পশ্চিমে প্রোম এবং পশ্চিমে বেসিন পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট সড়ক গিয়াছে।

দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধের পর জাপানীরা কয়েকদিন দম ধরে। বোধ হয় দিন দশেক তাহারা পরবর্ত্তী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। কোন বুদ্ধিমান সেনাপতিই পর্য্যুদস্ত ও ম্রিয়মান শত্রুকে অবসর দেয় না, জাপানীরাও দেয় নাই। তাহাদের টহলদারী সৈন্যেরা রেঙ্গুণ ছাড়াইয়া উত্তরে

ও উত্তর পশ্চিমে সাম্রাজ্যবাহিনীর সন্ধান করিতে লাগিল। ব্রহ্ম যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায় গিয়াছে মালয় উপদ্বীপের সঙ্গে। টেনাসেরিমের উপকূল হইতে মৌলমেন পর্য্যন্ত একটি পর্য্যায় ধরা যাইতে পারে। তারপর মৌলমেন হইতে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পর্য্যায় এবং তৃতীয় বা শেষ পর্য্যায় অনুষ্ঠিত হইবে রেঙ্গুণ হইতে লাসিও পর্য্যন্ত। এই পর্য্যায়ের সঙ্গে ইরাবতী, সিতাং ও বঙ্গোপসাগরের জলপথের প্রশ্ন আছে। রেঙ্গুণ পোতাশ্রয় ধ্বংস করা হইলেও বন্দরটি একেবারে অব্যবহার্য্য হয় নাই বলিয়া লণ্ডন হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। জাপানীরা রেঙ্গুণে সৈন্য নামাইতে পারিবে, তবে, মালপত্র বেশী নামাইতে পারিবে না। সমুদ্রপথ দিয়া তাহারা আরাকান অঞ্চল এবং আকিয়াব বন্দরের দিকেও অগ্রসর হইতে পারে। রেঙ্গুণ হইতে ইরাবতীর তীরে প্রোম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াও জাপানীরা আরাকানে প্রবেশ করিতে পারে। আরাকান ভারতবর্ষ বা বাঙ্গলার সীমানার সহিত যুক্ত। যদিও আরাকান ব্রহ্মের অভ্যন্তর-ভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন, তথাপি দুইটি পার্ব্বত্যপথ দিয়া আরাকান আক্রমণ করা যায়। স্থলপথে দক্ষিণ হইতে প্রোমের টাউংগাপ গিরিপথ এবং মিনবুর আন গিরিপথ দিয়া আরাকানে তাহারা ঢুকিতে পারে। এই দুই গিরিপথের সহিত আরাকানের উপকূলপথ সংযুক্ত এবং উপকূলপথ আকিয়াব হইয়া কক্সবাজার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং একদিকে বঙ্গোপসাগর এবং আর এক দিকে এই স্থলপথ, উভয় দিক দিয়া জাপানীরা আরাকান দখল করিতে পারে। কিন্তু রেঙ্গুণের পর ব্রহ্মদেশের আসল যুদ্ধ সুরু হইবে দুইটি প্রধান সড়ক ধরিয়া —পূর্ব্ব দিকে টাঙ্গুর মধ্য দিয়া মান্দালয় রোডে এবং পশ্চিমে প্রোম রোডে। জাপানীরা জঙ্গল-যুদ্ধে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। তৎসত্ত্বেও এই দুই সড়ক দিয়াই যুদ্ধ চলিবে বলিয়া মনে হয়। কারণ, ট্যাঙ্ক, মোটর যান ও সরবরাহ গাড়ীগুলির পক্ষে সাধারণতঃ রাস্তা ছাড়িয়া যুদ্ধ চালানো সম্ভব নহে। ২০শে মার্চ্চ সংবাদদাতাগণ জানাইতেছেন যে, প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ ও পরিষ্কার আব-হাওয়ার মধ্যে ব্রহ্মদেশ রক্ষার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। বৃটিশ সৈন্যগণ তাহাদের নূতন আত্মরক্ষার ঘাঁটিতে অবস্থান করিয়া জাপ আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছে। মান্দালয়ের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে বর্ত্তমানে তাহা ধরিয়াই জাপানীদের প্রধান আক্রমণ চলিতেছে। এই পথে টাঙ্গু দখল করাই জাপানীদের আশু লক্ষ্য। ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীর কেবলমাত্র সম্মুখসারির সৈন্যেরা কানিয়ুৎকিনে জাপানীদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত আছে। এই স্থানটি টাঙ্গু হইতে ৪০ মাইল

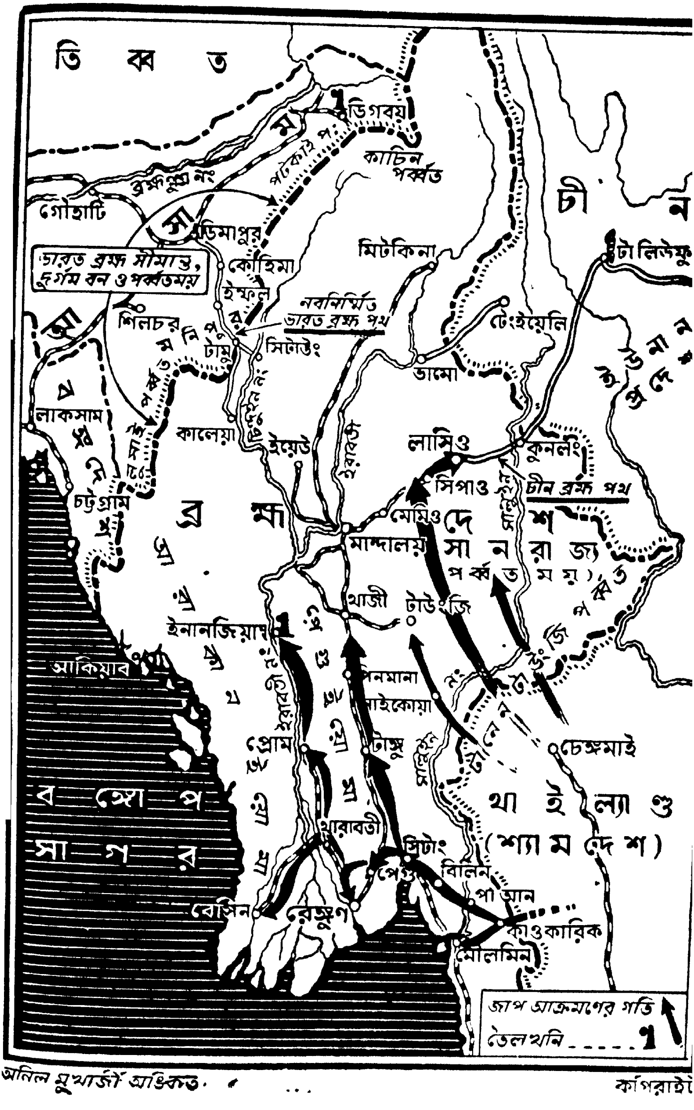
দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাতে বুঝা যায় যে, বৃটিশ পক্ষের প্রধান বাহিনী অনেক উত্তর দিকে সরিয়া গিয়াছে।

এদিকে ইরাবতী নদীতেও জাপানীদের কার্য্যকলাপ দেখা যাইতেছে। মনে হয় প্রোম রোডের দিকেও ইহারা আক্রমণ করিবে। ব্রহ্মদেশের শ্রেষ্ঠ নদী ইরাবতী, ইহা উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত গোটা ব্রহ্মদেশকে লম্বালম্বিভাবে অতিক্রম করিয়া মার্ত্তাবান উপসাগরে পড়িয়াছে। ভামো হইতে ইহা যেন ১৪টি বাহু দিয়া সমুদ্রকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে—এত বাহু-পথে সমুদ্রের সঙ্গে আর কোন নদী মিশে নাই। ইরাবতী ১৩০০ মাইল দীর্ঘ, এই দীর্ঘ পথের ৯০০ মাইল নৌ-চলাচলের যোগ্য। প্রোম হইতে ১২৫ মাইল উত্তরে ইরাবতীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে যথেষ্ট তৈলখনি আছে। সুতরাং জাপানীরা প্রোম হইয়া ইরাবতীর তীর ধরিয়া সমান্তরাল পথে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিবে। এজন্য প্রোমের রণক্ষেত্রকে ইরাবতীর রণক্ষেত্র বলিয়াও অভিহিত করা যায়। নৌকারোহী জাপসৈন্যগণ ইতিমধ্যেই থারাবড্ডি হইতে ২০ মাইল উত্তরে পৌঁছিয়াছে। তথায় তাহারা "বিশ্বাসঘাতক" বর্ম্মীদের সহিত যোগ স্থাপন করিয়াছে। পরস্পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হইয়া ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ করার জন্যই তাহারা এভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং বর্ম্মীদের সাহায্য লইতেছে। তাহাদের মূলবাহিনী এখনও থারাবড্ডির প্রায় ৪৫ মাইল দক্ষিণে রহিয়াছে এবং উত্তর দিকে আরও ৬০ মাইল অগ্রসর না হইলে বৃটিশ মূলবাহিনীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে না। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জাপানীরা ইরাবতী নদীপথে যত বেশী দূর সম্ভব অগ্রসর হইতে চাহে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা অধিকৃত এলাকার নৌকাগুলি হস্তগত করিয়াছে। প্রত্যেকটি নৌকায় একশত লোক চড়িতে পারে, এরূপ বহু নৌকা আছে। ঐ সকল নৌকাযোগে রাত্রিকালে বহু সৈন্য নামাইয়া দেওয়া হইবে এবং নদী-তীর ও রেঙ্গুণ-প্রোম পথের মাঝে থাকিয়া তাহারা ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্য চলাচলে বাধা সৃষ্টি করিবে। *

পরবর্ত্তীকালে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উপরে যে সমস্ত অনুমানিক গবেষণা দেওয়া হইল, সেগুলির অধিকাংশই ফলিয়া গিয়াছে।

---

* ব্রহ্ম যুদ্ধের পর বাঙ্গলার কোন কোন নদীবহুল অঞ্চল হইতে গবর্ণমেণ্ট এই কারণেই নৌকাগুলি সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন কিম্বা নিজেদের দখলে আনিয়া রাখিয়াছিলেন।



অনিল মুখার্জী অঙ্কিত

প্রোম ও টাঙ্গুর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত ও অরণ্যবহুল অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া জাপানী সৈন্যেরা যেমন পিপীলিকার মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বৃটিশ বাহিনীকে ঘিরিয়া ধরিতে চাহিয়াছে, তেমনই বড় বড় বাঁধানো সড়ক দিয়াও তাহারা অগ্রসর হইয়াছে। ইরাবতী বা প্রোম রণক্ষেত্রে তাহারা প্যারাসুট সৈন্যও নামাইয়াছে। এই সমস্ত প্যারাসুট সৈন্য "বিশ্বাসঘাতক" বর্ম্মীদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। প্রোমের সড়ক এবং ইরাবতী নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীর—এই তিন দিক দিয়া জাপ সৈন্যেরা প্রোমকে আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়াই অগ্রসর হইয়াছে। টাঙ্গু রক্ষাকারী জেনারেল ষ্টিলওয়েলের অধীন চীনাবাহিনী এবং ইরাবতী রণাঙ্গনে জেনারেল আলেকজেণ্ডারের অধীন ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনী—এই উভয় দলের পারস্পরিক যোগাযোগ নষ্ট করিবার জন্যও জাপবাহিনী কৌশল-পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছে। টাঙ্গু-মান্দালয় পথ এবং টাঙ্গু ও প্রোমের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া তাহারা মিত্রবাহিনীর যোগসূত্র ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিল। ইহা ছাড়া মিত্রপক্ষ কতকগুলি অনিবার্য্য অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট রাস্তাঘাট তাহাদের হাতছাড়া হওয়ায় যোগাযোগ ও রসদ সরবরাহের ব্যবস্থায় নিদারুণ বিঘ্ন দেখা দেয়। বিশেষভাবে চীনা সৈন্যদের রসদ জোগানো একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। জাপানীরা দেশীয় লোকদের সাহায্যও পাইয়াছে এবং তাহারা দীর্ঘ ইরাবতী ও সিতাং নদীর উপত্যকা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। পক্ষান্তরে মিত্রবাহিনীকে পর্ব্বতের দিকে পিঠ রাখিয়া অগ্রসর হইতে ও লড়াই করিতে হইয়াছে। তথায় যে রাস্তা ছিল, তাহা পায়ে হাঁটিয়া চলিবার উপযোগী, এই ধরণের রাস্তায় যানবাহন চালনা একান্ত কঠিন ছিল। যেখানে রাস্তাঘাট, রসদ ও যোগাযোগ রক্ষা একটা সুকঠিন সমস্যা, সেখানে যুদ্ধ চালনা যে দুঃসাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণেই টাঙ্গু এবং প্রোম দ্রুত হাতছাড়া হইয়া গেল—খুব বড় রকমের যুদ্ধ ইহার জন্য প্রয়োজন হয় নাই।

ব্রহ্মদেশে জাপানীরা ঠিক কত সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত-রূপে জানা যায় নাই। তবে, অনুমান এই যে, তাহারা ব্রহ্ম-শ্যাম সীমান্তে এক ডিভিসন (এই দলে কিছু কিছু শ্যাম দেশীয় সৈন্যও ছিল), সিতাং নদী অঞ্চলে এক ডিভিসন, ইরাবতী অঞ্চলে এক ডিভিসন এবং মৌলমেনে রিজার্ভ বা মজুত এক ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল। বোধ হয় মোট ১ লক্ষ সৈন্য হইবে। এই সংখ্যাটা নিশ্চয়ই সামান্য নহে।

—২—

টাঙ্গু-প্রোম, আকিয়াব-আন্দামান

১লা এপ্রিল '৪২।

ফেব্রুয়ারী মাসে মৌলমেন ও মার্ত্তাবান দখলের পর মার্চ্চ মাসে জাপানীরা দক্ষিণ ব্রহ্মের গোটা অংশ দখল করিয়া এক্ষণে এপ্রিল মাসে উত্তর ব্রহ্ম অভিমুখে অভিযান করিতেছে। জাপানীরা সম্ভবতঃ বর্ষা নামিবার আগেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মদেশ দখল করিতে চাহে। মালয় অভিযানের সময় তাহারা দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্মের শেষাংশে ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট ও টেনাসেরিম বিভাগ দখল করিয়াছিল। তারপর সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়া তাহারা একই সঙ্গে রেঙ্গুণ ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের সংগ্রাম শেষ করে। সালুইন ও সিতাং নদীর যুদ্ধশেষে জাপানীরা পেগু ও রেঙ্গুণ কাড়িয়া লইয়াছে। থারাবড্ডি ও বেসিনও তাহাদের হাতে গিয়াছে। এক্ষণে প্রোম ও টাঙ্গুও তাহারা অধিকার করিল। এক কথায় নিম্ন ও মধ্য ব্রহ্মের প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য স্থানই জাপানীরা কাড়িয়া লইয়াছে। ভালো ভালো রাস্তা, রেলপথ, নদীতট ও সমুদ্রতীর জাপানীদের দখলে গিয়াছে। ভবিষ্যতে যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে ইহা দ্বারা জাপানীরা যেমন লাভবান হইল, তেমনই চীনা, ভারতীয় ও বৃটিশ সম্মিলিত বাহিনীর বাধা-দানের পক্ষে অধিকতর অসুবিধার সৃষ্টি হইল। রণনীতি গায়ের জোরের উপর নির্ভর করে না। সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষে রেলপথ, রাস্তাঘাট, নদীতীর ইত্যাদি অবস্থানুসারে প্রচুর সহায়তা কিম্বা প্রচুর বিঘ্নের সৃষ্টি করে। ব্রহ্মদেশের ভৌগোলিক সংস্থান আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বোমারু বিমান এমন একটী পদার্থ যে, উহার নিকট প্রকৃতির অনেক বাধাই সহজ হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে জাপানীরা বিমানশক্তিতে শ্রেষ্ঠ। মার্কিণ ও বৃটিশ বিমানবহর বহু স্থানে জাপানীদিগকে কৃতিত্বের সহিত বাধা দিলেও জাপানীরা সংখ্যাশক্তির গুণে আকাশের আধিপত্য লাভ করিয়াছে। টাঙ্গুর রণক্ষেত্রে চীনা বাহিনীর পশ্চাদপসরণ বা বৃটিশ বাহিনীর সাফল্যের সহিত প্রোম ত্যাগ মালয়ের যুদ্ধের সেই একই

শোচনীয় কাহিনী উদ্ঘাটিত করিতেছে। মালয় ও সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় এবং অষ্ট্রেলিয়ার দিকে পরিপূর্ণ অভিযান আরম্ভ না হওয়ায় জাপানীরা ব্রহ্মদেশে বেশী পরিমাণ শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে পারিতেছে। তাহারা টাঙ্গু সহরকে কার্য্যতঃ বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল এবং নূতন নূতন বিমান আমদানী করিয়া চীনা বাহিনীর প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল।* তবে পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও টাঙ্গু দুর্গের চীনাবাহিনী পূর্ব্বদিকস্থ জাপানীদের দুর্ব্বল ব্যূহের উপর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং ৭ মাইল দূরবর্ত্তী মূল বাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। জাপানীরা উত্তর দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক ধরিয়া টাঙ্গু সহর ঘিরিয়া ধরে। পূর্ণ এক সপ্তাহকাল এখানে অবরোধ যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত জল, খাদ্যদ্রব্য ও গোলাগুলী ইত্যাদির অভাবে পড়িয়া চীনাবাহিনী টাঙ্গু ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। টাঙ্গু এবং প্রোম উভয় সহরই রাস্তা ও রেলপথের দিক দিয়া সমৃদ্ধ। সুতরাং এই দুই সহর হারাইবার ফলে মিত্রশক্তির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসংবাদ এই যে, কয়েক হাজার বর্ম্মী সৈন্য জাপানীদিগকে সাহায্য করিয়াছে। প্রকাশ যে, এই সমস্ত বর্ম্মী সৈন্য অগ্রসর হইয়া গিয়া মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে ঘিরিবার চেষ্টা করে। ব্রহ্মদেশের বাসিন্দারা ব্রহ্মের রাস্তাঘাটের সহিত স্বভাবতঃই সুপরিচিত। তাহারা জাপানীকে বাধা দেওয়ার বদলে সাহায্য করিতেছে—সমরনীতির দিক দিয়া এই সংবাদ মারাত্মক। এই সমস্ত পঞ্চমবাহিনী যদি আক্রমণকারী জাপানকে পথ দেখাইয়া দেয় এবং সামরিকভাবে পূর্ণ সহযোগিতা করিতে থাকে, তবে, দেশরক্ষার পক্ষে ইহার চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে ?

---

* ২৩ ও ২৪শে মার্চ্চ তারিখে টাঙ্গুর উপর প্রচণ্ড বিমানহানার পর আক্রমণ সুরু হয়। জাপানীরা ১২ বার বিমানহানা দিয়াছিল, ইহার মধ্যে ৬ বার ঘটিয়াছে টাঙ্গুর বিমান ঘাঁটির উপর। ২৫শে তারিখে ১ হাজার জাপসৈন্য বিমানঘাঁটি দখল করে এবং পরে একাধিক সৈন্য 'সাদা পোষাকে' বে-সামরিক লোকের ছদ্মবেশে চীনাদের পার্শ্বদেশে ঢুকিয়া পড়ে এবং টাঙ্গুর ২০ মাইল উত্তরে যাদেশী সহরটি দখল করে, পরদিন ইহারা বিতাড়িত হয় এবং 'সাদা পোষাকে'র সৈন্যেরা নিহত হয়। তারপর তিনদিন টাঙ্গুর চারিদিকে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। জাপানীরা ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেনের সাহায্যে চীনাদিগকে আক্রমণ ও পার্শ্ববেষ্টন করে। জাপানীরা সংখ্যায় দ্বিগুণ হইতে চারিগুণ ছিল। এখানে সঙ্গীন যুদ্ধও হইয়াছিল। ১লা এপ্রিল তারিখে চীনারা জাপ পরিবেষ্টনী হইতে উদ্ধারলাভ করে।

—Hutchinson's 'Quarterly Record of War', Vol. I0.

জাপানীরা মান্দালয় ও উত্তর ব্রহ্মের দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। স্থলপথে সৈন্য সংখ্যায় এবং আকাশপথে বিমান সংখ্যায় তাহাদের শ্রেষ্ঠতা নিঃসন্দেহে দুঃসংবাদ। তাহারা কেবল ব্রহ্মের সীমান্তেই আবদ্ধ থাকিতেছে না। সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া তাহারা আরও বহু দূরে—ভারতবর্ষের দিকেও হাত বাড়াইতেছে। জাপানীদের দ্বারা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিকার ভারতবর্ষের পক্ষে অকল্যাণকর। এই দ্বীপটি যেন তাহারা কতকটা নিঃশব্দে ও অতর্কিতে অধিকার করিয়াছে।* আন্দামান দ্বীপে কোন বড় রকমের নৌঘাঁটি নির্ম্মাণ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তবে, বিমান ও ক্ষুদ্র নৌবহরের পক্ষে বোধ হয় আশ্রয়স্থল তৈয়ার করা কঠিন নহে। বঙ্গোপসাগরের বুকের উপর এই দ্বীপের ঘাঁটি শত্রু কবলিত হওয়ায় ভারতবর্ষের জলপথ ও আকাশপথ অধিকতর বিপন্ন হইল। কলিকাতা হইতে পোর্ট ব্লেয়ারের দূরত্ব ৬৭৮ মাইল এবং রেঙ্গুণ ৭৮০ মাইল—ইহা জলপথের দৈর্ঘ্য। আকাশপথে এই দৈর্ঘ্য হ্রাস পাইলেও সোজা রেঙ্গুণ ও পোর্ট ব্লেয়ার হইতে কলিকাতায় বিমান হানা দেওয়া আদৌ সহজ নহে। কিন্তু সিঙ্গাপুর, পেনাং, মৌলমেন, রেঙ্গুণ, বেসিন ইত্যাদি প্রত্যেকটি সমুদ্রতীরস্থ বন্দর ও সহর জাপানীদের কবলে যাওয়ায় এবং জাপ নৌবহরের শক্তি প্রচুর পরিমাণে অটুট থাকায় জাপানের পক্ষে নৌ-অভিযানের আশঙ্কা আছে। নৌ-অভিযানের চেয়েও বেশী সম্ভাবনা রহিয়াছে নৌবহরের সহযোগী বিমানবহরের আক্রমণের। আন্দামান দ্বীপে জাপ নৌ-বহরের সহিত মার্কিণ বিমানবহরের সাফল্যপূর্ণ সংঘর্ষের সংবাদ সেই বিপদের বার্ত্তাই বহন করিয়া আনিতেছে। চট্টগ্রাম অঞ্চল দিয়াও বিপদের আশঙ্কা করা যাইতেছে। প্রোম জাপানীরা কাড়িয়া লইয়াছে, তাহারা ইরাবতীর তীর ধরিয়া উত্তর দিকস্থ তৈল ও কয়লা খনিসমূহের দিকে নিশ্চয়ই অগ্রসর হইবে। প্রোম ও মিনবু হইতে পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তর দিক দিয়া এবং সমুদ্রতীর ধরিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে বাঙ্গলার চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত। অবশ্য বিখ্যাত আরাকান গিরিমালা উত্তর ও দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া এই দিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বত ও অরণ্যের জন্য এই অঞ্চল দুর্গম এবং যে দুইটি প্রধান সড়ক পথ চলাচলের জন্য রহিয়াছে, তাহা কোন সামরিক অভিযানের পক্ষে যথেষ্ট কিনা আমরা জানি না। তবে, জাপ

* ১২ই মার্চ্চ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ আন্দামান পরিত্যাগ করেন।

সৈন্যেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া এই রাস্তা ধরিয়া হানা দিতে পারে কি না, তাহা একমাত্র সমর-কর্ত্তৃপক্ষ বলিতে পারেন। প্রোম ও মিনবু হইতে দুর্গম পথে ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া যদি জাপ সৈন্যেরা অগ্রসর হইতে চায়, তবে, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য জাপানীরা পূর্ব্বাহ্লে জলপথে আকিয়াব দখল করিতে পারে। আকিয়াব সম্পর্কেও চুংকিং হইতে দুঃসংবাদ আসিয়াছে। চুংকিংয়ের মতে আকিয়াব জাপানীদের হাতে গিয়াছে, তাহারা নৌ-বহরের সাহায্যে আক্রমণ করিয়াছিল এবং ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ারের সাহায্যে অবতরণ করিয়াছে।* যদিও আকিয়াব ব্রহ্মদেশের সীমানার মধ্যে তথাপি উহা বাঙ্গলা বা চট্টগ্রামের সীমান্তবর্ত্তী এবং বাঙ্গলাদেশের এত সন্নিকটে জাপানীদের উপস্থিতি নিশ্চয়ই কাহারও নিকট বাঞ্ছনীয় নহে।

ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম শেষ হইবার পূর্ব্বে জাপানীরা ভারতবর্ষের স্থলপথে অভিযান করিবে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। আকাশপথে এবং সম্ভবতঃ জলপথে তাহারা হুমকি দেখাইতে পারে। ভারতবর্ষ সোভিয়েট রাশিয়ার মত বিরাট দেশ। এই দেশে সহসা বহু সহস্র মাইল দূর হইতে প্রচুর সংখ্যক সৈন্য ও সমরোপকরণ জাপানীদের পক্ষে আমদানী করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবে, রেঙ্গুণ হইতে বোম্বাই ও করাচী পর্য্যন্ত সমগ্র জলপথের উপর জাপ নৌবহর কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষকে কতকটা অবরোধ বা blockade' এর অবস্থায় ফেলিতে পারে। এজন্য অবশ্যই প্রচুর নৌবলের প্রয়োজন, জাপানের পক্ষে এত নৌবহরের সমাবেশ আপাততঃ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তথাপি সমুদ্রপথে ইতস্ততঃ আক্রমণের উৎপাত বাড়িবার সম্ভাবনা।

---

* প্রথমে নয়াদিল্লী হইতে আকিয়াব দখলের সংবাদ অস্বীকার করা হয়। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে (৭ই মে) সেই সংবাদ সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে।

—৩—

ব্রহ্ম যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য

১০ই এপ্রিল, '৪২।

টাঙ্গু হইতে পশ্চাদপসরণের পর মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনী আরও উত্তর দিকে অপসরণে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা থিয়েমিও হইতে হটিয়া গিয়াছে। মিত্রশক্তির এই ক্রমাগত পশ্চাদপসরণের মূলে রহিয়াছে তাহাদের সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য। জাপানীরা মিত্রশক্তির তুলনায় অনেক বেশী সৈন্য, বিমান ও আনুষঙ্গিক সামরিক অস্ত্রের সমাবেশ করিতে পারিয়াছে। ফলে অল্প পরিমাণ শক্তি লইয়া মিত্রশক্তিবাহিনী জাপানীদিগকে সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। রণনীতির সাধারণ ধর্ম্মানুসারে ইহাই স্বাভাবিক যে, যাহারা আক্রমণ করে, তাহারা অনেক বেশী শক্তি লইয়া অগ্রসর হয়। প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক বেশী সৈন্য ও সমরাস্ত্রের সমাবেশ করিতে না পারিলে অধিকাংশ সেনাপতিই আক্রমণাত্মক অভিযানে বাহির হইতে চাহেন না। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও অনেক স্থলে ঘটিয়া থাকে। নেপোলিয়ান কোন কোন সময় অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াও বিস্ময়কর জয়লাভ করিয়াছেন। কিন্তু নেপোলিয়ানের মত প্রতিভা সামরিক ইতিহাসে কয়টি দেখা যায়? যেখানে প্রতিভার বদলে সাধারণ কৃতিত্বের প্রশ্ন সেখানে উভয় পক্ষের শক্তি অন্ততঃ সমান হওয়া প্রয়োজন। যদি এক পক্ষ সৈন্যে ও সমরাস্ত্রে হীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপর পক্ষের জয়লাভ বিস্ময়কর নহে। কিন্তু ব্রহ্ম যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য কেবল ইহারই মধ্যে নিবদ্ধ নহে। ব্রহ্মদেশের ভৌগোলিক অবস্থা এই যুদ্ধে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেনের এতখানি অগ্রগতির পূর্ব্বে সমর-নীতিবিদ্‌গণ যে কোন রণক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থা লইয়া যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করিতেন। নদী, পাহাড় ও জঙ্গল আত্মরক্ষার পক্ষে সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। অবশ্য নদী, পাহাড়, জঙ্গল ইত্যাদি বিঘ্নগুলিকে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করিতে পারাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় নহে। ইহার সঙ্গে উপযুক্ত সৈন্য ও সমরাস্ত্রের এবং সমরশক্তির যথোপযুক্ত বণ্টনের প্রয়োজন আছে। যদি

সেই বণ্টন ঠিক মত ও উপযুক্ত সংখ্যায় না হয়, তবে, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলের বা উচ্চতর নদীতীরের আড়ালে দাঁড়াইলে কি হইবে? একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়া বলা যাইতে পারে যে, মিত্রশক্তিবাহিনী সিতাং নদীর তীরে সুবিধাজনক স্থানে দণ্ডায়মান এবং তাহারা বাধাদানের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও বেশী নহে এবং বিমানশক্তিরও অভাব। অপরপক্ষে জাপানীরা সিতাং নদীর অপর তীরে অধিক সংখ্যক সৈন্য, কামান, বন্দুক ও এরোপ্লেন লইয়া উপস্থিত। এক্ষণে সিতাং নদী পার হইতে গিয়া জাপানীরা যদি অজস্র এরোপ্লেন হইতে নদীর অপর তীরে অপেক্ষমান মিত্রশক্তির উপর বোমা বর্ষণ করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কামানও গর্জ্জন করিতে থাকে, তাহা হইলে আত্মরক্ষাকারিগণ কতক্ষণ নদীতীরে বাধা দিতে পারিবে? সুতরাং কেবল নদী বা পাহাড় থাকিলেই চলিবে না। এই সমস্ত বিঘ্নকে যথোপযুক্ত সামরিক শক্তির দ্বারা কাজে লাগাইবার সুযোগ থাকা চাই।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে প্রথমেই চোখে পড়িবে নদীগুলি। সালুইন, বিলিন, সিতাং ও ইরাবতী—প্রধানতঃ এই নদীগুলিই ব্রহ্মযুদ্ধে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। এই নদীগুলির অবশ্য কয়েকটি শাখা আছে। পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, দক্ষিণ ব্রহ্মের সংগ্রামের সময় মিত্রশক্তিবাহিনী পর পর সালুইন, বিলিন ও সিতাং, এই তিনটি নদীতীর ধরিয়া জাপানীদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। একটি নদীতীর হইতে হটিবার পর তাহারা আর একটি নদীতীরে গিয়া ব্যূহ রচনা করিয়াছে। কিন্তু জাপানীরা শক্তির প্রাচুর্য্যে এবং আধুনিক রণকৌশলের infiltration বা অনুপ্রবেশ নীতির দ্বারা ক্রমাগত নানাস্থানে প্রতিপক্ষের ব্যূহগুলিকে বিদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। নদীগুলির মধ্যে ইরাবতী ও সালুইন অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অধিকাংশ বড় নদী ব্রহ্মদেশের উত্তর দক্ষিণ ভেদ করিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। কেবল যে নদীগুলিই উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি চলিয়া গিয়াছে, এমন নহে। যে কয়টি বড় রাস্তা ও রেলপথ রহিয়াছে, সেগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদীসমূহের সহিত যেন সমান্তরাল রেখায় উত্তর-দক্ষিণ অতিক্রম করিয়াছে। রাস্তা, রেলপথ ও নদী যেমন ব্রহ্মদেশে প্রচুর নহে, তেমনই এইগুলি পরস্পরকে কাটিয়া যায় নাই। রাশিয়ার মধ্য রণাঙ্গনে যেমন প্রচুর রেলপথ ও রাস্তা পরস্পরকে মাকড়সার জালের মত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ব্রহ্মদেশে তেমন নহে। রাস্তা, রেলপথ ও নদীর এই অভিনব বৈশিষ্ট্য

ব্রহ্মদেশে মিত্রশক্তির আত্মরক্ষায় প্রচুর বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। রণাঙ্গনগুলি একটানা দীর্ঘ হইয়াছে এবং সেই তুলনায় প্রস্থ অত্যন্ত সামান্য ছিল। আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রামের আত্মরক্ষার দিক হইতে ইহা একটা গুরুতর বাধা। কারণ, যাহাকে defence in depth বা গভীরতর ব্যূহের আত্মরক্ষা বলে, সেই রণকৌশলের সুযোগ পাওয়া যায় নাই। শত্রু যেখানে দ্রুত আক্রমণশীল, সেখানে সম্মুখে, দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে বহুবিস্তৃত ভূমি না থাকিলে ইচ্ছামত সৈন্যদলকে খেলানো যায় না। বরং বাধ্য হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সরু ও দীর্ঘ রেখা ধরিয়া পশ্চাতে হটিতে হয়। মিত্রশক্তিবাহিনীও ক্রমাগত এইভাবে পশ্চাতে হটিতেছে। আত্মরক্ষাকারিগণ যখন বর্ম্মা রোডের আড়াল ধরিয়া পিছু হটিয়াছে, আক্রমণকারিগণ তখন উহারই সমান্তরালবর্ত্তী রণাঙ্গনে অগ্রসর হইতেছে। রণনীতির পক্ষে ইহা গুরুতর।

এভাবে ব্রহ্ম রণক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে। ইংরাজ সেনাপতি জেনারেল আলেকজেণ্ডার ও মার্কিণ সেনাপতি জেনারেল ষ্টিলওয়েল—দুই রণক্ষেত্রের অধিনায়ক। মার্কিণ সেনাপতির অধীনে রহিয়াছে চীনা সৈন্যদল। সিতাংয়ের পর পেগু ও রেঙ্গুণ ছাড়িয়া জেনারেল আলেকজেণ্ডার শেষ পর্য্যন্ত প্রোম ত্যাগ করিয়া একেবারে ইরাবতীর তীর ধরিয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সালুইন ও সিতাংয়ের পর তিনি পশ্চাদপসরণের দিক পরিবর্ত্তন করিয়া সোজা উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। অপরপক্ষে মার্কিণ সেনাপতি জেনারেল ষ্টিলওয়েল চীনা সৈন্যদলসহ ছিলেন সিতাং নদীর ধারে, তিনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন। রেঙ্গুণ-মান্দালয় রেলপথ ইহারই সমান্তরাল রেখায় চলিয়া গিয়াছে। এখানে চীনা বাহিনী টাঙ্গু সহরে যথেষ্ট বাধা দেওয়া সত্ত্বেও আরও উত্তরে সরিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, আলেকজেণ্ডার ও ষ্টিলওয়েল, এই দুই সেনাপতি মোটামুটি ইরাবতী ও সিতাং—এই দুইদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা পরস্পর হইতে ৬০ মাইল ব্যবধানে আছেন এবং এই ৬০ মাইলের মধ্যে পাহাড় ও জঙ্গল রহিয়াছে যথেষ্ট। এখন পর্য্যন্ত তাঁহারা রেলপথ ও রাস্তার এবং পশ্চাদ্ভাগে বিমানঘাঁটিরও সুযোগ পাইতেছেন। কিন্তু জাপানীরা এই অবস্থায় সিতাং ও ইরাবতীর উপত্যকা ধরিয়া ক্রমশঃ উত্তর দিকে অগ্রসর হইবে এবং এভাবেই মিত্রশক্তির দুই বাহিনীকে নষ্ট করিতে চাহিবে।

—৪—

লাসিওর পতন

৩০শে এপ্রিল '৪২।

প্রোম ও টাঙ্গু অধিকারের পর জাপানীরা প্রোমের ১২০ মাইল উত্তরে ইনানজিংয়ের তৈলখনির দিকে অভিযান করে। এখানেও কয়েকদিন যুদ্ধের পর বৃটিশ ব্যূহ পার্শ্বদেশ হইতে বিপন্ন হয়। তখন ইনানজিয়াংয়ের সমস্ত কলকারখানা, তৈল-শোধনাগার ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া বৃটিশবাহিনী আরও উত্তরে সম্ভবতঃ চিন্দুইন নদীর দিকে সরিয়া যায়। এদিকে যে জাপ সৈন্যেরা শান রাজ্যের মধ্য দিয়া আক্রমণ চালাইতেছিল, তাহারা লাসিও দখল করিয়া লয়। চীনা সৈন্যেরা লাসিও ত্যাগ করিয়া নূতন ঘাঁটিতে আসিয়া দাঁড়ায়।

এই সংবাদ নিরতিশয় দুঃখজনক। চীন-ব্রহ্ম সড়কের মর্ম্মকেন্দ্র লাসিও। বহু অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রমে এই রাস্তা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং একমাত্র এই রাস্তা ধরিয়াই চীন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে সামরিক যোগাযোগ রক্ষা করা হইতেছিল। মিত্রশক্তির সহিত চীনা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ও সহযোগিতা লাসিওর পথ ধরিয়া অনুসৃত হইতেছিল। গত তিন চার বৎসরকাল চীন-ব্রহ্ম রাস্তা সম্পর্কে বহু নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। বৃটেন কর্ত্তৃক চীনকে সাহায্যদান জাপানী কর্ত্তাদের কোনকালেই মনঃপূত ছিল না। তাঁহারা এই রাস্তা বন্ধের জন্য বারম্বার চাপ দিয়াছিলেন এবং একদা চেম্বারলেনের গবর্ণমেণ্ট দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে জাপানী ক্রোধ শান্ত করিবার আশায় কিছুকালের জন্য ইহা বন্ধ করিয়াও দিয়াছিলেন। সুতরাং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের পতন ব্রহ্ম-সংগ্রামের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। লাসিওর পতনের দ্বারা মান্দালয়ের আত্মরক্ষার পথেও গুরুতর বিঘ্ন দেখা দিল। মান্দালয় হইতে লাসিওর দূরত্ব ১২০ মাইল এবং ইহা রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। যে চীনা বাহিনী বীরত্বের সহিত উত্তর ব্রহ্মের সংগ্রামে যুঝিতেছিল, লাসিও ও মান্দালয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবার ফলে সামরিক দিক হইতে তাহারা বেকায়দায় পড়িবে। জাপানীরা তাহাদের নূতন অভিযানে এই কৌশলটি খাটাইতে চাহিয়াছিল। ইরাবতী, সিতাং ও সালুইন ইত্যাদি নদী-উপত্যকা ধরিয়া তাহারা যে যুদ্ধ চালাইতেছে

উহার লক্ষ্য প্রোম ও মান্দালয় এবং মান্দালয় ও লাসিওর মধ্যে সংযোগ নষ্ট করিয়া দেওয়া। সোজা কথায় প্রোম-মান্দালয় পথে বৃটিশ বাহিনীর এবং মান্দালয়-লাসিওর পথে চীনা বাহিনীর সহিত কিম্বা জেনারেল আলেক-জাণ্ডারের ও জেনারেল ষ্টিলওয়েলের পারস্পরিক যোগাযোগ বিনষ্ট করা। বিভিন্ন রণক্ষেত্রে সংযোগ রক্ষা করিয়া যাহারা আত্মরক্ষা করিতেছে, যদি তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়, তবে স্বভাবতঃই আক্রমণকারীর পক্ষে রণনৈতিক সুবিধা দেখা দিবে। কারণ, আত্মরক্ষাকারিগণ তখন নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং যে ঐক্যবদ্ধ সংহতশক্তি আক্রমণকারীগণকে বাধা দিতেছিল তাহাও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এই কারণেই চুংকিং ও লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল ব্রহ্ম-সংগ্রামের সঙ্কটের উপর জোর দিয়াছেন এবং অবস্থা যে নিতান্ত মারাত্মক, তাহা তাঁহারা গোপন করেন নাই।

জাপানীরা শান রাজ্যের ভিতর দিয়া পূর্ব্বদিক হইতে লাসিওর দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই অভিযানে বাধা দেওয়ার জন্য চীনা সৈন্যরা টাউংজি পুনরায় দখল করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছিল। টাউংজি দখল চীনাদের পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল। জাপানীরা যখন উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন চীনারা দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া জাপবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ ও বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যদি এই কৌশল শেষ পর্য্যন্ত সফল হইত, তাহা হইলে জাপানীরা এত দ্রুত লাসিওতে পৌঁছিতে পারিত না। চীনারা লাসিওর বিপদ বুঝিতে পারিয়া উহার দক্ষিণ দিকস্থ সমস্ত রাস্তা ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। তাহারা টাউংজি পুনরায় দখল করিয়া জাপানীদের পশ্চাদ্ভাগ বিপন্ন করিবার জন্য লয়লেম অভিমুখে অগ্রসর হইতে-ছিল। জাপানীরা লয়লেম হইতে তিনটি বিভিন্ন বাহিনীর সাহায্যে আক্রমণ চালাইয়াছে। গবেষকদের অভিমত এই যে, যদি এই সময় প্রচুর বৃষ্টি নামিত, তবে রাস্তাঘাটের যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থার দিক হইতে জাপানীরা বেকায়দায় পড়িত। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে চীনাগণ কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট-গুলি জাপানীরা বোধ হয় মেরামতের সুযোগ পাইয়াছে। প্রকাশ যে, প্রচুর কামান ও বিমানের গোলা ও বোমা বর্ষণের আড়াল ধরিয়াই জাপবাহিনী লাসিওর দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং প্রত্যহ নূতন নূতন সৈন্যদল ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিয়াছে। এই যুদ্ধে জাপানীরা প্রচুরসংখ্যক যান্ত্রিকবাহিনীর

সাহায্য পাইয়াছে এবং ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিয়াছে। ইহাদের তুলনায় মিত্র-পক্ষের অস্ত্রশক্তি ও সৈন্যশক্তি যে কম ছিল, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। জাপানীরা যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে মান্দালয়ের বিপদ বৃদ্ধি পাইল। কারণ প্রোম-মান্দালয় ও রেঙ্গুণ-মান্দালয় পথ ধরিয়া জাপানীরা যেমন চাপ দিবে, তেমনই লাসিও হইতে মান্দালয়ের উপর পশ্চাদ্ভাগ দিয়াও আক্রমণের চেষ্টা করিবে। এই তিন দিকের চাপ মান্দালয়ের পক্ষে স্বভাবতঃই সঙ্কটজনক হইবে। জাপানীরা সম্ভবতঃ মে মাসের মধ্যেই উত্তর ব্রহ্মের সংগ্রাম শেষ করিতে চাহে। কারণ ইহার পর বর্ষাকাল সুরু হইবে। মেঘ, বৃষ্টি ও বাতাসের জন্য বিমানবহরের কার্য্যকলাপ যেমন বাধাগ্রস্ত হইবে, তেমনই রাস্তাঘাট ইত্যাদিও পদাতিক বা যান্ত্রিকবাহিনীর পক্ষে ক্লেশকর হইবে। দক্ষিণ ব্রহ্ম জাপানীদের হাতের মুঠায় যাওয়ায় এবং উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি নদীতীর ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে থাকায় আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিয়াছে। ইহা ছাড়া রেঙ্গুণ, প্রোম, বেসিন, মৌলমেন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নদীতীরস্থ বন্দরগুলির পতন ঘটায় জাপানীদের সরবরাহ ব্যবস্থায় সুবিধা হইয়াছে। ইতিমধ্যে জাপানীরা কিছুকাল নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু সেই নিষ্ক্রিয়তা সম্ভবতঃ উত্তর ব্রহ্ম অভিযানের উদ্যোগ-পর্ব্ব ছিল। লাসিওতে তাহাদের অভিযান শেষ হইয়া গেলে মান্দালয় অভিমুখে জাপানীদের চাপ নিশ্চয় প্রবলরূপে বৃদ্ধি পাইবে। এই দুই সহরের উপর জাপানীরা ইতিপূর্ব্বেই নিদারুণ বোমারু আক্রমণ চালাইয়া অগ্নিদগ্ধ করিয়াছে।

যদি মে মাসের মধ্যেই জাপানীদের উত্তর ব্রহ্ম অভিযান শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ ও চীন কি অবস্থায় পড়িবে? চীনা সামরিক মুখপাত্রগণ অবশ্যই দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, তাঁহারা জাপানীদের বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিবেন। কিন্তু শ্যাম, ইন্দোচীন ও ব্রহ্মদেশে জাপ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে পর চীন কি ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে না? ইহার পর ভারতবর্ষ কি স্থলপথে বা জলপথে নিরাপদ? অবশ্য মে মাসের পর মেঘ, বৃষ্টি ও ঝড় দেখা দিবে এবং তারপর তিন মাস প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের জন্য দূর দেশের সামরিক অভিযান বিঘ্নসঙ্কুল হইবে। যদি এই তিন মাস সময় পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার আয়োজন নিশ্চয়ই আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী

হইবে। ব্রহ্মদেশে মিত্রশক্তির দুর্ভাগ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ এই যে, পূর্ব্ব হইতে সামরিক আয়োজন ব্যাপক ও দৃঢ় হয় নাই এবং ব্রহ্মের জনসাধারণের সহিত সরকারী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে, ব্রহ্মের জনসাধারণ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে নাই। রাজনৈতিক অসন্তোষ রণনৈতিক সমস্যাকে জটিল ও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ফিলিপাইনের জনগণ জাপ আক্রমণ প্রতিরোধে যতটা সাহায্য করিয়াছে এবং বাতান উপদ্বীপে জাপানীদিগকে তিন মাসকাল যে বীরত্ব ও দৃঢ়তার সহিত বাধা দেওয়া হইয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মদেশে তেমন হইতে পারে নাই। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলা, শাসন কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য এবং বৃটেনে চার্চ্চিল মন্ত্রিসভার অদূরদর্শী নীতি ব্রহ্ম রণাঙ্গনে যথেষ্ট ক্ষতি ও দুর্ব্বিপাকের কারণ হইয়াছে। অতএব কেবল সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রসজ্জার ঘাটতি লইয়া আপশোষ করিয়া লাভ নাই।

—৫—

মান্দালয় পরিত্যাগ

২রা মে '৪২।

লাসিওর পতনের পর মান্দালয়ের অবস্থা যে কাহিল হইবে, তাহা আর অজ্ঞাত ছিল না। জাপানীরা যেভাবে লাসিও-মান্দালয় রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া লাসিও কাড়িয়া লইয়াছে এবং তারপর যেরূপ দ্রুত মান্দালয়ের দিকে গিয়াছে, তাহা তাহাদের রণচাতুর্য্যের পরিচায়ক হইলেও বিস্ময়ের নহে। কারণ, একদিকে লাসিও বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং অন্যদিকে ইরাবতী নদীর উপত্যকা ও রেঙ্গুণ-মান্দালয় পথ ধরিয়া জাপানীরা মান্দালয়ের উপর যেভাবে চাপ দেওয়ার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের লক্ষ্যসিদ্ধি অত্যন্ত সহজ ছিল। আত্মরক্ষার পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও বড় রকমের ভাঙ্গন ধরিলে সেই বৃহৎ ছিদ্র ধরিয়া আক্রমণকারী অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া বাকি ব্যূহগুলিকে অপেক্ষাকৃত সহজে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। এজন্যই লাসিওর পতনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মান্দালয়ও মিত্রশক্তিবাহিনী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। রেঙ্গুণের পর মান্দালয়ই ব্রহ্মদেশের শ্রেষ্ঠ নগর এবং ইহা খাস বর্ম্মীদের সহর। রেঙ্গুণে ছত্রিশ জাতির বাস, উহাকে একমাত্র বর্ম্মীদের সহর বলা চলে না।

মান্দালয় উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী ছিল, ইহা অপেক্ষাকৃত পুরাণো এবং উত্তর ব্রহ্মের নৃপতিগণের ইহা প্রধান নগর ছিল। রাজদরবারের জাঁকজমক ইহার গর্ব্ব ছিল। বর্ম্মীরা সাধারণতঃই বিলাসী, উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্রের বেশভূষা তাঁহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এজন্য মান্দালয়ে দেশীয় রেশমের ব্যবসায় এককালে যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর ব্রহ্ম ইংরাজের দখলে যায়, আর আজ তাহা জাপানীরা কাড়িয়া লইল! প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের দ্বারা মান্দালয় ইতিপূর্ব্বেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। মান্দালয়ের পর উত্তর ব্রহ্মের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সহর ভামো বাকি রহিল। ইহা চীন সীমান্ত হইতে মাত্র ২০ মাইল দূরে।

মান্দালয়কে আমরা বর্ত্তমানে উত্তর ব্রহ্মের জাপানী অগ্রগতির প্রধান ভিত্তিভূমি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এই সহর জাপানীদের হাতে যাওয়ায় ইঙ্গ-ভারতীয় ও চীনবাহিনীগণ যথেষ্ট বেকায়দায় পড়িবে। কাহারও কাহারও অনুমান যে, মিত্রপক্ষের সৈন্যরা হয়তো ভারত সীমান্তের দিকে পশ্চাদপসরণ করিবে। আবার 'রয়টারে'র মতে বৃটিশবাহিনীর অবস্থা গুরুতর। কারণ, জাপানীরা মান্দালয় হইতে ভামোর দিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইবে এবং তাহার ফলে বৃটিশবাহিনীর বাম পার্শ্ব বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে। অপর পক্ষে তাহারা ইরাবতী নদী পার হইয়া এবং কিঞ্চিৎ ঘুরিয়া গিয়া বৃটিশ বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বও বিপন্ন করিতে পারে। মানচিত্রের দিকে তাকাইলে বুঝা যাইবে যে, মান্দালয় হইতে বামে ও দক্ষিণে দুইটি জাপানী বাহু ভামো সহরে চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের নিকট মিলিত হইতে চাহিতেছে। যদি বৃটিশবাহিনী মান্দালয়ের অদূরবর্ত্তী ইরাবতীর তীরে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে জাপানীরা উহার দুইদিকে বাহু বাড়াইয়া এই বাহিনীকে বেষ্টন করিতে চাহিবে। এই অবস্থাটা সামরিক দিক হইতে নিশ্চয়ই গুরুত্বব্যঞ্জক। এই অবস্থায় বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদল গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করিবে কিনা, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, এই বেষ্টনী ভাঙ্গিতে না পারিলে মিত্রবাহিনীর পক্ষে উদ্বেগজনক সমস্যা দেখা দিবে। মান্দালয় ও লাসিওর পতনের পর রণকৌশলের আর একটি চমৎকার অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। জাপানীরা শান রাজ্য ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এদিকে চীনা সৈন্যেরা দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া জাপানীদের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিল। চীনা সৈন্যেরা এখনও দক্ষিণ দিকের সেই টাউংজিতে অবস্থান করিতেছে।

লয়লেম ও টাউংজির মধ্যে জাপানীদের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছে এবং চীনারা টাউংজি দখল করিয়া রাখিয়াছে। মান্দালয় হইতে সোজা দক্ষিণে থাজী এবং থাজী হইতে পূর্ব্ব দিকে টাউংজি। যদি চীনারা টাউংজিতে তিষ্ঠিতে পারে এবং যদি প্রভূত শক্তি লইয়া প্রচণ্ডবেগে জাপানীদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, তাহা হইলে রণনীতির দিক হইতে অত্যন্ত কৌতূহল-জনক অবস্থার সৃষ্টি হইবে। কারণ, চীনারা এখানে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ চালাইতে পারিলে উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মের জাপ সৈন্যদলের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যাইবে। ভৌগোলিক অবস্থার জন্য এই অঞ্চলে স্বাভাবিক কারণেই যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার। পদাতিক ও যান্ত্রিক, উভয় বাহিনীর পক্ষে রসদ ও পেট্রোলের দরকার। চীনারা যদি এখানে কৃতিত্বের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া দিতে এবং এই ঘাঁটি আগলাইয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে জাপানীরা বেকায়দায় পড়িবে। অর্থাৎ মিত্রবাহিনী মান্দালয়ের উত্তরে যে ধরণের সমস্যায় পড়িয়াছে, জাপবাহিনী এই দক্ষিণবর্ত্তী অঞ্চলে তেমন সমস্যায় পড়িতে পারে। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ইহা উভয় পক্ষের সমর-শক্তির উপর নির্ভর করিবে।

উত্তর ব্রহ্মের মান্দালয়কে ভিত্তি করিয়া জাপানী বাহিনী যে কোন তিন দিকে অগ্রসর হইতে পারে। লাসিওর পথ ধরিয়া চীনের দিকে—চীন ও ব্রহ্মের সীমানায় যে সমস্ত সহর আছে, একে একে সেগুলি তাহারা আক্রমণ করিতে পারে। মান্দালয় হইতে মিচিনা পর্য্যন্ত রেলপথ গিয়াছে, সেই রেলপথ ও ইরাবতীর ধার ধরিয়া ফোর্ট হ্যারিসন; মিচিনা ও ভামো পর্য্যন্ত জাপানীরা হয়তো অগ্রসর হইবে। খুব সম্ভবতঃ তাহারা চীনকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ব্রহ্ম-চীন সীমান্তের এই গোটা অংশটাই দখল করিবে। ইহা ছাড়া তাহারা মিচিনার পশ্চিমে মগাউং হইতে মেইংকোয়াং হইয়া একেবারে আসামের সীমানা, অর্থাৎ তিনসুকিয়া, ডিগবয় ইত্যাদির দিকে যাইতে পারে কিম্বা তাহারা চিন্দুইন নদীর তীর ধরিয়া মণিপুরের দিকেও যাইতে পারে। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ হইতে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী যেপথ ধরিয়া মণিপুরের ইম্ফল পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, জাপানীরা অতঃপর সেদিকেও নজর দিতে পারে। অবশ্য ইহা অনুমানের কথা। তবে, কার্য্যতঃ তাহারা লাসিও অতিক্রম করিয়া চীন-ব্রহ্ম রাস্তার ২৫ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহারা যে চীন ও ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, ভারতবর্ষের

দিকে অবিলম্বে অভিযান করিবে কি না—জলপথে চট্টগ্রাম বা স্থলপথে আসামের দিকে যাইবে কি না, তাহা বলা শক্ত। আরাকান হইতে বোমা-বর্ষণের সংবাদ আসিয়াছে। সুতরাং চট্টগ্রাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত বোধ করিবার কারণ নাই। কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে ভরসা দেওয়া হইয়াছে যে, জাপানীরা ব্রহ্মের নানাস্থানে অগ্রসর হইলেও তাহারা সামরিক দিক হইতে মূল্যবান কোন সম্পদ পায় নাই। সড়ক ও সেতু ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। পোড়া মাটির নীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং মধ্যব্রহ্মের পশ্চিম অঞ্চলের সমস্ত তৈলখনির সাজসরঞ্জাম ও কারখানা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পশ্চিম অঞ্চলের খনিগুলি হইতে বার্ষিক ১০ লক্ষ গ্যালন তৈল উৎপন্ন হইত। এগুলি যাহাতে শত্রুর হাতে না পড়ে, তেমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে একথা সত্য যে, এই সমস্ত খনি নষ্ট হওয়া মিত্রশক্তির পক্ষেও ক্ষতিজনক, যদিও তাহাদের পেট্রোলের কোন অভাব নাই। উত্তর ব্রহ্মের যুদ্ধ ক্রমশঃ শেষ হইয়া আসিতেছে এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের ভাগ্যও ক্রমশঃ অন্ধকার হইতেছে।

—৬—

মিত্রবাহিনীর প্রত্যাবর্ত্তন

মে, '৪২।

[লাসিও ও মান্দালয়ের পতনের পর ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। ইহার পরেও যুদ্ধ চালাইতে গেলে জেনারেল আলেকজান্দার ও জেনারেল ষ্টিলওয়েল অত্যন্ত বিপদে পড়িতেন, এমন কি জাপানীদের দ্বারা তাঁহাদের ঘেরাও হওয়ারও একান্ত সম্ভাবনা ছিল এবং জাপানীরা তেমন চেষ্টাও করিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে আমরা মোটামুটি জাপানী অভিযানের নক্সা দিয়াছি। কিন্তু যুদ্ধ যখন চলিতে থাকে, তখন সমস্ত খবর পাওয়া যায় না, সুতরাং খুব স্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্টরূপে যুদ্ধের গতি বিশ্লেষণ কঠিন হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তীকালে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে মিত্রবাহিনীর প্রত্যাবর্ত্তনের ইতিহাস পুনরায় আলোচনা করা হইল।]

রেঙ্গুণের পতনের পর বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যেরা দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া গেল—একদল গেল দীর্ঘ সিতাং নদীর উপত্যকা ধরিয়া উত্তরদিকে চীনা

সৈন্যদের সহিত হাত মিলাইতে। চীনা সৈন্যেরা তখন নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছিল টাঙ্গু অভিমুখে। আর একদল গেল ইরাবতী নদীর উপত্যকা ধরিয়া উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে। অর্থাৎ মিত্র সৈন্যেরা রেঙ্গুণ হইতে ৬৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে মোটামুটি সিতাং তীরের সোয়েগাইন অঞ্চল হইতে থারাওয়াড্ডি পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। জাপানীরা ইতিমধ্যে পশ্চিম দিকে হাত বাড়াইয়া বেসিন সহর ও বিমানঘাঁটি কাড়িয়া লইল। কিন্তু তাহাদের আসল লক্ষ্য ছিল ইনানজিয়াং তৈল খনি এবং তাহাদের আশু লক্ষ্য ছিল সেই অঞ্চলে পৌছিবার দ্বারস্বরূপ ইরাবতীর তীরে প্রোম ও সিতাংয়ের তীরে টাঙ্গু দখল। টাঙ্গুতে জেনারেল ষ্টিলওয়েলের অধীন চীনা বাহিনীতে ৫নং ও ৬নং এই দুইটি আর্ম্মি ছিল, যোদ্ধা হিসাবে ইহারা অভিজ্ঞ ছিল বটে, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ইহাদের সামান্য ছিল।* কিন্তু ইহাদের সঙ্গে ইরাবতীর প্রোম রণক্ষেত্রের বৃটিশবাহিনীর মধ্যে দূরত্ব ছিল ৬০ মাইল। পেগু ইয়োমা পর্ব্বত ও অতি নিবিড় বনজঙ্গল এই ৬০ মাইল ধরিয়া বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এই দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া সামান্য পায়ে হাঁটা পথ দিয়াই যোগাযোগ রক্ষার জন্য নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং আধুনিক যুদ্ধের পক্ষে ইহা কত অসুবিধাজনক ছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এই অবস্থায় জেনারেল আলেকজান্দারের লক্ষ্য ছিল যতদূর সম্ভব জাপানীদের ক্ষতি সাধন করা এবং যতদূর সম্ভব ব্রহ্মদেশে আত্মরক্ষা করা। ইহার চেয়ে বেশী কোন রণনৈতিক লক্ষ্য তাঁহার থাকার কথা নহে। কেননা রেঙ্গুণের পতনের পর ব্রহ্মদেশে নূতন সৈন্য ও সামরিক সাজসরঞ্জাম আমদানির সম্ভাবনা ছিল না। এই বিপদ বুঝিতে পারিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট সরাসরি আসাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। ১৯৪১ সালে যখন ইন্দোচীন জাপানীদের আওতায় গেল, তখন জাপানী যুদ্ধ সম্পর্কে সজাগ থাকিলে এবং ভারত-ব্রহ্মের মধ্যে সামরিক রাস্তাঘাট তৈয়ার করিলে ব্রহ্মযুদ্ধে অনেকটা লাভবান হওয়া যাইত। কিন্তু রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে জেনারেল আলেকজান্দার ও ষ্টিলওয়েলের সৈন্যেরা পাহাড়ে, জঙ্গলে

---

* Hutchinson's 'Quarterly Record of the War'—Vol 10.

ও সঙ্কীর্ণ রাস্তার ধারে ধারে জাপানীদের দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার বিপদে পড়িয়াছিল। বর্ম্মীরা বৃটিশ বাহিনীকে তেমন কোন সাহায্য তো দেয়ই নাই, উপরন্তু 'স্বাধীন বর্ম্মী সৈন্যদল' গঠন দ্বারা জাপানীদের সহিত সহযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাহিনীর বিরুদ্ধতা করিয়াছে।

মার্চ্চমাসের শেষভাগে ইরাবতীর তীরে প্রোম সহরে বৃটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে এবং সিতাংয়ের তীরে টাঙ্গুতে চীনাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কৌশলপূর্ণ আক্রমণ চালাইয়া জাপানীরা জয়লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে মার্ত্তাবানের পর সিতাং নদীর সেতুমুখের দুর্দ্দান্ত লড়াইয়ের দ্বারা যেমন পেগু ও রেঙ্গুণের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এক্ষণে টাঙ্গুর যুদ্ধের দ্বারাও প্রোম ও উত্তরব্রহ্মের দ্বার খুলিয়া গেল। জাপানীরা টাঙ্গুর উত্তর দিকে অনুপ্রবেশ করায় ও ইরাবতীর তীরে সোয়েডাউংয়ে (প্রোমের দক্ষিণে) এবং পাউংদ'র উত্তরবর্ত্তী রেলপথে (প্রোম-রেঙ্গুণ রেলপথ) হাজির হওয়ায় প্রোমের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। পরদিন রাত্রিবেলা (১লা এপ্রিল) জাপানীরা প্রোমে প্রবল আক্রমণ করে এবং বৃটিশবাহিনী ২রা এপ্রিল সহরের উত্তরদিকে চলিয়া যায়। পশ্চাদপসরণের আগে তাহারা থায়েৎমিও ও এলানমিওর তৈল ও সিমেণ্টের কারখানা নষ্ট করিয়া দেয়। এই সময় উত্তরব্রহ্মে জাপানীরা প্রবল বোমা বর্ষণ সুরু করে—বোমা মারিয়া সহরের পর সহর তাহারা ধ্বংস করিয়া ফেলে। ৩রা এপ্রিল মান্দালয়ের উপর তাহারা যে বোমা বর্ষণ করে, তাহাতে সহরটি দগ্ধ হইয়া যায়। সেদিন বাতাস জোরে বহিতেছিল এবং মান্দালয়ের ঘরবাড়ী ছিল কাঠের। সুতরাং অগ্নিশিখা দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। বহু লোক এই বোমাবর্ষণে মারা যায়। ইরাবতী তীরের সৈন্যদের উপরও বোমা ও মেসিনগানের গুলী বর্ষিত হয়—আকাশপথে জাপানীরা একাধিপত্য লাভ করে।

প্রোমের পতনের পর ইরাবতী ও সিতাং, উভয় রণক্ষেত্রে সামান্য কয়েকদিন নিস্তব্ধতা ছিল। কিন্তু ১১ই এপ্রিল ইরাবতীর তীর হইতে ২০ মাইল দূরে টাউংভিঙ্গি নামক স্থানে জাপানীরা বৃটিশ বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য বোধহয় ছিল চীনাদের সহিত যোগাযোগ নষ্ট করা। কারণ, বৃটিশ বাহিনী তখন ঐ স্থানে চীনাদের দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করিতেছিল। রাস্তা ও রেলপথের জন্য উহার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। মান্দালয় হইতে যে শাখা-রেলপথ

পিনমানা (টাঙ্গু ও জেদাশির উত্তরে এবং সিতাংয়ের তীরে) হইয়া কায়ুকপাদাউং পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, টাউংভিঙ্গি সেই রেলপথেই অবস্থিত এবং মগউই হইতে উহা আবার সড়কের দ্বারা সংযুক্ত। জাপানীরা বোমারু সহ যে প্রবল আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে বৃটিশ বাহিনী কয়েকদিন মাটি আঁকড়াইয়া থাকিলেও তাহাদের ব্যূহতে ভাঙ্গন ধরে এবং মিয়িনগায়ুনে পৃষ্ঠ-রক্ষী সৈন্যদলের প্রবল যুদ্ধের পর ১৭ই এপ্রিল তাহারা মগউই ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে সরিয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে, তাহারা ইনানজিয়াংয়ের তৈল কূপ ধ্বংস করিয়া দেয়। কিন্তু জাপানীরা অত্যন্ত কৌশলী, তাহারা পলায়মান বৃটিশ বাহিনীকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র একদল জাপ সৈন্য পিনচাউং নদী পার হইয়া ইনানজিয়াং ও কায়ুকপদাউংয়ের মধ্যবর্ত্তী সড়কের দুইস্থানে রাস্তা রোধ করিয়া প্রতিবন্ধকতা (road blocks) সৃষ্টি করে। এই প্রতিবন্ধকতার মুখে উত্তর ব্রহ্ম-সংগ্রামের এক নিদারুণ যুদ্ধ হইয়াছিল। কেননা এই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিতে না পারিলে অনেক বৃটিশ সৈন্য জাপানীদের হাতে পড়িত। ১৮ই এপ্রিল ট্যাঙ্কসহ আক্রমণ করিয়া গ্লাউসেষ্টার সৈন্যেরা মিয়িনগায়ুন হইতে জাপদিগকে বিতাড়িত করে। এই স্থানটি ছিল ইনানজিয়াংয়ের উত্তরে তিনটি সড়কের মোড। এখানে জাপানীরা হটিল বটে, কিন্তু ইনানজিয়াংয়ে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং আট্‌কা পড়িল। এই অবরুদ্ধ বাহিনীর মধ্যে নানা শ্রেণীর ইংরাজ সৈন্য ছাড়া পাঞ্জাবী, শিখ, রাজপুত ও গুর্খা সৈন্যেরাও ছিল।* এই অবরোধের মধ্যে পড়িয়া সাম্রাজ্যবাহিনী প্রধানতঃ চীনাদের সাহায্যেই উদ্ধার লাভ করিয়াছিল। পিনচাউং নদীর উত্তরে নুতন চীনা সৈন্যেরা আসিয়া যোগ দিল এবং তাহারা ট্যাঙ্কের (বৃটিশ) সাহায্যে উত্তর দিক হইতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। এদিকে বৃটিশ সৈন্যেরা দক্ষিণ দিক হইতে প্রবল আক্রমণ করিল। দুই দিকের এই আক্রমণের চাপে পড়িয়া জাপানী 'চক্রব্যূহে' ভাঙ্গন ধরিল এবং অবরুদ্ধ সাম্রাজ্যসৈন্যেরা হাজারে হাজারে সেই 'ছিদ্র' দিয়া বাহির হইয়া আসিল—যদিও তাহাদের যানবাহন ও অনেক কামান পিছনে ফেলিয়া আসিতে হইল। চীনারা এতখানি শক্তি লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল যে,

---

* 'To Stalingrad and Alamien' পুস্তকে 'The withdrawal from Burma' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—'Strategious' কর্ত্তৃক লিখিত।

তাহারা সহরের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছিল এবং জাপানীদের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাহারা সহর দখল করিয়া রাখিয়াছিল।

চীনারা ইনানজিয়াংয়ের অবরুদ্ধ সাম্রাজ্যবাহিনীকে উদ্ধার করিল বটে, কিন্তু এদিকে তাহাদের নিজেদের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছিল। কারণ, জাপানীরা সিতাং নদী ধরিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছিল এবং পিনমনায় (মান্দালয়-রেঙ্গুণ রেলপথের একটি জংশন, যেখান হইতে একটি শাখা-লাইন কায়ুকপদাউংয়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে) যে চীনাবাহিনী ছিল, তাহার একাংশ ইনানজিয়াংয়ের অবরুদ্ধ মিত্রবাহিনীকে সাহায্যের জন্য পিনচাউং নদীতটে প্রেরিত হইয়াছিল। ফলে, পিনমনায় চীনারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং ২১শে এপ্রিল জাপানীরা এই সহরটি দখল করে। এই অবস্থায় টাউংভিঙ্গির মিত্রসৈন্যেরা উত্তর দিকে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয় (মগউই হইতে সাম্রাজ্যসৈন্যের পশ্চাদপসরণ সত্ত্বেও টাউংভিঙ্গিতে এতদিন তাহাদের একটা অংশ অপেক্ষা করিতেছিল)। কেননা, চীনাদের দক্ষিণ পার্শ্বরক্ষার আর কোন প্রশ্ন ছিল না। এদিকে সালুইন নদীতটের দিক হইতে জাপানীদের কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইল। পাঠকদের এখানে স্মরণে রাখা দরকার যে, ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ যুদ্ধই ঘটিয়াছে ইরাবতী, সিতাং ও সালুইন নদীর উপত্যকা ধরিয়া। কেননা, সমগ্র ব্রহ্মদেশে এই নদীগুলিই প্রাণপ্রবাহস্বরূপ—এই সুদীর্ঘ নদীগুলি উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত এবং যে সামান্য রাস্তা ও রেলপথ ব্রহ্মদেশে রহিয়াছে, সেগুলিও এই নদীগুলিকে অনুসরণ করিয়াছে। কারণ, ব্রহ্মের উল্লেখযোগ্য সহরগুলি এই সমস্ত নদীতীর কেন্দ্র করিয়াই প্রতিষ্ঠিত এবং উনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মদেশে যখন ইংরাজেরা প্রথম বণিকবেশে সেখানে গিয়া পরে রাজদণ্ডধারীরূপে আবির্ভূত হয়, তখন এই নদীগুলিই ছিল কাজ-কারবার, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও যোগাযোগের প্রধান অবলম্বন। ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশ অধিকারের সময় (লর্ড ডালহৌসি ও লর্ড ডাফরিণের বড়লাটগিরির আমলে) ইরাবতী নদী দিয়া অভিযান করিয়াছিল। এই ইরাবতীর তীর হইতেই ইংরাজের ষ্টীমারগুলিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল।* কিন্তু ইরাবতী ছাড়া অন্যান্য নদীগুলি দিয়া অভিযান চালানো সম্ভব নহে, কারণ সেগুলির অধিকাংশই নৌচলাচলের উপযোগী নহে।

---

* 'Annexation of Burma'—by Prof. A. C. Banerjee M. A., P. R. S. দ্রষ্টব্য।

চীনা সৈন্যেরা পিনমনা হইতে মায়োলাতে হটিল বটে, কিন্তু সালুইন নদী রণাঙ্গন হইতে জাপানীদের এক বাহু অকস্মাৎ চীনাদের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া লয়কাউয়ের উত্তরে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। চীনারা রাত্রিবেলা পলায়ন করিল এবং টাউংজির দক্ষিণে তাহাদের প্রধান বাহিনীর সহিত মিলিত হইল। চীনারা দাবী করিতেছে যে, জাপানীদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপানীদের উত্তরদিকে অগ্রগতি অবরুদ্ধ হইল না। তাহারা লয়কাউয়ের মত পার্শ্বদেশ ভেদ করিবার কৌশল দেখাইয়া ২৩শে এপ্রিল তারিখে টাউংজিও দখল করিয়া ফেলিল। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে জাপানীরা লয়কাউ হইতে টাউংজি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেল, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টারমধ্যে তাহারা ৭০ মাইল অতিক্রম করিল। কিভাবে তাহারা এই অসাধ্য সাধন করিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেননা, ইহা রেলপথে ঘটে নাই—রাস্তা অত্যন্ত খারাপ ও সঙ্কীর্ণ ছিল। অতঃপর যাহা ঘটিল, তাহা ইংরাজ সমর-ঐতিহাসিক ফিলিপ গ্রেভসের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Now came a sudden and disastrous change in the military situation. While the Japanese marked time in the Irrawaddy valley and continued their pressure on the Sittang and Salween fronts, a fairly strong and very mobile force seemingly from Siam delivered a sudden and heavy attack led by mechanized units and strongly supported by aircraft on the extreme left of the Chinese forces in the Shan States. The Chinese Sixth Army ill-led and surprised, was scattered, never to re-form, by the attack which aimed at the Burma Road. One of its next consequences was the evacuation of May-myo by the Civil Government of Burma who had repaired to that City after the burning of Mandalay. Inspite of poor roads and difficult country the Japanese outflanking thrust was pressed home with alarming speed. *

Hutchinson's 'Quarterly Record of the war'—Vol. 11.

"এই সময় সমগ্র সামরিক অবস্থার মধ্যে অতি আকস্মিক এবং অতি বিপর্য্যয়কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। জাপানীরা যখন ইরাবতীর উপত্যকায় সময়ের অপেক্ষা করিতেছিল এবং সিতাং ও সালুইন রণাঙ্গনে চাপ দিতেছিল, তখন বাহ্যতঃ শ্যামদেশ হইতে খুব একটি শক্তিশালী মোটরারূঢ় বাহিনী হঠাৎ আসিয়া হাজির হইল। ইহারা যান্ত্রিক সৈন্যদলের পরিচালনায় এবং প্রচুর বিমানবহরের সহযোগিতায় শান রাজ্যে অবস্থিত চীনাবাহিনীর দক্ষিণতম পার্শ্বদেশের উপর অতর্কিতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। ৬নং চীনা আর্ম্মি, যাহার পরিচালনায় ভুল হইয়াছিল, তাহারা এই অতর্কিত আক্রমণে বিহ্বল হইয়া একবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল এবং এই বাহিনী আর কখনও পুনর্গঠিত করা যায় নাই। অবশ্য এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বর্ম্মা রোড, কিন্তু ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ মেমিও ত্যাগ করিতে হইল। ব্রহ্মদেশের অ-সামরিক গভর্ণমেণ্ট (রেঙ্গুণের পর মান্দালয়ে) বিমান আক্রমণে মান্দালয় দগ্ধ হইবার পর মেমিওতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে মেমিও পর্য্যন্ত ছাড়িতে হইল। অত্যন্ত খারাপ রাস্তাঘাট এবং দুরধিগম্য দেশ সত্ত্বেও জাপানীদের পার্শ্বদেশ আক্রমণের আঘাত অত্যন্ত তীব্রতা ও মারাত্মক দ্রুততার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।"

জাপানী রণকৌশলের এই চমকপ্রদ অগ্রগতিতে লাসিওর দ্রুত পতন ঘটিল। ২৮শে এপ্রিল জাপানীরা লাসিওর উপর বোমারু আক্রমণ চালাইয়া সহরটি অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলিল এবং একটি দ্রুতগামী যান্ত্রিক জাপবাহিনী সীপতে মান্দালয়-লাসিও রোড বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। পরদিন তাহারা অপ্রত্যাশিতভাবে কামান, ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেনসহ একযোগে প্রবল আক্রমণ চালাইল এবং ৩০শে এপ্রিল তাহারা লাসিও দখল করিয়া ফেলিল। লাসিও হইতেই চীন-ব্রহ্ম সড়কের সুরু এবং এই পথ দিয়া উত্তর (য়ুনান) হইতে চীনাদের সাহায্যের জন্য কোন নুতন সৈন্য ও সরবরাহ আসিবার আগেই জাপানীরা লাসিওতে আসিয়া হাজির হইল। এদিকে সালুইন এবং সিতাং উপত্যকার চীনা সৈন্যেরাও চীন দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ঘটনাবলী অতি দ্রুত জাপানের অনুকূলেই গেল। ইয়েনইয়াংজঙ্গের তৈলখনি হইতে সুরু করিয়া মিত্রপক্ষের যে লাইন কায়ুকপদাউং, মিকটিলা, থাজি ও টাউংজি হইয়া এবং তারপর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে মঙ্‌কুং ও মঙ্‌সুংয়ের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই লাইন ভাঙ্গিয়া পড়িবার জো হইল। টাউংজির পূর্ব্বদিকে

সমস্ত কিছুই চুরমার হইয়া গিয়াছিল এবং জাপানীরা বর্ম্মা রোড হইতে অনায়াসেই মেমিও ও মান্দালয়ের উপর আঘাত হানিতে পারিত—কেবল অবস্থার দিক দিয়াই নহে, সংখ্যাশক্তির দিক দিয়াও জাপানীরা এই সময়ে প্রভূত শক্তিশালী হইয়া পড়িল। আরও দুই ডিভিসন জাপ সৈন্য আসিয়া ব্রহ্মদেশে যোগ দিল। ইহার মধ্যে ছিল সুবিখ্যাত ১৮নং ডিভিসন, যাহারা চীনদেশে প্রভূত অভিজ্ঞতা এবং মালয়ের যুদ্ধে প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই সময় অনুমান করা গেল যে, শান রাজ্যসহ ব্রহ্মদেশে জাপানীদের ৫ ডিভিসন সৈন্য রহিয়াছে। *

এদিকে চীনা সৈন্যেরা টাউংজিতে এবং বৃটিশ সৈন্যেরা ইরাবতীর রণক্ষেত্রে ঘোরতর বিপদে পড়িল। উভয় সৈন্যদলই বেষ্টিত ও বিচ্ছিন্ন হইবার জো হইল। সালুইনের পূর্ব্বতীরে ছত্রভঙ্গ ৬নং চীনা আর্ম্মির দলগুলি কোনও-ক্রমে টাউংজি হইতে উত্তর দিকে সরিয়া পড়িল এবং ৬ই মে তারিখে মেমিওতে পৌছিল। সেখানে জাপানীদের সহিত কিছুকাল সংঘর্ষের পর শেষ পর্য্যন্ত তাহারা য়ুনানের দিকে চলিয়া গেল। সিতাং উপত্যকার ৫নং চীনা আর্ম্মিও অনুরূপ বিপদে পড়িয়া উত্তর দিকে পশ্চাদপসরণ করিল। এক ডিভিসন চীনা সৈন্য মান্দালয়ে পৌছিল বটে, কিন্তু ১লা মে তারিখ তাহারা সহর ছাড়িতে বাধ্য হইল এবং ২রা মে তারিখ জাপানীরা মান্দালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিল সহরের কিছুই অবশিষ্ট নাই, সমস্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। 'ডোমেই এজেন্সির' (জাপানী) একজন সংবাদদাতা সহরের সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন, 'No one, not even a dog, could be seen in the streets'—'রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নাই, এমন কি একটা কুকুর পর্য্যন্ত নাই!' ব্রহ্ম রাজগণের প্রাচীন ঐশ্বর্য্যশালী মান্দালয়ের এই অবস্থা!

ইরাবতীর উপত্যকায় বৃটিশ সৈন্যদের অবস্থাও কাহিল হইয়া পড়িল। সোজা কথায় পলায়ন ছাড়া তাহাদের আর কোন উপায় রহিল না। যদি চিন্দুইন নদী ধরিয়া ভারতবর্ষের দিকে পলাইতে হয়, তাহা হইলে ইরাবতী ও ইয়েনইয়াংজঙ্গের তৈলখনি অঞ্চল অবিলম্বে ছাড়িতে হয়। সুতরাং বৃটিশবাহিনী তৈলখনি জ্বালাইয়া দিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিল—মান্দালয়ের পশ্চিমে ইরাবতীর বাঁকের দিকে তাহারা রওনা হইল। সেগায়েংর

* 'To Stalingrad and Alamien'—by Strategicus.

বিখ্যাত আভাব্রিজ* দিয়াই তাহাদের নদী পার হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু জাপানীরাও ছাড়িবার পাত্র নহে। মিক্‌টিলার পূব দিক ধরিয়া একদল জাপ সৈন্য চুপিচুপি হাজির হইল এবং তাহারা কায়ুকসীর উত্তরে আভা সেতু অতিক্রমকারী বৃটিশবাহিনীর পৃষ্ঠরক্ষীদিগকে আক্রমণ করিল। গুর্খা সৈন্যেরা ট্যাঙ্কের সাহায্যে ইহাদের আক্রমণ রোধ করিল এবং বৃটিশ সৈন্যেরা সেতু পার হইয়া গেল। তারপর গুর্খারাও ট্যাঙ্কসহ সেতু পার হইল। ইরাবতীর অপর তীরে পৌছিবার আগে তাহারা আভার এই বিখ্যাত সেতুটি ভাঙ্গিয়া দিল।

বৃটিশ বাহিনী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্যই ইরাবতী ত্যাগ করিয়া আসিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ পথ দিয়া তাহারা ভারতবর্ষে পৌছিবে? জেনারেল আলেকজান্দারের সম্মুখে দুইটি পথের সম্ভাবনা দেখা দিল—একটা হইতেছে অনেক উত্তরে মিচিনা অভিমুখে এবং আর একটা হইতেছে উত্তর-পশ্চিমে কালেওয়া হইয়া ও চিন্দুইন নদী পার হইয়া আসামে। কিন্তু কার্য্যতঃ পথ বাছাই করিরার কোন সুযোগ বা সময় রহিল না। একেতো আসন্ন বর্ষা ও দ্রুত অগ্রসরমান শত্রু ছিলই, তাহা ছাড়া মিচিনাগামী রেলপথ ব্যবহারের অযোগ্য ছিল এবং আর কোন রাস্তা ছিল না। আর একটা বিপদেরও কারণ ছিল; যে সমস্ত যান্ত্রিক জাপ সৈন্য লাসিও হইতে চীন-ব্রহ্ম সড়কে পৌছিয়াছিল, তাহারা সীপ হইতে ভামো হইয়া জেনারেল আলেকজান্দারের আগেই মিচিনায় পৌছিতে পারিত এবং জাপানীরা একবার মিচিনায় পৌছিলে বৃটিশ বাহিনীর পক্ষে ত্রাণ পাওয়া একান্ত শক্ত হইয়া পড়িত। কেবল তাহাই নহে, কালেওয়া ও চিন্দুইন নদীর অংশও তেমন অবস্থায় উন্মুক্ত হইয়া যাইত, আর জাপানীরা সেই পথ দিয়া আসাম আক্রমণ করিতে পারিত।† সুতরাং এই পথ রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইলে জাপানীদের ভারত

---

* ইরাবতীর তীর ধরিয়াই ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত পুরানো সহরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। সেগায়েং, আভা, অমরপুরা ও মান্দালয়—এইগুলি সমস্তই ইরাবতীর তীরে এবং পরস্পরের অতি নিকটে। আলুঙ্‌পায়া রাজবংশের রাজত্বকালে এইগুলিতে পর পর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সেগায়েং ইরাবতীর পশ্চিম তীরে, বাকিগুলি সমস্তই পূব তীরে। রেঙ্গুণ বৃটিশ আমলের সৃষ্টি যেমন আমাদের কলিকাতা।—লেখক

† ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসে বোধহয় এই পথেই জাপানীরা আসাম ও মণিপুর আক্রমণ করিয়াছিল।—লেখক।

সীমান্ত আক্রমণও রুদ্ধ হইবে। কিন্তু এই পথ অতি বিশ্রী ছিল, বিশেষতঃ ইয়েয়ু হইতে চিন্দুইন পর্য্যন্ত। ইহা ছাড়া পানীয় জলেরও সমস্যা ছিল। তথাপি এই পথ সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে পৌছানো যাইবে বলিয়া জেনারেল আলেকজান্দার এই পথই বাছিয়া লইলেন। সুতরাং পাকোকু হইয়া মণিওয়ার উত্তর দিকে চিন্দুইন নদীর পশ্চিম তীরাভিমুখে, আর সোয়েবোর ভিতর দিয়া চিন্দুইনের পূর্ব্ব তীর ধরিয়া মিত্রবাহিনী আসাম ও মণিপুর যাত্রা করিল।

জাপানীরাও মিত্রবাহিনীকে পাকড়াও করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিল না। তাহারা চিন্দুইনের পথ অবরোধ করিবার জন্য মণিওয়ার উপর আক্রমণ করিল। কেননা এই পথ ধরিয়া মিত্রবাহিনী ভারত সীমান্তে হটিতেছিল। প্রচুর গোলা বর্ষণ করিয়া একদল জাপানী নদী পার হইল এবং দক্ষিণ দিকে পথের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিল। ১৭নং ডিভিসন ও বর্ম্মা সৈন্যদলের একাংশ এই পথ দিয়া পশ্চাদপসরণ করিতেছিল। তীব্র সংঘর্ষের পর তাহারা এই প্রতিবন্ধকতার অপসারণ করে এবং মণিওয়া হইতে জাপানীদিগকে হটাইয়া দিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে থাকে। বাকি বৃটিশ সৈন্য ও একটি সাঁজোয়া ব্রিগেড আভা সেতু হইতে সোয়েবু পর্য্যন্ত পৃষ্ঠরক্ষী সৈন্যের কাজ করে। সোয়েবু হইতে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইয়েয়ু নামক স্থানে তাহারা অন্যান্য চিন্দুইন-বাহিনীর সহিত মিলিত হয় এবং তারপর কালেওয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু জাপানীরা কালেওয়ার দক্ষিণে সোয়েগাইনের খেয়াঘাট পর্য্যন্ত মিত্রবাহিনীকে অনুসরণ করে। ষ্টিমার ও বার্জ্জের সাহায্যে তাহারা নদীতে বাধা দেয় এবং যে গরুর গাড়ীর রাস্তা ধরিয়া মিত্রবাহিনী নদীতীরে উপস্থিত হইতেছিল, সেখানে অনবরত বোমা ও মেসিনগানের গুলী চালাইতে থাকে। ফলে, এক সময় এমন সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, মিত্রবাহিনীর সম্পর্কে নিদারুণ উদ্বেগ বোধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জাপানীরা পরাভূত হয় এবং মিত্রবাহিনী নদী পার হইয়া কালেওয়াতে পৌছিতে সমর্থ হয়। তাহারা দুর্গম জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ ধরিয়া বহু কষ্ট স্বীকারের পর আসাম ও মণিপুর সীমান্তে পৌছে। জেনারেল আলেকজান্দারের বাহিনীর মত জেনারেল ষ্টিলওয়েলের ৫নং চীনা আর্ম্মিও ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। জেনারেল ষ্টিলওয়েল চীনা ও বর্ম্মী অফিসার এবং নার্সসহ ১০৪ জনের লইয়া গঠিত একটি দলসহ ১৮ দিন ধরিয়া পাহাড়

পাহাড় ও জঙ্গল পথের দুর্ভোগ ভুগিবার পর মধ্যব্রহ্ম হইতে আসামে উপস্থিত হন।

মিত্রবাহিনীর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বর্ম্মা মুলুক হইতে ভারতীয় শরণাগতের দলও যোগ দেয়। দক্ষিণ ব্রহ্মে জাপ আক্রমণ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে ভারতীয়গণ সর্ব্বপ্রকার যানবাহনে ও সর্ব্বপ্রকার পথে ভারতবর্ষ অভিমুখে রওনা হয়। মোট ৪ লক্ষেরও অধিক ভারতবাসী আসাম, চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় পৌছে। কিন্তু এই চারি লক্ষের মধ্যে সমুদ্রপথে জাহাজযোগে কিম্বা আকাশপথে বিমানযোগে যাহারা ভারতবর্ষে ফিরিতে পারিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা সামান্য। অধিকাংশই আসিয়াছে জঙ্গল ও পাহাড়ের পথে। যে সমস্ত ভারতবাসী (কিছু ইংরাজ, চীনা ও বর্ম্মীও ছিল) উত্তর ব্রহ্মে পলাইয়া আসিয়াছিল, তাহাদের অনেকে মিত্রবাহিনীর সহায়তায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। একান্ত উত্তরবর্ত্তী ব্রহ্মের মিচিনা যখন ১০ই মে তারিখ জাপ সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত হয়, উহার আগ পর্য্যন্ত ৮৬১৬ জন বিমানপথে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। উহার মধ্যে প্রায় ২৫০০ ছিল আহত বা রুগ্ন সৈন্য। মিত্রবাহিনীর আসামে পৌছিবার পর ব্রহ্মদেশে প্রবল বর্ষা সুরু হইল।

—৭—

ব্রহ্ম যুদ্ধের অবসান

৩০শে মে, '৪২।

একদিকে সিতাং ও ইরাবতী নদীর যুদ্ধে বিপর্য্যয় এবং অন্যদিকে লাসিও ও মান্দালয়ের পতনের পর ব্রহ্মদেশে মিত্রবাহিনীর সংগ্রাম চালাইবার আর কোন সুযোগ ছিল না। কোনও দেশের প্রাণকেন্দ্রগুলি যদি দ্রুত হাতছাড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই দেশের অভ্যন্তরভাগে দাঁড়াইয়া নিয়মিত যুদ্ধ চালনা আর সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ গেরিলা যুদ্ধই চলিতে পারে। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের কোন ব্যবস্থা ব্রহ্মদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ করেন নাই। সুতরাং উত্তর ব্রহ্মের লাসিও ও মান্দালয়ের পতনের পরেই কার্য্যতঃ ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান হয়।

২৮শে মে তারিখ নয়াদিল্লী হইতে ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়েভেল ঘোষণা করেন যে, আপাততঃ ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান হইল। কি কারণে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদলকে এই দুর্ভাগ্য বরণ করিতে

হইল সে সম্পর্কে জেনারেল ওয়েভেলের ঘোষণা হইতে কিছু কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে—"ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যদি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে এমন কোন উৎকৃষ্ট রাস্তা থাকিত, যাহা বর্ষার বারিধারা সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে শত্রুকে ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরভাগে ঠেকাইয়া না রাখিবার কোনই কারণ ছিল না। সোয়েবুর দক্ষিণে আমাদের অগ্রবর্ত্তী ব্যূহের সেনাদলের যখন বেষ্টিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, তখন তাহারা সেই বিপদ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিয়াছিল। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে, শত্রুর আক্রমণে বাধ্য হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে হয় নাই। এখন বর্ষা আরম্ভ হইবার বাকী নাই, অথচ ভারত হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সরবরাহের পথটিও আমরা যথাসময়ে সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই পথটি উৎকৃষ্ট সামরিক রাস্তার অনুপযোগী,—ইহা গিয়াছে পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর দিয়া। বর্ষার জল ঠেকাইবার উপযোগী করিয়া ইহাকে নির্ম্মাণ করা যায় নাই। সেজন্য ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সেনাদলের চাপ হ্রাস করিবার জন্য নূতন নূতন সৈন্যদল প্রেরণ করা সম্ভব ছিল না। এই কারণেই সেনাবাহিনীকে ভারতবর্ষের দিকে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। এই পশ্চাদপসরণ করিতে গিয়া সময়ের সহিত পাল্লা দিতে হইয়াছে। কারণ, বর্ষা যদি একবার নামিয়া যাইত, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরভাগের কতকগুলি রাস্তা চলাচলের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিত। ভারতবর্ষ হইতে যেসকল বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যকে ব্রহ্মদেশে পাঠান হইয়াছিল, তাহাদের পাঁচভাগের চারিভাগই নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে। ব্রহ্মদেশে আমাদের সৈন্যের সংখ্যা কখনও খুব বেশী পরিমাণ ছিল না। জেনারেল আলেকজান্দারের অধীন যুধ্যমান সৈন্যগণ দুইটি ছোট ডিভিসন কিংবা একটি বড় ডিভিসনের অধিক ছিল না। ইহার তুলনায় শত্রু সৈন্য সংখ্যায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল।

"মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদিগকে প্রভূত পরিমাণ যান ও ট্যাঙ্ক ফেলিয়া আসিতে হইয়াছে। অবশ্য শত্রুর আক্রমণের ফলেই এরূপ করিতে হইয়াছে, এমন নহে। চিন্দুইন নদীতে হঠাৎ বান ডাকাতেই এরূপ করিতে হইয়াছে। এজন্য কয়েকটি মাত্র ফেরী ষ্টীমার পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেগুলির সাহায্যে ভারী ভারী জিনিষ পার করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। চিন্দুইনের খরস্রোত ধরিয়া নদী পার হওয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। এদিকে বর্ষা আসিয়া পড়িল।

সেজন্য স্থির হয় যে, যে সকল ট্যাঙ্ক ও যান পার করা সম্ভব নহে সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া আসা হইবে। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ নানাদিক দিয়া নিরুৎসাহ ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক হইয়াছে। ইহার একটি বড় কারণ ভৌগোলিক অসুবিধা। ব্রহ্মদেশে প্রবেশের একটিমাত্র পথ ছিল এবং জাপানীরা যখন আমাদের নিকট হইতে সমুদ্রের উপর আধিপত্য কাড়িয়া লয়, তখন হইতেই রেঙ্গুণ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। নিম্ন-ব্রহ্ম ও রেঙ্গুণ আরও কিছুকাল আমরা হাতে রাখিতে পারিতাম, কিন্তু ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে সিতাং নদীর যুদ্ধে আমাদের পরাজয়ের ফলে উহা সম্ভব হয় নাই। ব্রহ্মের সমগ্র সংগ্রামের মধ্যে জাপানী-দের হাতে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রকৃত পরাজয়। এই যুদ্ধে আমাদের প্রভূত ক্ষতি হয় এবং আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। বাকী সমস্ত সামরিক কার্য্যকলাপকে অনেকটা পৃষ্ঠরক্ষার কার্য্য বা rearguard action বলা যাইতে পারে। সিতাংয়ের যুদ্ধে আমাদের দুইটি সেনাদলের অধিকাংশই বিনষ্ট হয় এবং নিম্ন-ব্রহ্মের ভাগ্য চূড়ান্তরূপে নির্ণীত হয়। সমুদ্রে আধিপত্য হারাইয়া আমরা স্থায়ীভাবে রেঙ্গুণ রক্ষা করিতে পারিতাম না। রেঙ্গুণ হাতছাড়া হইবার পর একমাত্র ব্রহ্ম-আসাম পথ ছাড়া ব্রহ্মদেশে কোন সৈন্য আমদানী সম্ভব ছিল না। বিমানযোগে অবশ্য কিছু প্রয়োজন মিটান যাইত, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। জাপানীরা খুব উন্নত মানুষ বা অদ্ভুত সৈন্য নহে, তবে তাহাদের সৈন্যরা নিঃসন্দেহে অধিকতর শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিশেষতঃ মালয় ও ব্রহ্মে যে ধরণের যুদ্ধ হইয়াছে, সেই যুদ্ধের তাহারা উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত। আর মিত্রপক্ষীয়দিগকে ইউরোপে, ইংলণ্ডে ও মধ্য প্রাচ্যের উন্মুক্ত প্রান্তরে এবং ব্রহ্ম ও মালয়ের জঙ্গলে বিভিন্ন ধরণের যুদ্ধে একই সময়ে সৈন্য নিয়োগ করিতে হইয়াছে। কাজেই তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত করিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করা কম সমস্যা ছিল না, তবে আমরা এক্ষণে সকল রকম অভিজ্ঞতা হইতেই শিক্ষা পাইয়াছি এবং সেই শিক্ষা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই কাজে লাগিবে।”

ব্রহ্মযুদ্ধ সম্পর্কে জেনারেল ওয়েভেলের এই বিবৃতি ছাড়া আরও বহু পদস্থ সেনানী ও ব্যক্তিগণের বিবৃতি বাহির হইয়াছে। জেনারেল ষ্টীলওয়েল, জেনারেল আলেকজেন্দার ও “ডেলী টেলিগ্রাফ” পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা প্রভৃতি যে সমস্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী মতামত প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও মোটামুটি পরাজয়ের কারণগুলি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

এই কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, (১). জাপানের বিরুদ্ধে এত বড় যুদ্ধের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও মিত্রপক্ষ পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত ছিলেন না।* হংকং হইতে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত এত বড় সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের আয়োজন জাপান বহুদিন হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে এবং একদা অতর্কিতে তাহারা এই বিপুল রণাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, এমন নিশ্চিত বিশ্বাস বড়কর্ত্তাদের ছিল না। ফলে, জাপান যতখানি শক্তি ও আয়োজন লইয়া রণাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিয়াছে মিত্রপক্ষ তাহা পারেন নাই। মোটামুটিভাবে এই অবস্থাটাই সর্ব্বত্র ভাগ্যবিপর্য্যয় ডাকিয়া আনিয়াছে। এই অবস্থারই ফলস্বরূপ, (২) ব্রহ্ম বা মালয়ের যুদ্ধে জাপানী বিমানশক্তির সহিত মিত্রপক্ষ পাল্লা দিতে পারেন নাই। আধুনিক যুদ্ধে বিমান ও ট্যাঙ্ক সর্ব্বাগ্রগণ্য। ট্যাঙ্কের ব্যবহার কোন পক্ষেই ব্যাপক আকারে হয় নাই। কিন্তু গোড়া হইতেই জাপানীরা প্রচুর পরিমাণ বিমান ব্যবহার করিয়াছিল, এই বিমান ব্রহ্মদেশের আকাশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। যদি কোন পক্ষের বিমানশক্তি আকাশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, তবে মাটিতে অবস্থানকারী সৈন্যদলের যুদ্ধাভিযান অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। কারণ, উপর হইতে নিরন্তর বোমাবর্ষণের ফলে সৈন্যদলের পক্ষে লড়াই করা একটা প্রকাণ্ড সমস্যার মত দেখা দেয়। আধুনিক যুদ্ধ বিমানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় মিত্রবাহিনী গোড়া হইতেই অসুবিধায় পড়িয়াছিল। (৩) সংখ্যার দিক দিয়াও মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। মাত্র দুই ডিভিসন সৈন্য ব্রহ্ম যুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল। কিন্তু জাপানীদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী এবং অনেক প্রবল ছিল। সাধারণ

---

* বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের রণনৈতিক বুদ্ধি কত কম ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইম্পিরিয়েল ডিফেন্স কমিটি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ রক্ষার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত অনুসৃত হয় নাই। এই সম্পর্কে 'Strategicus' মন্তব্য করিতেছেন :—

Although the Committee of Imperial Defence had decided before the war that every part of the Empire should be provided with sufficient elements of defence to enable it to hold its own until relief came, the implementing of this decision foundered upon reluctance to foot the bill. Here, as elsewhere, the public reaction was based on a widespread refusal to face the facts of the international situation......"

'—To Stalingrad and Alamien.'

রণধর্ম্মানুসারে বলা যায় যে, উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রসজ্জা সমান না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালানো কঠিন। সংখ্যাশক্তি সমান হইলে এবং রণপটুতা পরস্পরের নিতান্ত কমবেশী না হইলে যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিতে পারে, যেমন চলিতেছে বর্ত্তমান রাশিয়ায়। কিন্তু আক্রমণকারী যদি সৈন্য ও অস্ত্রের সংখ্যায় দ্বিগুণ তিনগুণ বেশী হইয়া থাকে, তবে কেবলমাত্র সংখ্যাশক্তির জোরেই অনেক সময় তাহাদের জয় ঘটিয়া থাকে। (৪) একই সৈন্যদল দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা তেমন কোন বিশ্রাম পায় নাই। এই অক্লান্ত একটানা যুদ্ধ যে কোন বাহিনীর স্নায়ু ও শিরার পক্ষে পীড়াদায়ক। তথাপি বিস্ময়ের কথা এই যে, মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা প্রতিদিন অক্লান্ত যুদ্ধ চালাইয়াও সাফল্যের সহিত সুস্থ শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিয়াছে। সাধারণতঃ সৈন্যসংখ্যায় ঘাটতি পড়িলে এবং সৈন্যদল ক্লান্ত হইলে নূতন নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া ক্ষয় ও ক্লান্তি পূরণ করা হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশে নূতন নূতন সৈন্যদল পাঠানো সম্ভব হয় নাই। ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, (৫) ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষের মধ্যে উপযুক্ত রাস্তা ও যোগাযোগের অভাব। ব্রহ্মদেশের সহিত প্রধানতঃ ভারতবর্ষের জলপথের সংযোগ ছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুরের পতনের পর এই জলপথ বিপন্ন হইয়া পড়ে। ইহার সঙ্গে মিত্রপক্ষের নৌবহর ও বিমানবহরের ঘাটতি পড়ায় এবং উপযুক্ত ঘাঁটিগুলি হাতছাড়া হওয়ায় জলপথের যোগাযোগ নষ্ট হইয়া যায়। রেঙ্গুণের পতনের পর এই অবস্থা আরও শোচনীয় রূপ ধারণ করে। তখন কার্য্যতঃ ব্রহ্মদেশের সহিত সমুদ্রপথের সংযোগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, জাহাজযোগে কোন নূতন সৈন্য ও অস্ত্র পাঠানো সম্ভব হয় নাই। একমাত্র উপায় ছিল স্থলপথ। কিন্তু স্থলপথেও ব্রহ্মদেশ ও আসামের মধ্যে কোন রেলপথ ছিল না। এই রেলপথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনার গুজব মাঝে মাঝে আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন রেলপথই তৈয়ার হয় নাই। রেল বা ষ্টীমার ছাড়া বৃহৎ সৈন্যদল ও ভারী সামরিক দ্রব্য পাঠানো অসুবিধাব্যঞ্জক। যুদ্ধের জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে পড়িয়া যে রাস্তা তৈয়ার হইয়াছে, তাহা বৃহৎ অভিযানের উপযোগী নহে। গভীর অরণ্য, দুর্গম পর্ব্বত ও বন্ধুর ভূমি দিয়া যে রাস্তা আসাম হইতে ব্রহ্মদেশের সহিত মিলিয়াছে, তাহা সামরিক প্রয়োজনের দিক হইতে খুব উৎকৃষ্ট নহে। সম্ভবতঃ এই রাস্তা ধরিয়া কোনওক্রমে পালাইয়া আসা যায়, কিন্তু বৃহৎ অভিযান

চালানো যায় না। ফলে, ব্রহ্মদেশের সংগ্রামে যখন সৈন্য ও অস্ত্রের জরুরী প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, তখন যথোপযুক্তভাবে উহা সরবরাহ করা যায় নাই। ইহা ছাড়া সংবাদ আদান প্রদান এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফেরও সুব্যবস্থা ছিল না। (৬) ব্রহ্মের ভৌগোলিক অবস্থাও মিত্রপক্ষের অসুবিধা ঘটাইয়াছে। তিনটি পর্ব্বতমালা ও তিনটি সুবৃহৎ নদী ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য। প্রথমতঃ আরাকান ইয়োমা ইরাবতীর পশ্চিম ভাগ হইতে ব্রহ্মদেশকে বাকী অংশের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই পর্ব্বতের পশ্চিমে চট্টগ্রামের সহিত যুক্ত আরাকান জেলা। দ্বিতীয়তঃ পেগু ইয়োমা (এই পাহাড়গুলি অবশ্য তেমন উঁচু নহে) ইরাবতী ও সিতাং নদীকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। তৃতীয়তঃ ১৭৫০ মাইল দীর্ঘ সালুইন নদী শান মালভূমির তৃতীয় গিরিমালা ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই নদীর অর্দ্ধেক বা ইহা বর্ম্মা রোডে না পৌছানো পর্য্যন্ত ইহাতে কোন সেতু নাই। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত লম্বালম্বিভাবে প্রবাহিত দীর্ঘ নদী, উঁচু পাহাড় ও দুর্গম অরণ্য আক্রমণকারীর পক্ষে বিঘ্ন ও আত্মরক্ষার দিক হইতে সুবিধাজনক হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিঘ্নগুলি তখনই আত্মরক্ষার পক্ষে সহায়ক হইয়া থাকে, যখন শত্রুকে বাধা দেওয়ার মত উপযুক্ত সৈন্যবল, অস্ত্রবল ও যন্ত্রবলের এবং রণনীতি ও রণকৌশলের সংযোগ ঘটিয়া থাকে। আসলে ব্রহ্মের যুদ্ধে হীনবল মিত্রশক্তি লড়াইয়ের দিক হইতেই দুর্ব্বল ছিল। সুতরাং উৎকৃষ্ট রাস্তাঘাটের অভাব, দীর্ঘ নদী এবং পাহাড় ও জঙ্গল ইত্যাদি পাল্টা আত্মরক্ষার পক্ষে প্রবলতর বিঘ্নরূপে দেখা দিয়াছিল। প্রাকৃতিক বিঘ্ন সৈন্যেরা তখনই ভালোভাবে কাজে লাগাইতে পারে, যখন সৈন্যদলের সংগ্রামশক্তি আক্রমণকারীর তুলনায় অন্ততঃ সমান থাকে। কিন্তু বিপরীত অবস্থায় এই প্রাকৃতিক বিঘ্নই অধিকতর বিপদ ডাকিয়া আনে। ব্রহ্মের সংগ্রামেও তাহাই ঘটিয়াছে। (৭) ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে ঋতু এবং আবহাওয়ার কথাও ভাবিতে হইবে। প্রধানতঃ তিনটি ঋতু উল্লেখযোগ্য—জুন হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত বর্ষাকাল, তারপর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শীতকাল এবং মার্চ্চ হইতে মে পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকাল, এই সময় মাটী শুষ্ক থাকে। জাপানীরা শীত ও গ্রীষ্মের সুযোগ লইয়াছে। (৮) জাপানীদের আয়োজন বৃহৎ ও ব্যাপক ছিল এবং মালয় ও ব্রহ্মদেশের ভৌগোলিক অবস্থার উপযোগী অভিজ্ঞতা সৈন্যদলের ছিল। ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর চীনের দুর্গম অঞ্চলে যুদ্ধ চালাইয়া অরণ্য, নদী ও পর্ব্বতবহুল স্থানের রণকৌশলে জাপানীরা

দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে। কুমীর, সাপ বা হাতী ইত্যাদি জন্তু-জীবগুলিকে জাপানীরা অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছে এবং হাতীগুলিকে তাহারা সময় সময় কাজেও লাগাইতে পারিয়াছে। সামান্য আহার ও সামান্য পোষাকে সর্পসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে তাহারা বেপরোয়া যুদ্ধনীতি ও অনুপ্রবেশ কৌশল অনুসরণ করিয়াছে। তাহাদের রণনৈতিক চালও চমৎকার ছিল। তাহারা সর্ব্বত্র এমনভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রেই তাহারা 'principle of superiority' বা শ্রেষ্ঠতর শক্তি প্রয়োগের মূলনীতি খাটাইতে পারিয়াছিল। মালয়ের মত ব্রহ্মদেশেও মিত্রপক্ষের সৈন্যদিগকে তাহারা আলাদা আলাদাভাবে বা এক একটা টুকরার (piece meal) মত পাইয়াছিল। ফলে জাপানীদের পক্ষে আঘাত হানা সোজা হইয়াছিল। (৯) রাজনৈতিক কারণও উল্লেখযোগ্য। মালয় ও ব্রহ্মদেশে জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধযাত্রায় উৎসাহ ছিল না। বৃটিশ সরকারের রাষ্ট্রনীতি ব্রহ্মদেশের বহু লোকের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল। এই কারণে জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধজয়ের বাসনা প্রবল ছিল না। জাপানীরা ব্রহ্মদেশের এই রাজনৈতিক অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছে। সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের ইহা একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। আধুনিক কালে কেবল সৈন্য ও সেনাপতি-গণই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না; সমগ্র দেশবাসীর প্রত্যেকটি লোকের স্বেচ্ছাকৃত আন্তরিক সহযোগিতা যুদ্ধের পিছনে থাকা চাই। ইহার অভাব ঘটিলে সমরায়োজনে বিঘ্ন ঘটিবে। ব্রহ্মযুদ্ধের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে যদি ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের বড়কর্ত্তাগণ উপযুক্ত শিক্ষালাভ করেন এবং সমরনীতিকে রাজনীতির আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা দিয়া সমগ্র রাষ্ট্রিক কাঠামোর পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংশোধন করেন, তাহা হইলেই এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সার্থকতা। ব্যর্থতা হইতেই মানুষ সাফল্যের শিক্ষা পায়, অন্ততঃ বুদ্ধিমান মানুষ সেই শিক্ষাই গ্রহণ করে।

নবম অধ্যায় ঃ ভারতবর্ষ অভিমুখে

—১—

সিংহলে আক্রমণ

৬ই এপ্রিল, '৪২।

[ব্রহ্মদেশে জাপানীদের ক্রমবিস্তার ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের জলপথ ও আকাশপথও যে ক্রমশঃ বিপন্ন হইতেছে, এই তথ্য এপ্রিল মাসে একান্তরূপে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। প্রশান্ত মহাসমুদ্র ও ভারত মহাসমুদ্রের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য নৌঘাটি জাপানীদের হাতে যাওয়ায় জাপ নৌবহরের পক্ষে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইল। ব্রহ্মদেশের পর জলপথে ও আকাশপথে যে কোনদিন ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইতে পারে, এমন সম্ভাবনার জন্য ভারতবর্ষের কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণ ক্রমশঃ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। সিংহলে জাপানীদের বিমান আক্রমণ ভারতবর্ষের জলপথে জাপ অভিযানের প্রথম ইঙ্গিতস্বরূপ।]

সিংহলে কয়েকদিন বিমান আক্রমণের সতর্কতা ধ্বনির পর অবশেষে গত ৫ই এপ্রিল সকাল বেলা সত্য সত্যই জাপানীরা বোমা বর্ষণ করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে জাপানীদের এই বোমারু অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। সরকারীভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মোট ৭৫ খানা জাপ বিমান সিংহলে হানা দিয়াছিল। তাহারা পোতাশ্রয়ে ও রাতমালানায় ছোঁমারা বিমান হইতে বোমা ও রাস্তার উপর মেসিনগানের গুলী বর্ষণ করিয়াছিল। হতাহত ও ক্ষতির পরিমাণ সামান্য। হাসপাতালের উপর বোমাবর্ষণের ফলে কয়েকজন রোগী মারা গিয়াছে। (পরে জানা গিয়াছিল যে, ৫০ জন হত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক ছিল হাসপাতালের রোগী।) ইহা যুদ্ধনীতির বিপরীত ধর্ম্ম এবং জাপ ক্রূরতার পরিচায়ক। সিংহলের বিমান আক্রমণে জাপানীদের ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর*—২৫ খানা জাপ বিমান জঙ্গী-বিমানের

---

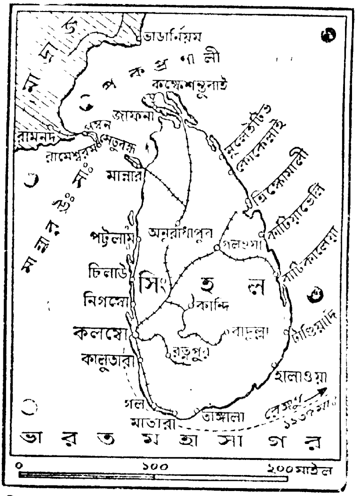
* কয়েক দিন পরে কমন্স সভায় মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতিতে জানা গিয়াছে যে, মিত্রপক্ষের বিমানগুলিও 'কার্য্যতঃ' সমস্তই ধ্বংস হইয়াছিল।

দ্বারা নিশ্চিতরূপে ধ্বংস হইয়াছে, ২ খানা বিমানমারা কামানের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। আরও ৫ খানা সম্ভবতঃ মারা পড়িয়াছে এবং আরও ২৫ খানা জখম হইয়াছে। সিংহলের প্রধান সেনাপতি স্যার জিওফ্রে লেটন বলিয়াছেন যে, জাপ বিমানবাহী জাহাজ হইতেই এই আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে ২৫ খানা বিমান জখম হইয়াছে, সেগুলি সম্ভবতঃ তাহাদের নিজস্ব ঘাঁটিতে ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। ৭৫ খানার মধ্যে মোট ৫৭ খানা জাপ বিমান ধ্বংস, জখম বা ঘায়েল হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই যথেষ্ট কৃতিত্ব ও জনসাধারণের পক্ষে আশা ও আনন্দের কথা। জাপানীদিগকে যদি এই হারে মালয়ে ও ব্রহ্মদেশে বাধা দেওয়া যাইত, তবে এত দ্রুত তাহারা ভারতের পূর্ব্ব বহির্দ্বার অতিক্রম করিয়া দূরবর্ত্তী সিংহলে পৌঁছিতে পারিত না। জাপানীদের এই যুদ্ধে জাহাজ ও বিমানই প্রধান সম্বল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে মিত্রশক্তিপুঞ্জ এই দুইদিক দিয়াই বর্ত্তমানে হীনবল। সিংহলে যেভাবে জাপ বিমানবহরকে প্রতিরোধ করা হইয়াছে, আত্মরক্ষার দিক হইতে তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। জঙ্গীবিমান ও বিমানমারা কামানের প্রাচুর্য্য থাকিলে জাপানীরা এত শীঘ্র ব্যাপক জয়লাভ করিতে পারিত না। ৪।৫ দিন আগে আন্দামান দ্বীপের পোর্ট ব্লেয়ারেও মার্কিণ বিমানবহর একটি ক্ষুদ্র জাপ নৌবহরের উপর চমৎকার আক্রমণ চালাইয়া নৌবহরকে ঘায়েল করিয়াছে। এই সমস্তই সুসংবাদ। সোজা কোন স্থলপথের ঘাঁটি হইতে কলিকাতা, কলম্বো, মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের উপর জাপ বিমানবহর আক্রমণ চালাইবার সুবিধা পাইবে না। তাহাদের পক্ষে বিমানবাহী জাহাজ হইতেই আক্রমণ চালানো সম্ভব—একথা অনেকবার আলোচিত হইয়াছে। সিংহলে জাপানীদের জাহাজ হইতে বিমান আক্রমণ সেই সম্ভাবনাকেই নিকটতর করিয়া আনিতেছে।

অকস্মাৎ সিংহলে জাপানীদের এই উৎপাতের উদ্দেশ্য কি? জাপানীরা নৌবলপ্রধান জাতি এবং ইহার সঙ্গে তাহারা বিমানশক্তি ও আধুনিক যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণও প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছে। তাহারা দুইটি নৌবল-প্রধান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে—বৃটেন ও আমেরিকা। বর্ত্তমানে প্রাচ্যখণ্ডে বৃটেনের নৌশক্তি দুর্ব্বল এবং আমেরিকার নৌবল এখনও এদিকের সমুদ্রে সংহত হয় নাই। সুতরাং আঘাত হানিবার ও অগ্রসর হইবার পক্ষে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তই জাপানের সুবর্ণসুযোগ। মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে

জাপ রণনীতির একটা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িবে। তাহারা চীন, ইন্দোচীন, মালয়, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি বহুদূরবিস্তৃত রাজ্যগুলির সমুদ্রোপকূল প্রথমে দখল করিয়াছে এবং তারপর স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। সাংহাই, হংকং, সিঙ্গাপুর, পেনাং, রেঙ্গুণ ইত্যাদি প্রত্যেকটি সমুদ্রতীরস্থ বড় বড় নৌঘাঁটি ও বন্দর জাপানীরা কাড়িয়া লইয়াছে যাহাতে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের দীর্ঘ জলপথ জাপানীদের প্রভুত্বের মধ্যে থাকে। এজন্য নৌঘাঁটিগুলিই জাপানী আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হইতেছে। ইহা দ্বারা একদিকে যেমন মহাসমুদ্রের উপর জাপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তেমনি মিত্রপক্ষের সরবরাহ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পোতাশ্রয় ও নৌঘাঁটি ছাড়া কোন নৌবহরই সংগ্রাম করিতে পারে না। ভবিষ্যতে ইঙ্গ-মার্কিণ নৌবহর যাহাতে জাপানী নৌশক্তিকে সহজে পাল্টা-আক্রমণ করিতে না পারে, এই জন্যই জাপান নৌঘাঁটিগুলি একে একে দখলের চেষ্টা করিতেছে। তবে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তাহারা অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে রণকৌশল হিসাবে কেবল বিমান আক্রমণের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা চাহিতেছে বোমাবর্ষণের দ্বারা নৌঘাঁটিগুলিকে বিধ্বস্ত করিতে। অষ্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দর এবং ভারতবর্ষের সিংহলে এজন্য বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইতেছে। এভাবে নৌঘাঁটিগুলি আক্রমণ করিয়া তাহারা সম্ভবতঃ আফ্রিকা ও মধ্য-প্রাচ্যের রণাঙ্গনের সহিত বৃটেনের যোগাযোগ নষ্ট করিতে এবং তাহাদের রণদোসর জার্ম্মাণীকে আসন্ন অভিযানে সাহায্য করিতে চাহে। দূরত্বের ব্যবধান বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, জাপানীদের পক্ষে চট্টগ্রামে বিমান আক্রমণ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কারণ, ব্রহ্মের সীমান্ত হইতে চট্টগ্রাম যত দূরে, আন্দামান হইতে (যদি সিংহল হইতে হাজার মাইল দূরবর্ত্তী আন্দামান বর্ত্তমানে ক্ষুদ্রতর জাপ নৌবহরের আশ্রয় বলিয়া ধরিয়া লই) সিংহল তার চেয়ে অনেক বেশী দূরে। কিন্তু চট্টগ্রাম কোন নৌঘাঁটি নহে, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের নৌপথের দৃষ্টিতে চট্টগ্রামের কোন গুরুত্ব নাই। অপরপক্ষে সিংহল ভারতবর্ষের নৌপথের হিসাবে বোধ হয় সর্ব্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন। পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের মানচিত্রের দিকে চাহিলে কলম্বোকে প্রায় কেন্দ্রস্থলে মনে হইবে। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া—এই চারিটি মহাদেশের ইহা নৌমিলন কেন্দ্র এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যবর্ত্তী আশ্রয়স্থল বলিয়া ইহাকে গণ্য করা যায়। সিংহলের আর একটি বৈশিষ্ট্যও

উল্লেখযোগ্য। সমস্ত জাহাজের পক্ষেই কয়লা অত্যাবশ্যক—জীবনধারণের পক্ষে যেমন জল, জাহাজের পক্ষে তেমনি কয়লা। এই কয়লা লইবার প্রধান কেন্দ্র হইতেছে কলম্বো। এই হিসাবে ইহা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর—বানিজ্যিক হিসাবে নহে, কয়লার প্রয়োজনে। শান্তির সময়ে ৪টী মহাদেশের অসংখ্য জাহাজ এখানে আসিয়া থামে। সিংহলের পশ্চিম তীরে



কলম্বো এবং ইহার পোতাশ্রয়ের গুরুত্বের জন্যই আজ ইহা জাপানী আক্রমণের লক্ষীভূত হইয়াছে। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা (তাহারা দেড়শত বৎসর এই অঞ্চল দখল করিয়া রাখিয়াছিল) এবং ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা সিংহল অধিকার করিয়া দুর্গ, খাল, জলপথ ইত্যাদি তৈয়ার করিয়াছিল। ইহার বহু পরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সিংহল ইংরাজদের অধীনে যায় এবং সিংহলের বদলে ওলন্দাজ-দিগকে জাভা দ্বীপ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজ পর পর আবির্ভূত হইয়া সিংহল দখল করায় নৌকেন্দ্র হিসাবে ইহার মর্য্যাদা ঐতিহাসিক মূল্য অর্জ্জন করিয়াছে। বাঙ্গলার বিজয়সিংহের নৌ-অভিযানও এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালীমাত্রেই গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে পারেন। কলম্বো ছাড়া সিংহলে আরও দুইটি পোতাশ্রয় আছে—একটি ত্রিঙ্কোমালিতে এবং আর একটি জাফনায়। স্বাভাবিক পোতাশ্রয় হিসাবে ত্রিঙ্কোমালি উৎকৃষ্ট। ইহা পূর্ব্বদিকে এবং জাফনা সিংহলের একেবারে উত্তর প্রান্তে। জাফনায় ক্ষুদ্র জাহাজ ছাড়া বৃহৎ কোন পোত ঢুকিতে পারে না এবং একদা দক্ষিণ ভারত হইতে এই পথ দিয়াই লোকে সিংহলে প্রবেশ করিত।

সমুদ্রপথে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার এবং মিত্রপক্ষের পাল্টা-আক্রমণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ করিবার জন্যই জাপানীরা সিংহলে বিমান আক্রমণ

চালাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দর সম্পর্কেও তাহারা এই নীতি অবলম্বন করিয়াছে। কলিকাতার ভাগ্য সম্ভবতঃ পরে নির্ণীত হইবে। কারণ, কলিকাতা নদীতীরস্থ বন্দর, সমুদ্র হইতে অনেক দূরে—৮০ মাইল ব্যবধানে। গঙ্গার মোহনা দিয়া শত্রু জাহাজের পক্ষে কলিকাতায় প্রবেশ অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। কলিকাতার চেয়ে সিংহল বা মাদ্রাজ জাপ নৌবহর ও বিমানবহরের পক্ষে সহজতর লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু জাপানীদের এত দূরবর্ত্তী সমুদ্রপথের দিকে অভিযান কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর। যদি টোকিওকে জাপ সমরাভিযানের কেন্দ্র ধরা যায়, তবে অঙ্ক কষিলে দেখা যাইবে যে, জাপানীরা হংকং ও সিঙ্গাপুর হইতে একটানা কলম্বো পর্য্যন্ত মোট ৪৬০৫ মাইল সমুদ্রপথে পৌঁছিয়াছে। কেবল পূর্ব্ব এশিয়া ও ভারতবর্ষই নহে, মার্কিণ নৌ-বহরকে বাধা দেওয়ার জন্য তাহারা আরও পূর্ব্ব দিকে—টোকিও হইতে গুয়াম হইয়া ওয়েক দ্বীপ পর্য্যন্ত ৩ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে। এই দুই দৈর্ঘ্য যোগ দিলে মোট ৭ হাজার মাইলের বেশী হইবে। ইহার সঙ্গে সিঙ্গাপুর হইতে বাটাভিয়া হইয়া থার্সডে দ্বীপ ধরিলে ২৭০০ মাইল এবং সিঙ্গাপুর হইতে মালয় অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ব্রহ্মের রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত হিসাব করিলে ১১০০ মাইলের বেশী হইবে। রণক্ষেত্রের এই বিশালতার মধ্যে দুইটি মহাসমুদ্র রহিয়াছে এবং চারিটি মহাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভ্রাট ঘটাইবার রাক্ষুসে প্ল্যান জাপানীরা অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু এই বহুবিস্তৃত এবং অবিশ্বাস্য পরিমাণ দীর্ঘ রণক্ষেত্রের বিস্তার জাপানীদিগকে ভবিষ্যতে বিষম সঙ্কটে ফেলিতে পারে। সমরনীতিতে যোগাযোগ রক্ষা এক অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ। সুতরাং আজ সিংহল বা মাদ্রাজের উপকূল বিপন্ন হইলেও জাপ রণনীতি ভবিষ্যতে নিদারুণ বে-কায়দায় পড়িবে না—এমন বিশ্বাসের যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই।

—২—

মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার উপকূলে

১২ই এপ্রিল, '৪২।

৫ই এপ্রিল সিংহলে বিমান আক্রমণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ষের দুই সহস্রাধিক মাইল দীর্ঘ উপকূলভাগ আর নিরাপদ নহে। এই উপকূলভাগ সম্পূর্ণরূপে খোলা এবং ইংলণ্ডের মত সুরক্ষিত নহে। সুতরাং জাপানীদের পক্ষে ইহার কোন কোন অংশে আবির্ভূত হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে। ৬ই তারিখ মাদ্রাজ সরকার একটি ইস্তাহারে জানান যে, বঙ্গোপসাগরে একটি জাপ নৌবহর ঘুরাফেরা করিতেছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। এজন্য মাদ্রাজ সহরে পূর্ণ নিষ্প্রদীপের বা ব্ল্যাক-আউটের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সমুদ্রপথে বা আকাশপথে শত্রু কর্ত্তৃক মাদ্রাজ আক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য জনসাধারণের সতর্ক হওয়া উচিত।

সিংহলের পর ৬ই এপ্রিল মাদ্রাজের উপকূলে ভিজাগাপট্টম ও কোকনদে বোমা বর্ষিত হয়। বঙ্গোপসাগরে যে জাপ নৌবহর হাঙ্গরের মত ঘুরিতেছে, সেই নৌবহরের সঙ্গী বিমানবাহী জাহাজ হইতেই এই আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইতেছে। সকালবেলা ভিজাগাপট্টম বন্দরে আক্রমণ ঘটে। পোতাশ্রয়ের দিকে যে সমস্ত জাহাজ আসিতেছিল সেগুলির উপরেই আক্রমণ চালানো হয়। তীরবর্ত্তী কোন স্থানে বোমা বর্ষিত হয় নাই। ডক এলাকায় প্রথম আক্রমণ বেলা প্রায় ১-১৫ মিনিটের সময় ও দ্বিতীয় আক্রমণ প্রায় ৫টার সময় চালানো হয়। এই দুইবার আক্রমণে এক একবারে ১০টির বেশী বিমান যোগদান করে নাই। সমস্ত বোমাই (প্রায় ২০টি) ডক এলাকায় পড়িয়াছিল, পোতাশ্রয়ের কয়েকটি ইমারতের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। খুব অল্প লোকই হতাহত হইয়াছে। সহরের উপর কোন বোমা পড়ে নাই। কোকনদে একটি বিমান সকাল প্রায় ৭টার সময় আক্রমণ চালায়। সেই সময় একটি লঞ্চ ও একটি জাহাজ বন্দরের দিকে যাইতেছিল। কিন্তু বিমান হইতে উভয় জাহাজের উপর মেসিনগান চালানো হয় এবং লঞ্চের একজন খালাসী নিহত ও একজন আহত হয়। বেলা প্রায় ১-৪৫ মিনিটের সময় জাপ বোমারু ভূভাগের

উপর প্রথম আক্রমণ চালায়। ৫টি জাপ বিমান তেলের গুদামে বোমা বর্ষণ করিয়া সামান্য ক্ষতি সাধন করে, কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই। ভিজাগাপট্টমের ন্যায় কোকনদেও সহরের প্রধান অংশের উপর কোন বোমা পড়ে নাই।

সিংহলের পর মাদ্রাজ এবং মাদ্রাজের পর উড়িষ্যার উপকূল হইতে দুঃসংবাদ আসিল। মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব বহির্দ্বার অতিক্রম করিয়া আমাদের দক্ষিণ উপকূলে পৌঁছিল। বাঙ্গলার একান্ত সন্নিকটবর্ত্তী উড়িষ্যার উপকূলেও ইহা দেখা দিল।

সরকারীভাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, 'ডরসেটসায়ার' ও 'কর্ণওয়াল' নামক দুইখানা ক্রুজার, বিমানবাহী জাহাজ 'হারমিস্' এবং ৬খানা বাণিজ্য জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। এই জাহাজগুলি বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে জাপানী নৌ ও বিমানবহরের আক্রমণে ধ্বংস হইয়াছে। 'রয়টারে'র মতে ক্রুজার দুইটির নিমজ্জন অতি গুরুতর ব্যাপার। ঠিক কোন্ স্থানে 'ডরসেটসায়ার' ও 'কর্ণওয়াল' ডুবিয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে মোট দেড় হাজার লোকের মধ্যে ১১০০ জন উদ্ধার পাওয়ায় মনে হইতেছে সঙ্গে অন্যান্য জাহাজ ছিল কিম্বা তীরভূমির অতি নিকটে, এমন কি কোন বন্দরের কাছেও এইগুলি ডুবিয়া থাকিতে পারে। বিমানবাহী জাহাজ 'হারমিস' সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, এই পোতটিও জাপানীদের বিমান আক্রমণে সিংহলের কাছে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই জাহাজেরও অনেক লোক উদ্ধার পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, সিংহলের তীর হইতে মাত্র ১০ মাইল দূরে 'হারমিসে'র সলিলসমাধি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উড়িষ্যার উপকূলে ৬ খানা জাহাজের ধ্বংস সম্পর্কে যে বিস্তৃত সংবাদ আসিয়াছে, তাহাও দুঃখজনক। প্রকাশ যে, কতকগুলি জাহাজ যখন কনভয়যোগে যাইতেছিল, তখন সকাল প্রায় ৮টার সময় শত্রুপক্ষের প্রহরী বিমান সেখানে আসিয়া হাজির হয়। এই বিমানগুলি জাহাজসমূহের উপর উড়িয়া যায় এবং কয়েক মিনিট পরেই জাপানীদের দুইটি বড় ক্রুজার ও একটি ডেষ্ট্রয়ার সেখানে আবির্ভূত হয়। এই পোত তিনটি ত্রিভুজাকৃতি ব্যূহের আকারে দাঁড়াইয়া বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজসমূহের উপর প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত ব্যাপার শেষ হইয়া যায়। আক্রান্ত জাহাজগুলি ডুবিবার আগে পাল্টা কামানের গোলাবর্ষণ করিতে পারে নাই। জাহাজ-

গুলিতে মার্কিণ, ইংরাজ, চীনা ও ভারতীয় ইত্যাদি নানাজাতির লোক ছিল। মোট ৪।৫ শত লোক উদ্ধার পাইয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই ইংরাজ, মার্কিণ ইত্যাদি। বেলা ১১টার সময় কটকে এই সংবাদ পৌছিলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমুদ্রতীরে যান এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে যথোচিত সাহায্য ও সেবা করেন। উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদিগকে কটকে আনা হইয়াছে।

উপরে যে সমস্ত সংবাদের সারমর্ম্ম দেওয়া গেল, তাহা হইতে বুদ্ধিমান পাঠক অনায়াসেই বুঝিতেছেন যে, কটক হইতে কলম্বো পর্য্যন্ত সমগ্র সমুদ্রতীর ও জলপথ কিরূপ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। কোকনদ ও ভিজাগাপট্টমে বোমবর্ষণ এবং সিংহলের ত্রিঙ্কোমালি পোতাশ্রয়ে গত বৃহস্পতিবার পুনরায় বহু সংখ্যক জাপ বিমানের হানা এই শোচনীয় অবস্থাই উদ্ঘাটিত করিতেছে। সিঙ্গাপুরের পতনের পর ভারত মহাসমুদ্রের দ্বার যে খুলিয়া যাইবে, এবিষয়ে কাহারও সংশয় ছিল না এবং গভর্ণমেণ্টও কয়েক মাস আগে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, বঙ্গোপসাগরে জাপানী নৌবহর উৎপাত করিতেছে। সিঙ্গাপুর হইতে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত গোটা সমুদ্রতীর ও বন্দর এবং নৌঘাঁটি জাপানীদের দখলে; তাহারা আন্দামানও অধিকার করিয়া লইয়াছে। অনুমান করা যাইতেছে যে, পোর্ট ব্লেয়ারেই জাপানীরা ক্ষুদ্রতর নৌবহর ও বিমান-বহরের ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে। সম্ভবতঃ সেই ঘাঁটি হইতে জাপানী রণতরী-সমূহ ও বিমানবাহী পোতগুলি বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে টহল দিতেছে। পোর্ট ব্লেয়ার হইতে কলম্বো সম্ভবতঃ এক হাজার মাইল এবং কটক ও ভিজাগাপট্টম ৭শত মাইল। দূরত্ব হিসাবে নিশ্চয়ই ইহা সামান্য নহে। কিন্তু যুদ্ধজাহাজ ও বিমানগুলি যেন কতকটা স্বচ্ছন্দচিত্তে সমুদ্রে বিহার করিতেছে। যদিও মিত্রশক্তির বোমারু বিমান মাঝে মাঝে জাপ নৌবহর ও বিমানবহরকে বাধা দিতেছে, তথাপি খাস সমুদ্রের উপর আধিপত্য না থাকায় শত্রুপক্ষকে অচিরে দমন করা যাইতেছে না। দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষের বহুদূরবিস্তৃত সমুদ্রতীর লইয়া সামরিক মহলে আলোচনা হইয়াছে। হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ এই সমুদ্রতীর একেবারে খোলা, প্রবলতর নৌবহর ও বিমানবহরকে দ্রুত প্রতিরোধের ব্যবস্থা আজ জরুরী প্রয়োজনের মত অনুভূত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে স্থলবাহিনী এবং সেই বাহিনীর আনুষঙ্গিক অস্ত্রশস্ত্র যতটা আছে, নৌবহর সেই অনুপাতে সামান্য। নৌবহর ও বিমানবহর ভারতবর্ষে গড়িবার জন্য আন্দোলন হইয়াছে প্রচুর,

কিন্তু বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক নেতাগণ ইহাতে রাজী হন নাই। আজ ইহার বিষময় ফল ফলিতেছে। অন্যথা হাজার হাজার মাইল দূর হইতে জাপান কলম্বো বা কটক পর্য্যন্ত নৌ-অভিযানে সাহসী হইত না।

জাপানীগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের সমুদ্রতীর আক্রমণের অভিসন্ধি ও চেষ্টা এক্ষণে আর অস্পষ্ট নহে। চক্রশক্তির যে 'গ্রাণ্ড ষ্ট্রাটিজি'র কথা আমরা শুনিতেছি, ইহা বোধ হয় সেই বিরাট রণ-পরিকল্পনারই আক্রমণ-পর্ব্ব! ইউরোপে জার্ম্মাণীর রণনৈতিক অভিযান নূতন করিয়া আরম্ভ হয় নাই। এই অবসরে জাপানী উৎপাত হয়তো পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিম্বা মধ্যপ্রাচ্যে জার্ম্মাণীর অভিযান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জাপান আরব সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে। সিঙ্গাপুর হইতে করাচী বা এডেন পর্য্যন্ত গোটা সমুদ্রপথের উপর তাহারা যদি প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে, তবে জলপথে ভারতবর্ষ, বৃটেন, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার যোগাযোগ বিনষ্ট হইবে এবং ভারতবর্ষ কতকটা নৌপথে অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়িবে। ইহা দ্বারা জাপান পরোক্ষে ইউরোপীয় সংগ্রামে জার্ম্মাণীকে যেমন সাহায্য করিতে চাহে, তেমনই মিত্রশক্তির যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিভ্রাট ঘটাইতে চাহিতেছে। ভারতবর্ষের উপর জলপথে ও বিমানপথে যে আক্রমণ সুরু হইল এবং যাহা এখনও একান্তরূপে সমুদ্র-তটভূমিতেই নিবদ্ধ, তাহা আরও অভ্যন্তরভাগে প্রসারিত হইবে কিনা, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের ইহাই উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন। সম্ভবতঃ জার্ম্মাণীর নূতন অভিযানের আগে জাপান ভারতবর্ষের অভ্যন্তরভাগে আক্রমণাত্মক অভিযানে বাহির হইবে না। ব্রহ্মদেশে এখনও যুদ্ধ চলিতেছে এবং অষ্ট্রেলিয়া আজও প্রায় অক্ষত আছে। সুতরাং এই দুই দিক দিয়া কিছুটা ভরসা পাওয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ অবশ্য মার্কিণ নৌবহরের দোহাই দিতেছেন, কিন্তু এই প্রকার সান্ত্বনা সামরিক দিক দিয়া বিচার-সাপেক্ষ। মার্কিণ নৌবহর কত হাজার মাইল দূরে এবং কি অবস্থায় আছে, তাহা কাহারও জানা নাই। যদি এই সময় মার্কিণ নৌবহর অষ্ট্রেলিয়ায়ও উপস্থিত থাকিতে পারিত, তাহা হইলেও জাপান বহুদূর সমুদ্রের এই দুঃসাহসিক অভিযানে ইতস্ততঃ করিত। তবে, সিংহল, মাদ্রাজ এবং উড়িষ্যা বা বাঙ্গলার উপকূলভাগে যাহাই ঘটুক না কেন, পরিণামের আত্মবিশ্বাস ও জয়ের আশা লইয়া ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই।

—৩—

বঙ্গোপসাগরে

১৫ই এপ্রিল, '৪২।

বঙ্গোপসাগরে পর পর কতকগুলি জাহাজডুবি হওয়ায় বৃটেনে যথেষ্ট উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুঃসময়ে দুইখানা যুদ্ধ-জাহাজ, একখানা বিমানবাহী জাহাজ ও ছয়খানা বাণিজ্য জাহাজ উড়িষ্যা ও সিংহলের উপকূলে নিমজ্জিত হইয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল এই প্রসঙ্গে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে, গত ৪ঠা এপ্রিল একটি বড় জাপানী নৌবহরকে ভারত মহাসাগর দিয়া সিংহল অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। এই নৌবহরে অন্ততঃ ৩ খানা বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাট্‌লশিপ, ৫ খানা বিমানবাহী জাহাজ এবং কয়েকখানা বড ও ছোট যুদ্ধজাহাজ ও কতকগুলি ডেষ্ট্রয়ার ছিল। কলম্বো ও ত্রিঙ্কোমালির পোতাশ্রয়ে জাপানীরা যে বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল, তাহাতে জাপানী বিমানবহরের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃটিশ পক্ষেরও অনেকগুলি বিমান নষ্ট হইয়াছে, তীরবর্ত্তী কামানগুলির সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, যে কয়েকখানা জাহাজ পোতাশ্রয়ে ছিল সেগুলিও জখম হইয়াছে। জাপানী বিমানবাহী জাহাজগুলির মধ্যে একখানি যথেষ্ট বড় এবং নূতন। এই পোতখানি ২৮ হাজার টনের কম নহে। মিঃ চার্চ্চিলকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, জাপানীরা যখন কলম্বো আক্রমণ করিয়াছিল তখন বৃটিশ বিমানবহর পাল্টা-আক্রমণ চালাইয়াছিল কিনা। মিঃ চার্চ্চিল স্বীকার করেন যে, পাল্টা-আক্রমণ চালানো হইয়াছিল বটে, কিন্তু সবগুলি এরোপ্লেনই হয় নষ্ট, না হয় জখম, কিম্বা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে। জাপানীরা যে বিমানবাহী জাহাজ হইতে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই জাহাজটির উপর টর্পেডোবাহী বৃটিশ বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল বটে, কিন্তু মেঘ ও বৃষ্টির জন্য উহা ব্যর্থ হইয়াছে। ভারত মহাসাগরে বৃটিশ জাহাজডুবির এই সমস্ত বিবরণ পাইয়া লণ্ডনের 'টাইমস্', 'নিউজ ক্রনিক্যাল', 'ডেলী মেল', 'ডেলি এক্সপ্রেস' প্রভৃতি বড় বড় পত্রিকাগুলি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—ব্যাপার কি? বৃটিশ নৌবহরের ক্রমাগত এত ক্ষতির রহস্য কি?

পত্রিকাগুলির মতে বৃটিশ নৌ-রণপরিকল্পনার গোড়ায় নিশ্চয়ই কোন বড় রকমের ত্রুটি আছে। নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী—সমর বিভাগের এই তিন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য ও সহযোগিতার অভাব আছে বলিয়া যে সন্দেহ হইতেছিল, এই সমস্ত সামরিক দুর্ঘটনায় তাহাই দৃঢ় হইতেছে। নৌ-বহরের সহিত বিমানশক্তির পরিপূর্ণ সহযোগিতার অভাবে এ পর্য্যন্ত বহু দুর্ব্বিপাক ঘটিয়াছে। নৌ-বহরের বণ্টন (naval dispositions) নির্দ্দিষ্ট নৌ-রণনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহ আছে এবং ঘন ঘন নৌ-দুর্ঘটনার দ্বারা একথাই প্রমাণিত হইতেছে যে, নৌ-বিভাগীয় কর্ত্তাগণের পক্ষে নৌ-নীতি পরিচালনার সংশোধন ও পরিবর্ত্তন একান্তরূপে জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। 'ডেলী মেল' কঠোর ভাষায় বলিতেছেন, 'নৌ-শক্তির এই ক্রমিক ক্ষয় অত্যন্ত সঙ্কটের কথা।' It is one of the grimmest tales in the annals of Royal Navy and it demands urgent attention. রাজকীয় নৌ-বহরের ইতিহাসে এগুলি সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ঘটনার অন্যতম এবং অবিলম্বে এদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বিভিন্ন সংবাদপত্রের এই মন্তব্যের সঙ্গে 'রয়টারে'র নৌ-বিশেষজ্ঞ সংবাদদাতার সমালোচনাও চিন্তার যোগ্য। 'হার্মিস', 'কর্ণওয়াল' ও 'ডরসেটসায়ার' ডুবির কথা আলোচনা করিয়া তিনি বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে প্রত্যেকটি জাহাজই অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ, বৃটিশ নৌবহর নানা সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত থাকায় নৌ-শক্তির উপর প্রবল চাপ পড়িতেছে। এই অবস্থায় এই জাহাজসমূহের নিমজ্জন বৃটিশ নৌবহরের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড আঘাতের মত। জাপানী বোমারুগুলি অত্যন্ত ব্যাপক ও কঠোর আক্রমণ চালাইয়াছিল। ৩।৪ খানা বিমানবাহী জাহাজ হইতেই তাহারা এই অভিযানে বাহির হইয়াছিল। তাঁহার মতে জাপ বিমানবাহী জাহাজগুলিতে গড়পড়তা ৪০ খানা বিমান আছে। এই সমস্ত পোতের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎখানা ২৮ হাজার টনের এবং উহাতে ৬০ খানা বিমান ধরে। অপর ৩ খানা জাহাজের প্রত্যেকটি ৪৬ খানা করিয়া এবং ২ খানা জাহাজ যথাক্রমে ৩০ ও ২০ খানা করিয়া বিমান বহন করে। সম্ভবতঃ জাপানীরা অন্যান্য কয়েকখানা ক্ষুদ্র জাহাজকেও বিমানবাহী পোতে রূপান্তরিত করিয়াছে। 'রয়টারের'র এই বিশেষজ্ঞের মতে জাপানীরা বৃটিশ জাহাজগুলির বিরুদ্ধে টর্পেডো ব্যবহার করে নাই, করিয়াছে ছোঁমারা বিমান (dive bombers)। এই বিমানগুলির

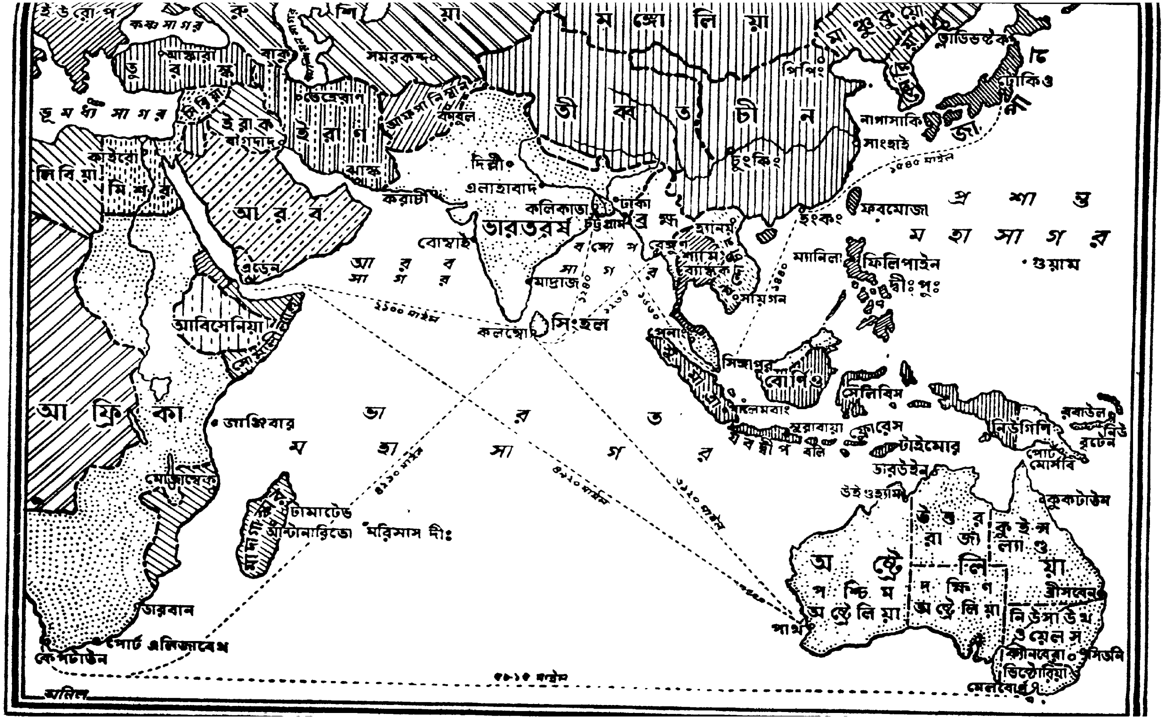
কার্য্যকারিতা ও নৈপুণ্য সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ। তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন—

Japanese successes have demonstrated very convincingly the efficacy of the dive-bomber in naval warfare as in land operations. The accuracy with which they reach their targets is remarkable when compared with the effects of ordinary bombing high or even low altitudes. This raises a problem that may have an important bearing on the future of the war.

সহজ কথায়, জাপানীরা স্থলযুদ্ধের মত নৌ-সংগ্রামেও ছোঁমারা বিমানের সাফল্য ও নৈপুণ্য সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত করিয়াছে। আকাশের খুব উপর বা নীচু হইতে সাধারণ বোমাবর্ষণের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, উহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, জাপানী ছোঁমারা বিমানগুলি তাহাদের লক্ষ্যবস্তুর উপর যেরূপ নির্ভুলভাবে পতিত হয়, তাহা খুব অভিনব। ইহা দ্বারা এমন একটা সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে যাহা ভবিষ্যৎ সংগ্রামের ধারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিবে।

বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে জাপানীদের অভিযান সম্পর্কে এই সমস্ত মতামত নৌ-যুদ্ধের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিতেছে। শত্রুপক্ষের কৃতিত্বের প্রশংসা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু শত্রুর প্রকৃত শক্তি কোথায়, তাহার নৈপুণ্যের মূল রহস্য কি, মিত্রপক্ষের কেন পরাজয় হইতেছে এবং এই পরাজয়ের মধ্যে রণনৈতিক ও রণকৌশলের কি কি দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি আছে, তাহা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে জানা ও আলোচনা করা উচিত। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই শত্রুকে তুচ্ছ করা কিম্বা উহার শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখা উচিত নহে। জাপানীদের সম্পর্কে বরাবর বহু বিশেষজ্ঞের এই ধারণাই ছিল যে, রণশক্তিতে জাপান প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র নহে। তাহাদের নৌ-বহরের যোগ্যতা আছে বটে, কিন্তু তাহা যেমন বৃটেনের সমকক্ষ নহে, তেমনই জাপানীরা বিমানবহরের দিক দিয়া একেবারে নগণ্য। এই ভ্রান্ত ধারণা মিত্রশক্তির রণনীতিতে আপাততঃ প্রকাণ্ড বিপর্য্যয় ডাকিয়া আনিয়াছে। বিশেষভাবে জাপানের বিমানবহর সম্পর্কে অত্যন্ত ভুল ধারণা থাকায় প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে এবং বহু দ্বীপে ও উপদ্বীপে একে একে বহু পরাজয়

ঘটিয়াছে। এই পরাজয়ের প্রথম সূত্রপাত বিখ্যাত 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্' ও 'রিপাল্‌স্' ডুবির মধ্যে। বর্ত্তমানে এই দুইটি ভীমকায় যুদ্ধ-জাহাজের ধ্বংসের যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও দেখা যায় যে, বৃটিশ নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি এডমিরাল স্যার টম ফিলিপ্‌স্‌ও এই ভুল করিয়াছিলেন। উত্তর মালয়ে জাপানী নৌ-বহরকে অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা জব্দ করিতে গিয়া তিনি 'রিপাল্‌স্' ও 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্' সহ খোলা সমুদ্রে বহুদূর অগ্রসর হইয়া যান। তাঁহার অনুমান ছিল এই যে, সেদিন দিনের বেলা জাপানী বিমানেরা তেমন ব্যাপক আক্রমণ করিতে পারিবে না এবং তিনি পর্য্যবেক্ষণ-কারী জাপ বিমানের চক্ষে ধূলি দিয়া মালয়ের উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে পৌছিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার এই হিসাবে ভুল হইয়াছিল। কারণ, ঐদিনই সন্ধ্যা ৫-২০ মিনিটের সময় পর্য্যায়ক্রমে মোট ২৯ খানা টর্পেডোবাহী ও বোমাবাহী জাপ বিমান প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছিল। 'রিপাল্‌স্' ও 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের' কামানগুলি প্রাণপণে বাধা দেয় বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা পাইল না। ভীমকায় জাহাজ দুইটি অতি দ্রুত ডুবিয়া যায়। ইহার প্রথম কারণ জাপ বিমানশক্তি সম্পর্কে হিসাবে ভুল এবং দ্বিতীয় কারণ (মিত্রপক্ষের) বিমান সহযোগিতার একান্ত অভাব। যুদ্ধজাহাজ দুইটি এত দূর-সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, তীর হইতে মিত্রপক্ষীয় বিমানেরা কোন সাহায্য দিতে পারে নাই। আধুনিক সমরনীতি সম্পর্কে যাঁহারা কিছু খোঁজ খবর রাখেন তাঁহারাই জানেন যে, বর্ত্তমান কালের নৌ-বহরগুলি বিমানবহরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া চলিতে পারে না। বড় বড় যুদ্ধজাহাজগুলি বোমারু বিমান ও টর্পেডো বিমানের পাল্লায় পড়িয়া প্রায় অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। নরওয়ের যুদ্ধে, ক্রীটের যুদ্ধে, ইংলিশ চ্যানেল ও প্রাচ্যখণ্ডের যুদ্ধে এই তথ্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, নৌ-বহর একান্তরূপে বিমানশক্তির উপর নির্ভরশীল। যে তথ্য বহুদিন যাবৎ রণনৈতিক মহলে আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে, বৃটেনের নৌ-বিভাগীয় কর্ত্তাগণ কেন সেই দিকে শৈথিল্য দেখাইতেছেন, ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিশেষভাবে যে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি দ্বীপ ও সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল তাঁহাদের নিকট নৌযুদ্ধের এই বিপুল পরিবর্ত্তন বহুদিন আগেই স্পষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু ১৯৩৯ সাল হইতে সংগ্রাম চালাইয়াও আজিকার বৃটিশ সমরকর্ত্তাগণ এই দিক দিয়া সচেষ্ট ও সক্রিয় হন নাই। আজও এই গভীরতর সঙ্কটের দিনে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি নৌ-যুদ্ধের ও নৌ-রণপরি-


ইউরোপ
কৃষ্ণ সাগর
রুশিয়া
মঙ্গোলিয়া
মাঞ্চুকুয়ো
ভ্লাডিভস্টক
টোকিও
জাপান
তুরস্ক
আঙ্কারা
বাকু
সমরকন্দ
পিপিং
ভূমধ্য সাগর
ইরাক
ইরাণ
তেহেরাণ
আফগানিস্থান
কাবুল
তীব্বত
চীন
নাগাসাকি
বাগদাদ
সাংহাই
কাইরো
লিবিয়া
মিশর
দিল্লী
চুংকিং
১৫৪০ মাইল
এলাহাবাদ
করাচী
ঢাকা
কলিকাতা
আরব
ব্রহ্ম
ফরমোজা
হংকং
প্রশান্ত মহাসাগর
ভারতবর্ষ
চট্টগ্রাম
বোম্বাই
বঙ্গোপসাগর
রেঙ্গুণ
শ্যাম
আনাম
ম্যানিলা
ফিলিপাইন
গুয়াম
আরব সাগর
এডেন
মাদ্রাজ
ব্যাঙ্কক
সায়গন
আবিসেনিয়া
কলম্বো
সিংহল
পেনাং
সিঙ্গাপুর
বোর্ণিও
সেলিবিস
পালেমবাং
আফ্রিকা
জাঞ্জিবার
ভারত মহাসাগর
সুরাবায়া
ফ্লোরেস
রবাউল
নিউগিনি
নিউ বৃটেন
যবদ্বীপ
বলি
টাইমোর
পোর্ট মোর্সবি
ডারউইন
মোজাম্বিক
উইণ্ডহ্যাম
কুকটাউন
টামাটেভ
আন্টানারিভো
মরিসাস দ্বীঃ
মাদাগাস্কার
উত্তর রাজ্য
কুইন্সল্যাণ্ড
অষ্ট্রেলিয়া
পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া
দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া
ব্রীসবেন
ডারবান
পার্থ
নিউসাউথ ওয়েলস
পোর্ট এলিজাবেথ
কেপটাউন
ক্যানবেরা
সিডনি
ভিক্টোরিয়া
মেলবোর্ণ
অনিল

কল্পনার তীব্র সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জাপান যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে তাহার পক্ষে সমুদ্রপথের অভিযানই হইবে বড় কথা। সমুদ্রপথের অভিযানের দ্বারা কোন বিদেশী রাজ্যের আক্রমণ সর্ব্বদাই রণনীতির একটা বৃহত্তম জটিল প্রশ্ন। কারণ এই প্রকার অভিযানে নৌ-বহর, বিমানবহর ও স্থলবাহিনীকে সম্মিলিতভাবে ঘড়ির কাঁটার মত নিপুণ শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিতে হয়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সংগ্রামে জাপান গোড়া হইতেই এই তিন বাহুর সমন্বয় শক্তির দ্বারা রণনৈতিক মহলকে চমৎকৃত করিয়াছে। কিন্তু মিত্রশক্তির রণপরিকল্পনার যাঁহারা কর্ণধার, তাঁহারা আজও বিমানবহর, নৌ-বহর ও স্থলবাহিনীর মধ্যে পরিপূর্ণ সংযোগ ঘটাইতে পারিলেন না। বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে জাপানীদের আক্রমণ ও সাফল্য মিত্র-পক্ষীয় রণকৌশলের দুর্ব্বলতাই ঘোষণা করিতেছে। এই মারাত্মক ত্রুটির অবিলম্বে সংশোধন হওয়া উচিত এবং কোন নৌ-বহরকেই উপযুক্ত বিমান-বহরের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া অরক্ষিত সমুদ্রপথে পাঠানো উচিত নহে।

বঙ্গোপসাগরের আত্মরক্ষার উপর মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বাঙ্গলা ও ব্রহ্মদেশ—বিশেষভাবে এই সমস্ত দেশের তটভূমি নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এইগুলির মধ্যে রেঙ্গুণসহ গোটা ব্রহ্মদেশ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। রেঙ্গুণের পর যদি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ হাতে থাকিত, তাহা হইলেও খোলা সমুদ্রের মধ্যে অন্ততঃ একটি ক্ষুদ্র ঘাঁটির সাহায্য পাওয়া যাইত। কিন্তু পোর্ট ব্লেয়ার ও আন্দামান নিঃশব্দে দখল হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বাংশে কোন ভালো ঘাঁটি মিত্রপক্ষের হাতে নাই। নৌযুদ্ধের দিক হইতে এই অবস্থাটা অসুবিধা-ব্যঞ্জক। বঙ্গোপসাগরকে ইউরোপের নর্থ সী বা উত্তর সাগরের সঙ্গে কতকটা তুলনা দেওয়া যায়। উত্তর সাগরের উপর নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্ম্মাণী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরবর্ত্তী আত্মরক্ষা, যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা নির্ভরশীল। সুতরাং বিগত ও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে উত্তর সাগরের আধিপত্য জার্ম্মাণ ও বৃটিশ রণনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব খাটাইয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালে বৃটেনের সর্ব্বপ্রধান নৌবহর বা Grand Fleet উত্তর সাগরের পথ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার ফলে জার্ম্মাণীর সরবরাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছিল। এজন্য এবার জার্ম্মাণী গোড়াতেই ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করে এবং তারপর হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম

কাড়িয়া লয়। ফ্রান্সের ব্রেষ্ট বন্দর হইতে সুরু করিয়া নরওয়ের নার্ভিক বন্দর পর্য্যন্ত সমগ্র উপকূল দখলে থাকায়, এবার উত্তর সাগরে জার্ম্মাণী আর আগের মত বিপদে পড়ে নাই। বরং জলপথে ও আকাশপথে বৃটেনের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই বিগতবারের তুলনায় অনেক বেশী বিপন্ন হইয়াছে।

বঙ্গোপসাগরও যেন অনেকটা ইউরোপের উত্তর সাগরের মত। মানচিত্রের দিকে তাকাইলে মনে হইবে যে, মাদ্রাজ হইতে এই সমুদ্রতীর ক্রমে উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং একটি কঙ্কনবলয়ের মত আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি অবশ্যই বাহিরের সরবরাহ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল নহে। যদি নির্ভরশীল হইত, তবে উত্তর সাগরের তটবর্ত্তী নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্ম্মাণী, হল্যাণ্ড ইত্যাদির মত মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ প্রভৃতিও সমুদ্রপথকে আঁকড়াইয়া ধরিত। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে সমুদ্রপথের উপর নির্ভরশীল না হইলেও, আত্মরক্ষা ও বাহিরের পৃথিবীর সহিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে বঙ্গোপসাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাদ্রাজ, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়ার সহিত এই যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। তারপর দূরবর্ত্তী ইংলণ্ডের সহিতও কলিকাতা বন্দরের যোগাযোগ বঙ্গোপসাগর দিয়াই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এই সমুদ্রকে জাপানী উৎপাত হইতে উন্মুক্ত রাখা জরুরী প্রয়োজনের মত। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে মিত্রপক্ষীয় নৌবলের আধিপত্য নষ্ট হওয়ায় জাপান এই দূর-সমুদ্রে যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছে। তবে ভরসার কথা এই যে, মে মাস পর্য্যন্ত জাপানী নৌবহর বঙ্গোপসাগরে যাহা কিছু উৎপাত সৃষ্টির সুযোগ পাইবে। জুন মাস হইতে মেঘ, বৃষ্টি ও বর্ষা ঋতুর আবির্ভাব—এমন কি মে মাসেও প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া জলপথ ও আকাশপথকে বিপর্য্যস্ত করিয়া থাকে। অতএব এপ্রিল মাস অতিক্রান্ত হইলে আগামী সেপ্টেম্বরের আগে জাপ নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে আর ততটা উপদ্রব ঘটাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। মিত্রপক্ষীয় নৌবল ও বিমানবল সেই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই বঙ্গোপসাগরে এবং উহার তিন দিকবর্ত্তী দীর্ঘ উপকূলে আত্মরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

—৪—

চট্টগ্রামের আক্রমণ

১০ই মে, '৪২।

মহাযুদ্ধ এতদিন ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে ছিল। আমরা দূর হইতে উহার গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমুদ্রপথে ও উপকূলভাগে জাপ নৌ-বহরের দৌরাত্ম্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, স্থলপথের সংগ্রাম ব্রহ্মদেশের সীমায় আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্রহ্মদেশে মিত্রপক্ষের বাধাদান আপাততঃ শেষ হইয়া গেল। ব্রহ্ম সংগ্রামের অবসানে জাপান কোন্ দিকে যাইবে, তাহা লইয়া সর্ব্বত্র গবেষণা হইতেছিল। সেই গবেষণাও আজ নিস্তব্ধ হইতে চলিয়াছে। আজ যুদ্ধ আমাদের দেশে, আমাদের বাঙ্গলার বুকে, আমাদের নিজস্ব গৃহ ও সংসার সীমায় তাহার অশুভ মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিল। বাঙ্গলা-দেশের ইতিহাসে এক অভাবনীয় সঙ্কট, এক নূতন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। আমরা মহাযুদ্ধের নূতনতর পর্ব্বে উপনীত হইলাম।

গত ২৫শে বৈশাখ, ৮ই মে শুক্রবার অপরাহ্ণে বাঙ্গলাদেশে প্রথম বোমা বর্ষিত হইয়াছে। সরকারীভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, চট্টগ্রামে শুক্রবার অপরাহ্ণে ও শনিবার সকালে জাপ বোমারু বিমান ও জঙ্গীবিমান হানা দিয়াছিল। তাঁহারা কেবল বোমাবর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মেসিনগানও চালাইয়াছিল। আকাশের অনেক উঁচু হইতে বোমা বর্ষিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মেসিনগানের গুলীবর্ষণের সংবাদে মনে হইতেছে কোন কোন বিমান হয়তো নীচুতেও নামিয়াছিল। সাধারণতঃ নীচু দিয়া উড়িয়া না গেলে মেসিনগান চালানো হয় না। চট্টগ্রামে যে জাপ আক্রমণ ঘটিতে পারে ইহা লইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষণা চলিতেছিল। এজন্য পূর্ব্বাহ্ণে সতর্কতাও অবলম্বিত হইয়াছিল। ইউরোপে নেপোলিয়নের যুগ হইতে আধুনিক যুদ্ধের সুরু, তারপর শতাব্দী কালের অধিক সময় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের কোন ব্যাপক রূপ এই দেশে অনুভূত হয় নাই। সুতরাং বাঙ্গলা ভূমির ইতিহাসে ইহাকে আমরা এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়াই ধরিয়া লইব। পূর্ব্ব বাঙ্গলার নদীপথে এবং উপকূলভাগে একদা পর্ত্তুগীজ দস্যুদের উৎপাত

ঘটিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের তুলনায় উহা সত্যই উৎপাত মাত্র। আজ জাপানী বিমানবহর বাঙ্গলার চট্টলভূমিতে হানা দিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গই প্রথম এই দানবীয় যান্ত্রিক সংগ্রামের তীব্র ও তিক্ত স্বাদ অনুভব করিল।

ব্রহ্ম সংগ্রামের পর জাপানের লক্ষ্য ভারতবর্ষ কিম্বা অষ্ট্রেলিয়া, এই প্রশ্ন সর্ব্বত্র জিজ্ঞাসিত হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দরে অনেক আগেই বোমা বর্ষিত হইয়াছে। তারপর এপ্রিল মাসে সিংহলে এবং উড়িষ্যার উপকূলে জাপ বিমানবহর হানা দিয়াছিল। সমুদ্রপথে বিমানবাহী জাহাজযোগে সেই আক্রমণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু চট্টগ্রামে সম্ভবতঃ সমুদ্রপথের দিক হইতে আক্রমণ ঘটে নাই, ঘটিয়াছে আকিয়াব হইতে। ব্রহ্ম সংগ্রামের পর চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল না। বিশেষতঃ আকিয়াব হাতছাড়া হাওয়ার সেই সম্ভাবনা আরও নিকটতর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। আরাকানের উপকূলভাগস্থ আকিয়াবকে বাঙ্গলা ও ব্রহ্মের শেষ সীমা বলা যাইতে পারে। জাপ সৈন্যেরা এখানে জলপথ দিয়া আসে নাই, আসিয়াছে আরাকানের দুর্গম স্থলপথ ধরিয়া।* ব্রহ্মদেশের টেনাসেরিম বিভাগ যেমন দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ সুতার মত নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চট্টগ্রাম বিভাগকেও কতকটা তেমন বলা যায়। উহা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়া আরাকানের সঙ্গে মিশিয়াছে। আরাকান ও চট্টগ্রাম টেনাসেরিম বিভাগের মতই পাহাড়, নদী, অরণ্য ও বন্ধুর ভূমির বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক যুদ্ধের যন্ত্রবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বিঘ্নকে বার বার অস্বীকার করিতেছে এবং রণকৌশলের দুঃসাহসের দ্বারা সেগুলি অতিক্রান্ত হইতেছে।

জাপানী বোমারু বিমানের চট্টগ্রামে হানা দেওয়ার অর্থ কি? এই পর্য্যন্ত একমাত্র অষ্ট্রেলিয়ার বন্দর ছাড়া জাপানীরা অন্য কোথাও বিনা উদ্দেশ্যে বিমান আক্রমণ করে নাই। 'বিনা উদ্দেশ্যে' বলিবার অর্থ এই যে, বোমাবর্ষণের পর স্থলপথে অভিযান ও আক্রমণের মতলব না লইয়া জাপ বোমারুরা হানা দেয় নাই। জাপানী বিমানবাহিনীর একটা বৈশিষ্ট্য স্মরণে রাখা উচিত। উহা বৃটেনের শক্তিশালী আর-এ-এফ বা রাজকীয় বিমান

---

* এই বিষয়ে মতবিরোধ আছে। চুংকিংয়ের চীনা কর্তৃপক্ষীয় মহলের মতানুসারে জাপানীরা ক্ষুদ্র নৌ-বহরযোগে আকিয়াবে অবতরণ করিয়াছে, আর নয়াদিল্লীর কর্তৃপক্ষের মতানুসারে তাহারা আসিয়াছে আরাকান প্রদেশের পার্ব্বত্যপথ ধরিয়া।

বাহিনীর মত কোন পৃথক ও বিচ্ছিন্ন সামরিক বাহু নহে। বৃটিশ বিমানবহরের সহযোগিতা যেমন নৌ-বাহিনী ও স্থলবাহিনীর সহিত রহিয়াছে, তেমনই কেবলমাত্র বোমাবর্ষণের উদ্দেশ্য লইয়া বিচ্ছিন্নভাবেও সে অভিযান করিয়াছে এবং করিতেছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে, অধিকৃত ফ্রান্সে ও বেলজিয়ম ইত্যাদিতে বৃটিশ বিমানবহর নৌ ও স্থলবাহিনীর অপেক্ষা না রাখিয়া বোমারু অভিযান চালাইতেছে। কিন্তু জাপানী বিমানবহর সাধারণতঃ স্থল ও নৌবাহিনীর সহযোগিতা ছাড়া চলে না। তাহারা কোন 'স্বাধীন' ও বিচ্ছিন্ন সামরিক বাহু নহে। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণ কি বাঙ্গলাদেশ আক্রমণের উদ্যোগ পর্ব্ব? কিম্বা ইহার উদ্দেশ্য কেবল চট্টগ্রামকে নৌ ও বিমানপথে অকেজো করিবার চেষ্টা অথবা জাপানীদের অন্য কোন গুরুতর মতলব আছে? বর্ত্তমানে উত্তর ব্রহ্ম হইতে জাপানীরা লাসিওর চীন-ব্রহ্ম সড়ক ধরিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চীনা রাজ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। চীনকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করাই ইহার লক্ষ্য। 'রয়টারের' সমর-সমালোচক বলিয়াছিলেন, মিত্রপক্ষীয় বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনী সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের দিকে পিছু হটিতেছে। চিন্দুইন নদীতীর ধরিয়া কি জাপানীরা মণিপুরের সীমানায় পৌছিবে? বৃটিশ সৈন্যরা চিন্দুইন এলাকায় রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। জাপানীদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া এমন সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে, তাহারা মণিপুর সীমা ধরিয়া আসামের উপর চাপ দিবে। হয়তো দুর্গম পথের জন্য এই চাপ যথেষ্ট প্রবল হইবে না। শুধু পশ্চাৎ দিক হইতে বিপন্ন করার ইহা কৌশলমাত্র। অন্যপক্ষে তাহারা আকিয়াব ও চট্টগ্রামের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবে এবং এইভাবে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ও ব্রহ্মের সীমান্ত ধরিয়া আসাম ও বাঙ্গলাদেশকে বিপন্ন করিতে চাহিবে। জাপানীরা আকিয়াবে পৌছায় এবং চট্টগ্রামে হানা দেওয়ায় কলিকাতা, ঢাকা ও নোয়াখালী সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ ঘটিল। কারণ এগুলি এক্ষণে জাপ বোমারুর পাল্লায় পড়িল। মানচিত্রের উপর সোজা স্কেল ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, বিমানপথে আকিয়াব হইতে চট্টগ্রাম ১৯০ মাইল, কলিকাতা ৩৪০ মাইল এবং ঢাকাও প্রায় ৩৪০ মাইল। অপর পক্ষে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা বিমানযোগে বোধ হয় ২২৫ মাইলের বেশী নহে। সুতরাং জাপ বোমারু বিমান সম্পর্কে আর ঔদাসীন্য বা অলস গবেষণার স্থান নাই। তাহারা কেবল চট্টগ্রামে বোমা ফেলিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে, এমন মনে করিবার

কারণ নাই। কলিকাতা ও মাদ্রাজের উপরও তাহারা যুগপৎ হানা দিতে পারে। যদি এই বোমাবর্ষণের উদ্দেশ্য আক্রমণ না হইয়া থাকে, তবে অন্ততঃ ভারতবর্ষের উপকূলভাগের ঘাঁটি নষ্ট করিয়া বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে জাপ নৌবহরের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইহা যে দুঃসাহসিক চেষ্টা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

—৫—

আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ

২০শে মে, '৪২।

ব্রহ্মদেশের সংগ্রামের পর জাপানীরা কোন্ দিকে অগ্রসর হইবে, ইহা যেমন গবেষণার বিষয় তেমনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলে তাহারা স্থলপথে ও জলপথে আক্রমণ চালাইবে কিম্বা কেবলমাত্র বোমাবর্ষণের মধ্যেই তাহাদের যুদ্ধ নিবদ্ধ রাখিবে, ইহাও আলোচনার বিষয়। যদি তাহারা স্থলপথে অগ্রসর হয়, তবে তাহারা প্রথমে আসাম আক্রমণ করিবে কিম্বা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম একযোগে লাঞ্ছিত হইবে? অথবা জাপানীরা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের উপকূলবর্ত্তী বন্দরের দিকেই তাহাদের আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখিবে? —এই ধরণের অনেক প্রশ্ন রণনীতির দিক হইতে সংশয় সৃষ্টি করিতেছে। একথা সত্য যে, ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, আসাম হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে জাপানের পক্ষে আক্রমণ চালান একটা দুঃসাহসিক কল্পনার মত। একদিকে অষ্ট্রেলিয়া, আর একদিকে চীন এবং তাহার পিছনে সোভিয়েট রাশিয়া, এতগুলি রাষ্ট্রশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জাপানের পক্ষে গোটা ভারতবর্ষ গিলিবার চেষ্টা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তথাপি জাপানের নিজস্ব রণনীতির বিচারে কয়েকটি প্রশ্ন ভাবিবার আছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের মনে দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের জন্য লোভ ছিল। কোন কোন জাপ সেনাপতি হংকং ও সিঙ্গাপুর দখলের পর এক আঘাতে ভারতবর্ষ ছিনাইয়া লইবার দুঃস্বপ্নও রচনা করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত প্ল্যানের অধিকাংশ ইতিমধ্যেই কার্য্যক্ষেত্রে পালিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত

জাপানীরা যে সমস্ত দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিজেদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহার পরিমাণ ও ঐশ্বর্য্য প্রচুর। এমন কি এই হিসাবে জার্ম্মাণীর চেয়ে জাপান বেশী লাভবান। কিন্তু এই দেশগুলি জাপানীরা নিশ্চয়ই সুরক্ষিত করিতে চাহিবে অর্থাৎ জাপানীরা বর্ত্তমানে যে দুর্দ্দান্ত আক্রমণাত্মক নীতি চালাইতেছে, এক সময়ে উহা ক্ষান্ত হইবেই এবং মিত্রশক্তিবর্গ পাল্টা আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইবেন। এই পাল্টা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জাপান নিশ্চয়ই চিন্তা করিতেছে। ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার পক্ষে ব্রহ্মদেশ যেমন দূরবর্ত্তী ঘাঁটি, তেমনই ভারতবর্ষ হইতে পাল্টা আক্রমণের ক্ষেত্রে আসাম ও পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রহ্মদেশের পক্ষে একান্ত নিকটবর্ত্তী ঘাঁটি। আসাম ও পূর্ব্ব বাঙ্গলা যদি ঘাঁটি হইয়া থাকে, তবে ইহার সংশ্লিষ্ট জলপথ বা বঙ্গোপসাগরও সেই হিসারে জরুরী প্রয়োজনের মত। যদি এই অনুমান সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশে শক্ত হইয়া বসিবার জন্য জাপান হয়তো আসাম ও পূর্ব্ব বাঙ্গলা আক্রমণ করিতে চাহিবে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কোন বৃহৎ নদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত জাপানী অগ্রগতির সম্ভাব্যস্থল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রামে এবং আসামের পূর্ব্ব সীমানাবর্ত্তী কোন কোন সহরে ইতিমধ্যেই জাপানী বোমারু হানা দিয়াছে। চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণের উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। তবে যুদ্ধ যখন আসামের প্রান্তলগ্ন পশ্চিম ব্রহ্মের সীমানা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, তখন আসামের বুকে জাপ বোমারুর আবির্ভাব অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত নহে। চিন্দুইন নদী ব্রহ্মদেশ ও আসামের সীমান্তপথ ধরিয়া প্রবাহিত। জাপানীরা এই নদী অতিক্রম করিয়াছে। সুতরাং শত্রুসৈন্য আসামের অদূরবর্ত্তী সীমানার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। শিলংয়ের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, আসাম সামরিক ও বে-সামরিক উভয় দিক দিয়া আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়ার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্যবল ও অস্ত্রবল আসামে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যদি কোন দুঃসাহসী শত্রু স্থলপথে বা আকাশপথে আসাম আক্রমণে উদ্যত হয়, তবে উহাকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হইবে, এমন ভরসা কর্ত্তৃপক্ষ দিতেছেন। আসামের জনসাধারণ শান্ত ও সংযত আছেন।

আধুনিক রণনীতিতে বোমারু আক্রমণ একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই আক্রমণের প্রথম উদ্দেশ্য বিপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা।

জনসাধারণের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দৈনন্দিন শাসনকার্য্য চালাইবার বিভ্রাট হইবে এবং উহার ফলে সামরিক কার্য্যকলাপও বাধাগ্রস্ত হইবে। কোনও দেশ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে উহার জনসাধারণকে ভীতিবিহ্বল করিয়া দেওয়ার অর্থ সেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে কাবু করা এবং রাষ্ট্রশক্তি যদি অসামরিক ব্যাপারেই ২৪ ঘণ্টা ব্যতিব্যস্ত থাকে, তবে যুদ্ধ চালাইবে কিরূপে? এই জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বোমাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া জনসাধারণের ধীরস্থির থাকা, সংযম ও সাহস সহকারে এই দুর্ব্বিপাকের সম্মুখীন হওয়া। ব্যাপক আকারে কলেরা বা বসন্ত দেখা দিলে জনসাধারণের যতটুকু সতর্কতা ও সাহস অবলম্বনের প্রয়োজন, শত্রুর আক্রমণের মুখেও তেমন নীতি অনুসরণযোগ্য। আর যদি জনসাধারণ ঘাবড়াইয়া গিয়া যত্রতত্র ছুটাছুটি করিতে থাকে, তবে উহাদ্বারা ঘোরতর বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। প্রকৃতপক্ষে এমন আচরণের দ্বারা শত্রুকেই সাহায্য করা হইবে। সুতরাং আসামের জনসাধারণের প্রয়োজন ধৈর্য্য ও সাহসের। খাদ্য, পানীয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লোকজন অপসারণ, শরণাগতকে আশ্রয় দান, চিকিৎসা, শুশ্রূষা, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, পরস্পরকে সাহায্যদান ও সহযোগিতা করা ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন আসামের (এবং বাঙ্গলার) সম্মুখে রহিয়াছে। আসামে যে সমস্ত পাহাড়িয়া জাতি আছে তাহারা যাহাতে কোন সঙ্কটের সুযোগ লইতে না পারে, তেমন সতর্কতা অবলম্বন করা আসামের গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য। আসাম সরকার নিশ্চয়ই এই দিক দিয়া সচেতন।

আসামে খুব ব্যাপক বোমাবর্ষণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ওখানে কোন বন্দর ও নৌঘাঁটি নাই এবং কলিকাতা বা লণ্ডনের মত কোন বড় সহরও নাই। শ্রমশিল্পের সহর হিসাবেও আসাম লোভনীয় নহে। আসামের এই অবস্থাটা স্থলপথে অভিযানের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অনেক সময় বড় বড় নগর, বন্দর ও দুর্গ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতে থাকে। প্রচুর কামানের গোলা ও বোমাবর্ষণের দ্বারা বৃহৎ নগরীকে যেভাবে ধ্বংস করার প্রয়োজন হইয়া থাকে, আসামের পক্ষে তেমন সমস্যা দেখা দিবে না। ভৌগোলিক কারণে যে কোন শত্রুর পক্ষেই আসাম 'আক্রমণ দুরূপ ব্যাপার। দুর্গম অরণ্য ও পাহাড় আসামের বৈশিষ্ট্য। জাপানীরা হয়তো ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করিতে চাহিবে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র দলবিভক্ত শত্রুসৈন্যকে প্রতিরোধ বা ঘায়েল করা আদৌ কঠিন

নহে। গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে আসাম অত্যন্ত উপযোগী, যেমন উপযোগী পূর্ব্ব বাঙ্গলা। নগর ও বন্দর-প্রধান দেশে যে ধরণের ব্যাপক অভিযান ঘটিয়া থাকে, আসামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহা সম্ভব হইবে না। সুতরাং আসামের জনসাধারণের ভীত হইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বরং তাহাদের ইতিহাসে নূতন কিছু ঘটিবে। এই পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বহিঃশত্রুর যত আক্রমণ হইয়াছে, সমস্তই ঘটিয়াছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া। খাইবার ও বোলান গিরিবর্ত্ম এ কারণে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব সীমানা কোন বহিঃ-শত্রুর আক্রমণে এই পর্য্যন্ত রক্তলাঞ্ছিত হয় নাই। প্রাচীন বা মধ্য যুগে যাহা ঘটে নাই, হয়তো আধুনিক যন্ত্রযুগে তাহাই ঘটিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গের নদীপথ ও নরম মাটী এবং আসামের অরণ্যপথ ও পার্ব্বত্য মাটী এজন্য প্রস্তুত!

—৬—

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ

২১শে ডিসেম্বর, '৪২।

মে মাসের প্রথম ভাগে চট্টগ্রামে দুইবার বিমান হানার পর জাপানীরা সম্পূর্ণ নিঃশব্দ থাকে। একাদিক্রমে প্রায় ৬ মাস কাটিয়া গেল। ব্রহ্মদেশের পর কলিকাতায় বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইবে আশঙ্কা করিয়া কলিকাতা হইতে গত শীতকালেই লক্ষ লক্ষ লোক চলিয়া গিয়াছিল। তারপর মে মাসে চট্টগ্রামে বোমা বর্ষিত হইল। জাপানীরা স্থলপথে না হইলেও আকাশপথে ও জলপথে যে ভারতবর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী চট্টগ্রামে হানা দিবে, এমন ধারণা দৃঢ়তর হইল। কিন্তু চট্টগ্রামে বিমান আক্রমণের পর ৬ মাস অতিক্রান্ত হইল। ৬ মাসের মধ্যে জাপান ভারতবর্ষের দিকে অভিযান না করায় জনসাধারণের মধ্যে পুনরায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া জাপান চীনে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ব্যতিব্যস্ত ছিল। ব্রহ্মদেশ দখলের পর সেই দেশে শক্ত হইয়া বসিবার জন্য এই দীর্ঘকাল তাহারা উদ্যোগ আয়োজনও করিতেছিল। অপর পক্ষে ভারতবর্ষ হইতে ইঙ্গ-ভারতীয় সমর-কর্ত্তৃপক্ষ

ব্রহ্মদেশে পশ্চাৎ আক্রমণের ভূমিকাস্বরূপ চট্টগ্রামের দক্ষিণস্থ আরাকানে প্রবেশ করিল। চারিদিকে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে লাগিল যে, গত ৬ মাসের জাপ নিষ্ক্রিয়তা যে কোনভাবে আবার ক্রূরতার আকারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এমন সম্ভাবনা দেখা দিল। জাপান কর্ত্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতে গত এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা সহরে বোমা বর্ষিত হয় নাই। অবশেষে ২১শে ডিসেম্বর সত্যসত্যই কলিকাতা অঞ্চলে জাপানী বিমানের আক্রমণ ঘটিল। কিন্তু সেই আক্রমণ ব্যাপক নহে এবং প্রাণ ও সম্পত্তির অতি সামান্য ক্ষতিই হইয়াছে।

কলিকাতা অঞ্চলে বোমাবর্ষণের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম আক্রমণ (first raid) রাত্রিবেলায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জাপানীরা আর কোথাও প্রথম আক্রমণ রাত্রিবেলা করে নাই, দিনের বেলাই করিয়াছে। রেঙ্গুণে প্রথম আক্রমণ দিনের বেলা হইয়াছিল এবং তারপর ক্রমাগত আক্রমণের পথে জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রে এবং ভোর রাত্রেও তাহারা আক্রমণ চালাইয়াছে। রেঙ্গুণে জাপানীরা যে কারণে ব্যাপক বিমানহানার দ্বারা গুরুতর প্রাণহানি ও সম্পত্তিহানি ঘটাইতে পারিয়াছিল, কলিকাতায় তাহা সম্ভব নহে। শ্যাম দেশের সীমান্তবর্ত্তী বিমান ঘাঁটি হইতে রেঙ্গুণের দূরত্ব দেড়শত হইতে দুইশত মাইলের মধ্যে ছিল। রেঙ্গুণ সহর অট্টালিকা-প্রধান নহে, কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহই সেখানে বেশী এবং সব চেয়ে বড় কথা রেঙ্গুণবাসীরা অত্যন্ত অসাবধান ও অসতর্ক ছিল। বিমান আক্রমণের সময় তাহারা আড়াল বা আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। কিন্তু রেঙ্গুণের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে কলিকাতাবাসীরা সাবধান হইতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা প্রয়োজনমত গৃহ, গর্ত্ত এবং অন্যান্য আশ্রয়-স্থলে প্রবেশ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া এ-আর-পি'র শিক্ষা, প্রচারকার্য্য ও সাবধান বাণীতে কলিকাতাবাসীরা বোমাবর্ষণের সময় তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সজাগ হইয়াছেন।

জাপানী বিমানবহরের সংগঠন ও বিধিব্যবস্থা যে ধরণের তাহাতে উহা প্রধানতঃ সৈন্যবাহিনীর সহযোগীরূপেই ছিল। অর্থাৎ জার্ম্মানী বা বৃটেনের বিমানবহরের যেমন একটি পৃথক সত্ত্বা ও সংগঠন আছে জাপানীদের তেমন নহে। অন্ততঃ যে ৬ মাসকাল জাপান 'ব্লিজক্রিগ' চালাইয়াছে, উহার অধিকাংশ সময়েই জাপ বোমারুর একদল সৈন্যবাহিনীর কিম্বা নৌবহরের সহযোগীরূপে কার্য্য করিয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে কামানের গোলাবর্ষণই ছিল

পদাতিক দলের অভিযানের সঙ্কেত। বড় বড় কামানের অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণের আড়াল ধরিয়া পদাতিক সৈন্যরা অগ্রসর হইয়াছে। এবার যান্ত্রিক সংগ্রামের রণনীতি এই রণকৌশলের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। এবার বোমারুর বোমাবর্ষণই যান্ত্রিক দলের অভিযানের ইঙ্গিত করিতেছিল। ইতস্ততঃ দুই চারিটি দৃষ্টান্তের (যেমন অষ্ট্রেলিয়ার পোর্ট ডারুইন) ব্যতিক্রম ছাড়া ব্রহ্মযুদ্ধ পর্য্যন্ত জাপানী বোমারুর আমরা এই রণ-নীতিই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু আসাম, চট্টগ্রাম, ফেণী ও কলিকাতায় এখন পর্য্যন্ত সেই রণকৌশলের ব্যতিক্রম দেখিতেছি। অবশ্য এমন কথা নিশ্চিতরূপে কেহই বলিতে পারে না যে, জাপানীরা কিছুতেই ভারতবর্ষে অভিযান বা invasion করিবে না, কেবল বোমাবর্ষণের মধ্যেই তাহাদের সমস্ত কার্য্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকিবে। যুদ্ধ যখন চলিতে থাকে, তখন এক একটি দেশ যবনিকা অন্তরালে এক এক রকমের পন্থা ও কৌশলের আয়োজন করিতে থাকে। দূর হইতে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা উহার সম্যক বিচার সম্ভব নহে। তবে প্রকাশিত তথ্য ও সাধারণ রণনীতির বিচারে মনে হয় যে, স্থলপথে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে জাপানী অভিযানের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম এবং আকাশপথে দৌরাত্ম্য বৃদ্ধিরই একান্ত সম্ভাবনা। সৌভাগ্যের বিষয় মিত্রপক্ষ ভারতবর্ষে সমরায়োজনের যথেষ্ট সময় পাইয়াছেন। মালয় বা ব্রহ্মদেশের অবস্থা ভারতবর্ষে ঘটিবে না। কারণ, মালয় বা ব্রহ্মদেশ হইতে ক্রমাগত পিছু হটিবার সুযোগ থাকিলেও ভারতবর্ষ হইতে আর পশ্চাদপসরণের সুযোগ নাই। ঐরূপ অবস্থায় মিত্রপক্ষ কোথায় দাঁড়াইয়া জাপানকে পাল্টা আক্রমণ করিবেন? সুতরাং ব্রহ্মদেশ বা মালয়ের মত অবস্থার পুনরাবৃত্তির প্রশ্ন ভারতবর্ষের পক্ষে অবান্তর। মিত্র পক্ষ এখানে এমনভাবে প্রস্তুত হইয়াছেন যে, জাপানীদের পক্ষে অভিযান যেমন কষ্টকর, বিমান হানা দেওয়াও তেমনি শক্ত। এইজন্যই সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, জাপানী বোমারু রাত্রিবেলায় কলিকাতা আসিয়াছে, দিনের বেলা নহে। অর্থাৎ সহর রক্ষার আয়োজন এত ব্যাপক ও পাকা রকমের যে, দিনের বেলায় এখানে বিমানহানা দেওয়া শক্ত—সরকারী বিজ্ঞপ্তির ইহাই অর্থ।

২৬. ১২. '৪২.

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে পুনরায় জাপানী বোমারু বিমান কলিকাতা অঞ্চলে হানা দিয়াছিল। এই পর্য্যন্ত চারবার জাপ বিমান উৎপাত সৃষ্টি করিল। সরকারী মতে বৃহস্পতিবার রাত্রের বিমান হানায় কিছু লোক হতাহত ও কিছু ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। কতকগুলি বোমা যত্রযত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইহার আগে তিন রাত্রি যে সমস্ত জাপ বোমারু আসিয়াছিল, সেগুলি মাত্র একসঙ্গে একবারই হানা দিয়াছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাত্রে তাহারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছিল। দ্বিতীয় দল প্রথম দলের প্রায় এক ঘণ্টা পরে আসিয়াছিল। কিন্তু সংখ্যায় সেগুলি বেশী ছিল না। বিমান-মারা কামান ও জঙ্গী বিমানগুলি রাত্রির উর্দ্ধ আকাশে উহাদিগকে বাধা দিয়াছিল। উভয় পক্ষে কিছু সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছে। একখানা জাপ বোমারু ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে। বোধ হয় কলিকাতা অঞ্চলে ইহাই প্রথম শত্রু বিমানের পতন। এই কয়দিনে নগরবাসীরা বিমান হানার যথেষ্ট স্বাদ পাইয়াছেন এবং ক্রমেই তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন। এতদিন পর্য্যন্ত আমরা কেবল বিদেশের রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাপ্রদ গল্প ও সংবাদ শুনিয়াছি। যে সমস্ত সহরের উপর বোমারু বিমান ধ্বংসলীলা বিস্তার করিয়াছে, সে সমস্ত বাসিন্দাদের প্রতি আমরা গভীর সহানুভূতি অনুভব করিয়াছি এবং তাহাদের সাহস ও ধৈর্য্যের অকৃত্রিম প্রশংসা করিয়াছি। এই বিষয়ে লণ্ডন মহানগরীর দৃষ্টান্তই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। ক্রমাগত ৯ মাসকাল ইংলণ্ডে বোমা বর্ষিত হইয়াছে এবং যে ধরণের ব্যাপক বিমানহানা বা mass air raid লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। তথাপি লণ্ডন নগরীর জীবনযাত্রা অচল হয় নাই। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ, গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ একযোগে একটি মেসিনের মত কার্য্য করিয়াছেন। কলিকাতার সম্মুখে সেই অগ্নিপরীক্ষা। এখন পর্য্যন্ত খুব সামান্য সংখ্যক বিমান (বোধ হয় ৫।৭ খানার বেশী নহে) কলিকাতা অঞ্চলে হানা দিয়াছে, কিন্তু ইহার চেয়েও বেশী সংখ্যায় যে আসিতে পারে, সেই অনুমান করিয়া রাখাই বুদ্ধিসম্মত। বিমান আক্রমণের একটা উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন এই যে, এই আক্রমণকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা যায় না। বিমান-মারা কামান, জঙ্গী-বিমানের লড়াই এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা যত নিখুঁত এবং যত ব্যাপকই হউক না কেন, দ্রুতগতিশীল বোমারুগুলিকে একেবারে অকেজো করা যায় না। বোমারু-

গুলি কত উর্দ্ধে আসিতেছে এবং কি পরিমাণ বেগে আসিতেছে, অর্থাৎ altitude and speed, এই দুইটি প্রশ্ন আক্রমণের সময় সঠিকরূপে বুঝা যায় না। ফলে বিমান-মারা কামানের গোলা দাগিয়া পাখীর মত দ্রুত উড্ডীয়মান গতিশীল বিমানগুলিকে বিদ্ধ করা আদৌ সহজ নহে। এ কারণেই লণ্ডনের মত সুরক্ষিত নগরীতেও বোমারু বিমানের ব্যাপক উপদ্রব রোধ করা যায় নাই। আবার জঙ্গী-বিমানের পাহারায় বিমানগুলি আসিলে (সাধারণতঃ সেভাবেই তাহারা আসিয়া থাকে). অপরপক্ষের জঙ্গী-বিমানগুলি উহাদিগকে রোধ করিতে নিযুক্ত থাকে এবং সেই ফাঁকে বোমারুগুলি ছোঁ মারিতে কিম্বা বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। জন্তু জগতের সহিত তুলনা দিয়া বলা যাইতে পারে যে, এ যেন শিয়ালের কুকুরছানা চুরির মত! একটি শিয়ালকে যখন কুকুর তাড়া করিয়া দূরে ধাওয়া করিল, সেই ফাঁকে আর একটি শিয়াল আসিয়া ছানাগুলিকে ঘাড় মট্‌কাইয়া লইয়া গেল! জঙ্গী-বিমান ও বোমারু বিমান একত্রে আসিলে প্রায় এই ধরণের রণকৌশলই অনুসৃত হইয়া থাকে। এজন্যই দেখা যায় যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামরিক ব্যবস্থা থাকিলেও বিমান আক্রমণ ও বোমাবর্ষণ সম্পূর্ণরূপে ঠেকানো যায় না।

কিন্তু বোমাবর্ষণ সর্ব্বাংশে প্রতিরোধ করিতে না পারা গেলেও শক্রপক্ষেরও সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বিমান হইতে বোমাগুলি প্রায়শঃই লক্ষ্যবস্তুর উপর পড়ে না। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এবং প্রাণ হাতে করিয়া তাহাদেরও আসিতে হয়। বিমানগুলি হয়তো ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। বহু উর্দ্ধ হইতে অপরিচিত দেশে অজ্ঞাত লক্ষ্য-বস্তুর উপর তাহাদিগকে বোমা ফেলিতে হইবে। যেখানে এক সেকেণ্ডের হিসাবও নির্ভুল হওয়া দরকার, সেখানে ৫ হাজার ১০ হাজার বা ১৫ হাজার ফুট উর্দ্ধ হইতে ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগে ধাবমান বোমারুর পক্ষে লক্ষ্য স্থির করা কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, একটি সেতুর উপর ১০।১২ বার বোমারু বিমান হানা দেওয়া সত্ত্বেও সেতু অক্ষত রহিয়াছে। বিমান আক্রমণে লক্ষ্যভেদের এই ব্যর্থতার জন্যই শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপক বিমানহানার দিকে আক্রমণকারীকে ঝুঁকিতে হয়। বিশল্যকরণি চিনিতে না পারিয়া গোটা গন্ধমাদন পর্ব্বত বীর হনুমান যেমন উপড়াইয়াছিলেন, বৈমানিক বীরগণও মাঝে মাঝে তেমন বেপরোয়া পন্থা অনুসরণ করেন। তথাপি কেবল বিমানহানার দ্বারাই কোন

দেশ ও নগরী জয় করা যায় না, কিম্বা গভর্ণমেণ্টকে ছত্রভঙ্গ করা যায় না। ষ্ট্যালিনগ্রাদ সহরের উপর হাজার বিমান একযোগে আক্রমণ করিয়াছিল, তথাপি সেই সহরের পতন হয় নাই। পশ্চিম জার্ম্মাণীতে হাজার বৃটিশ বিমান এক রাত্রে হানা দিয়াছিল, তবু হিটলার দন্তে তৃণ ধারণ করেন নাই এবং ইংলণ্ডের উপর অবিশ্রান্ত বোমা বর্ষণ করিয়াও ইংরাজ জাতিকে নত করা যায় নাই। এগুলি ঐতিহাসিক সত্য, কোন গল্প নহে। সুতরাং কেবল বিমান-হানার দ্বারাই একটা সহর বা একটা দেশকে কাবু করা যায় না। কিন্তু ইহার জন্য চাই গভর্ণমেণ্টের সংগঠন ক্ষমতার নৈপুণ্য, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের বাধাদান শক্তির প্রচণ্ডতা এবং সরকারী ও বে-সরকারী চেষ্টার পরিপূর্ণ সহযোগিতা।

* *

*

কলিকাতায় কি ধরণের বোমা পড়িয়াছে, সেই সম্পর্কে জনসাধারণের কৌতূহল স্বাভাবিক। এই বিষয়ে একটা আধা-সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে ঃ—

"গত রাত্রে শত্রু-হানাদার বিমান দুই দলে হানা দিতে আসে। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বহু দূরবর্ত্তী অঞ্চলে বোমা পড়ে। হানাদাররা বিশেষ করিয়া 'এ্যাণ্টি-পারসোন্যাল' বোমাই ফেলে। এই বোমা খোলা জায়গায় অবস্থিত লোকদের বিরুদ্ধেই বিশেষ করিয়া কার্য্যকরী। অসামরিক লোকদের মধ্যে অনেককে হতাহত করিয়া তাহাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চারই আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। কয়েকটি বোমা বসতিপূর্ণ অঞ্চলে পড়ে। ইহার ফলে জানালার কাঁচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বোমার টুকরায় কয়েকটি বাড়ীর দেওয়াল ও কতিপয় 'বিফল প্রাচীরে' ছোট ছোট গর্ত্ত হইয়া যায়। ইহার দ্বারাই 'বিফল প্রাচীরের' কার্য্যকারিতা প্রতিপন্ন হইতেছে। টুকরাগুলি কোন ক্ষেত্রেই দেওয়াল ভেদ করিতে পারে নাই। যাঁহারা এই সমস্ত প্রাচীরের পিছনে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ছিলেন। খুব কম লোকই হতাহত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই আশ্রয় লয় নাই। দালান কোঠার ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য। হানাদাররা যেরূপ এলোপাথাড়িভাবে কলিকাতার উপর আসে এবং দূরে দূরে বোমা ফেলে, তাহা হইতে মনে হয় যে, আমাদের প্রতিরোধক ব্যবস্থায় তাহাদিগকে বিশেষভাবে বিব্রত হইতে হয়।"

যে সমস্ত দালান কোঠা, বাজার বা বস্তীতে বোমা পড়িয়াছে, সেগুলি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে, বোমাগুলি খুব সাংঘাতিক ধরণের নহে। সাধারণতঃ হাই-এক্সপ্লোসিভ বোমা পড়িলে যেরূপ ব্যাপক ধ্বংসলীলা সাধিত হয়, এখন পর্য্যন্ত তেমন মারাত্মক কিছু হয় নাই। ক্ষতি যদি কোথাও হইয়া থাকে, তবে উহা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। সাধারণতঃ ছবিতে লণ্ডনের গৃহাদি ধ্বংসের যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমরা দেখিয়াছি এবং অট্টালিকা-শ্রেণীর বিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত অবস্থা জনসাধারণের মধ্যে যে ত্রাস সঞ্চার করে, কলিকাতা অঞ্চলে তেমন ভয়াবহ কিছু ঘটে নাই। ইহার কারণস্বরূপ আধা-সরকারী ইস্তাহারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বোধহয় প্রধানতঃ anti-personnel বা 'লোক ভাগানো' বোমাই বর্ষিত হইয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টিই ইহার উদ্দেশ্য। এই 'লোক ভাগানো' বোমার জন্য সহরে কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে এবং অজ্ঞ ও ভীত জনগণের একাংশ সহর ছাড়িয়াছে।

একথা নিঃসন্দেহ যে, সামরিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও বে-সামরিক জনগণের সঙ্ঘবদ্ধতা ও নৈতিক দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে। এই হিসাবে কলিকাতার জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রণালী বজায় রাখাও আত্মরক্ষার অন্যতম মূলনীতিরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। আমাদের দেশ যুদ্ধবিগ্রহের সহিত অপরিচিত—বিশেষতঃ আধুনিক সংগ্রামের সহিত। ইহার সর্ব্বব্যাপকতা ইউরোপে যে ধ্বংসলীলার বিস্তার করিয়াছে, যথেষ্ট শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট এবং অত্যন্ত বীরের জাতি বলিয়া পরিচিত ইউরোপীয়ানগণও তাহা প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। ফ্রান্সের মত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীরপ্রসবিনী ভূমির জনগণও ছত্রভঙ্গ হইয়াছিল এবং পলায়নপর বেলজিয়ান ও ফরাসী নর-নারীদের ভীড়ে সৈন্যদলের মহড়ায় পর্য্যন্ত বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের অতি তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি এখনও জনগণের মনে টাট্‌কা আছে। সুতরাং এই দেশের জনগণকেও অতিরিক্ত 'নার্ভাস' কিম্বা অতিরিক্ত বীরপুরুষ বলিয়া ধরিয়া লইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণকারী সৈন্য-দেরও প্রথম সমস্যা আত্মরক্ষা বা নিজেকে বাঁচানো। নিজে না বাঁচিলে অপরকে আক্রমণ করা যায় না, মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে এই সমস্যাটি সমরবিজ্ঞানীদের নিকটও উদ্বেগের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। যেখানে সৈন্যদের সম্পর্কে এই সমস্যা, সেখানে বে-সামরিক জনসাধারণের পক্ষে আরও উদ্বেগের

কারণ আছে। কিন্তু কেবল বিপন্ন অঞ্চল ত্যাগ করিলেই এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না।

শিক্ষিত জনগণ এই সমস্ত প্রশ্ন নিশ্চয়ই জানেন এবং তেমন বিচার বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা চলিতেছেন। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে সমাজের নিম্নবর্ত্তী জনগণকে লইয়া—যাহারা দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। অথচ নাগরিক সভ্যতা ও আধুনিক সমাজ এই নিম্নতম শ্রেণীর লোকদের উপরেই দণ্ডায়মান। এই সমস্ত লোকের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য যেমন আশ্বাস ও ব্যবস্থার দরকার, তেমনই ইহাদের দারিদ্র্য সমস্যারও প্রতিকার হওয়া দরকার। যে মতবাদ হইতে জনগণের যুদ্ধ বা People's Warএর উৎপত্তি, সেই মতবাদ শ্রেণীহীন সমাজের ন্যায়বিচার ও সমব্যবহার মানিয়া লইয়াছে। জনগণের অধিকারের ভিত্তির উপর সেই কল্যাণকর আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের ব্যাপক সর্ব্বনাশ রোধ করিতে হইলে জনসাধারণের দাবী ও অধিকারকে স্বীকার করিতে হইবে। জাপানী বোমার মুখে দাঁড়াইয়া এই তথ্যকে আজ অস্বীকার করা কঠিন। লণ্ডনের গভর্ণমেণ্ট অন্ততঃ তাঁহাদের স্বদেশের বেলা গণতান্ত্রিক স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট, জাতির জন্য তাঁহারা যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া যথা-সাধ্য করিতেছেন। মস্কো বা ষ্টালিনগ্রাদের গভর্ণমেণ্টতো সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উপরেই দাঁড়াইয়াছে এবং সেখানে গৃহ হইতে গৃহাভ্যন্তরে জনযুদ্ধের নীতি প্রসারিত হইয়াছে। আমাদের দেশেও এই রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত এবং দেশের জনগণের বিশ্বাসভাজন কংগ্রেস নেতৃ-বৃন্দকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের হাতে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের ভার দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই কলিকাতা বা ভারতবর্ষে জাপ বোমারুর আক্রমণ সাফল্যের সহিত প্রতিহত হইতে পারে এবং জনসাধারণও নিঃশঙ্ক হইতে পারে।

—৭—

আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় ভারতবর্ষ

৩১শে ডিসেম্বর, '৪২।

প্রায় ৮ মাস নিঃশব্দ থাকিবার পর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে জাপানী বোমারু বিমান কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও ফেণী অঞ্চলে বার বার হানা দিয়াছে। নানাস্থানে বোমা বর্ষণ করিয়া তাহারা উৎপাত সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছে। এই

প্রকার বোমার উৎপাত দেখিয়া লোকের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগিয়াছে জাপান কি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে? স্থলপথে জাপানী আক্রমণ বা অভিযান সম্ভব কি না, ইহা লইয়া দীর্ঘকাল আলোচনা চলিতেছে। কেবল ভারতবর্ষ নহে, অষ্ট্রেলিয়ার প্রশ্নও এই সম্পর্কে অবিরত আলোচিত হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কার্টিনের ধারণা জাপানের পরবর্ত্তী লক্ষ্য অষ্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সলোমন ও নিউগিনি দ্বীপ অঞ্চলে জাপানের অগ্রগতি সেই আশঙ্কা প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া উপনিবেশ এবং শ্বেতকায় জাতির উপনিবেশ—সুতরাং জাতিগত বিদ্বেষের দিক হইতে জাপানের উহার প্রতি রোষ থাকা অস্বাভাবিক নহে। তারপর মার্কিণ নৌবহরের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার ঘাঁটি হইতে পাল্টা-আক্রমণ এবং অষ্ট্রেলিয়ার সহিত তাঁহার পূর্ণ সহযোগিতাও সহজতর। জাপান অষ্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে পারে অনুমান করিয়াই দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের অভিযানে জেনারেল ম্যাক-আর্থারকে প্রধান সেনাপতি করা হইয়াছে। তাহার অধীনে অষ্ট্রেলিয়ার সৈন্যদল রহিয়াছে। এখান হইতে জাপানকে প্রতিরোধের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে। প্রকৃতপক্ষে সলোমন দ্বীপ ও নিউগিনিতে উভয় পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে।

তথাপি অষ্ট্রেলিয়া কিম্বা ভরেতবর্ষ জাপান আগাইয়া আসিয়া আক্রমণ করিবে, চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া ইহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু একথা সত্য যে, আধুনিক জাপানকে যে সমস্ত সমরনেতা 'দিগ্বিজয়ে' উত্তেজনা দিয়া উহার সাম্রাজ্যলিপ্সা বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষকেও তাঁহাদের প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। জেনারেল ট্যানাকার বিখ্যাত 'মেমোরেণ্ডাম' ও লেঃ কমাণ্ডার ইসিমারুর লিখিত এক সামরিক পুস্তকে এই দুই মহাদেশের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই সমস্ত বিবৃতি ও পুস্তক প্রায় ১০ বৎসর আগেকার। সেই মনোবৃত্তির সহিত বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার খাপ খাইবে কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয়। আপাততঃ অষ্ট্রেলিয়া লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু ভারতবর্ষ আমাদের নিজস্ব দেশ, ইহার আক্রমণ বা অনাক্রমণ আমাদের নিকট জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নের তুল্য।

কোনও দেশ আক্রমণ করিবার আগে গোটাকয়েক প্রশ্ন চিন্তা করা দরকার। যথা—(১) ভৌগোলিক অবস্থা, (২) রাজনৈতিক অবস্থা, এবং

(৩) আক্রমণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। প্রথম প্রশ্নের বিচারে ভারতবর্ষ অতি প্রকাণ্ড দেশ, রাশিয়া ও চীনের মতই ইহা একটা মহাদেশ। অরণ্য, পাহাড়, নদী এবং খোলা প্রান্তর এই দেশের বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক বিঘ্ন যাহা আছে, তাহার উপর গুরুত্ব দিয়া লাভ নাই। কারণ, আধুনিক বিমান ও ট্যাঙ্ক প্রকৃতির বিঘ্নকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছে। মালয়ের জঙ্গল, ব্রহ্মদেশের নদী ও পাহাড়, উক্রাইনের খোলা প্রান্তর, লিবিয়ার মরুভূমি, বলকান অঞ্চলের পর্ব্বত এবং নরওয়ের রুক্ষ, দীর্ঘ, সঙ্কীর্ণ সমুদ্রতীর কোনটাই আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রামের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করে নাই। তবে, জার্ম্মাণী যেমন রাশিয়ায়, জাপান যেমন চীনে, তেমনই ভারতবর্ষেও জাপানীরা ভূমিখণ্ডের বিশালতা লইয়া বিব্রত হইবে। কেবল আসাম বা বাঙ্গলা বা বিহার দখল করিলেই ভারতবর্ষের যুদ্ধ শেষ হয় না। লাসিও হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত কিম্বা টোকিও হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত দূরত্বটা চিন্তা করিবার মত। জাপান ইতিমধ্যেই মাঞ্চুরিয়া হইতে ব্রহ্মদেশ এবং মালয় হইতে সারা ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই দেশগুলি দখল করিয়া হজম করিতে হইবে। হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথ ও হাজার হাজার মাইল স্থলপথের প্রশ্ন আছে। এজন্য যে পরিমাণ বিমানবহর ও নৌ-বহর—বিশেষভাবে বিমানবহরের প্রয়োজন, জাপান তাহা সমাবেশ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহজনক। ইহা ছাড়া কয়েক লক্ষ স্থলসৈন্য এবং সেই সৈন্যদলের আনুষঙ্গিক সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র ও যন্ত্র এবং সরবরাহ ব্যবস্থার প্রয়োজন। যে সমস্ত কলকারখানা ও শ্রমশিল্প আধুনিক ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, সাঁজোয়া গাড়ী ইত্যাদি নির্ম্মাণের সর্ব্বাধিক উপযোগী, জাপানের তাহা যথেষ্ট পরিমাণে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জাপান যে চমকপ্রদ জয় এবং বিশাল সাম্রাজ্য দখল করিয়াছে, ইহার অন্যতম কারণ মিত্রশক্তিবর্গের আয়োজনহীনতা এবং অসতর্কতা। অর্থাৎ জাপান যদি এই শক্তি লইয়া সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইত, তাহা হইলে এই প্রকার জয়লাভ তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। মাঞ্চুকু-সোভিয়েট সীমান্তে ইহার বার বার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আরও সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, জাপান জার্ম্মাণীর মত শক্তিশালী নহে, যদিও নিঃসন্দেহে এশিয়ার মধ্যে জাপান সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান সামরিক রাষ্ট্র।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বা রাজনৈতিক প্রশ্ন জাপানের অনুকূল। মালয় ও ব্রহ্মদেশে বৃটেন যে ভ্রান্তনীতি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রশক্তিকে জনসাধারণের সহযোগিতা

হইতে দূরে রাখিয়াছিল, ভারতবর্ষেও বৃটেন সেই মারাত্মক ভুল করিতেছে। জনসাধারণ বৃটিশ নীতির উপর বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। আক্রমণকারীর পক্ষে অসন্তুষ্ট দেশ সহায়ক, রণপণ্ডিতদের ইহাই অভিমত। ব্রহ্মদেশ ও মালয় ইহার বড় দৃষ্টান্ত। কিন্তু কেবলমাত্র এই একটি প্রশ্নে জাপানী সমরনেতারা উৎসাহ বোধ করিলেও অন্যান্য প্রশ্নগুলির বিচারে জাপান এত বড় দুঃসাহসিক অভিযানে বাহির হইবে কিনা সন্দেহজনক। তৃতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ আক্রমণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। আমাদের মতে সেই সন্ধিক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে। সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুণ, আকিয়াব, আন্দামান ইত্যাদি ঘাঁটি দখল করার পর জাপানী নৌশক্তি ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে যে সুবিধা পাইয়াছিল, সেই সমস্ত সুবিধা আজ আর নাই। কেন না, মিত্রশক্তির নৌবল ইতিমধ্যে কিছু সামলাইয়া উঠিয়াছে এবং নৌবলের মত বিমানবলও বড কথা। আজ মার্কিণ বিমানবহর বৃটিশ বিমানবহরের সহযোগিতায় পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং মিত্রশক্তির প্রচুর সৈন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কোন বিপক্ষ দল যখন ক্রমাগত হারিতে ও পশ্চাদপসরণ করিতে থাকে, তখন তাহাকে ক্রমাগত আরও আঘাত দেওয়া এবং ধাওয়া করা রণনীতির ধর্ম্ম। সেই নীতি অনুসারে মালয় ও ব্রহ্মদেশ ত্যক্ত হওয়ার পর জাপান আসামের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারিত। কিন্তু জাপান তাহা করে নাই। দীর্ঘ ৮ মাস কাল জাপান আর এদিকে অগ্রসর হয় নাই। যখন মিত্রশক্তির অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং যুদ্ধায়োজন অত্যন্ত কম ছিল জাপান তখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল না কেন? সে কি স্বেচ্ছায় ক্রমাগত ৮ মাস ধরিয়া মিত্রশক্তিকে ভারতবর্ষে শক্তি সঞ্চয় করিতে দিয়াছে? কোন বুদ্ধিমান সমরনীতিবিদ্ প্রতিপক্ষকে এতটা সময় দিবেন কেন? বর্ষাঋতুতে অভিযানের যথেষ্ট অসুবিধা ছিল সত্য, কিন্তু সেই অসুবিধা একমাত্র আক্রমণকারী জাপানেরই ঘটিত না। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বারিধারাসিক্ত মাটি এবং বন্যাপ্লাবিত নদী ও প্রান্তর শত্রুমিত্র উভয়ের পক্ষে সমান অসুবিধাব্যঞ্জক। উভয়ের ট্যাঙ্ক ও বিমানবহরই মেঘে ও কাদায় বাধা পাইত। আজিকার যুদ্ধে প্রকৃতি বা আবহাওয়ার বিঘ্নই একমাত্র বিবেচনার বিষয় নহে। যখন প্রতিপক্ষের সামরিক আয়োজন সামান্য এবং রণক্ষেত্রের বিপর্য্যয়ের মাত্রা বেশী ঘটিয়া থাকে, তখনই উহাকে আরও আঘাত দেওয়া নির্ম্মম সমরনীতির লক্ষ্য। গত গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ একই প্রধান সেনাপতির অধিনায়কত্বে একটি-

মাত্র রণক্ষেত্রের মর্ত ছিল। অবশ্য এই বৃহৎ রণাঙ্গন দুই অংশে বিভক্ত ছিল —ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ পরস্পরের সহিত বাঙ্গলা ও আসামের সীমান্ত দিয়া সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন ছিল। রণনীতির ভাষায় ইহাকে joint বা গ্রন্থি বলা যাইতে পারে। কিন্তু গত গ্রীষ্মকালে এই গ্রন্থি কি দুর্ব্বল ও শিথিল ছিল না? রণনীতির নির্দ্দেশ এই যে, প্রতিপক্ষের রণাঙ্গনের যে অংশ বা গ্রন্থি দুর্ব্বল ও শিথিল, সেই অংশে আঘাত হানিতে হইবে—এইআঘাতের দ্বারা গোটা রণক্ষেত্রের সমুদয় অংশই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। ব্রহ্মদেশে অতি দ্রুত ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর মিত্রপক্ষ ভারতবর্ষে সরিয়া আসিয়াছিলেন। সেই সময় ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের পারস্পরিক গ্রন্থি অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। জাপানের পক্ষে সেই সময় ভারতবর্ষে আঘাত হানা অত্যন্ত সহজ ছিল। এমন কি ডানকার্কে বৃটিশবাহিনীর ইতিহাসখ্যাত পশ্চাদপসরণের পর ইংলণ্ড আক্রমণ জার্ম্মাণীর পক্ষে যত সহজ ছিল, জাপানের পক্ষে ব্রহ্মদেশের পর ভারতবর্ষ আক্রমণ তার চেয়েও বেশী সহজ ছিল। কিন্তু সেই সন্ধিক্ষণ কি পার হইয়া যায় নাই? আজিকার মিত্রশক্তি কি ভারতবর্ষে গত এপ্রিল মাসের তুলনায় ঢের বেশী শক্তিশালী নহেন? জাপান ভারতবর্ষকে এই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সময় দিল কেন? এদিকে লিবিয়া ও মিশরের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর পরাজয় এবং ককেশাসে ও ষ্ট্যালিনগ্রাদে রুশ পাল্টা-আক্রমণের অগ্রগতি জার্ম্মাণীকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ফেলিয়াছে। সুতরাং এই শীতকালে জাপান পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে অগ্রসর হইয়া গিয়া লোহিত সাগরে বা আরবের মরুভূমিতে কিম্বা পারস্য উপসাগরে জার্ম্মাণীর সহিত হাত মিলাইবে, সামরিক দিক হইতে ইহা কষ্টকল্পনা মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে জাপানের আক্রমণের পালা ফুরাইয়াছে। যে পরিমাণ জমিদারী ও কাঁচামালের ঐশ্বর্য্য জাপান সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা জার্ম্মাণীর তুলনায় অনেক বেশী লাভজনক। সুতরাং এই বিশাল জমিদারী রক্ষাই হইবে জাপানের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মদেশ, মালয় ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের মত রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প,সংস্কৃতি এবং সভ্যতায় উন্নত নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে, মালয়ে এবং ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে কলোনি বা উপনিবেশ সৃষ্টি সম্ভব হইলেও আগামী দিনের ভারতবর্ষে তাহা সম্ভব হইবে না। প্রায় দুই শত বৎসরের বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক জীবন নিঃশেষিত আয়ু হইয়াছে। আগামী দিনে ভারতবর্ষ কেবল উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহৃত হইবে, এতখানি

দুরাশা বোধহয় আধুনিক কোন রাষ্ট্রশক্তির নাই। এই মহাযুদ্ধই ভারতবর্ষের পরাধীনতার শেষ সীমারেখা। সুতরাং ভারতবর্ষ জাপানী অভিযানের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিনা, তাহা চিন্তা করা উচিত। অর্থনৈতিক বিচার ছাড়া সমর-নৈতিক অভিযান চলে না, আবার সমরনীতিও অর্থনীতিকে অস্বীকার করিতে পারে না।

তবে, জাপানের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন ভারতবর্ষের ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি। বৃটেন ও আমেরিকা জাপানের সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ভারতবর্ষ ইহার প্রধান ঘাঁটি—মধ্যপ্রাচ্য ও ব্রহ্মদেশ, এই দুইয়ের বিচারেই। এই ঘাঁটি হইতে জাপানের বিরুদ্ধে পাণ্টা অভিযান আরম্ভ হইবে, জাপান ইহা জানে এবং ইতিমধ্যে তেমন আয়োজন ও ব্যবস্থা হইতেছে। সেই অভিযানের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইবার জন্য জাপান হয়তো নিঃশব্দ আয়োজন করিতেছে। যদি মিত্রপক্ষ পাণ্টা আক্রমণ করেন, তবে, উহার সংঘাতে ও সংঘর্ষে ভারতবর্ষ রণক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। কিম্বা জাপান যদি মনে করে যে, ভারতবর্ষের সামরিক ঘাঁটি পূর্ব্বাহ্লে চূর্ণ করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক শক্তিকে কাবু করা দরকার, তাহা হইলে জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারে। রণনীতির বিচারে ইহা সম্ভাব্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রকার ব্যাপক অভিযানের বিরুদ্ধে যে সমস্ত তথ্য ও যুক্তি আছে, তাহাও উপেক্ষা করিবার নহে। সংক্ষেপে সেগুলি এই :—

(১) ভারতবর্ষ একটা মহাদেশের মত বিশাল। এত বড় দেশ বর্ত্তমান যুগে সম্পূর্ণরূপে জয় ও বশীভূত করা সম্ভব নহে। পর্ব্বত, অরণ্য, সমুদ্র, নদী, মরুভূমি ইত্যাদি ইহার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—এই বৈশিষ্ট্য অজেয় না হইলেও দ্রুত জয়ের পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

(২) ব্রহ্মদেশ, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদির পর এত বড় দেশে পুনরায় যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া অগ্রসর হওয়া একান্ত দুঃসাধ্য। যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা ছাড়া কোন সৈন্যদলই যুদ্ধ করিতে পারে না।

(৩) ভারতবর্ষ দীর্ঘ সমুদ্রতটবর্ত্তী দেশ—ইহার তিনদিকেই সমুদ্র এবং একদিকে পর্ব্বত। যে পরিমাণ নৌবহর ভারতবর্ষ দখল ও অবরোধ করার এবং সরবরাহ রক্ষার জন্য দরকার জাপানের পক্ষে তাহা বর্ত্তমানে সমাবেশ করা সম্ভব নহে। সমুদ্রপথে জাপানের আর অবাধ কর্ত্তৃত্ব নাই এবং সমুদ্রে অবাধ কর্ত্তৃত্ব ছাড়া ভারত অভিযান দুরাশা মাত্র।

(৪) আধুনিক যান্ত্রিকযুদ্ধ ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন এবং সমুদ্রপারের যুদ্ধ বিশেষভাবে জাহাজের উপর নির্ভরশীল। জাপান ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন সংক্রান্ত ইণ্ডাষ্ট্রি বা শ্রমশিল্পে দুর্ব্বল। আমেরিকা, রাশিয়া, জার্ম্মাণী বা বৃটেনের মত জাপান এই দিক দিয়া ততটা শক্তিশালী নহে। বিশেষভাবে জাপানের ইস্পাত শিল্প অত্যন্ত দুর্ব্বল।

(৫) জাপান ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের মত বিশাল ভূখণ্ড—মাঞ্চুরিয়া, উত্তর চীন, দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীন, মালয়, ব্রহ্মদেশ ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়াছে। এইগুলি রক্ষা ও হজম করার জন্য প্রচুর সমরশক্তি এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য শক্তি ও যথেষ্ট সময়েরও দরকার। ভারতবর্ষে ইংরাজ শক্তির কায়েম হইয়া বসিতে ১০০ বৎসর লাগিয়াছে—১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ সাল। আগেকার তুলনায় বর্ত্তমানে অনেক কম সময় লাগিবে বটে, কিন্তু কত কম?

(৬) আক্রমণের সন্ধিক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ব্রহ্মযুদ্ধের পর ভারতবর্ষ অনেকখানি অসহায় অবস্থায় ছিল। এক্ষণে আর সে অবস্থা নাই। মিত্রশক্তির আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। অপর দিকে জাপানের ইউরোপীয় সঙ্গী ইতালী সম্পূর্ণ পরাজিত এবং জার্ম্মাণী রুশ-রণক্ষেত্রে অত্যন্ত বিব্রত, এমন কি জার্ম্মাণীরও ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। সুতরাং একা জাপান কি ভারতবর্ষ অভিযানে সাহসী হইবে?

(৭) ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চাহে। এদেশে বৃটিশ নীতি ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ হইয়া থাকিলেও এবং দেশের বৃহৎ অংশে বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ থাকিলেও জাপানকে কেহই নূতন প্রভু হিসাবে চাহে না। অর্থাৎ জাপানী আক্রমণের পক্ষে কোন সামাজিক ভিত্তি এই দেশে গড়িয়া উঠে নাই এবং এই সামাজিক ভিত্তি ছাড়া পরের দেশ আজিকার দিনে দখল ও গ্রাস করা যায় না। ইহার বড় দৃষ্টান্ত আধুনিক চীন।

(৮) মিত্রপক্ষ অনতিদূর ভবিষ্যতে জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিবে। প্রশান্ত মহাসাগর আমেরিকার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। আমেরিকার অর্থনৈতিক জীবনের একটা প্রকাণ্ড ধারা প্রশান্ত মহাসমুদ্র দিয়া প্রবাহিত। ইহা ছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষ বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রশ্ন আছে। অর্থাৎ বৃটেনেরও একান্ত স্বার্থ রহিয়াছে জাপানকে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর হইতে বিতাড়িত করিবার। ইহার সঙ্গে চীনের প্রশ্নও চিন্তা করিবার মত। আমেরিকা, বৃটিশ সাম্রাজ্য ও চীন

—এই তিন রাষ্ট্রশক্তি সম্মিলিতভাবে জাপানের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান করিবে। এই অভিযান রোধ করাই জাপানের আশু কর্ত্তব্য, অন্যথা তাহার বিপদ ঘটিবে।

এই সমস্ত প্রশ্ন বিচার করিলে জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। মোট কথা, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সুবিধা এবং অসুবিধা-গুলির তুলনামূলক বিচার করিয়া জাপানের পক্ষে যাহা লাভজনক মনে হইবে, জাপান তেমন নীতির দিকেই ঝুঁকিবে। কিন্তু এই সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নহে। কারণ, প্রত্যেকটি যুদ্ধরত রাষ্ট্রেরই এমন কতকগুলি আভ্যন্তরীণ সামরিক এবং বে-সামরিক প্রশ্ন আছে, যাহা দূর হইতে জানা বা সম্যক বিচার করা সম্ভব হয় না।

এমন নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী বা স্থির সিদ্ধান্ত সম্ভব নহে বলিয়াই ভারতবর্ষের সমর কর্ত্তৃপক্ষও অলস থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা আত্মরক্ষা ও আক্রমণের আয়োজন ব্যাপক আকারে সম্পূর্ণ করিতেছেন। কয়েক মাস আগে জেনারেল ওয়েভেলও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের উপর আপাততঃ জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। তথাপি জাপানের মত ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে বিশ্বাস নাই। তাহারা চতুর, দক্ষ এবং বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং জাপানী আক্রমণের জন্য সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। সামরিক ব্যাপার সর্ব্বদাই গোপন রাখা বাঞ্ছনীয়। এজন্য ইহার কোন বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। তবে, কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল হইতে যতটুকু প্রকাশ করা হইয়াছে তাহারই আলোচনা করা যাইতে পারে।

জাপ আক্রমণের সম্ভাবনার উপর নজর রাখিয়াই একদিকে যেমন প্রদেশে প্রদেশে 'ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রণ্ট' গঠিত হইয়াছে, বে-সামরিক আত্মরক্ষা ও 'এ-আর-পি' ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে, তেমনই অন্যদিকে ভারতবর্ষ রক্ষার সামরিক বিলিব্যবস্থা নূতন পরিকল্পনায় গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়েভেল গত মে মাসে যে বেতার বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, শান্তির সময়ে ভারতবর্ষ তিনটি সামরিক মণ্ডলে বিভক্ত ছিল—উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ। এই তিন অংশে সৈন্য সংগ্রহ, শিক্ষাদান ও বিভিন্ন শাখা উপশাখার শাসনকার্য্য অব্যাহত রাখাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে স্বাভাবিক অবস্থা আর বজায় নাই। কেবল শাসনকার্য্যের ধারা বহিয়া এই তিন অংশ চলিতে পারে না। এজন্য নূতন

পরিকল্পনা অনুসারে এই তিন অংশকে ভাঙ্গিয়া তিনটি পৃথক বাহিনী বা Armyতে পরিণত করা হইয়াছে। অর্থাৎ উত্তর অংশের বদলে উত্তর-পশ্চিম সেনাবিভাগ, পূর্ব্বাংশের বদলে পূর্ব্ব সেনাবিভাগ ও দক্ষিণাংশের পরিবর্ত্তে দক্ষিণ সেনাবিভাগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। সোজা কথায় বলা যায় যে, ভারতবর্ষকে তিনটি পৃথক রণাঙ্গনে ভাগ করা হইয়াছে—পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গন। যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইয়া আক্রমণ চালাইবার জন্য যাহা কিছু করা দরকার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাহিনীকে সেভাবেই গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সৈন্যবাহিনী এক্ষণে এমনভাবে প্রস্তুত হইয়া আছে যে, যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন স্থানে তাহারা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান ও আক্রমণ চালাইতে পারিবে। যে ব্যবস্থা আগে ছিল বাঁধাধরা শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য, তাহাই এক্ষণে সক্রিয় ও গতিশীল অভিযানের পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। দক্ষিণ বাহিনী ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ এবং পূর্ব্ব বাহিনী ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব সীমা, বিশেষভাবে বাঙ্গলা ও আসাম রক্ষা করিবে। উত্তর-পশ্চিম বাহিনীর উপর ভার পড়িয়াছে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও উত্তর সীমানা পাহারা দেওয়ার। ভারতবর্ষকে কার্য্যতঃ এই তিনটি প্রধান রণাঙ্গনে বিভক্ত করিয়া স্থল ও জলপথে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই তিন রণাঙ্গনের পরেও ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় স্থানগুলি বাদ পড়িয়া যাইতেছে। এজন্য জেনারেল ওয়েভেল এগুলিকে একত্র করিয়া আর একটি পৃথক সামরিক নেতৃত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাকে কেন্দ্রীয় বা মধ্য রণাঙ্গনের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে—এই মধ্য রণাঙ্গনের আওতায় পড়িয়াছে দিল্লী। এতকাল এই স্থানগুলি অপর তিনটি অংশের মধ্যে বিজড়িত ছিল এবং তাহার ফলে সমরবিভাগীয় শাসনকার্য্যের ঝঞ্চাট ছিল প্রচুর। নূতনতর ব্যবস্থায় এই অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে এবং ভারতবর্ষের তিনটি পৃথক সামরিক ও ভৌগোলিক অংশ রণক্ষেত্র হিসাবে আপন আপন যুদ্ধাভিযানের কার্য্য চালাইয়া যাইতে পারিবে।

ভারতবর্ষকে তিনটি সামরিক মণ্ডলে ভাগ করিয়া ইহার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আধুনিক কায়দায় গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আগেকার মত ভারতীয় সৈন্যেরা কেবল সাধারণ পদাতিক নহে—রাইফেলধারী সাধারণ সৈন্য ও সেকেলে গোলন্দাজের মত নহে। ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জায় এবং এরোপ্লেন ও আধুনিক বিধিব্যবস্থায় নূতন নূতন সৈন্যদল গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের অধিকাংশ

প্রদেশ হইতেই এই নূতন সৈন্যবাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহাদের সংখ্যা অন্যূন ১৫ লক্ষ। ভারতবর্ষ এক প্রকাণ্ড সামরিক শিবিরে পরিণত হইয়াছে। কেবল স্থলভাগ ও আকাশ পথের যুদ্ধের উপযোগীই নহে, জলপথের দিকেও নজর দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের পথে এক্ষণে আর জাপ নৌবহরের সহজ আবির্ভাব এবং নিশ্চিন্ত দৌরাত্ম্য সম্ভব নহে। সেখানে নৌবহর ও বিমানবহরের সতর্ক পাহারা রহিয়াছে। তীরগুলি আগের চেয়ে অনেক বেশী সুরক্ষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সমুদ্রতীর অত্যন্ত দীর্ঘ—দুই হাজার মাইলেরও অধিক। এজন্য ইহার প্রতি ইঞ্চি স্থানে আত্মরক্ষার পাকা ঘাঁটি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা কার্য্যতঃ অত্যন্ত কঠিন। এজন্য স্থির হইয়াছে, যে যে স্থানে জাপ আক্রমণ সম্ভব, সেই সেই স্থানে অতিদ্রুত সৈন্য সমাবেশের ও আঘাত হানিবার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। অর্থাৎ আত্মরক্ষার মূলনীতি আক্রমণের উপর নজর রাখিয়াই অনুসৃত হইবে। আরও সহজ ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, কেবল ভৌগোলিক বিলিব্যবস্থার মত বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব বণ্টন করিয়া দিলেই যুদ্ধাভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। ইহার জন্য চাই যুদ্ধের কতকগুলি মূলনীতিকে কার্য্যতঃ সফল করার চেষ্টা। জেনারেল ওয়েভেলও বলিয়াছেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আত্মরক্ষার ব্যূহ রচনা নহে, সেই ব্যূহগুলি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকাও নহে। আমাদের উদ্দেশ্য শত্রুর অভিযানকে ক্ষিপ্রতার দ্বারা এবং আক্রমণের দ্বারা প্রতিরোধ করা। যে সমস্ত স্থানে শত্রুর আবির্ভাবের সম্ভাবনা, সেই স্থানগুলিতে যাহাতে সাফল্যের সহিত আঘাত হানা যাইতে পারে এবং এই আঘাত হানিবার জন্য যাহাতে ক্ষিপ্র ও দ্রুতগামী সৈন্যদল শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আক্রমণ করিতে পারে—ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার মূলনীতি তাহাই। এই কথাগুলি বুদ্ধিসম্মত এবং রণবিজ্ঞানসম্মত। আধুনিক কালের যুদ্ধে 'অচল অবস্থার' যুগ পার হইয়া গিয়াছে। কোন নির্দ্দিষ্ট ঘাঁটিতে বসিয়া থাকিয়া কিম্বা কেবল দুর্গপ্রাকারের আড়ালে অবস্থান করিয়া বর্ত্তমান কালের সংগ্রাম চালানো যায় না। যুদ্ধ যান্ত্রিকবাহিনীর ক্ষিপ্র আক্রমণের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ও মোটরযন্ত্র ইহাকে সম্পূর্ণরূপে গতিশীল করিয়াছে। জাপানীরা যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তবে, আধুনিক রণবিজ্ঞানের এই নীতিই তাহারা অনুসরণ করিবে এবং এই নীতি প্রতিরোধ করিতে হইলে দ্রুত, ক্ষিপ্র ও সক্রিয় পাল্টা আক্রমণের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

আক্রমণই আত্মরক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতি—সমরবিজ্ঞানের এই মূলনীতি ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষ বিস্মৃত হন নাই। জেনারেল ওয়েভেলের স্কন্ধে নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষ রক্ষার প্রকাণ্ড দায়িত্ব পড়িয়াছে। সেই দায়িত্ব তিনি সাফল্যের সহিত বহন করিতে পারিবেন, এমন আশাই করা উচিত।

উপসংহার

—:০:—

জাপানী যুদ্ধের আক্রমণের পালা শেষ হইয়া গেল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৪২ সালের মে মাস পর্য্যন্ত দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী আক্রমণ ব্যাপক, দুর্দ্ধর্ষ ও নিয়মিত আকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা নিঃসন্দেহ যে, একমাত্র নৌবহরের ক্ষতি ছাড়া জাপানের এই যুদ্ধযাত্রায় সৈন্যবল ও সমরাস্ত্রের দিক হইতে তেমন কোন গুরুতর ক্ষতি হয় নাই। সামরিক দিক হইতে যে রণনীতি সারবান, অর্থাৎ ন্যূনতম (minimum) ক্ষতি স্বীকার করিয়া বৃহত্তম (maximum) লাভ, চতুর জাপানীরা তাহাই অর্জ্জন করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ এবং ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের কাঁচামালের ঐশ্বর্য্য বিবেচনা করিলে মনে হইবে জাপানীরা জার্ম্মাণদের তুলনায় অধিক লাভবান। জার্ম্মাণী ইউরোপীয় ভূখণ্ডের কলকারখানা ও শ্রমশিল্পে সমৃদ্ধ যে সমস্ত দেশ দখল করিয়াছে, উহার জন্য তাহাদের ক্ষয় ও ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর। একমাত্র রাশিয়ার যুদ্ধেই জার্ম্মাণীর ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ এবং সেই ক্ষতি সামলাইয়া জার্ম্মাণীর পক্ষে ভবিষ্যতে মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো কার্য্যতঃ প্রায় অসম্ভব। কিন্তু জাপানের এখন পর্য্যন্ত তেমন প্রচণ্ড ক্ষতি হয় নাই। যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা তাহাদের এখনও প্রচুর। প্রকৃত পক্ষে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া আর কোথাও জাপানের বিরুদ্ধে সত্যকার যুদ্ধ হয় নাই। অন্যান্য স্থানে জাপানীরা আক্রমণ করিবা মাত্র আত্মরক্ষাকারী সৈন্যেরা কেবল পিছু হটিয়াছে। এই একঘেয়ে পিছু হটিবার কাহিনী প্রকৃত যুদ্ধ নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইঙ্গ-মার্কিণ

শক্তিদ্বয় আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না ; অধিকন্তু তাঁহারা ইউরোপীয় সংগ্রাম লইয়া ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। অপর পক্ষে জাপান দীর্ঘকাল ধরিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এশিয়ার মধ্যে জাপান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক রাষ্ট্র। উগ্র জাতীয়তাবাদ, তথা সাম্রাজ্যবাদের উপর এই শক্তি প্রতিষ্ঠিত। রণনীতিবিদ্‌গণই জাপানের আসল নেতা, তাঁহারা জাপানের সর্ব্বপ্রকার শক্তি রণক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। এদিকে মিত্রপক্ষের কোন আয়োজন ছিল না। ফলে, জাপান যেন একটি আঘাতে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া দখল করিয়া ফেলিল। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহা বিস্ময়কর মনে হইলেও ইহার মূলে বড রকমের কোন রহস্য নাই। একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সঙ্ঘবদ্ধ সামরিক শক্তি যদি একটি অসতর্ক ও বিব্রত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে আক্রমণকারীর দ্রুত জয়লাভ কোন অসম্ভব ঘটনা নহে। তথাপি প্রবাল সাগর, জাভা সাগর, ম্যাকাসার প্রণালী, মিড্‌ওয়ে দ্বীপ এবং নিউগিনি দ্বীপের সমুদ্রপথে জাপানী নৌবহর মিত্রশক্তির হাতে প্রচণ্ড মার খাইয়াছে। জাপানের প্রচুর পরিমাণ জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের (১৯৪৩ খৃঃ) ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকার নৌদপ্তর হইতে সরকারী ভাবে জাপানী নৌবহরের ক্ষতির যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, জাপানী সামরিক জাহাজ নিশ্চিতরূপে ডুবিয়াছে ১০৭ খানা, ডুবিয়াছে বলিয়া অনুমান ২৬ খানা, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ১৪২ খানা। অসামরিক জাপানী জাহাজ নিশ্চিত ডুবিয়াছে ১৫৯ খানা, ডুবিয়াছে বলিয়া অনুমান ১৮ খানা, জখম হইয়াছে ৮১ খানা। সুতরাং মোট নিমজ্জিত জাহাজের সংখ্যা ২৬৬, নিমজ্জিত বলিয়া অনুমান ৪৪ এবং ক্ষতিগ্রস্ত ২২৩— সর্ব্বশুদ্ধ ৫৩৩ খানা জাহাজ। ইহা ছাড়া নিউগিনি দ্বীপের সমুদ্রপথে মোট ২২ খানা জাহাজ নষ্ট হইয়াছে। জাপানী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা দ্বীপ, উপদ্বীপ, সমুদ্র, প্রণালী এবং জলপথের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং নৌবহর ও জাহাজ তাহাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা ছাড়া তাহারা টোকিও হইতে রেঙ্গুন এবং উত্তর চীন হইতে নিউগিনি পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই বিস্তীর্ণ স্থলপথে ও জলপথে ক্রমাগত যোগাযোগ রক্ষা, সরবরাহ রক্ষা এবং অধিকৃত দেশগুলি রক্ষা করিয়া চলা এক নিদারুণ সমস্যার মত দেখা দিবে। প্রচুর এরোপ্লেন ও জাহাজ জাপানের প্রয়োজন। যদিও জাপান অপরিমিত কাঁচা-মালের ঐশ্বর্য্যে শক্তিশালী হইয়াছে, তথাপি মিত্রশক্তি বা আমেরিকার

উৎপাদন শক্তির সহিত পাল্লা দেওয়া জাপানের পক্ষে সহজ নহে। ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেনের 'ইণ্ডাষ্ট্রি' বা কলকারখানা রাতারাতি গড়িয়া তোলা যায় না। ইহার জন্য দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক। অধিকন্তু ইদানীং কালের বিমান ও নৌযুদ্ধে জাপান তেমন কোন বিস্ময় দেখাইতে পারে নাই, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাপানকে হার মানিতে হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সমান অস্ত্র ও সমান শক্তি লইয়া যুঝিতে পারিলে জাপান এত শীঘ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া জয় করিতে পারিত না। রণকৌশল ও রণনীতির চমৎকারিত্বের প্রমাণ জাপান দিয়াছে বটে, কিন্তু সেই কৃতিত্ব এক তরফা। অর্থাৎ যুদ্ধটা সমানে সমানে হয় নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে ইঙ্গ-মার্কিণ সম্মিলিত শক্তি জাপানকে ছাড়াইয়া যাইবে। তবে, ১৯৪৩ সালে নয়। ইউরোপে জার্ম্মাণ যুদ্ধের অবসান না হইলে মিত্রপক্ষ জাপানের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। বোধহয় এজন্য ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু কেবলমাত্র সৈন্যবল ও অস্ত্রবল দিয়াই আধুনিক যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় আনা যাইবে না। জাপান যে নিকৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদ ও পররাজ্য হরণের নীতি অনুসরণ করিতেছে, ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তি ছাড়া আত্ম-রক্ষার চরমশক্তি পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। এই নৈতিক ভিত্তিই আধুনিক যুদ্ধের আসল প্রাণ। যদি মিত্রশক্তিকে চরম জয়লাভ ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে এই প্রাণমন্ত্রে দীক্ষা লওয়া প্রয়োজন। কেবল বৃহত্তর সমরশক্তি নহে, মহত্তর নৈতিক শক্তির দ্বারা জাপানকে জয় করিতে হইবে। এই বৈপ্লবিক মতবাদের অনুসরণ ছাড়া আধুনিক যুদ্ধের অবসান একান্ত কঠিন। কারণ, ইহার সহিত রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি একান্তরূপে বিজড়িত।

১০ই মার্চ্চ, ১৯৪৩।

পরিশিষ্ট

(১)

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ অগ্রগতি

সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধের সময়েই রণনৈতিক গবেষক মহলে একটি প্রশ্ন আলোচিত হইতেছিল: অতঃপর জাপান কোন্ দিকে যাইবে—ভারতবর্ষে না অষ্ট্রেলিয়ায়? কিন্তু কার্য্যতঃ ১৯৪২ সালে জাপান যেমন ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমানায় (আসাম-ব্রহ্ম ও বাঙ্গলা-ব্রহ্ম) আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অষ্ট্রেলিয়ার বেলায়ও তাহারা উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমানার দ্বীপমালার দিকে অগ্রসর হইল। জাপানের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ দুইটিই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ শক্তি ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে মার্কিণ শক্তি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এ কারণে ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া উভয় দেশেই যেমন জাপ আক্রমণের সম্ভাবনায় সোরগোল বাধিয়া গেল, তেমনই জাপানী রেডিও-প্রচারকগণও দস্তুর মত একটা স্নায়ুর লড়াই সুরু করিয়া দিল। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কার্টিন সময় সময় এমন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন যে, মনে হইল জাপানীদের হাত হইতে অষ্ট্রেলিয়ার আর রক্ষা নাই। অবশ্য এই আর্ত্তনাদ একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। কারণ, জাপান অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব দ্বারের দ্বীপময় ঘাঁটিগুলি এমনভাবে কাড়িয়া লইল যে, অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যক্ষ আক্রমণের বিপদে পড়িল,—যেমন পড়িল ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ হইতে। এজন্য যে সমস্ত অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইল। মার্চ্চ মাসে জেনারেল ম্যাকআর্থার ফিলিপাইন হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় চলিয়া আসিলেন। সেখানেই তাঁহার প্রধান শিবির প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তিনিই প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। আত্মরক্ষার দিক হইতে অষ্ট্রেলিয়া ক্রমশঃ বৃটেনের দুর্ব্বল আশ্রয় ত্যাগ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকিল। অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মধ্যে এতটা সামরিক সহযোগিতার সৃষ্টি হইল যে, বৃটেনের সঙ্গে উহার সম্পর্ক বিতর্কের বিষয় হইয়া উঠিল।

১৯৪২ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যেই জাপানীদের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের অভিযান স্পষ্ট হইয়া উঠিল। পূর্ব্বেই অনেকবার বলা হইয়াছে যে, এই মহাসমুদ্র অসংখ্য দ্বীপে সমাচ্ছন্ন এবং দ্বীপগুলি আমাদের নিকট অপরিচিত। বিদেশী ছায়াচিত্রে অনেক সময় 'Southern Sea' এর রোমান্টিক ছবি দেখান হইয়াছে। অর্দ্ধনগ্না, অতি বিলাসিনী, শিরে পুষ্পমালা-ধারিণী দ্বীপনায়িকা বিদেশী অভিযাত্রীর প্রেমে পড়িয়া গভীর জঙ্গলে কিংবা সমুদ্রতীরের নারিকেল কুঞ্জের ছায়ায় আলিঙ্গনে ও চুম্বনে মশগুল রহিয়াছে, এমন সময় 'অসভ্যদের' হাতে প্রেমিক যুগলের প্রাণ যায় যায়—এই ধরণের উত্তেজনাপ্রদ দুঃসাহসিক রসবিহ্বল চিত্র অনেকবার দেখা গিয়াছে। 'দক্ষিণ সমুদ্রের' এই ছবিগুলি প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপমালা হইতেই গৃহীত। জাপানীরা কোন রোমান্সের জন্য নহে, নিতান্ত সাম্রাজ্য-স্বার্থের খাতিরেই এই দ্বীপগুলির দিকে সশস্ত্র অভিযান করিল অষ্ট্রেলিয়াকে বিপদে ফেলিবার জন্য। ক্যারোলাইন, গিলবার্ট ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ ফিলিপাইনের মিণ্ডানাও ঘাঁটি হইতে জাপানীরা নৌ-অভিযান চালাইয়া নিউ বৃটেন দ্বীপের রাবাউল, নিউগিনির উত্তর পূর্ব্বাংশ এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জ দখল করিল। তাহারা যেন এক একটা ধাপে অগ্রসর হইয়া আবার পরবর্ত্তী ধাপের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল এবং এভাবে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব্বে অর্দ্ধ-বলয়াকৃতি দ্বীপমালা দখল করিয়া তাহারা এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকিতে চাহিল যখন তাহারা খাস অষ্ট্রেলিয়া কিম্বা নিউজিল্যাণ্ড আক্রমণ করিতে পারিবে। এজন্য তাহাদের রণনৈতিক লক্ষ্য ছিল টাইমুর সমুদ্র এবং উহার পূর্ব্বদিকের জলপথের গলিগুলি—যেমন, টরেস প্রণালীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার এবং দ্বীপগুলি দখল পূর্ব্বক অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দেওয়া।

অষ্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য ছিল শত্রুকে যথাসম্ভব দূরে রাখা এবং তাহার যুদ্ধজাহাজ, সৈন্যবাহী জাহাজ ও বিমান ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষণ করিয়া তাহার অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটানো। অর্থাৎ আত্মরক্ষার delaying tactics কৌশলই অবলম্বিত হইল। ইতিমধ্যে আমেরিকা হইতে সরবরাহের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল এবং প্রশান্ত মহাসাগরের এই অংশে মার্কিণ রণনীতির লক্ষ্য হইল প্রথমতঃ আমেরিকা হইতে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডগামী মার্কিণ সেনা ও সমরোপকরণবাহী জাহাজগুলিকে ক্রুজারের পাহারায় রক্ষা করা।

দ্বিতীয়তঃ এই আত্মরক্ষার সঙ্গে খানিকটা আক্রমণাত্মক কৌশলও আমেরিকা অবলম্বন করিল। কতকগুলি ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার ও বিমানবাহী জাহাজ লইয়া একটা নৌবহর গঠিত হইল এবং এই নৌবহর মার্শাল ও গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ এবং বিষুবরেখার উত্তরবর্ত্তী দ্বীপগুলিতে হানা দিতে লাগিল। এই দ্বীপগুলি ছিল জাপানের আত্মরক্ষার বহির্ব্যূহ বা outer defence—এই বহির্ব্যূহগুলির উপর আক্রমণ চালাইয়া বলক্ষয়কারী রণকৌশল অনুসরণ করা হইল। অধিকন্তু এই সমস্ত দ্বীপে জাপানের রণসজ্জা, অস্ত্রসজ্জা ও সামরিক ঘাঁটিগুলি কি ধরণের ছিল সেই সমস্ত সংবাদ জানিবারও চেষ্টা হইল।

প্রধানতঃ এই অঞ্চলের যুদ্ধ কেবলমাত্র বিমানপথে ও সমুদ্রেই অনুষ্ঠিত হইল—একমাত্র রাবাউল ছাড়া। ঈষৎ কাস্তের মত আকৃতিসম্পন্ন নিউ বৃটেন দ্বীপের শেষ পূর্ব্ব প্রান্তে রাবাউল। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে নিউ বৃটেনে বিমান আক্রমণ সুরু হইল। ২২শে জানুয়ারী তারিখে ৫টি সৈন্যবাহী জাহাজ সহ ৬টি জাপ যুদ্ধজাহাজ রাবাউলের অদূরে দেখা দিল। তাহার সঙ্গে বিমান বহরও আসিল এবং বিমানগুলি রাবাউল বন্দরের আত্মরক্ষার পাকা গাঁথুনি এবং জাহাজ ও দুর্গের উপর বোমা ও মেসিনগান চালাইতে লাগিল। রাবাউলের একমাত্র দুর্গটি এভাবে ধ্বংস হইয়া গেল। এই দুর্গে দেড় হাজারের বেশী সৈন্য ছিল না। আত্মরক্ষার জন্য তাহারা রাবাউলের পশ্চিমে দুর্গম অরণ্য ও পাহাড়ের সানুদেশে আশ্রয় লইল। ১০ হাজার জাপ সৈন্য রাবাউল আক্রমণ করিল এবং বোমা ও মেসিনগান সহ জঙ্গলের মধ্যে আত্মরক্ষাকারীদিগকে তাড়া করিল। অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া কতক হতাহত, কতক বন্দী এবং কতক বা রাবাউল হইতে কোনক্রমে পলাইয়া সমুদ্রের ধারে হাজির হইল। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, গ্রীষ্মে ও পীড়ায় কাতর এই সমস্ত সৈন্যকে অস্ট্রেলিয়ান জাহাজ উদ্ধার করিল।

রাবাউল দখলের সঙ্গেই জাপসৈন্যেরা নিউবৃটেনের পূর্ব্বদিকে নিউ আয়র্লণ্ডের ক্যাভিয়েংয়ে অবতরণ করিল এবং নিউগিনির লে সহরে বোমা ও মেসিনগান চালাইয়া প্রচুর ক্ষতি সাধন করিল। ফেব্রুয়ারীর প্রথমভাগে খাস নিউগিনির সালামায়ুয়া বন্দর, স্বর্ণখনি অঞ্চলের ওয়ায়ু এবং বুলোলোর উপর বিমান আক্রমণ করিল। নিউগিনি উপনিবেশের রাজধানী পোর্ট মোরসবীর উপর ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রথম বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। ১০ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্ব বৃটিশ নিউগিনির গ্যামারাই আক্রান্ত হইল এবং নিউ বৃটেন দ্বীপের

গ্যাসমাতায় বৃহৎ একদল জাপসৈন্য অবতরণ করিল। ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রথম অষ্ট্রেলিয়া ভূভাগে জাপ বোমারু হানা দিল। ৭২টি জাপ বোমারু পোর্ট ডারুইনের বন্দরে ও সহরে আক্রমণ চালাইয়া প্রভূত ক্ষতি করিল। বন্দরের মার্কিন ডেষ্ট্রয়ার 'পেরী' নিমজ্জিত হইল। কতকগুলি বাণিজ্যজাহাজ ধ্বংস বা জখম হইল। ঘরবাড়ীও অনেক গেল এবং প্রচুর সামরিক ক্ষতি সাধিত হইল। জাহাজে ও সমুদ্রতীরে অনেকে প্রাণ হারাইল। ৩রা মার্চ্চ উত্তর-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় উইণ্ডহ্যাম ও ব্রুম এই দুইটি ক্ষুদ্র বন্দরেও জাপ বোমারু হানা দিল। বোধ হয় এইগুলি আসিয়াছিল ৪২০ হইতে ৫০০ মাইল দূরবর্ত্তী টাইমুর দ্বীপের (ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের এলাকায়) ঘাঁটি হইতে।

৭ই মার্চ্চ নিউগিনি অভিযান আরম্ভ হইল। পোর্ট মোরসবী ও বুলোলোতে বিমান আক্রমণের আড়াল ধরিয়া জাপ সৈন্যেরা সালামায়ুয়া ও লে সহরে অবতরণ করিল এবং দুই দিন পর জার্ম্মাণ যাজকদের আড্ডা ফিন্স হারবার দখল করিল। নিউগিনিরক্ষী ক্ষুদ্র অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল অভ্যন্তরভাগে হটিয়া গেল। যথেষ্ট সংখ্যায় জাপসৈন্য অবতরণ করিল এবং তাহারা মার্কহ্যাম নদীর উপত্যকা ধরিয়া নিউগিনির 'পুচ্ছ' অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। জাপযুদ্ধ ঘোষণার পর যে সমস্ত জার্ম্মান মিশনারী জঙ্গলে লুকাইয়া ছিল, তাহারা জাপানীদিগকে পথ দেখাইয়া দিল এবং অন্যান্যভাবে সাহায্য করিল। মার্চ্চমাস ধরিয়া উভয়পক্ষে এই দ্বীপ অঞ্চলে ক্রমাগত বিমান আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চলিল। সহরে, বন্দরে, জাহাজে ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল এবং মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে মার্কিন নৌদপ্তর দাবী করিল যে, তাহারা যুদ্ধারম্ভ হইতে এই পর্য্যন্ত দেড় শতাধিক জাপানী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে বা জখম করিয়াছে।

ফেব্রুয়ারী মাসের সুরু হইতেই মার্কিণ সৈন্যেরা আমেরিকা হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় আসিতেছিল। আমেরিকা হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত চারিটি 'সোজা রাস্তা' (direct route) ধরিয়া মার্কিণ কনভয় অষ্ট্রেলিয়ায় পৌছিতে লাগিল। জাপানীরা এই সমস্ত কনভয় আক্রমণ করিয়াও সাফল্যলাভ করিতে পারিল না। আসিবার পথে কনভয়গুলি কতকগুলি জাপানী দ্বীপে বিমান হানা দিয়াছিল।

মার্চ্চ ও এপ্রিলমাসের মধ্যে জাপানীরা অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব দিকের দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ দখল করিয়া বিভিন্ন দ্বীপে ও সমুদ্রপথে বিমান ও

নৌবহর যোগে প্রচুর উৎপাতের সৃষ্টি করিল। এই সময় অষ্ট্রেলিয়া আক্রান্ত হইবে কিনা তাহা লইয়া প্রবল গবেষণা দেখা দিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই দেখা গেল যে জাপানীরা দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে যে ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে খাস অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপে অভিযান হয়তো সম্ভব নয়। দূরত্বের প্রশ্নও বিশেষভাবে চিন্তা করিবার। জাপানের ইয়কোহামা বন্দর হইতে নিউবৃটেনের রাবাউল বন্দরের দূরত্ব ২,৬০০ মাইল এবং রাবাউল হইতে অষ্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন ১,৪২৫ মাইল—মোট ৪ হাজার মাইলের অধিক। এই অসম্ভব দূর পথের মধ্যে অপরিমিত পেট্রোল ও জ্বালানী দ্রব্য ছাড়া বিমান ও সমুদ্রপথের যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নহে। নৌবহর ও বিমান বহরের প্রাচুর্য্যও যে দরকার সেকথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং জাপান খাস অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের বদলে সলোমোন দ্বীপপুঞ্জ হইতে নিউগিনি এবং নিউগিনির দক্ষিণ কূল হইতে (পোর্ট মোরসবী যাহার আসল ঘাঁটি) অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বদিকে নিউ হেব্রাইডিস ও নিউ ক্যালেডোনিয়া দ্বীপ পর্য্যন্ত ঘিরিয়া রাখিতে চাহিল।

এদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নানা অংশে বিমান হানা চলিতে লাগিল। এবং ২৬শে এপ্রিল তারিখ মার্কিণ সৈন্যেরা জাপ আক্রমণের আশঙ্কায় নিউ ক্যালেডোনিয়া দ্বীপে অবতরণ করিল। এই দ্বীপটি ছিল ফ্রান্সের। জাপানীরা যাহাতে এই দ্বীপ দখল করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বে একটা ঘাঁটি তৈয়ারী করিতে না পারে তাহাই ছিল মার্কিণীদের উদ্দেশ্য। এই সময় দেখা গেল জাপানীরা সলোমোন দ্বীপপুঞ্জে অনেক যুদ্ধজাহাজ, সৈন্যবাহী জাহাজ ও বিমানবহর সমবেত করিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা গেল যে, তাহারা সলোমোন ও লুইসাইড দ্বীপপুঞ্জের বাকি অংশ দখল করিতে এবং অন্যত্রও অভিযান করিতে চাহে। সুতরাং অষ্ট্রেলিয়ায় মিত্রসেনামণ্ডলী স্থির করিলেন যে, নূতন কোন অভিযানের আগেই জাপানকে আঘাত করিতে হইবে। ৪ঠা মে তারিখে জাপ নৌবহরের একাংশকে সলোমোনের অন্তর্গত টুলাগীর অদূরে নোঙ্গর করা দেখা গেল। মার্কিণ নৌবহরের সেনাপতি রীয়র-এডমিরাল এফ জে ফ্লেচারের আদেশে মার্কিন বিমানবহর এই নৌবহরকে ভোরবেলা অতর্কিতে আক্রমণ করে। ১টি হাল্কা ক্রুজার ও ২টি ডেষ্ট্রয়ার সহ মোট ১২টি জাহাজ নষ্ট বা জখম হয় এবং ৬টি জাপ বিমান ধ্বংস হয়। এখানেই প্রবাল-সাগরের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ৭ই মে তারিখে জাপ সৈন্যবাহী নৌবহরের

প্রধান অংশকে মিসিমার অদূরে দেখা যায়। 'রিওকাকো' নামে জাপানীদের নূতন বিমানবাহী জাহাজ প্রথম আক্রান্ত হয়। মার্কিণ বিমানবাহী জাহাজ লেক্সিংটনের বোমারুগুলি ইহাকে আক্রমণ করে—১০টি টর্পেডো ও ১৫টি বোমার আঘাতে 'রিওকাকো' ধ্বংস হইয়া ডুবিয়া যায়। ৭ই মের অপরাহ্ন বেলা রিওকাকোর সহোদরা 'সোকাকোর' বোমারুগুলি মার্কিণ তৈলবাহী পোত 'নিওসো' এবং উহার সঙ্গী ডেষ্ট্রয়ার 'সিমস্'কে আক্রমণ ও জলনিমগ্ন করে। তারপর দিন বিচিত্র নৌযুদ্ধ সুরু হইল,—বিচিত্র এই অর্থে যে, এই যুদ্ধে দুইপক্ষের যুদ্ধজাহাজ সংঘর্ষে মাতিল না,—যুদ্ধজাহাজের বোমারুগুলিই সংগ্রামে লিপ্ত হইল। 'লেক্সিংটনে'র বোমারুগুলি 'সোকাকোকে' আক্রমণ করিল। বোমা ও টর্পেডোর আঘাতে 'সোকাকো' জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই অবস্থায়ই তাহাকে ফেলিয়া আসা হইল। কিন্তু 'সোকাকো'ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিমানবাহী 'লেক্সিংটন'কে আক্রমণ করিল। 'লেক্সিংটন' দুইটি টর্পেডো ও অন্ততঃ দুইটি বোমারু দ্বারা আহত হইল এবং কতকগুলি বোমা নিকটে পড়িবার জন্যও জাহাজের ক্ষতি হইল। জখমী 'লেক্সিংটন' প্রবাল সাগরে যুদ্ধের কয়েক ঘণ্টা পর যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তখন উহার অভ্যন্তরভাগে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। উহাকে রক্ষা করিবার জন্য ১৫ ঘণ্টা ধরিয়া সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা চলিতে থাকে। অহতগণকে অন্য ডেষ্ট্রয়ারে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং জাহাজটি পরিত্যক্ত হয়। 'লেক্সিংটনের' ডুবির দ্বারা মার্কিণ নৌবহরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। কেননা স্বাভাবিক অবস্থাতেই 'লেক্সিংটন' ৭০ হইতে ৮০ খানা বিমান বহন করিত।

প্রবাল সাগরের এই নৌযুদ্ধে জাপানীদের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। মার্কিণ নৌবিভাগের দাবীতে প্রকাশ ১খানা বিমানবাহী জাহাজ, ৩টি বড় ক্রুজার ১টি হাল্কা ক্রুজার, ২টি ডেষ্ট্রয়ার এবং কতকগুলি সৈন্যবাহী ও সরবরাহ জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে। ১টি ক্রুজার ও ১টি ডেষ্ট্রয়ার গুরুতর ভাবে জখম হইয়াছে এবং বোধহয় ডুবিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ২০টি জাহাজ (১টি বিমানবাহী জাহাজ ও ৩টি ক্রুজার) গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। বিমান নষ্ট হইয়াছে জাপানীদের শতাধিক। কিন্তু মার্কিণীদের এই যুদ্ধে কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। এদিকে ২৭শে মে তারিখে জেনারেল তোজো জাপ পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিলেন, "অষ্ট্রেলিয়া প্রশান্ত মহাসমুদ্রের পিতৃমাতৃহারা সন্তানে পরিণত হইয়াছে। প্রবাল সাগরের যুদ্ধে তাহার

নৌবল ধ্বংস হওয়ায় অসহায়ের মত সে জাপানী আক্রমণের অপেক্ষায় আছে। ৭ই ডিসেম্বর হইতে ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে জাপানের মাত্র ২৯ হাজার সৈন্য নষ্ট হইয়াছে।" মিত্রপক্ষের স্বীয় ক্ষতি গোপন করার সঙ্গে জাপ মুখপাত্রদের প্রচারকার্য্য একত্রিত হওয়ায় প্রবাল সাগরের যুদ্ধের ফলাফল জনসাধারণের চিত্তে রেখাপাত করিতে পারে নাই।

কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া 'বাপ-মা মরা ছেলেতে' পরিণত হওয়া সত্ত্বেও জাপান তাহাকে আক্রমণ করিল না। কেবল পোর্ট মোরসবীতে বার বার বিমান আক্রমণ ও সিডনী বন্দরে ৩১শে মে রাত্রিবেলা ক্ষুদে সাবমেরিনযোগে এক দুঃসাহসিক হানা দিল। পার্ল হারবারে যে ধরণের 'পকেট সাবমেরিন' ব্যবহার করা হইয়াছিল এখানেও সেই ধরণের ৪খানা সাবমেরিন হানা দিল। এগুলি দুইজন লস্করের দ্বারা বাহিত ছিল। বোধহয় কোন বড় জাহাজ ঐগুলিকে বহন করিয়া আনিয়া ওখানে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ইহাদের আক্রমণে ক্ষতি সামান্যই হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর হইতে যুদ্ধের গতি ক্রমশঃ উত্তরদিকে ফিরিতেছিল। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দিকে জাপানীরা নজর দিতেছিল। তাহাদের এই আক্রমণের উদ্দেশ্য দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আমেরিকার দৃষ্টি সরাইয়া নেওয়া কিম্বা ব্লাডিভোষ্টক বন্দর দিয়া আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে যে যোগাযোগ চলিতেছিল তাহাতে বাধা দেওয়া। আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো হইতে ২০৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং জাপান হইতে ২৫৩৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। ৩রা জুন জাপানী বোমারু আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ডাচ্ হারবারে হানা দেয়। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। কেননা এতদিনে মার্কিনীরা সতর্ক হইয়া গিয়াছিল। পরদিন জানা যায় যে, একটি শক্তিশালী জাপ নৌবহর মিড্ওয়ে দ্বীপ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। মিডওয়ে বা 'মধ্যবর্ত্তী' দ্বীপটি জাপান ও আমেরিকার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় মাঝামাঝি স্থানেই অবস্থিত। মিডওয়ের সমুদ্র এলাকায় ৪ দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। মার্কিণ নৌবিভাগীয় বর্ণনায় দেখা যায় যে, অনেকগুলি ক্রুজার, সৈন্যবাহী জাহাজ, বিমানবাহী জাহাজ, মালবাহী জাহাজ ও ডেষ্ট্রয়ার সহ একটি বড় জাপ নৌবহর ৫টি দলে বিভক্ত হইয়া মিডওয়ের প্রায় ৭০০ মাইল পশ্চিমে অগ্রসর হয়। ১০০ মাইলেরও বেশী তফাৎ হইতে

এই নৌবহরের উপর আক্রমণ চালানো হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে আমেরিকার মাত্র দুইটি জাহাজ (এবং তাহার মধ্যেও আবার একখানা সাবমেরিন) নিযুক্ত হইয়াছিল। আসল যুদ্ধ চালাইয়াছিল মার্কিণ বোমারুগুলি। "উড়ন্ত কেল্লা" শ্রেণীর বোমারু টর্পেডো ও অতি-বিস্ফোরক বোমা লইয়া চন্দ্রালোকিত রাত্রে জাপ নৌবহরকে প্রথম আক্রমণ করে। তারপর দিনের বেলাও অবশ্য ঝাঁকের পর ঝাঁক আসিয়া আক্রমণ চালাইতে থাকে।

মার্কিণ বোমারুগুলি যখন মিডওয়ে দ্বীপ ছাড়িয়া জাপ নৌবহর আক্রমণে বাহির হইল। চতুর জাপানীরাও তখন তাহাদের বিমানবাহী জাহাজ হইতে এক ঝাঁক বোমারু উড়াইয়া দিল। এই বোমারুগুলি ৩৮ মিনিট ধরিয়া মিডওয়ে দ্বীপের উপর আক্রমণ করিতে থাকে এবং তারপর আর এক ঝাঁক ছোঁমারা বোমারু ও জঙ্গীবিমান আসিয়া হাজির হইল। ইহারা মিডওয়ে দ্বীপের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিল। এই আক্রমণে ৪০ খানা জাপ বোমারু নষ্ট হয়। ওদিকে মিডওয়ের সমুদ্রে মার্কিণ বোমারুগুলি জাপ নৌবহরের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে থাকে। চারিদিনের এই নৌ-বিমান যুদ্ধে জাপ নৌবহরের ক্ষতির পরিমাণ হইল নিম্নলিখিত রূপ :—

ধ্বংস—বিমানবাহী জাহাজ 'আকাগি', 'কাগা', 'হিরায়ু' ও সরিয়ু—এই ৪ খানা, বড় ক্রুজার ২ খানা 'মিকুমা' ও 'সোগামি', ৩টি ডেস্ট্রয়ার ও আরও দুইটি অন্য পোত।

ক্ষতিগ্রস্ত—৩টি ব্যাটলসিপ, ১টির জখম অত্যন্ত গুরুতর। ৩টি বড় ক্রুজার, ১টির জখম গুরুতর, ১টি ছোট ক্রুজার, কয়েকটি ডেস্ট্রয়ার এবং ৩টি সৈন্যবাহী জাহাজ।

এই নৌযুদ্ধে প্রায় ৪৮০০ জাপানী নিহত বা নিমজ্জিত হইয়াছিল। আমেরিকার নষ্ট হইয়াছে ৯২ জন অফিসার ও ২১৫ জন সৈন্য। প্রবাল সাগরের মত এই যুদ্ধেও মার্কিণ বিমান বহরই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং নৌযুদ্ধে বিমানের আধিপত্য প্রমাণিত হইয়াছিল।

মিডওয়ের যুদ্ধে জাপানীরা ব্যর্থ ও পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা উত্তরদিকে আরও একটি সাফল্যমণ্ডিত অভিযান চালাইল। আলুশিয়ান দ্বীপমালার একান্ত পশ্চিম প্রান্তিক ঘাঁটি আত্তুতে তাহারা অবতরণ করিল এবং কিস্কা দ্বীপ দখল করিল। কিস্কায় একটি উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে।

আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রের নানা অংশে মার্কিণ ও জাপানী বিমানবহর (সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু নৌবহরও) ইতস্ততঃ পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে লাগিল। বিভিন্ন দ্বীপের সহর ও ঘাঁটি এবং সমুদ্রপথের অলিগলিতে আক্রমণ চালাইয়া উভয় পক্ষই পরস্পরের নৌ ও বিমান ধ্বংসের আজগুবি দাবী প্রকাশ করিতে লাগিল। জাপানীরা যেমন মার্কিণ নৌবহরের সর্ব্বনাশ প্রচার করিল, মার্কিণীরাও তেমনি জাপানের 'ক্যাপিটাল শিপ' ও ক্রুজারের সম্পূর্ণ খতম দাবী করিল। এই দাবী কিরূপ হাস্যকর ও অতিরঞ্জিত ছিল তাহা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। মিডওয়ের সামুদ্রিক এলাকায় জাপানী নৌবহর সম্পর্কে মার্কিণ নৌ ও সমর-বিভাগ ঘোষণা করিলেন যে, জাপানের ৫৩টি ক্রুজার নষ্ট হইয়াছে। অথচ জাপানের মোট ক্রুজারের সংখ্যা বোধহয় ৩৫ খানার বেশী নহে। যাহা জাপানের নাই তাহাও ধ্বংস করার দাবী প্রচারকার্য্যের মূর্খতা ছাড়া আর কি?

মিড্‌ওয়ে দ্বীপের যুদ্ধের পর মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর যেন কিছুটা শান্তভাব অবলম্বন করে। এই সমস্ত যুদ্ধে জাপানী নৌবহরের ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু মার্কিণ নৌবহরও উহার ক্ষয়ক্ষতি সামলাইয়া ততদিনে প্রস্তুত হইতে পারে নাই। তথাপি ১৯৪২ সালের জুলাই মাসের মধ্যেই জাপানী আক্রমণাত্মক অভিযান শেষ হইয়া গেল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আত্তু ও কিস্কাদ্বীপ দখলই ইহার শেষ সীমারেখা এবং জাপান জলে ও স্থলে অদ্ভুতভাবে ছড়াইয়া পড়িল। এই অপরিসীম বিস্তার যোগাযোগ রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া পড়িল। ইহার পরবর্ত্তী বৎসরগুলি, বর্ত্তমান ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত জাপানী আত্মরক্ষা ও মিত্রপক্ষের আক্রমণ নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করিল।

পরিশিষ্ট

(২)

আমেরিকার পাণ্টা-আক্রমণ

১৯৪২ সালের মধ্যভাগে জাপানী রণনীতি যেন প্রশান্ত মহাসাগরের দুইটি বিরাট পার্শ্বদেশের কর্ম্মতৎপরতায় মুখর হইয়া উঠিল। উত্তর-পূর্ব্ব প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর—এই দুইটিকে জাপানের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে। আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আত্তু ও কিস্কা পর্য্যন্ত এই বামপার্শ্ব এবং অষ্ট্রেলিয়ার সন্নিহিত নিউগিনি ও সলোমোন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত ইহার দক্ষিণ পার্শ্ব প্রসারিত হইল। একদিকে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন, শীতার্ত্ত এবং বৃক্ষহীন কালো পাথরের দেশ আলুশিয়ান, অন্যদিকে তাপদগ্ধ, জঙ্গলপরিপূর্ণ দুর্গম পাহাড়ের দেশ নিউগিনি ও সলোমোন। এই দুই পার্শ্বদেশে জাপানীরা অগ্রসর হইয়া রাশিয়া ও আমেরিকা এবং আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া দিতে চাহিল। জাপানীদের এই দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরের দিকে অগ্রগতির নীতি লক্ষ্য করিয়া আমেরিকাও সতর্ক ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল যে, জাপানীরা যে সমস্ত বড় বড় নৌ ও বিমান ঘাঁটি, দ্বীপ ও উপদ্বীপ কাড়িয়া লইয়াছে, যদি সেইগুলিতে তাহারা কায়েম হইয়া বসিতে পারে, তবে মিত্রপক্ষের বিপদ শতগুণে বাড়িয়া যাইবে। যদিও জাপানের অভিমুখে অগ্রসর কিম্বা তাহার বিরুদ্ধে পাণ্টা-আক্রমণাত্মক অভিযান আরম্ভের সাধ্য সেই সময় মিত্রপক্ষের ছিল না, তথাপি জাপানের দূর বিস্তৃত দুই সামুদ্রিক বাহুর আঙ্গুলের ডগাগুলির উপর নিরন্তর আঘাত হানিতে পারিলে, উহার বাহু অন্ততঃ কিছুটা সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে, অথবা সে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে পুরাপুরি পাকা করিয়া তুলিতে পারিবে না। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকা জাপানের দক্ষিণ ও বাম বাহুর ডগাগুলির (যেমন, আলুশিয়ানের বিভিন্ন দ্বীপ এবং নিউগিনি ও সলোমোনের বিভিন্ন দ্বীপ) উপর নৌবহর ও বিমানবহর যোগে যেন হাতুড়ির ঠোকা দিতে লাগিল। আগষ্ট মাসে তাহারা সলোমোন-

দ্বীপপুঞ্জের গুয়াদালক্যানেল এবং সেপ্টেম্বর মাসে আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আন্দ্রেয়ানোভ্ * দ্বীপে অবতরণ করে। আন্দ্রেয়ানোভ দ্বীপটি আলুশিয়ান দ্বীপমালার মধ্যভাগে। কিস্কা হইতে উহা মাত্র ১২৫ মাইল দূরে। তথাপি জাপানীদের দৃষ্টি এড়াইয়া একটি ছোট মার্কিণ নৌবহর ও সৈন্যবাহী জাহাজ অত্যন্ত ঝড়ো আবহাওয়ার মধ্যে সেখানে আসিয়া হাজির হয় এবং বিনাযুদ্ধেই স্থানটি দখল করে। এখানে অবতরণের ১০ দিনের মধ্যেই একটি বিমান ঘাঁটি গড়িয়া তোলা হয় এবং এই ঘাঁটি হইতেই আলুশিয়ান দ্বীপের অন্যান্য অংশের কিস্কা ও আত্তুতে বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। কিস্কা ও আত্তুর পুনর্দখলের ইহাই ছিল সূচনা।

এদিকে জাপানীদের দক্ষিণ পার্শ্বে নিউগিনি ও সালোমোনেও মার্কিণ আক্রমণ আরম্ভ হইল। দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরের যে হাস্যকর মন্দগতি যুদ্ধ ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে আরম্ভ হইল এবং যাহার সূচনা লইয়া সেদিনের সামরিক জগৎ বিশেষ কোন মাথা ঘামায় নাই, তাহাই পুরাপুরি দুই বৎসর পর ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পাল্টা-অভিযানে পরিণত হইল। কিন্তু সেদিনের গুয়াদালক্যানেল এবং বুনা ও গোনা লইয়া মার্কিণী আক্রমণ কেবলমাত্র বিদ্রুপাত্মক আলোচনার বিষয়ীভূত ছিল।

মার্কিণ নৌদপ্তর অনুমান করিলেন যে, জাপানীরা যদি আরও অগ্রসর হইতে থাকে, তবে পোর্ট ডারুইন ও খাস অষ্ট্রেলিয়া আক্রান্ত হইতে পারে এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যাণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার যোগাযোগ নষ্ট এবং নিউ হেব্রাইডিস, নিউ ক্যালেডোনিয়া ও ফিজি দ্বীপের ঘাঁটি বিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং সলোমোন দ্বীপপুঞ্জের চাবিকাঠি স্বরূপ উহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ দখল করিতে পারিলে জাপানীদের এই অভিসন্ধি ব্যর্থ হইবে। এজন্য ৭ই আগষ্ট তারিখে মার্কিণ এবং অষ্ট্রেলিয়ান নৌ এবং স্থলসৈন্য অতর্কিতে গুয়াদালক্যানেল ও টুলাগী অঞ্চলে অবতরণ করে এবং স্থান দুইটি দখল করে। কিন্তু জাপানীরা তীব্র পাল্টা আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে মিত্রপক্ষের ৪খানা শক্তিশালী ক্রুজার ও একটি ডেষ্ট্রয়ার ধ্বংস হইয়া যায়। ক্রুজারগুলির মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার ‘ক্যানবেরা’ জাহাজটিও ছিল। উহার

* আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ জারের আমলের রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই দ্বীপগুলি রাশিয়ার নিকট হইতে কিনিয়া লয়। এই কারণেই দ্বীপগুলিতে রুশীয় নামের প্রভাব রহিয়াছে।—লেখক

ক্যাপ্টেনসহ ক্রুজারটি নষ্ট হইয়া যায়। জাপানীদের এই পাল্টা আক্রমণে ক্ষিপ্রতা, গোলাবর্ষণের পটুতা এবং সাহসিকতাপূর্ণ রণকৌশল যথেষ্ট প্রসংশনীয় ছিল। গুয়াদালক্যানেলে আমেরিকার পাল্টা আক্রমণাত্মক অভিযানের যে প্রথম সূচনা হয়, তাহাই ক্রমশঃ দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত যুদ্ধ অত্যন্ত কষ্টকর এবং দীর্ঘস্থায়ী ছিল। দ্বীপগুলি উন্নত নহে, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, জঙ্গল ও পাহাড়ের জন্য এত দুরধিগম্য যে, সাধারণ পথিকের পক্ষেও চলা কঠিন। ইহার উপর মশামাছি, কীটপতঙ্গ, জলাভূমি, নদী এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানা রকম ব্যাধির উপদ্রব ছিল। ফলে, মার্কিণ ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদের পক্ষে এই সমস্ত দ্বীপে আক্রমণ, অবতরণ ও যুদ্ধ পরিচালনা দস্তরমত সমস্যাসঙ্কুল ছিল। রণভূমির দুর্গমতার সঙ্গে জাপানীদের আত্মরক্ষার শক্তি মিলিত হইয়া মার্কিণ অভিযানকে স্বভাবতঃই অত্যন্ত মৃদু করিয়া তুলিল। একমাত্র গুয়াদালক্যানেল ও বুনা-গোনার নাম ক্রমাগত শুনিতে শুনিতে তখনকার দিনের সংবাদপত্রের পাঠকদের বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। কারণ, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের যুদ্ধ শেষ হইতে প্রায় ৭ মাস—১৯৪২ সালের আগষ্ট হইতে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত লাগিয়াছিল।

১৯৪২ সালের আগষ্ট হইতে বর্ত্তমান ১৯৪৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপে আমেরিকার আক্রমণ ও যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে অসম্ভব এবং সম্ভবতঃ আমাদের পাঠকদের নিকট অপ্রয়োজনীয়। সুতরাং এখানে কেবল বিভিন্ন দ্বীপাভিযানের তারিখ ও নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

গুয়াদালক্যানেল ও টুলাগী আক্রমণের পর মার্কিণ নৌসৈন্যেরা ১৭ই আগষ্ট তারিখে গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের ম্যাকিন দ্বীপে এক দুঃসাহসিক হানা (Commando raid) দেয়। কিন্তু জাপানীরা বোমারু মেসিনগান ও হাতবোমা লইয়া পাল্টা আক্রমণ করে। তালগাছে চড়িয়া জাপানীরা চোরা-গোপ্তা গুলী চালাইতে থাকে। ফলে, মার্কিণ সৈন্যেরা পরদিন দ্বীপ ত্যাগ করিয়া জাহাজে চড়িয়া ফিরিয়া আসে। ২৬শে আগষ্ট তারিখে জাপানীরা মিল্‌নে বে'তে অবতরণ করিয়া পপুয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের মিত্রপক্ষীয় গুরুত্ব-পূর্ণ ঘাঁটি দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু চার পাঁচ দিন তীব্র যুদ্ধের পর জাপানীদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাহারা পরাজিত হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর

তাহারা পোর্ট মোরস্‌বী হইতে ৩২ মাইল দূরে (বিমান পথে) একটি গ্রামে অবতরণ করে। কিন্তু ৩০শে সেপ্টেম্বর তাহারা সেখান হইতে পিছু হটিতে থাকে। ২৫শে অক্টোবর মার্কিণ বোমারু হংকং বন্দরে বোমা বর্ষণ করে। ২৬শে অক্টোবর সলোমোন দ্বীপপুঞ্জের অদূরে মার্কিণ বোমারুর দল একটি জাপ নৌবহরকে আক্রমণ করে। এই সঙ্ঘর্ষে আমেরিকার পক্ষ হইতে দাবী করা হয় যে, জুইকাকু শ্রেণীর দুইটি বিমানবাহী জাহাজের উপর যথাক্রমে ৬বার ও ৩বার বোমা বর্ষিত হয়, কঙ্গো শ্রেণীর দুইটি ব্যাটলশিপের উপর ২টি ও ১টি বোমা পড়ে, একটি ক্রুজারের উপর ৫টি বোমা পড়ে, একটি বড় ক্রুজারের উপর বোমা ও টর্পেডোর আক্রমণ ঘটে, এবং আর একটি বড় ক্রুজারের উপরও দুইটি টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু এই আক্রমণের আঘাতে জাহাজগুলি ডুবিয়াছে, কিম্বা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে তাহা বুঝা যাইতেছে না।

৩রা নভেম্বর অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যেরা নিউগিনির পূর্ব্বাংশের কোকোদায় প্রবেশ করে। ১০ই নভেম্বর মার্কিণ পর্য্যবেক্ষণকারী বিমানসমূহ রিপোর্ট দেয় যে, নিউ বৃটেন ও উত্তর-পশ্চিম সলোমোন দ্বীপপুঞ্জের সামুদ্রিক এলাকায় জাপানী যুদ্ধ জাহাজ, সৈন্যবাহী জাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজসমূহের একটা প্রকাণ্ড বহর সমবেত হইয়াছে। লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, জাপানীরা দক্ষিণ সলোমোন পুনরায় দখলের উদ্দেশ্যে এক প্রকাণ্ড আঘাত হানিতে উদ্যত হইয়াছে। এই আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য ১৩ই হইতে ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত গুয়াদালক্যানেলের অদূরে এক প্রকাণ্ড নৌ সংঘর্ষ হয়। ফলে, দক্ষিণ সলোমোন পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে জাপানীরা যে অভিযাত্রী বাহিনী নামাইবার চেষ্টা করে তাহা ব্যর্থ হয়। মার্কিণ নৌদপ্তরের মতে মার্কিণ বোমারু ও পোতসমূহের আক্রমণে ১টি জাপানী ব্যাটলশিপ, ৩টি ভারী ক্রুজার, ২টি হাল্কা ক্রুজার, ৫টি ডেষ্ট্রয়ার ও ৮টি সৈন্যবাহী জাহাজ ডুবিয়া যায়। ইহা ছাড়া ১টি ব্যাটলশিপ, ৬টি ডেষ্ট্রয়ার ও ৪টি সৈন্যবাহী বা মালবাহী জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩০শে নভেম্বর পুনরায় আর একটি জাপ সৈন্যবাহী 'কনভয়' যুদ্ধ জাহাজের পাহারায় গুয়াদালক্যানেলের দিকে অগ্রসর হয় এবং এবারেও মার্কিণীরা দাবী করে যে, ১২টি ক্রুজার অথবা বড় ডেষ্ট্রয়ার, ২টি সৈন্যবাহী জাহাজ ও ১টি মালবাহী জাহাজ তাহারা ডুবাইয়া দিয়াছে। ৯ই ডিসেম্বর অষ্ট্রেলিয়ানরা গোনা দখল করে।

১৯৪২ সালের শেষভাগ ধরিয়া মার্কিণ বোমারু, সাবমেরিন ইত্যাদি প্রশান্ত

মহাসমুদ্রের নানা অংশে জাপানী নৌবহর, বাণিজ্য বহর, সৈন্য ও মালবাহী প্রভৃতি জাহাজের উপর এবং বিভিন্ন অধিকৃত এলাকায় আক্রমণ চালাইতে থাকে। কিন্তু এই আক্রমণে দক্ষিণ চীন-সমুদ্রে একবার মিত্রপক্ষ নিদারুণ ভুল ও শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন। ২২শে ডিসেম্বর চুংকিংএর বৃটিশ দূতাবাস হইতে প্রকাশ করা হয় যে, জাপানী সৈন্যবাহী জাহাজ 'লিসবন' একটি মার্কিণ সাবমেরিনের টর্পেডোর আঘাতে সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই জাহাজে ২ হাজার বৃটিশ বন্দী ছিল। জাহাজটি হংকং হইতে জাপানে যাইতেছিল। পথিমধ্যে ১লা অক্টোবর তারিখে চেকিয়াং উপকূলের অদূরে সকালবেলা মার্কিণ টর্পেডোর আঘাতে জাহাজটি নিমজ্জিত হয়'। রাত্রিবেলা জাহাজের একাংশে বন্দীদিগকে ত্রিপল দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল। ইহাদের অনেকেই অত্যন্ত অসুস্থ ছিল। সকাল বেলা ত্রিপল খোলা হইলে 'লিসবন' জাহাজকে ডুবিতে দেখা যায়। জাপানীরা জাহাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল। বহু বন্দী তখন জাহাজ হইতে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সমুদ্রে পড়িয়া তাহারা জাপানী সাহায্যকারী পোত-সমূহের দিকে সাঁতার কাটিতে থাকে। প্রকাশ যে, জাপানী লস্করেরা এই অবস্থায়ও কোন কোন বন্দীর উপর গুলী চালায়। কতক লোককে তাহারা উদ্ধার করে এবং বাকি লোকদিগকে তাহাদের অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই সময় জাহাজটি একেবারে ডুবিয়া যায়। চীনা জেলে ডিঙ্গিসমূহ কতক লোককে উদ্ধার করে এবং কয়েকজনকে জাপানীদের হাতে দেওয়া হয়। অন্যান্য কয়েকজন অনধিকৃত চীনে পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। জাপানীরা দাবী করিল যে, নিমজ্জিত 'লিসবন' জাহাজ হইতে তাহারা ১৮০০ বন্দীর মধ্যে ৯০০ জনকে উদ্ধার করিয়াছে। যাহারা নিখোঁজ হইয়াছে, তাহাদের একটা নামের তালিকা জাপ গভর্ণমেণ্ট অবশ্য বৃটিশ সমর দপ্তরকে সরবরাহ করিয়াছিলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপানীদের জাহাজ ডুবি এবং অন্যান্য ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে আমেরিকার দাবী যেমন অতিশয়োক্তি পূর্ণ ছিল, তেমনই জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজোর বক্তৃতায়ও জাপানী ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে কিছুটা গোপন করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেননা টোকিও বেতারবার্ত্তা ও তোজোর বর্ক্তৃতার মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখ জেনারেল তোজো এক বক্তৃতায় বলেন যে, এতদিনে আসল যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। ইঙ্গ-

মার্কিণ বোমারু নিরন্তর হানা দিতেছে। তবে ব্রহ্মদেশে একটি নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে এবং একটি বর্ম্মী রক্ষীবাহিনী গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ফলে ব্রহ্মদেশে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চীনে চুংকিং গভর্ণমেণ্টের প্রায় ৩০ লক্ষ সৈন্য ও কমিউনিষ্টদের ৬ লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিতেছে। জেনারেল তোজোর এই বক্তৃতার সঙ্গে পার্ল হারবার আক্রমণের বার্ষিকী উপলক্ষে একটি জাপ সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয় যে, ১লা নভেম্বর (১৯৪২) পর্য্যন্ত চীনে হতাহতের সংখ্যা মোট ২১,১৬৬ জন জাপ সৈন্য নিহত এবং ৪২,৫৭৭ জন আহত হইয়াছে। আর ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত জাপানের ৩৯৪টি বিমান ও ৬২টি জাহাজ নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু নিউ ইয়র্ক হইতে প্রাপ্ত 'টাইম্‌সের' ৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে দেখা যায় যে, টোকিও বেতারে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ৩০টি যুদ্ধজাহাজ ও ৬৫টি বাণিজ্য জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে এবং ২২টি জাহাজ জখম হইয়াছে। নিমজ্জিত যুদ্ধ জাহাজগুলির মধ্যে ১টি ব্যাটলশিপ ও তিনটি বিমানবাহী জাহাজ ছিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত ছিল ১টি ব্যাটলশিপ ও দুইটি বিমানবাহী জাহাজ। কিন্তু আমেরিকার মতে বড় যুদ্ধজাহাজ হইতে সুরু করিয়া ছোট বাণিজ্য পোতসহ জাপানের মোট ৩৯৪খানা পোত নষ্ট হইয়াছে এবং ১৯৪২ সালের মধ্যে জাপানী সৈন্য নিহত বা অকেজো হইয়াছে মোট আড়াই লক্ষ। জাপানী নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই। তবে, ৭ই ডিসেম্বরের এক বেতার বক্তৃতায় টোকিও হইতে বলা হইয়াছিল যে, কয়েকটি নূতন ধরণের প্রকাণ্ড যুদ্ধ জাহাজ ও বিমানবাহী জাহাজ তৈয়ার ও সমুদ্রে ভাসানো হইয়াছে।

ডিসেম্বর, ১৯৪৪।

—:০:—

জাপানী যুদ্ধের দিনপঞ্জী

১৯৪১ সাল, ডিসেম্বর

৭ই ডিসেম্বর—হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বিখ্যাত মার্কিণ নৌঘাঁটি পার্ল হারবারে অতর্কিত জাপানী আক্রমণ ও মার্কিণ নৌবহরের নিদারুণ ক্ষতি। জাপানী যুদ্ধের আরম্ভ এবং ঐদিন হংকং, গুয়াম, ফিলিপাইন, ওয়েক, থাইল্যাণ্ড ইত্যাদিতেও আক্রমণ ও সাংহাই দখল।

৮ই ডিসেম্বর—জাপান ও মিত্রশক্তিপুঞ্জের পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও ফরাসী ইন্দোচীন হইতে জাপসৈন্যের থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ এবং মালয়ের সিঙ্গোরা ও পাটানি বন্দরে অবতরণ।

৯ই ডিসেম্বর—উত্তর গিলবার্ট দ্বীপ দখল।

১০ই ডিসেম্বর—ভীমকায় বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্' ও 'রিপালস্' মালয়ের অদূরে নিমজ্জন।

১১ই ডিসেম্বর—গুয়াম দ্বীপে অবতরণ ও দখল।

১২ই ডিসেম্বর—দক্ষিণ লুজনে (ফিলিপাইন) জাপ অবতরণ।

১৫ই ডিসেম্বর—ইংরাজদের কৌলুন (হংকং) পরিত্যাগ।

১৬ই ডিসেম্বর—বোর্ণিও দ্বীপের সারাওয়াকে জাপ অবতরণ।

১৮ই ডিসেম্বর—হংকংয়ে জাপ অবতরণ।

২১শে ডিসেম্বর—মিন্দানাও (ফিলিপাইন) দ্বীপে বৃহৎ জাপ সৈন্যের অবতরণ। জাপান ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে মৈত্রী ও সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর।

২২শে ডিসেম্বর—ওয়েক দ্বীপ দখল।

২৩শে ডিসেম্বর—রেঙ্গুনে জাপানীদের ব্যাপক বোমারু হানা ও কয়েক হাজার লোক হতাহত। ফলে, কলিকাতা পর্য্যন্ত গুজব ও আতঙ্ক বিস্তার।

২৫শে ডিসেম্বর—হংকংয়ের আত্মসমর্পণ ৭ দিন যুদ্ধের পর।

২৬শে ডিসেম্বর—ম্যানিলাকে 'খোলা সহর' বলিয়া ঘোষণা।

১৯৪২

২রা জানুয়ারী—ম্যানিলার পতন ও মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জের ২৬টি জাতির যুদ্ধজয় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ।

৪ঠা জানুয়ারী—দঃ পঃ প্রশান্ত মহাসাগরে জেনারেল ওয়েভেল সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত। সহকারী মেজর জেনারেল ব্রেট (মার্কিণ) এবং নৌ-অধিনায়ক এড্‌মিরাল টমাস্‌ সি হার্ট।

৮ই জানুয়ারী—ব্যাঙ্ককে ব্রিটিশ বোমারুর প্রবল বোমা বর্ষণ।

১১ই জানুয়ারী—মালয়ের প্রধান নগর কুয়ালালামপুরের পতন।

১৮ই জানুয়ারী—টেভয় (দক্ষিণ-প্রান্তিক ব্রহ্ম) সহরের পতন ও জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপান কর্ত্তৃক নূতন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর।

২০শে জানুয়ারী—ব্রহ্মের পূর্ব্বাংশে ও দক্ষিণে জাপ আক্রমণ।

২২শে—৩০শে জানুয়ারী—ম্যাকাসার প্রণালীতে জাপ-মার্কিণ নৌ-বিমান যুদ্ধ, ১৫টি জাপ জাহাজ ডুবি ও ২টি জখম।

২৩শে জানুয়ারী—রাবাউল (নিউগিনি) জাপ কর্ত্তৃক দখল।

২৪শে জানুয়ারী—দক্ষিণ বোর্ণিওর বালিক পাপানে ও সেলিবিস্‌ দ্বীপের কেণ্ডারিতে এবং নিউগিনি দ্বীপের রাজধানীতে জাপ অবতরণ ও থাইল্যাণ্ড কর্ত্তৃক বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

৩০শে জানুয়ারী—ওলন্দাজ নৌ-ঘাঁটি আম্বয়নার পতন।

৩১শে জানুয়ারী—পেনাং, সিঙ্গোরা, কেডা, সেলাংগড়, কুয়াণ্টান ইত্যাদি দ্রুত দখলের পর মালয় যুদ্ধের অবসান এবং সিঙ্গাপুর সংগ্রামের সুরু।

২রা ফেব্রুয়ারী—জহোর রাজ্য হইতে জাপানীদের সিঙ্গাপুরে অগ্রগতি।

৩রা ফেব্রুয়ারী—সুরাবায়া (ওলন্দাজ) নৌ-ঘাঁটিতে জাপ বোমারুর আক্রমণ। পোর্ট মোসবীতেও প্রথম আক্রমণ।

৮ই ফেব্রুয়ারী—রেঙ্গুনে আবার জাপ বোমা বর্ষণ।

৯ই ফেব্রুয়ারী—জহোর প্রণালী পথে রাত্রিবেলা সিঙ্গাপুরে জাপানীদের অবতরণ। এশিয়ার যুদ্ধে পরামর্শের জন্য জেনারেল চিয়াংকাইসেকের নয়াদিল্লীতে আগমন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—জাপানীদের মার্ত্তাবান দখল, পেগু ও রেঙ্গুনের বিপদ।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—জাপ প্যারাসুট সৈন্যদের পালেম্বং (সুমাত্রার তৈলকেন্দ্র) দখল।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণ, জাপানীদের হাতে ৬০ হাজার ভারতীয়, বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য বন্দী।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—অষ্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দরে বোমা বর্ষণ।

২০শে ফেব্রুয়ারী—বালিতে (বা বলি দ্বীপ) জাপানীদের অবতরণ।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—জাপ সাবমেরিণ হইতে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে গোলাবর্ষণ।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—জাভা সাগরের নৌ-যুদ্ধে প্রায় সমগ্র ওলন্দাজ ও মিত্রপক্ষীয় নৌ-বহরের ধ্বংস ও জাপানের সামান্য ক্ষতি।

১লা মার্চ্চ—জাভার তিন অংশে জাপ অবতরণ ও দ্রুত অগ্রগতি।

৩রা মার্চ্চ—সুদূর প্রাচ্যের অধিনায়কত্ব ছাড়িয়া জেনারেল ওয়েভেলের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ।

৫ই মার্চ্চ—বাটাভিয়ার (জাভার রাজধানী) পতন।

৮ই মার্চ্চ—রেঙ্গুন ও পেগুর পতন।

৯ই মার্চ্চ—বাণ্ডোয়েংয়ের পতন ও জাভা যুদ্ধের অবসান।

১৩ই মার্চ্চ—অষ্ট্রেলিয়ায় মার্কিণ সৈন্যের আগমন।

১৭ই মার্চ্চ—বাতান (ফিলিপাইন) ত্যাগ করিয়া জেনারেল ম্যাক-আর্থারের অষ্ট্রেলিয়ায় আগমন এবং দঃ পঃ প্রশান্ত মহাসাগরের অধিনায়কত্ব লাভ।

২৫শে মার্চ্চ—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ (বঙ্গোপসাগর) জাপান কর্ত্তৃক দখল ও মার্চ্চের শেষ হইতে এপ্রিল মাস ধরিয়া জাপানীদের মধ্যব্রহ্ম ও উত্তর ব্রহ্মে অগ্রগতি।

৫ই এপ্রিল—কলম্বোতে ৭৫টি জাপ বোমারুর (বিমানবাহী জাহাজ হইতে) হানা এবং অনেকগুলি বৃটিশ ও জাপ বিমান নষ্ট।

৮ই এপ্রিল—মাদ্রাজ উপকূলে ক্ষুদ্র জাপ বোমারুর হানা।

৯ই এপ্রিল—ত্রিঙ্কোমালি (সিংহল) নৌ-ঘাঁটিতে জাপ বোমারুর হানা।

১১ই এপ্রিল—বৃটিশ বিমানবাহী পোত 'হার্মিস্' ও ২টি ক্রুজার 'ডর্সেটসায়ার' এবং 'কর্ণওয়াল' বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত। বাতান উপদ্বীপের (ফিলিপাইন) আত্মসমর্পণ। দীর্ঘ অবরোধের অবসান।

১৮ই এপ্রিল—মার্কিণ বিমানবাহী জাহাজের বোমারু কর্ত্তৃক টোকিও, ইয়োকোহামা, কোবে এবং নাগোয়ায় বোমাবর্ষণ।

৩০শে এপ্রিল—লাসিওর (উত্তরব্রহ্ম) পতন।

৩রা মে—মান্দালয়ের (উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী) পতন।

৫ই মে—জাপ সৈন্যদের ব্রহ্ম-য়ুনান সীমান্ত অতিক্রম।

৬ই মে—ফিলিপাইনের কোরিজিডর দুর্গের আত্মসমর্পণ।

৭ই ও ১০ই মে—প্রবাল সাগরের নৌ-যুদ্ধে জাপানীদের ১১টি জাহাজ ধ্বংস ও ৭টি জখম। মার্কিণ বিমানবাহী জাহাজ 'লেক্সিংটন' ধ্বংস।

৮ই ও ৯ই মে—বাঙ্গলা দেশে প্রথম বোমাবর্ষণ, চট্টগ্রামে পর পর দুই দিন আক্রমণ।

১১ই মে—ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলাটের ভারতে আগমন। মে মাসের শেষদিকে জেনারেল আলেকজান্দার ও জেনারেল ষ্টিলওয়েলের এবং মিত্র সৈন্যদের চিন্দুইন নদী পার হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন।

২৮শে মে—ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান, ব্রহ্ম ও ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়েভেল কর্ত্তৃক নয়াদিল্লী হইতে ঘোষণা। ভারত সীমান্ত পর্য্যন্ত জাপানীদের অগ্রগতি।

৬ই হইতে ৮ই জুন—জাপানীদের নিউওয়ে দ্বীপ আক্রমণ। যুদ্ধে জাপানীদের ১৫টি যুদ্ধ-জাহাজ ও ৪টি বিমানবাহী জাহাজডুবি।

২২শে জুন—এলুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জে জাপানী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক কিস্কা দ্বীপ দখল।

২৪শে জুলাই—নিউগিনি দ্বীপে পাপুয়ার উত্তর উপকূলে জাপ সৈন্যের অবতরণ।

৩১শে জুলাই—মোরসবী বন্দরের দিকে জাপানীদের প্রচণ্ড চাপ।

১১ই আগষ্ট—সলোমন দ্বীপে মার্কিণ সৈন্যদের অবতরণ।

২৬শে ও ২৭শে আগষ্ট—সলোমন দ্বীপের নিকট বিরাট নৌ ও আকাশযুদ্ধ। জাপ নৌবহর উত্তরভাগে বিতাড়িত ; জাপ নৌবহরের প্রভূত ক্ষতি।

১৩ই সেপ্টেম্বর—মোরসবী বন্দর অভিমুখে জাপ অগ্রগতি প্রতিহত।

১লা অক্টোবর—নিউগিনি দ্বীপে জাপানীদের পশ্চাদপসরণ।

৭ই অক্টোবর—সলোমন দ্বীপে গুয়াদালক্যানালে জাপানী সৈন্যের অবতরণ।

৯ই অক্টোবর—এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের আত্তু দ্বীপ পরিত্যাগ।

১৫ই অক্টোবর—জাপানীদের গুয়াদালক্যানাল অধিকার চেষ্টা এবং প্রভূত ক্ষয় ও ক্ষতি স্বীকার।

২৬শে অক্টোবর—উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের বিমান ঘাঁটিতে জাপ বিমানের হানা।

১লা নবেম্বর—ষ্টুয়ার্ট দ্বীপমালার নিকট নৌ-যুদ্ধে সাতটি জাপানী জাহাজ ডুবি অথবা ক্ষতিগ্রস্ত।

১১ই ডিসেম্বর—ভারত মহাসাগরে ভারতীয় মাইন তোলা জাহাজ 'বেঙ্গল' কর্ত্তৃক একটি জাপানী হানাদারী জাহাজ নিমজ্জিত।

১৫ই-১৬ই ডিসেম্বর—সলোমন দ্বীপপুঞ্জে মার্কিণ নৌ ও বিমানবহরের বিরাট জয়লাভ। ২৩টি জাপানী জাহাজ ডুবি এবং ২৪ হাজার জাপসৈন্য নিমজ্জিত।

২০শে ডিসেম্বর—ব্রহ্ম সীমান্তে মিত্রবাহিনীর আক্রমণ; আরাকান পর্য্যন্ত অগ্রসর। কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম বিমান আক্রমণ।

১৯৪৩

১৬ই জানুয়ারী—কলিকাতায় জাপানী বিমান হানার সময় ব্রিটিশ বিমানবহরের ফ্লাইট লেফ্‌টেনাণ্ট প্রিং কর্ত্তৃক পাঁচ মিনিটে তিনটি শত্রু বিমান ধরাশায়ী।

৪ঠা ও ৫ই মার্চ্চ—বিসমার্ক সাগরে নৌযুদ্ধে জাপানীদের বিপুল ক্ষতি। ২২টি জাহাজভর্ত্তি সৈন্যদল উৎখাত, ৭৯টি বিমান ধ্বংস এবং ১৫ হাজার স্থলসৈন্য নিমজ্জিত অথবা নিহত।

৩০শে মার্চ্চ—বাঙ্গলা দেশ "বিপজ্জনক এলাকা" বলিয়া ঘোষণা।

১১ই মে—আরাকানে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের মাউংদ পরিত্যাগ।

২০শে মে—ব্রিগেডিয়ার উইনগেটের পরিচালনাধীনে একদল সৈন্য মধ্য ব্রহ্মে হানা দিয়া তিনমাস ধরিয়া অভিযান চালাইয়া আসিয়াছে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।

২৩শে মে—এলুশিয়ানের আত্তুদ্বীপে জাপানীদের প্রতিরোধের অবসান।

১২ই জুন—চীনের চেকিয়াং প্রদেশে চীনা সৈন্যদের জাপ বিমানঘাঁটি কিনওয়াতে প্রবেশ।

৩০শে জুন—সলোমন দ্বীপপুঞ্জে নিউ জর্জ্জিয়া এলাকায় রেনডোভা দ্বীপে মার্কিণ সৈন্যদের অবতরণ। মিত্রবাহিনীর আক্রমণাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ।

৮ই জুলাই—সলোমনে আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে মার্কিণ সৈন্যের অবতরণ।

১২ই জুলাই—জল ও স্থলপথে অবরুদ্ধ হইয়া মুণ্ডায় পরিবেষ্টিত জাপানী সৈন্যদের বিপর্য্যস্ত অবস্থা।

২৪শে জুলাই—নিউগিনি দ্বীপে নাসাউ উপসাগরে মার্কিণ সৈন্যের অবতরণ।

৬ই আগষ্ট—মিত্রবাহিনী কর্ত্তৃক মুণ্ডা অধিকার।

২১শে আগষ্ট—মার্কিণ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বিনা বাধায় কিস্কা দ্বীপ (এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ) দখল।

২৩শে আগষ্ট—দুই বৎসর পর চুংকিংএ প্রথম বিমান আক্রমণ।

২৫শে আগষ্ট—লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় মিত্রবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত।

২৮শে আগষ্ট—নিউ জর্জ্জিয়া দ্বীপে জাপানীদের প্রতিরোধের অবসান।

১৪ই সেপ্টেম্বর—মিত্রবাহিনী কর্ত্তৃক সালামাউয়া দখল।

১৬ই সেপ্টেম্বর—নিউগিনি দ্বীপে অষ্ট্রেলিয়ান্ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক জাপঘাঁটি লে অধিকার।

২রা অক্টোবর—অষ্ট্রেলিয়ান্ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক লে'র উত্তর-পূর্ব্বে ফিনশাফেন দখল।

৭ই অক্টোবর—লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের দিল্লী আগমন।

১৩ই অক্টোবর—রাবাউলে মিত্র বিমানবহরের প্রচণ্ড আক্রমণে জাপানীদের তিনটি ডেষ্ট্রয়ার ও চারিটি জাহাজ ডুবি এবং ১০০টি বিমান বিনষ্ট।

২রা নবেম্বর—সলোমনে মার্কিণ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক জাপানীদের শেষ ঘাঁটি বুগেনভিলা দ্বীপ আক্রমণ।

১২ই নবেম্বর—রাবাউলে মিত্র বিমানের আক্রমণ। ১৫টি জাপানী জাহাজ জখম।

২১শে নবেম্বর—মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিণ বাহিনীর অভিযান, গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের দুইটি দ্বীপে সৈন্যাবতরণ।

২৩শে নবেম্বর—মার্কিণ বাহিনী কর্ত্তৃক মেকিন অধিকৃত।

২৪শে নবেম্বর—মার্কিণ বাহিনী কর্ত্তৃক বেতিও দ্বীপ অধিকৃত।

২৬শে নবেম্বর—নিউগিনিতে অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনী কর্ত্তৃক স্যাটেলবার্গ অধিকৃত।

২৮শে নভেম্বর—ফেণীতে জাপ বিমানের হানা।

২৯শে নবেম্বর—পূর্ব্ববঙ্গে বিমান ঘাঁটিতে জাপ বিমানের হানা।

৫ই ডিসেম্বর—কলিকাতা এলাকায় দিবালোকে জাপ বিমানের হানা।

১৯৪৪

২রা জানুয়ারী—হুয়ন উপদ্বীপের উপকূলে অষ্ট্রেলিয়ানদের অগ্রগতি। মাদাঙ'এর দক্ষিণে মার্কিণ সেনার সাইডর অধিকার।

২২শে জানুয়ারী—প্রশান্ত মহাসাগরের সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের চুক্তি। এই চুক্তি ক্যানবেরায় সম্পন্ন হয়।

৩১শে জানুয়ারী—মার্কিণ বিমান ও নৌবাহিনী কর্ত্তৃক মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—মার্কিণ ও নিউজিল্যাণ্ড সৈন্যদলের গ্রীণ দ্বীপ অধিকার। এই দ্বীপ অধিকৃত হইবার ফলে বুগেনভিলা ও বুকার মধ্যবর্ত্তী জাপঘাঁটি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—বিরাট মার্কিণ নৌবহর কর্ত্তৃক পূর্ব্ব কেরোলিনের শক্তিশালী জাপঘাঁটি আক্রমণ।

২২শে ফেব্রুয়ারী—মার্কিণ নৌবহর কর্ত্তৃক মেরিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের জাপ অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ। সাইপান, টিনিয়ান ও গুয়ামে মার্কিণ বিমানের হানা।

১লা মার্চ্চ—মার্কিণ সেনার অতর্কিতে এডমিরেলটি দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ, ইহাতে রাবাউল ও কেভিয়েং'এর জাপঘাঁটি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

৫ই মার্চ্চ—মার্কিন সমর দপ্তরের ঘোষণায় প্রকাশ, এসিয়া ভূখণ্ডে মার্কিণ পদাতিক বাহিনী সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে ও উত্তর ব্রহ্মে চীনাদের সহিত মিলিত হইতেছে।

২০শে মার্চ্চ—মার্কিণ নৌবহর কর্ত্তৃক এমিরায়ু ও এলুমুসাউ দ্বীপ অধিকার। এই দ্বীপ দুইটি অধিকৃত হইবার ফলে নিউ বৃটেন, নিউ আয়ার্ল্যাণ্ড ও বুগেনভিলায় অবস্থিত জাপসৈন্যগণ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

২২শে মার্চ্চ—জাপ সৈন্যগণ ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

৩১শে মার্চ্চ—ব্রহ্মস্থিত জাপ সৈন্যদল ইম্ফলের উত্তরে মণিপুরের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে।

মণিপুরে তিন মাসের জন্য অবরোধের সৃষ্টি।

১২ই এপ্রিল—বৃটিশ সেনার টিড্ডিম পরিত্যাগ।

২৩শে এপ্রিল—মার্কিন সেনা কর্ত্তৃক মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের উজিল্লাং অধিকার।

২৪শে এপ্রিল—ব্রহ্মের ২শত মাইল অভ্যন্তরে মার্কিন বিমানবাহিত সৈন্যের অবতরণ।

৮ই মে—ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত কোহিমায় জাপানীদের পাল্টা আক্রমণ।

১৪ই মে—ইম্ফলের উত্তর ও দক্ষিণে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদলের আক্রমণ।

২১শে মে—মার্কিন ও চীনা বাহিনী কর্ত্তৃক মিচিনার এক তৃতীয়াংশ অধিকার।

৩০শে মে—মার্কিন বিমান বাহিনী কর্ত্তৃক ব্রহ্ম সড়ক বিচ্ছিন্ন।

৫ই জুন—ব্যাঙ্ককের উপর প্রথম সুপারফোরট্রেসের হানা।

১৫ই জুন—মার্কিন সেনার সাইপানে অবতরণ। পশ্চিম চীনের ঘাঁটি হইতে জাপানের উপর সুপারফোরট্রেসের প্রথম বোমাবর্ষণ।

১৭ই জুন—চীনা সৈন্য কর্ত্তৃক উত্তর ব্রহ্মের জাপঘাঁটি কেমিয়াং অধিকৃত।

২০শে জুন—আসাম হইতে জাপবিতাড়ন সম্পূর্ণ।

২৩শে জুন—কোহিমা-ইম্ফল সড়ক জাপমুক্ত।

১লা জুলাই—ক্যাণ্টন হইতে জাপানীদের উত্তরমুখী অভিযান।

৩রা জুলাই—জেঃ ম্যাকআর্থারের সৈন্যদলের নুম্ফার দ্বীপে অবতরণ।

৮ই জুলাই—মার্কিন সৈন্য কর্ত্তৃক সাইপান অধিকৃত।

২১শে জুলাই—মার্কিন সৈন্যের গুয়ামে অবতরণ।

২৪শে জুলাই—মার্কিন সৈন্যর টিপিয়ান আক্রমণ।

৪ঠা আগষ্ট—মিত্রসৈন্য কর্ত্তৃক মিচিনা পুনরধিকৃত।

৮ই আগষ্ট—জাপ সেনা কর্ত্তৃক ক্যাণ্টন-হাঙ্কাউ রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ-স্থল হেঙ্গিয়াং অধিকার।

১১ই আগষ্ট—বৃটিশ সেনা কর্ত্তৃক টাঙ্গু সহর অধিকৃত।

৮ই সেপ্টেম্বর—জাপ সেনা কর্ত্তৃক মধ্যচীনের মার্কিন বিমানঘাঁটি লিংলিং অধিকৃত।

১৪ই সেপ্টেম্বর—হালমাহেরা দ্বীপে (নিউ গিনির পশ্চিমে) মার্কিন সেনার অবতরণ।

১৫ই সেপ্টেম্বর—মার্কিন সৈন্যের পেলিলিউ দ্বীপে অবতরণ।

২৬শে সেপ্টেম্বর—মাঞ্চুরিয়ার আনশানে মার্কিন বোমারুর হানা।

৬ই অক্টোবর—ফুকিয়েন, হুনাণ, কোয়াংসি ও কোয়াঙ্‌টুং প্রভৃতি চীনের প্রদেশগুলিতে প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ।

৭ই অক্টোবর—ডাম্বার্টন ওক্সের আলোচনা সমাপ্ত।

১১ই অক্টোবর—ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য জাপানীদের দ্বিতীয় উদ্যম ব্যর্থ।

১৩ই অক্টোবর—জাপসৈন্য চীনের পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত ফুচাউ অধিকার করে।

২০শে অক্টোবর—লেত দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলে মার্কিন সেনার অবতরণ। ভারতীয় সৈন্য কর্ত্তৃক টিড্ডিম পুনরধিকৃত।

হোক্কাইডো অঞ্চলে কামানের গোলা বর্ষণ। নৌবাহিনী কর্ত্তৃক এই সর্ব্বপ্রথম খাস জাপান আক্রান্ত।

ম্যানিলায় ম্যাক্‌আর্থার ও মাউণ্টবেটানের বৈঠক।

১৭ই জুলাই—পটসড্যামে তিন প্রধানের বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সভাপতি নির্ব্বাচিত।

১৮ই জুলাই—টোকিও উপসাগরে জাপ যুদ্ধজাহাজ মার্কিন বিমানের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ।

২৫শে জুলাই—পটসড্যামে তিন প্রধানের বৈঠকের কাজ শেষ করিয়া লর্ড মাউণ্টবেটান লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৬শে জুলাই—বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীর পদে মিঃ ক্লিমেণ্ট এ্যাট্‌লী নির্ব্বাচিত। আত্মসমর্পণের দাবী জানাইয়া চীন, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পটসড্যাম হইতে জাপানের উদ্দেশ্যে বার্ত্তা প্রেরণ।

২৮শে জুলাই—যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে বিশ্বরাষ্ট্র সনদ অনুমোদন।

১লা আগষ্ট—প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী কর্ত্তৃক ওয়েক দ্বীপ আক্রান্ত।

২রা আগষ্ট—তিন প্রধানের বৈঠকে জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৬ই আগষ্ট—হিরোশিমায় সর্ব্বপ্রথম এ্যাটম বা আণবিক বোমা বর্ষণ। হিরোশিমার শতকরা ৬০ ভাগ অংশ বিনষ্ট।

৮ই আগষ্ট—রুশ পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ কর্ত্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। ঘোষণায় বলা হয় যে, মধ্যস্থতা করিতে জাপান কর্ত্তৃক রাশিয়া অনুরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু রাশিয়া প্রত্যাখান করিয়াছে।

নাগাসাকির উপর এই দ্বিতীয়বার এ্যাটম বা আণবিক বোমাবর্ষণ।

৯ই আগষ্ট—মাঞ্চুরিয়ায় রুশ আক্রমণ আরম্ভ।

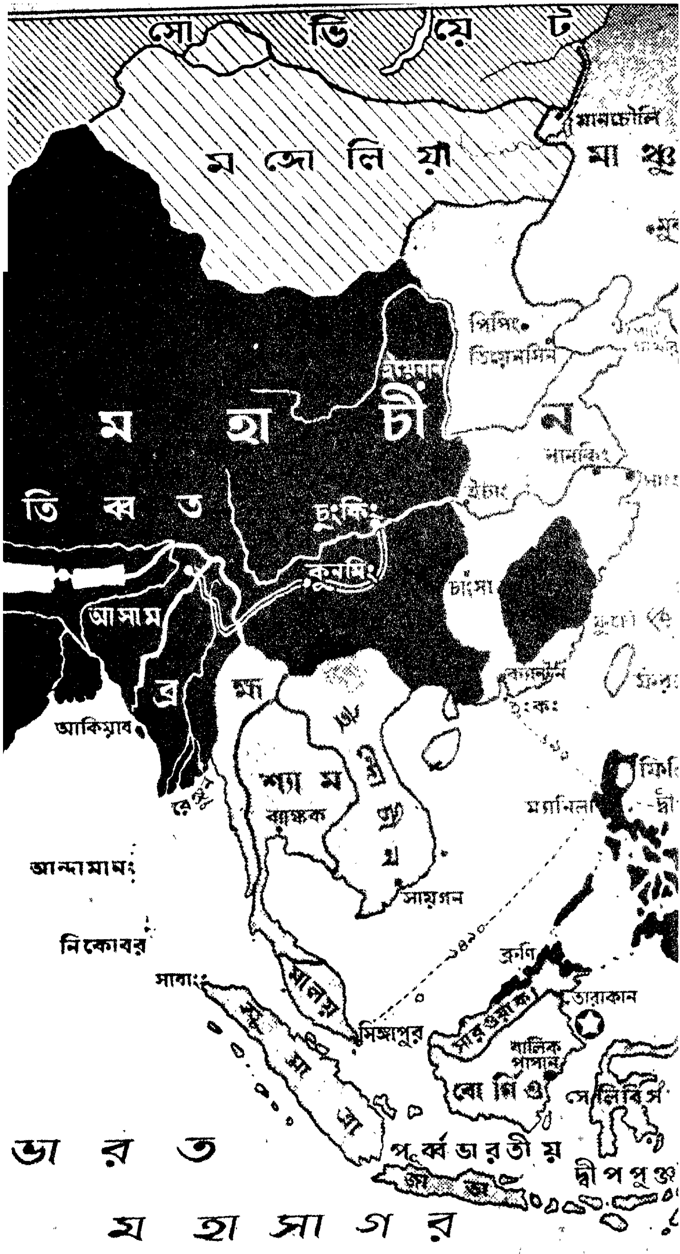
১০ই আগষ্ট—জাপ সম্রাটের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা হইলে জাপান আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত বলিয়া টোকিও বেতার কেন্দ্র হইতে ঘোষণা এবং পট্‌সডামের সর্ত্ত গ্রহণে সম্মতি।

১৪ই আগষ্ট—মিত্রশক্তির সহিত বার্ত্তা বিনিময়ের পর জাপানের বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ ও সমগ্র এশিয়া খণ্ডে জাপানী যুদ্ধের অবসান। ফলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি।*

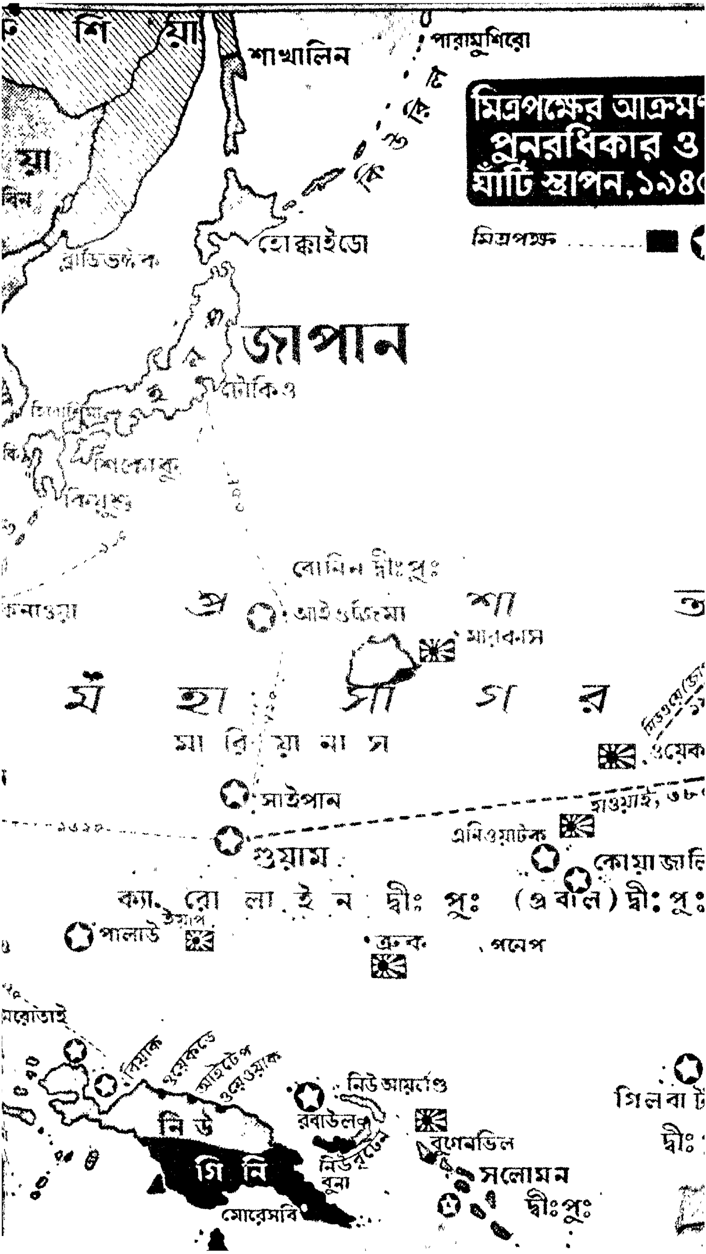
সমাপ্ত

---

* দিনপঞ্জীর এই তালিকা যথাসম্ভব নির্ভুল করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তথাপি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গা কিম্বা নৌযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু কিছু গোলমাল আছে। যেমন, জাপানী যুদ্ধের প্রথম দিকের গুয়াম, ওয়েক, আন্দামান দ্বীপ কিম্বা ম্যাকাসার প্রণালীর নৌযুদ্ধ ইত্যাদির তারিখ বোধহয় সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। তবে, বড় বড় ঘাঁটি, সহর ও যুদ্ধ সম্পর্কে এই তালিকা মোটামুটি নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণিক।—লেখক।



সোভিয়েট
মঙ্গোলিয়া
মানচৌলি
পিপিং
মহাচীন
তিব্বত
চুংকিং
কুনমিং
চাংসা
আসাম
ব্রহ্ম
আকিয়াব
রেঙ্গুন
শ্যাম
ব্যাঙ্কক
সায়গন
হংকং
ম্যানিলা
আন্দামান
নিকোবর
সাবাং
মালয়
সিঙ্গাপুর
সুমাত্রা
ব্রুনি
তারাকান
বালিক পাপান
বোর্ণিও
সেলিবিস
পূর্ব্ব ভারতীয়
দ্বীপপুঞ্জ
জাভা
ভারত
মহাসাগর



মিত্রপক্ষের আক্রমণ
পুনরধিকার ও
ঘাঁটি স্থাপন, ১৯৪
মিত্রপক্ষ
শাখালিন
পারামুশিরো
হোক্কাইডো
জাপান
টোকিও
বোনিন দ্বীঃপুঃ
আইওজিমা
মারকাস
মহাসাগর
মারিয়ানাস
সাইপান
গুয়াম
এনিওয়াটক
ক্যারোলাইন দ্বীঃ পুঃ
(প্রবাল) দ্বীঃ পুঃ
পালাউ
ইয়াপ
পনেপ
মরোতাই
বিয়াক
নিউ আয়র্ল্যাণ্ড
রবাউল
বুগেনভিল
সলোমন
দ্বীঃপুঃ
নিউ গিনি
বুনা
মোরেসবি